৵০ আকারাদি বর্ণক্রমে ষষ্ঠ কল্পের তৃতীয় ভাগের নির্ঘণ্ট পত্র।

	সংখ্যা	পৃষ্ঠ
আত্মোৎকর্ষ বিধান	২৬৩	৫০
আত্মোৎকর্ষ বিধান	২৬৬	১১৯
আত্মোৎকর্ষ বিধান	২৬৭	১৪৩
আত্মোৎকর্ষ বিধান	২৭২	২৫১
আর্য্য জাতির উৎপত্তি ও বিস্তার	২৬৫	৯০
ইজিপ্‌টীয় মত	২৬২	৩৩
ইজিপ্‌টীয় মত	২৬৬	১২৯
ইতিহাস তত্ত্ব	২৭০	২১৩
ঋগেদ সংহিতা	২৬১	১
ঋগ্বেদ সংহিতা	২৬২	১৭
ঋগ্বেদ সংহিতা	২৬৩	৪১
ঋগ্বেদ সংহিতা	২৬৪	৬৫
ঋগ্বেদ সংহিতা	২৬৫	৮৯
ঋগ্বেদ সংহিতা	২৬৬	১১৩
ঋগ্বেদ সংহিতা	২৬৭	১৩৭
ঋগ্বেদ সংহিতা	২৬৮	১৫৭
ঋগ্বেদ সংহিতা	২৭০	১৯৭
ঋগ্বেদ সংহিতা	২৭১	২২১
ঋগ্বেদ সংহিতা	২৭২	২৪৫
ওকবৃক্ষ	২৬৯	১৮৭
কলিকাতা মাসিক ব্রাহ্মসমাজ— প্রধান আচার্য্যের উপদেশ	২৬২	২০
কলিকাতা মাসিক ব্রাহ্মসমাজ— প্রাধান আচার্য্যের উপদেশ	২৬৬	১১৪
কলিকাতা মাসিক ব্রাহ্মসমাজ— প্রধান আচার্য্যের উপদেশ	২৬৮	১৫৮
কলিকাতা মাসিক ব্রাহ্মসমাজ— প্রধান আবার্য্যের উপদেশ	১৭২	২২১
কলিকাতা মাসিক ব্রাহ্মসমাজ	২৬৭	১৩৮
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য প্রণালী পরিবর্ত্তনের প্রার্থনা পত্র	২৬৪	৮০
ঐ পত্রের প্রত্যুত্তর	২৬৪	৮২
ঢন্নপুরী বেদসমাজ	২৬৩	৫৬
জীবনের প্রকৃত ব্যবহার	২৬১	৬
জীবনের প্রকৃত ব্যবহার	২৬২	২৫
জীবনের প্রকৃত ব্যবহার	২৬৩	৪৮
জীবনের প্রকৃত ব্যবহার	২৬৪	৭১
তত্ত্ব বিদ্যা	২৭২	২৪৭
থিওডোর পারকারের পত্র	২৬৪	৭৮
থিওডোর পারকারের পত্র	২৬৬	১২৬
থিওডোর পারকার	২৬৯	১৮৩
থিওডোর পারকার	২৭০	২০৯
থিওডোর পারকার	২৭২	২৫৬
ধর্ম্মোন্নতি	২৬১	১৩
নূতন পুস্তক	২৬১	১৫
নূতন পুস্তক	২৬৪	৮৪
নূতন পুস্তক	২৬৬	১৩০
নূতন পুস্তক	২৬৭	১৫৪
নূতন পুস্তক	২৬৮	১৭৬
নিবাধই ব্রাহ্মসমাজের ১৪সাম্বৎসরিক উৎসব	২৬৯	১৮৯
পৃথিবী ও মনুষ্য	২৬১	৯
পৃথিবী ও মনুষ্য	২৬২	২৮
পৃথিবী ও মনুষ্য	২৬৩	৫৪
পৃথিবী ও মনুষ্য	২৬৪	৭৫
পৃথিবী ও মনুষ্য	২৬৬	১২৩
পৃথিবী ও মনুষ্য	২৭২	২৫৪
পুরঞ্জনোপাখ্যান	২৬৭	১৪৮
প্রেরিত—সংখ্যা ১	২৬২	৩৪
প্রেরিত—সংখ্যা ২	২৬৩	৬২
প্রেরিত—সংখ্যা ৩	২৬৪	৮৫
প্রেরিত—সংখ্যা ৪	২৬৫	১০৯
প্রেরিত পত্র	২৬৬	১৩১
ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	২৬৯	১৮১
ভবানীপুর ত্রয়োদশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজের অধ্যেতার নিবেদন	২৬৩	৫৭
ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উপদেশ	২৬১	৪
মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	২৭০	২০০
ব্রাহ্মবন্ধু সভা	২৬৮	১৬৬
ব্রাহ্মধর্ম্ম ও পৌত্তলিক সমাজ	২৭০	২০৬
ব্রহ্মবিদ্যালয়—প্রথম উপদেশ	২৬২	২১
ব্রহ্মবিদ্যালয়—দ্বিতীয় উপদেশ	২৬৩	৪৪
ব্রহ্মবিদ্যালয়—তৃতীয় উপদেশ	২৬৪	৬৬
ব্রহ্মবিদ্যালয়—চতুর্থ উপদেশ	২৬৫	১০৩
ব্রহ্মবিদ্যালয়—পঞ্চম উপদেশ	২৬৬	১১৬
ব্রহ্মবিদ্যালয়—ষষ্ঠ উপদেশ	২৬৭	১৪০
ব্রহ্মবিদ্যালয় সপ্তম উপদেশ	২৬৮	১৬০
ব্রহ্মবিদ্যালয়—অষ্টম উপদেশ	২৭০	২০২
ষট্‌ত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ	২৭১	২২২
ঐ মধ্যাহ্ন কাল	২৭১	২৩৩
ঐ সায়ংকাল	২৭১	২৩৫
সিপিয়া মৎস্য	২৬৭	১৪৭
স্মৃতি শাস্ত্র	২৬১	১১
স্মৃতি শাস্ত্র	২৬২	৩০
স্মৃতি শাস্ত্র	২৬৮	১৬৩
স্মৃতি শাস্ত্র	২৭০	২১২
স্ত্রীর প্রতি উপদেশ	২৬৭	১৫৫
স্ত্রীর প্রতি উপদেশ	২৬৯	১৯৩
স্ত্রীর প্রতি উপদেশ	২৭১	২৪২
Mediator	২৬৭	১৫৫
Moral Perfection of Jesus	২৭০	২১৮
Nationality Promotion Society	২৭২	২৫৮
Religious Faith	২৬২	৩৬
Religious Faith	২৬৪	৮৭

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাসুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২২। কলিগতাব্দ ৪৯৬৬। ৫ চৈত্র শনি বার।

BANGIYA SAHITYA PARISHAD LIBRARY
১৯১
বি

একমেবাদ্বিতীয়ং

ষষ্ঠ কল্প
চতুর্থ ভাগ
বৈশাখ ১৭৮৮ শক।

২৭৩ সংখ্যা। ৩৭ ব্রাহ্মসম্বৎ

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

প্রথমমণ্ডলস্য ত্রয়োদশানুবাকে সপ্তমং সূক্তং।

গোতমঋষিঃ পংক্তিচ্ছন্দঃ ইন্দ্রোদেবতা।

৮৫৮

১১ ই॒মে চি॒ত্তব॑ ম॒ন্যবে॒ বেপে॑তে ভি॒যসা॑ ম॒হী। যদি॑ন্দ্র বজ্রি॒ন্নোজ॑সা বৃ॒ত্রং ম॒রুত্বাঁ॒ অব॑ধী॒রর্চ্চ॒ন্ননু॑ স্ব॒রাজ্য॑ং।

১১ 'মহী' মহত্যৌ 'ইমে চিৎ' দ্যাবাপৃথিব্যাবপি হে ইন্দ্র 'তব' 'মন্যবে' ত্বদীয়কোপাৎ 'ভিযসা' ভীতা 'বেপেতে' কম্পেতে হে 'বজ্রিন্' বজ্রবন্ 'ইন্দ্র' 'মরুত্বান্' মরুদ্ভির্যুক্তঃ ত্বং 'ওজসা' বলেন 'যৎ' যদা 'বৃত্রং' 'অবধীঃ'। তদা দ্যাবাপৃথিব্যাবপি ভযেনাকম্পিষাতাং ইত্যর্থঃ।

১১ হে বজ্রধর ইন্দ্র! যখন তুমি স্বাধিপত্য প্রকটিত করিয়া বলপূর্ব্বক বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলে, তখন এই বৃহৎ স্বর্গ মর্ত্যও তোমার কোপ-ভয়ে কম্পিত হইয়াছিল।

৮৫৯

১২ ন বেপ॑সা॒ ন ত॑ন্য॒তেন্দ্র॑ং বৃ॒ত্রো বি বী॑ভয়ৎ। অ॒ভ্যে॑ন॒ং বজ্র॒ আয॒সঃ স॒হস্র॑ভৃষ্টিরায়॒তার্চ্চ॒ন্ননু॑ স্ব॒রাজ্য॑ং।

১২ 'বৃত্রঃ' 'ইন্দ্রং' 'বেপসা' স্বকীযেন কম্পনেন 'ন' 'বিবীভযৎ' ভীতং নাকরোৎ। তথা 'তন্যতা' স্বকীযেন ঘোরেণ গর্জ্জনশব্দেন 'ন' বিবীভযৎ। অপিচ ইন্দ্রেণ বিসৃষ্টঃ 'আযসঃ' অযোমযঃ 'সহস্রভৃষ্টিঃ' অনেকাভির্ধারাভির্যুক্তঃ 'বজ্রঃ' 'এনং' বৃত্রং 'অভি' 'আযত' হন্তুমাভিমুখ্যেনাগচ্ছৎ। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ।

১২ বৃত্রাসুর কম্পন বা গর্জ্জন দ্বারা ইন্দ্রকে ভীত করিতে পারে নাই; প্রত্যুত ইন্দ্র স্বাধিপত্য প্রকটন পূর্ব্বক যে লৌহময় সহস্রধার বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা বৃত্রাসুরের অভিমুখে উপস্থিত হইয়াছিল।

৮৬০

১৩ যদ্বৃ॒ত্রং তব॑ চা॒শনি॒ং বজ্রে॑ণ স॒মযো॑ধয়ঃ। অহি॑মিন্দ্র॒ জিঘা॑ংসতো দি॒বি তে॑ বদ্বধে॒ শবোর্চ্চ॒ন্ননু॑ স্ব॒রাজ্য॑ং।

১৩ হে 'ইন্দ্র' 'যৎ' যদা 'বৃত্রং' 'তব' হননার্থং তেন সৃষ্টাং 'অশনিং' 'চ' ত্বং 'বজ্রেণ' 'সমযোধয়ঃ' সম্যক্ প্রাহার্ষীঃ। তদানিং 'অহিং' আগত্য হন্তারং বৃত্রং 'জিঘাংসতঃ' হন্তুমিচ্ছতঃ 'তে' তব 'শবঃ' বলং 'দিবি' 'বদ্বধে' বদ্ধং অনুস্যূতং ব্যাপ্তমাসীৎ। শিষ্টং পূর্ব্ববৎ।

১৩ হে ইন্দ্র! যখন তুমি স্বীয় প্রভুত্ব প্রকটন পূর্ব্বক বৃত্রাসুরকে ও তোমার প্রতি

প্রক্ষিপ্ত তাহার অশনিকে বজ্র দ্বারা প্রহার করিয়াছিলে, তখন নির্য্যাতনার্থ সমাগত সেই বৃত্রকে হননেচ্ছায় তোমার বল আকাশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল।

৮৬১

১৪ অভিষ্টনে তে অদ্রিবো যৎস্থা জগচ্চ রেজতে। ত্বষ্টা চিত্তে মন্যবে ইন্দ্র বেবিজ্যতে ভিযার্চ্চন্ননু স্বরাজ্যং।

১৪ হে 'অদ্রিবঃ' বজ্রবন্নিন্দ্র 'তে' তব 'অভিষ্টনে' সিংহনাদে সতি 'স্থাঃ' স্থাবরং 'জগৎ' জঙ্গমং 'চ' 'যৎ' অস্তি তদুভয়ং 'রেজতে' কম্পতে। 'ত্বষ্টা চিৎ' বজ্রনির্ম্মাতা ত্বষ্টা চ 'তব মন্যবে' ত্বদীয়ায় কোপায় 'ভিয়া' ভীত্যা 'বেবিজ্যতে' ভৃশং কম্পতে। অন্যৎ সমানং।

১৪ হে বজ্রধর ইন্দ্র! তোমার সিংহনাদে স্থাবর জঙ্গম কম্পিত হয়। বজ্র নির্ম্মাতা বিশ্বকর্ম্মাও তোমার কোপ-ভয়ে পুনঃপুন কম্পিত হন। তুমি এই রূপে স্বীয় স্বাধিপত্য বিস্তার করিতেছ।

৮৬২

১৫ নহি নু যাদধীমসীন্দ্রং কো বীর্য্যা পরঃ। তস্মিন্নৃম্ণমুত ক্রতুং দেবা ওজাংসি সংদধুরর্চ্চন্ননু স্বরাজ্যং।

১৫ 'যাৎ' যান্তং সর্ব্বত্র ব্যাপ্য বর্ত্তমানং 'ইন্দ্রং' 'নহি' 'নু' 'অধীমসি' বয়ং নহ্যবগচ্ছামঃ। যতোবয়মল্পাঃ। 'পরঃ' ইত্যেতৎ সকারান্তমব্যয়ং বৈদূর্য্যমাচষ্টে পরোদিবা পরএনেতি যথা। পরঃ পরস্তাদতিদূরে মনুষ্যৈরনবগাহ্যে স্থানে 'বীর্য্যা' বীর্য্যেণ সামর্থ্যেন বর্ত্তমানমিন্দ্রং 'কঃ' মনুষ্যঃ জানীযাৎ ন কোঽপীত্যর্থঃ। কস্মাদিতিচেৎ। তত্রাহ তস্মিন্নিতি। যস্মাৎ 'তস্মিন্' ইন্দ্রে 'দেবাঃ' 'নৃম্নং' ধনং 'উত' অপিচ 'ক্রতুং' বীর্য্যং কর্ম্ম 'ওজাংসি' বলানি চ 'সংদধুঃ' স্থাপযাঞ্চক্রুঃ। তস্মাদিত্যর্থঃ।

১৫ সর্ব্বত্রগামী ইন্দ্রকে আমরা অবগত নহি। অতি দূরে বর্ত্তমান ইন্দ্রের সামর্থ্য কোন মনুষ্যই জানিতে পারে না; যে হেতু দেবতারা ইন্দ্রেতে ধন, বীর্য্য ও বল স্থাপন করিয়াছেন। ইন্দ্র স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিতেছেন।

৮৬৩

১৬ যামথর্ব্বা মনুষ্পিতা দধ্যঙ্ধিয মত্নত। তস্মিন্ ব্রহ্মাণি পূর্ব্বথেন্দ্র উক্থা সমগ্মতার্চ্চন্ননু স্বরাজ্যং। ১।৫।৩১।

১৬ 'অথর্ব্বা' এতৎসংজ্ঞকঋষিঃ 'পিতা' সর্ব্বাষাং প্রজানাং পিতৃভূতঃ 'মনুঃ' চ 'দধ্যঙ্' অথর্ব্বণঃ পুত্রঃ এতৎ সংজ্ঞকঃ ঋষিশ্চ 'যাং' 'ধিযং অত্নত' যং কর্ম্মাতন্বত অকুর্ব্বন্। 'তস্মিন্' কর্ম্মণি যানি 'ব্রহ্মাণি' হবির্লক্ষণানি অন্নানি 'উক্থা' শস্ত্ররূপাণি স্তোত্রাণি চ যানি সন্তি তানি সর্ব্বাণি তস্মিন্ 'ইন্দ্রে' 'সমগ্মত' সমগচ্ছন্ত। তত্র দৃষ্টান্তঃ। 'পূর্ব্বথা' পূর্ব্বেষামন্যেষাং বশিষ্ঠাদীনাং যজ্ঞেষু যথা হবীংষি স্তোত্ররূপাণি চেন্দ্রেণ সংগচ্ছন্তে তদ্বৎ। যঃ ইন্দ্রঃ 'রাজ্যং' স্বস্য রাজত্বং 'অনু' 'অর্চ্চন্' অনু পূজয়ন্ বৃত্রবধাদিরূপেণ কর্ম্মণা স্বকীয়মধিপতিত্বং প্রকটযন্নিত্যর্থঃ।১।৫।৩১।

১৬ ইন্দ্র পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষিদিগের যজ্ঞের ন্যায় অথর্ব্ব, সকলের পিতা মনু, ও দধ্যঙ্ নামক ঋষিদিগের যজ্ঞীয় অন্ন ও স্তোত্র সকল গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ইন্দ্র বৃত্র বধাদি দ্বারা স্বকীয় আধিপত্য প্রকটিত করিতেছেন। ১।৫।৩১।

পঞ্চমোধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

মেদিনীপুরে গোপগিরিতে বসন্ত কালে ব্রহ্মোপাসনা।

বসন্ত ঋতু উপস্থিত, প্রাতঃ-সূর্য্য সমুদিত, গোপগিরি প্রফুল্লিত। আমরা এই শুভ ক্ষণে এক কালে নূতন ঋতু, নূতন দিবস, শরীর ও মনের নূতন বীর্য্য, লাভ করিয়াছি। সকলই অভিনব; আমারদের ভক্তি-পুষ্প অভিনব রূপ ধারণ পূর্ব্বক সেই মঙ্গলময়ের চরণে কি অর্পিত হইবে না? বন উপবন, গিরি কানন, স্রোতঃস্বতী, তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে; পক্ষিগণ বৃক্ষ-শাখায় আরূঢ় হইয়া তাঁহার গুণ গান করিতেছে; মলয় সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া তাঁহার যশ প্রচার করিতেছে; স্বয়ং বসন্ত গন্ধ পুষ্প

হস্তে লইয়া তাঁহার পূজার জন্য অগ্রসর হইয়াছে; আমরাই কি কেবল তাঁহার উপাসনা হইতে বিরত থাকিব? তিনিই এই নব ঋতু, নব পত্র, নব নব কলিকা প্রেরণ করিতেছেন। যিনি ব্যাধিকে আরোগ্যে, বিপদ্‌কে সম্পদে, পরাজয়কে জয়ে পরিণত করেন; তিনিই বসন্তের প্রকাশ করেন। যিনি শীতকে বসন্তে, ব্যাধি আরোগ্যে, বিপদ্ সম্পদে, পরাজয় জয়ে, পরিণত করেন; তিনি কি মৃত্যুকে অমৃতেতে পরিণত করিতে পারেন না? সেই পারলৌকিক জীবন, বসন্তের ন্যায় আমারদিগের সম্বন্ধে স্ফুরিত হইবে; বাহ্য সূর্য্য আমারদিগের সম্মুখে এ ক্ষণে যে রূপ দীপ্তি পাইতেছে, তাহা অপেক্ষা উজ্জ্বলতর রূপে প্রেম-সূর্য্য পর লোকে আমারদের সম্মুখে দীপ্তি পাইবেক। যে মঙ্গলময় পিতা আমারদিগকে ইহ কালে ধর্ম্মাচরণের সুখের পর আবার পর লোকে এ রূপ আনন্দ প্রদান করিবেন, তাঁহার উপাসনাতে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাক। তাঁহাকে প্রীতি কর, তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন কর; তাহা হইলে বসন্তের কুসুম অপেক্ষা তোমারদের হৃদয় মধুময় হইবে, বসন্তের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সৌন্দর্য্য তোমারদের মুখশ্রীতে প্রকাশিত হইবে, মলয়-সমীরণ অপেক্ষা প্রফুল্লকর আত্ম-প্রসাদের হিল্লোল তোমারদের অন্তরে নিত্য সঞ্চরণ করিবে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

মাসিক ব্রাহ্মসমাজ।

৬ চৈত্র ১৭৮৭ শক।

প্রধান আচার্য্যের উপদেশ।

যিনি চন্দ্র-তারকে থাকিয়া—চন্দ্র-তারকের অন্তরে থাকিয়া চন্দ্র-তারককে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই আমারদের আত্মাতে থাকিয়া—আত্মার অন্তরে থাকিয়া জ্ঞান ধর্ম্মে তাহাকে পরিপুষ্ট ও উন্নত করিতেছেন। তিনি আকাশে, তিনি আত্মাতে। তিনি বাহিরে, তিনি অন্তরে। তিনি সর্ব্ব-সাক্ষী, তিনি কর্ম্মাধ্যক্ষ। তিনিই আমারদের আরাধ্য দেবতা। তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য দূরে যাইতে হয় না, দেশ বিদেশে অনুসন্ধান করিতে হয় না—তাঁহার প্রিয় আবাস-স্থান এই পবিত্র আত্মা। যিনি আপনার আত্মাকে পবিত্র করেন, তিনি তাঁহাকে অন্তরে দেখিতে পান। আকাশে রূপ নাই; আকাশকে চক্ষে দেখা যায় না, আকাশকে হস্তে ধরিতে পারি না—তথাপি আমার সম্মুখে এই সুবিস্তৃত অসীম আকাশকে আমি সুস্পষ্ট অনুভব করিতেছি। এই শূন্য আকাশকে আমরা যে রূপ অনুভব করিতেছি, পূর্ণ ঈশ্বরকেও সে রূপ অনুভব করি না—আমারদের এ কি মোহ! আকাশ শূন্য পদার্থ—ঈশ্বর অনাকাশ, তিনি আকাশ নহেন, তিনি শূন্য নহেন; কিন্তু তিনি পূর্ণ, তিনি সত্য। আকাশ তাঁহার সত্তাতে—সেই সত্যের সত্তাতে পূর্ণ রহিয়াছে। তথাপি শূন্য আকাশকে আমরা যে রূপ অনুভব করিতেছি, পূর্ণ ঈশ্বরকে সে রূপ অনুভব করি না। যিনি এই আকাশে রহিয়াছেন; তিনি আবার যেখানে আকাশ নাই, সেখানেও রহিয়াছেন। আকাশ নাই কোথায়? আকাশ নাই আত্মাতে। আপনার শরীরের মধ্যে অশরীর আত্মাকে দেখ, দেখিবে যে সেখানে আকাশ নাই। আত্মাতে আকাশ নাই—আত্মা আকাশের অতীত পদার্থ। আত্মা স্থূল নহে, অণু নহে, হ্রস্ব নহে, দীর্ঘ নহে; এই আত্মার মধ্যেই অনাকাশ স্বপ্রকাশ পরমাত্মা অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি বাহিরে এই সমস্ত আকাশে ব্যাপ্ত

রহিয়াছেন; এবং যেখানে এই আকাশ নাই, সেখানেও রহিয়াছেন। এই চর্ম্ম-চক্ষু দ্বারা দেখিতে গেলে তাঁহাকে দূর হইতেও দূরে মনে হইবে, অন্তশ্চক্ষু দ্বারা স্বীয় আত্মাতেই তাঁহার উপলব্ধি হইবে। সেই একোবশী পরমেশ্বরের শাসনে আকাশে রবি শশী, আত্মাতে দয়া ধর্ম্ম, নিয়মিত হইতেছে। সেই একোবশী পরমেশ্বরেরই শাসনে মনুষ্য তাঁহার ধর্ম্ম-সেতু লঙ্ঘন করিতে কুণ্ঠিত, ভীত, লজ্জিত হয়—লঙ্ঘন করিলে গ্লানিতে শোকেতে তাহার হৃদয় শতধা ভিন্ন হইয়া যায়, নরকাগ্নিতে তার আপাদ-মস্তক দগ্ধ হইয়া যায়। তাঁহারি নিয়মে পাপী দণ্ড ভোগ করিতেছে, পুণ্যাত্মা পবিত্রতা লাভ করিতেছে। তাঁহারি করুণাতে পশু-সকল এই পৃথিবীর সুখ, পৃথিবীতে ভোগ করিয়া, পৃথিবীতেই লীন হইতেছে; তাঁহারি প্রসাদে আত্মা ধর্ম্ম লইয়া ঈশ্বর লইয়া, অন্য আকাশে অন্য লোকে, উদিত হইতেছে। পরমেশ্বরের শাসনে জড় রাজ্য, ধর্ম্ম রাজ্য, সকলি প্রশাসিত হইতেছে। যিনি এই আকাশের অন্তরাত্মা, যিনি এই আত্মার অন্তরাত্মা, তিনিই আমারদের আরাধ্য দেবতা। হৃদয়কে পবিত্র করিয়া এখানে তাঁর পবিত্র সত্তা উপলব্ধি কর, এখনি তাঁর আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ হও। তিনি এখানে উপস্থিত আছেন, তিনি তাঁহার তদ্গত ভক্তদিগের নিকট হইতে পূজা গ্রহণের জন্য হস্ত প্রসারিত করিয়া রহিয়াছেন। তিনি তাঁর সত্য তাঁহারদের জন্যে এখনি ব্যক্ত করিতেছেন। দেখ, রসনা তাঁহার গুণ বলিয়া ক্ষান্ত হইতেছে না। যত ক্ষণ না প্রতি জনে তাঁহার পবিত্র স্বরূপ উপলব্ধি করিবে, তত ক্ষণ তিনি এই রসনাকে তাঁহার কার্য্যে নিযুক্ত রাখিবেন। যত ক্ষণ না প্রত্যেকে তাঁহার পবিত্র স্বরূপ উপলব্ধি করিবে, যত ক্ষণ না প্রত্যেকে তাঁহাকে হৃদয়ের পূজা দিতে প্রস্তুত হইবে; তত ক্ষণ তিনি তাঁর সত্য প্রেরণ করিবেন, তত ক্ষণ রসনা হইতে তাঁহার সত্য উৎসারিত হইতে থাকিবে। তিনি এখনি পূজা গ্রহণের নিমিত্তে উপস্থিত আছেন, তাঁর পবিত্র নিঃশ্বাস এখানে সমীরিত হইতেছে, তাঁর এই বহমান-বসন্ত-সমীরণ-স্বরূপ আনন্দ-প্রবাহ অনুভব করিয়া তাঁহাকে পূজা কর। তাঁহার নিকটে অবনত হও। তিনি অনন্ত দেব, মঙ্গলময়, মহান্; তিনি আমারদের পিতা মাতা বলিয়া আমারদের নিকটে প্রীতি চান, পূজা চান; আমরা কি এ প্রকার অধম ও কঠোর যে তাহাও তাঁহাকে দিতে পারিব না। জড়তা দীর্ঘ-সূত্রতা পরিত্যাগ কর—ঈশ্বরের চরণে প্রণত হও। কি আশ্চর্য্য! বলিতে বলিতে যে এখানে সকলেই স্তব্ধ হইয়া আনন্দ-পুলকে তাঁহার মধুময় ভাব অবলোকন করিতেছেন, দেখিতেছি। এ কি আশ্চর্য্য মনোহর দৃশ্য; হে হৃদয়েশ্বর! আমারদের প্রীতি-পূজা গ্রহণ কর। তোমাকে বার বার নমস্কার করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

তত্ত্ববিদ্যা।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার সার সঙ্কলন করিয়া এই একটি অপূর্ব্ব সন্ধান পাওয়া যায় যে মূল-তত্ত্ব-সকলকে প্রজ্ঞাতেই অন্বেষণ করিতে হইবে। প্রজ্ঞার প্রকৃত ভাব স্পষ্ট-রূপে অবগত হইতে হইলে, ইন্দ্রিয়-বোধ এবং বুদ্ধি—এ দুয়ের সহিত উহার প্রভেদ অবধারণ করা আবশ্যক; অতএব ইন্দ্রিয়-বোধ ও বুদ্ধি—এ দুই ক্রিয়া উপলক্ষ্যে

প্রধান প্রধান কয়েকটি তথ্য অগ্রে পরিস্ফুট করিয়া পশ্চাতে প্রজ্ঞা-সম্বন্ধীয় গুরুতর বিষয়-সকলের প্রতি বিশেষ-রূপে মনো-নিবেশ করা যাইতেছে।

রূপ দর্শন, রসাস্বাদন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-বোধ ব্যতীত আমরা কোন বিষয়কেই প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ নহি। এই সকল ইন্দ্রিয়-বোধ কোথা হইতে আসিতেছে? আমারদের অন্তরে—যেখানে আমরা জীবাত্মাকে উপলব্ধি করি—সেখান হইতে নহে; এবং তাহারও অভ্যন্তরে—যেখানে আমরা সকল আত্মার আত্মা পরমাত্মাকে উপলব্ধি করি—সেখান হইতেও নহে; কিন্তু বাহিরের ভৌতিক বস্তু-সকল হইতেই উহারা সাক্ষাৎ অবতীর্ণ হইতেছে। ভৌতিক বস্তু-সকলকেই আমরা রূপ রস প্রভৃতির আধার বলিয়া নিশ্চয় করিয়া থাকি। একটা আম্র ফল, যাহাকে আমরা চক্ষুতে দর্শন করিতেছি, তাহাকেই আমরা আবার জিহ্বাতে আস্বাদন করিতেছি—এ স্থলে দৃষ্টি করিবার শক্তি এবং আস্বাদন করিবার শক্তি যেমন একই আত্মার শক্তি; সেই রূপ দৃষ্ট হইবার শক্তি এবং আস্বাদিত হইবার শক্তি একই ভৌতিক বস্তুর শক্তি; একই ভৌতিক বস্তু আমাদের দৃষ্টি এবং আস্বাদন উভয়কেই উত্তেজনা করিতেছে। যখন আমারদের ইন্দ্রিয়-বিশেষে বোধ- বিশেষের আবির্ভাব হয়, তখন আপনা হইতেই এই এক প্রত্যয় আইসে, যে উক্ত বোধোদয়ের কোন না কোন কারণ অবশ্যই আছে; এবং সেই কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমরা দেখিতে পাই যে উক্ত বোধ আমারদের স্বকীয় ইচ্ছা-সহকারে উদিত হয় নাই; অতএব আমারদের স্বাধীন আত্মা উহার কারণ নহে, অন্য কোন পদার্থই উহার কারণ হইবে।

বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়-বোধের সাক্ষাৎ কারণ যদি আমরা আপনারা না হইলাম, তবে কি স্বয়ং ঈশ্বর উহার সাক্ষাৎ কারণ? ঈশ্বরকে যখন আমরা বলি যে তিনি সমুদায়েরই মূল কারণ, তখন তাহাতে ইহাই বলা হয় যে যদিও ঘটনা-বিশেষের সাক্ষাৎ কারণ তাঁহারই ইচ্ছাতে নিযুক্ত রহিয়াছে, তথাপি তিনি স্বয়ং তাহা নহেন; অতএব বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়-বোধের সাক্ষাৎ কারণ ভৌতিক বস্তু ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না।

ইন্দ্রিয়-বোধে আমারদের আপন কর্ত্তৃত্বের অভাব উপলব্ধি হয় বলিয়াই আমরা উহার কারণ বাহিরে নির্দ্দেশ করিতে কাযে কাযে বাধ্য হই; কিন্তু যে কোন ক্রিয়া আমারদের আপন কর্ত্তৃত্বে সাধিত হয়, তাহার যে আমরা আপনারাই কারণ, ইহা বলা পুনরুক্তি মাত্র। আমরা যদি পশুদিগের ন্যায় রূপ দর্শন, শব্দ শ্রবণ, প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-মূলক অবস্থা-বিশেষ বোধ মাত্র করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতাম; তাহা হইলে আমরা আপনাকে কখনো দ্রষ্টা এবং শ্রোতা রূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতাম না। যদি এ রূপ হইত যে যখনি আমারদের চক্ষুতে আলোক নিপতিত হয়, তখনি পতঙ্গবৎ মূঢ়-ভাবে আমারদের মন তাহার প্রতি আসক্ত হয়; যখনি শ্রবণে শব্দ প্রতিহত হয়, তখনি মন তাহার প্রতি ধাবিত হয়; এবং তৎ তৎ সময়ে অথবা অন্য কোন সময়ে আমরা স্বাধীন-রূপে কোন কিছুতে মনো-নিবেশ করিতে সমর্থ না হই; তাহা হইলে বর্ণ দর্শন, শব্দ শ্রবণ প্রভৃতি বিচ্ছিন্ন ঘটনা-সকলের মধ্যে আমরা এ রূপ কোন যোগ নিবদ্ধ করিতে পারিতাম না, যাহাতে আমারদের আপন কর্ত্তৃত্ব বোধ-গম্য হইতে পারিত এবং সঙ্গে সঙ্গে আত্মাকে উপলব্ধি হইত।

কিন্তু ঈশ্বরের অপর্য্যাপ্ত মঙ্গল-ভাব মনুষ্যকে কেবল ইন্দ্রিয়-বৃত্তি দিয়াই ক্ষান্ত নহে; বুদ্ধি-রূপ আর এক উৎকৃষ্টতর বৃত্তি দিয়া উহার সমক্ষে উন্নতির গগন-ভেদী সোপান-পরম্পরা অনাবৃত করিয়া দিয়াছেন। এই বুদ্ধিই আমারদিগের কর্ত্তৃত্বের নিদান-ভূত—কেবল হস্ত পদ চালনাতেই কর্ত্তৃত্ব হয় না; বুদ্ধি পূর্ব্বক আমরা যে কোন কার্য্য করি, তাহাতেই আমাদের কর্ত্তৃত্ব।

আমরা যখন বস্তু-বিশেষকে প্রত্যক্ষ করি, তখন সঙ্গে সঙ্গে এই এক শক্তি অন্তরে অনুভব করি যে ইহার সমান অন্য অন্য বস্তুকে আমরা প্রত্যক্ষ অথবা কল্পনা করিলেও করিতে পারি; সুতরাং প্রত্যক্ষ-ক্রিয়াতে আমারদের মন উপস্থিত বিষয়েতেই সর্ব্ব সমেত আবদ্ধ থাকে না; পরন্তু উহা উপস্থিত বিষয়ের দিকে সমধিক আকৃষ্ট হইলেও কিয়ৎ পরিমাণে আমারদের আপন বশে থাকে, তাহাতে আর সংশয় নাই; এই হেতু আমরা স্বীয় চেষ্টা দ্বারা আমারদের মনকে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে অনায়াসে নিয়োগ করিতে পারি। আমরা যখন সম্যক্ জ্ঞাতসারে এক বিষয় হইতে অন্য বিষয়ে মনো-নিবেশ করি; তখন উজ্ঝিত বিষয় আমারদের স্মরণে থাকে, উপস্থিত বিষয় আমাদের সংজ্ঞাতে প্রত্যক্ষ হয়, এবং দুয়ের যোগ কল্পনাতে সাধিত হয়। আমরা চেতন-সহকারে প্রথমে একটা অশ্বকে প্রত্যক্ষ করিলাম, পরে একটা গোকে প্রত্যক্ষ করিলাম; গোকে যখন সংজ্ঞাতে প্রত্যক্ষ করিতেছি, তখন অশ্ব আমারদের স্মরণে আছে; এবং যখন গো এবং অশ্ব উভয়কেই পশু-রূপ এক শ্রেণীতে নিক্ষিপ্ত করিতেছি, তখন ইতি পূর্ব্বে উহারা অবশ্যই কল্পনা কর্ত্তৃক যোগবদ্ধ হইয়াছে। পশু শব্দ বলাতে আপাততঃ কোন বিশেষ পশুকে বুঝায় না, কিন্তু সাধারণ রূপে সকল পশুকেই বুঝায়; সুতরাং গো বা অশ্ব বিশেষকে পশু বলিয়া নিশ্চয় করিলে বিশেষ বিশেষ বিষয়কে একটি সাধারণ তথ্যের অন্তর্গত করা হয়—এই রূপ ক্রিয়াকেই বুদ্ধি কহে। সম্যক্ চেতন-সহকারে অশ্বকে স্মরণে রাখিয়া গোকে প্রত্যক্ষ করাতে, বা গোকে স্মরণে রাখিয়া অশ্বকে প্রত্যক্ষ করাতে—বিশেষতঃ পশু-রূপ উভয়ের সামঞ্জস্য-ভাব স্মরণে রাখিয়া উহারদের কোনটির প্রতি মনো-নিবেশ করাতে এবং এই রূপ সাধারণ হইতে বিশেষ বিশেষে অবতীর্ণ হওয়াতে—আমারদের আপনাদেরই কর্ত্তৃত্ব প্রকাশ পায়। এই হেতু ইন্দ্রিয়-বোধের সাক্ষাৎ কারণ যে রূপ ভৌতিক বস্তু, বুদ্ধি-ক্রিয়ার সাক্ষাৎ কারণ সেই রূপ আমরা আপনারা। বিষয়-বিশেষকে সজ্ঞান ভাবে প্রত্যক্ষ করাতেই বুদ্ধির প্রথম সূত্রপাত। আমরা যখন একটা অশ্বকে প্রত্যক্ষ করি; তখন যাহা অশ্ব নহে, এমন সকল সামগ্রী হইতে উহাকে বিশেষ করিয়াই উহার প্রতি মনঃ সংযোগ করি। এ স্থলে জানা আবশ্যক যে যেমন পুত্র বলাতে পিতার সহিত উহার সম্বন্ধ বুঝায়, অনেক বলাতে একের সহিত উহার সম্বন্ধ বুঝায়; সেই রূপ বিশেষ বলাতে সাধারণের সহিত উহার সম্বন্ধ বুঝায়। পিতা পুত্র, এক অনেক, সাধারণ বিশেষ; ইত্যাদি যুগল-গণের একটিকে যেখানে ব্যক্ত করা হয়, অন্যটি সেখানে কাজে কাজেই উহ্য থাকে। অতএব আমরা যখন একটা অশ্বকে অন্য অন্য সামগ্রী হইতে বিশেষ করিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছি, তখন অশ্ব এবং উক্ত অন্য অন্য সামগ্রী সম্বন্ধে সাধারণ কোন কিছু অবশ্যই আছে—অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে বিশেষ

বিশেষ প্রত্যক্ষ-বিষয়ের সম্বন্ধে যাহা সাধারণ, তাহা আমারদের স্বস্ব চেতন ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। একই চেতন কর্ত্তৃক অশ্ব, গো, হস্তী প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়-সকল প্রত্যক্ষ হয়; বিশেষ বিশেষ প্রত্যক্ষ-বিষয় বলিবা মাত্র একই চেতন পদার্থ উহারদের সাধারণ প্রত্যক্ষ-কর্ত্তা রূপে আপনা হইতেই প্রতীয়মান হয়। অশ্ব-বিশেষকে পশু বলিয়া নির্দ্দেশ করিবার এই মাত্র অর্থ যে অশ্ব গো, হস্তী, ইহারা সকলে সাধারণ-রূপে একই চেতনের বিষয়। এই রূপ সাধারণ চেতনকে মনোযোগ দ্বারা বিশেষ বিশেষ বিষয়ে নিযুক্ত করাতে বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব প্রকাশিত হয়; এবং বুদ্ধির দ্বারা বস্তু-সকলকে বিশেষ বিশেষ করিয়া জানিবার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞাতা রূপে আপনাকে উপলব্ধি করা অগত্যাই ঘটিয়া উঠে। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে ইন্দ্রিয়-বোধ অনুসরণ করিয়া আমরা যে রূপ ভৌতিক বস্তুতে উপনীত হই, সেই রূপ বুদ্ধি-ক্রিয়া অনুসরণ করিয়া আমরা আপন আত্মাতে উত্তীর্ণ হই।

পূর্ব্বে নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে ইন্দ্রিয়-বোধ-সকলের আধার বহির্ব্বস্তু, এ ক্ষণে পাওয়া গেল যে বুদ্ধি-ক্রিয়ার আধার আমারদের আত্মা; অতঃপর প্রজ্ঞার আধার কে তাহাই অন্বেষণ করা যাইতেছে। পূর্ব্ব অধ্যায়ে যথা-সাধ্য নিরূপণ করা হইয়াছে যে অবশ্যম্ভাবী ও সার্ব্বভৌমিক মূল-তত্ত্ব-সকলই প্রজ্ঞার সম্বল; এ ক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে এ সকল মূল তত্ত্ব কোথা হইতে আসিতেছে? উহারা ইন্দ্রিয়ের গোচর নহে, সুতরাং উহারা বাহির হইতে আসিতেছে না; উহারা বুদ্ধি কর্ত্তৃক পরীক্ষা-পরম্পরা হইতে সংগৃহীত নহে, সুতরাং উহারা আমারদের স্বীয় কর্ত্তৃত্ব হইতে আসিতেছে না—প্রত্যুত উহারা পূর্ব্ব হইতে আমারদের আত্মাতে আছে বলিয়াই এত কাল আমরা বুদ্ধি-বৃত্তি-সকলকে চালনা করিতে পারিয়াছি ও ভৌতিক বস্তু-সকলকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছি। দেশ অসীম, কাল অসীম, আমি এক, ঘটনা মাত্রেরই কারণ আছে, ইত্যাদি তত্ত্ব গুলিকে যদি বুদ্ধি খাটাইয়া পরীক্ষা সহকারে জানিতে হইত; তাহা হইলে আমরা কোন কালেই তাহাতে কৃতকার্য্য হইতাম না। দেশ অসীম—ইহা আমরা পূর্ব্ব হইতে জানি বলিয়া অগণ্য অগণ্য নক্ষত্রকে অবলীলা ক্রমে প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছি; কাল অসীম—ইহা আমরা পূর্ব্বাবধি জানিতেছি বলিয়া শত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর যেরূপ অবস্থা ছিল, অদ্য তাহা অনুমান বদনে পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি; আমি এক—ইহা আমরা পূর্ব্বাবধি জানিতেছি বলিয়া পরীক্ষা দ্বারা শত শত ঘটনাকে এক বন্ধনে আবদ্ধ করিতে সমর্থ হইতেছি; ঘটনা মাত্রেরই কারণ আছে—ইহা আমরা পূর্ব্ব হইতে জানি বলিয়া যাহা কিছু ঘটিতেছে, তাহারি কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতেছি। পণ্ডিতেরা ইহাও পরীক্ষা করিতে ত্রুটি করেন নাই যে পৃথিবীর স্থান-বিশেষে সূর্য্যের দৈনিক উদয়াস্ত হয় কি না; কিন্তু দেশ কাল অসীম কি সসীম? আমি এক কি অনেক? ঘটনা-বিশেষের কোন কারণ আছে বা নাই? এ সকল বিষয় পরীক্ষা করা উন্মাদ ভিন্ন আর কাহারো কার্য্য হইতে পারে না। মূলতত্ত্ব-সকলকে আমরা বহির্ব্বস্তু হইতে প্রাপ্ত হই নাই, আপন কর্ত্তৃত্বে পরীক্ষা করিয়াও প্রাপ্ত হই নাই, তবে উহারদিগকে কোথা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি? মূল তত্ত্ব-সকল অবশ্যম্ভাবী, নির্ব্বিকল্প, সার্ব্বভৌমিক ও অনতিক্রমণীয়; সুতরাং অবশ্যম্ভাবী কুক্কুর মাত্র; কিন্তু নির্ব্বিকল্প, অনতিক্রমণীয়,

এক জন পুরুষ হইতেই উহা আমারদের আত্মাতে অবতীর্ণ হইতেছে। অনেক প্রত্যক্ষ-বিষয়ের মধ্য হইতে বুদ্ধি যখন এক একটি তত্ত্ব সংগ্রহ করে, তখন তাহাতে যেমন একই জীবাত্মার উপলব্ধি হয়; সেই রূপ প্রজ্ঞা যখন অনেক জীবাত্মার মধ্য হইতে এক এক মূল তত্ত্বের সন্ধান পায়, তখন তাহাতে একই পরমাত্মার পরিচয় পাওয়া হয়। পরমাত্মা সর্ব্বান্তর্যামী বলিয়াই মূল তত্ত্ব-সকল, সকলের আত্মাতেই সমান-ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। আমরা যে সকল জ্ঞান আপন বুদ্ধি-প্রভাবে উপার্জ্জন করিয়াছি, তাহার মূল আমরা আপনারা, ইহাতে আর সংশয় হইতে পারে না; কিন্তু যাহা আমরা বুদ্ধি চালনা ব্যতিরেকেও সহজেই প্রাপ্ত হইয়াছি, এমন সকল সহজ জ্ঞানের কেবল তিনিই মাত্র আকর হইতে পারেন, যিনি আমারদের আত্মার আকর। যিনি আমাদের আত্মার আকর, যাঁহা হইতে আমরা আত্মা পাইয়াছি এবং যাঁহার বলে আমাদের আত্মা বিধৃত রহিয়াছে; তাঁহা হইতেই আমারদের সহজ জ্ঞান-সকল সাক্ষাৎ অবতীর্ণ হইতেছে। আমি যেমন আপনার চেষ্টাতে পৃথিবীতে আসি নাই, "আমি আছি" এ জ্ঞানও সেই রূপ আমার আপন চেষ্টাতে উদ্ভূত হয় নাই—প্রত্যুত আমি যেখান হইতে আসিয়াছি, "আমি আছি" এ জ্ঞানও সেইখান হইতে আসিয়াছে এবং অদ্যাপি আসিতেছে। এই রূপ আর আর যত মূল জ্ঞান আছে, সকলই সেই একই আকর হইতে বিনির্গত হইতেছে। ইন্দ্রিয়-বোধ-শ্রেণীর সকলের সাক্ষাৎ আকর বহির্ব্বস্তু, বুদ্ধি-সকলের সাক্ষাৎ আকর জীবাত্মা, পূর্ব্বে উহার মূল-তত্ত্ব-সকলের সাক্ষাৎ আকর বদ্ধ হইয়াছে।

বর্ত্তমান প্রস্তাব-সম্বন্ধে দর্শনকারদিগকে তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম, যাঁহারা বলেন যে অন্ধ শক্তি হইতে মূল-তত্ত্ব সকল উদ্ভূত হইয়াছে, তাঁহারদিগকে শাক্ত উপাধি দেওয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয়, যাঁহারা বলেন যে বুদ্ধি হইতে মূল তত্ত্ব-সকল উদ্ভূত হইয়াছে—সুতরাং আমরা আপনারাই মূল তত্ত্ব-সকলের উদ্ভাবক—তাঁহারদিগকে বৌদ্ধ উপাধি দেওয়া যাইতে পারে। তৃতীয়, যাঁহারা বলেন, পরব্রহ্মই মূল তত্ত্ব-সকলের আকর—তাঁহাদের কথাই যথার্থ—তাঁহারদিগকে ব্রাহ্ম উপাধি দেওয়া গেল। শাক্তেরা জড় শক্তিকেই মূল সত্য বিবেচনা করেন—ইঁহারদের মতে জড় শক্তি হইতেই আত্মা উদ্ভূত হইয়াছে, এবং তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া স্থিতি করিতেছে। বৌদ্ধেরা আপনাকেই মূল সত্য বিবেচনা করেন। ইঁহারা মনে করেন যে যদি আমি না থাকিতাম, তাহা হইলে আমার সম্বন্ধে জগৎও থাকিত না, ঈশ্বরও থাকিতেন না—আমি থাকাতেই আমার সম্বন্ধে ঈশ্বর থাকিতে পারিতেছেন ও জগৎ থাকিতে পারিতেছে। অতএব আমিই মূল সত্য, আর আর সত্য আমারই আনুসঙ্গিক। ইঁহারদের মতে বাহিরের জড় বস্তু সকল বিষয়ীরই আবির্ভাব, এবং ঈশ্বর বিষয়ী হইতেই উদ্ভাবিত। ইঁহারা সকল তত্ত্বেরই বাস্তবিকতা বিষয়ে সংশয় করেন; কারণ আমি লইয়াই যখন সকল সত্য, তখন আমার বাহিরে সত্য কি রূপে থাকিবে—ভ্রমবশতই আমরা বস্তু-সকলকে বাহিরে উপলব্ধি করি। এই রূপ বৌদ্ধেরা অবশেষে সংশয়বাদী হইয়া পরিণত হন। ব্রাহ্মেরা বলেন যে পরব্রহ্ম হইতেই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই স্থিতি করিতেছে এবং তাঁহা-

রই প্রসাদাৎ অনন্ত কাল উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। সকলই বাস্তবিক; সত্য স্বরূপ পরব্রহ্মের প্রসাদে সকলই সত্য, কিছুই স্বপ্নবৎ অর্থ-শূন্য নহে, সকলেরই গূঢ় অর্থ আছে; সকলই মঙ্গলের জন্য ব্যস্ত রহিয়াছে; মূলে সকলই সত্য, পরিণামে সকলই মঙ্গল; পরব্রহ্ম সেতু-স্বরূপ হইয়া সমুদায় জগৎ ধারণ করিতেছেন। এই তিন প্রকার মতের মধ্যে শেষোক্ত মতই সত্য, তাহাতে আর সংশয় নাই। শাক্তেরা* এই রূপ সিদ্ধান্ত করেন যে ইন্দ্রিয়-বোধ হইতেই ক্রমে ক্রমে বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার উদ্রেক হয়। বৌদ্ধেরা† এই রূপ স্থির করেন যে আমারদের আত্ম-কর্ত্তৃত্ব অবশ্য ইন্দ্রিয়-বোধ হইতে স্বতন্ত্র; কিন্তু আমরা যে হেতু বুদ্ধিরই স্রোত অনুসরণ করিয়া প্রজ্ঞাতে আরোহণ করি, এই হেতু বুদ্ধির দ্বৈধ-জনক তর্ক-বিতর্ক-ময় সিদ্ধান্তেরই উপর প্রজ্ঞার তত্ত্ব সকল নির্ভর করিতেছে। ব্রাহ্মেরা‡ এই রূপ নিশ্চয় করেন যে ইন্দ্রিয় বোধ হইতে বুদ্ধি উদ্ভূত হয় নাই, এবং বুদ্ধি হইতেও প্রজ্ঞা উদ্ভূত হয় নাই; কিন্তু সকলই আপন আপন উচ্চ নীচ পদক্রিয়ানুসারে সমবেত হইয়া কার্য্য করিয়া প্রজ্ঞার মূল মুকুলের পত্র-সকল যে রূপ পরমাত্মা। স্থান করে, এবং প্রস্ফুটন-রূপ পৃথক্ পৃথক্ রূপে রূপ অতীব শৈশব কালের [illegible] ইন্দ্রিয়-বোধ, বুদ্ধি এবং প্রজ্ঞা, তিনই সংহত ও সম্বৃত ভাবে অবস্থান করে, পরে বয়ো-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহারা পৃথক্ পৃথক্ হইয়া প্রকাশ পাইতে থাকে। মনুষ্যের শৈশব কালে ইন্দ্রিয়-বোধ-সকল যেমন প্রস্ফুটিত হইতে থাকে, বুদ্ধিও তেমনি প্রজ্ঞাকে অবলম্বন করিয়া বিষয়-সকলকে আয়ত্ত করিবার জন্য চেষ্টা পাইতে থাকে। শৈশব কালে সকল ঘটনাই নূতন—সে সময়ে কি জানিব? জানিবার আছে কি? জানিয়া ফল কি? এবম্বিধ বিলাপ-ধ্বনির এক মুহূর্ত্তও অবকাশ থাকে না। নূতন ভাষা শিক্ষা করিতে গেলে ব্যাকরণ আবশ্যক, অভিধান আবশ্যক, গ্রন্থ পাঠ আবশ্যক, আর আর কত না আবশ্যক; কিন্তু এক জন অনভিজ্ঞ শিশু কেমন অবলীলা-ক্রমে একটা ভাষাকে আয়ত্ত করিয়া ফেলে—উহাকে চেষ্টা করিয়া কেহই শিক্ষা দান করে না, উহার আপন সহজ চেষ্টাই সর্ব্বস্ব। আপাততঃ মনে হইতে পারে যে কুক্কুরাদি জন্তু-বিশেষ যেমন ইন্দ্রিয়-বোধের উত্তেজনা বশতঃ মনুষ্যের কথানুসারে কার্য্য করে, শিশুর ভাষা শিক্ষাও সেই প্রণালীতেই সম্পন্ন হয়; কিন্তু কিঞ্চিৎ প্রণিধান করিলেই প্রকাশ পাইবে যে পূর্ব্বোক্তের সহিত শেষোক্তের কেবল মাত্রার প্রভেদ নহে, উহারদের মধ্যে স্বরূপতই প্রভেদ। একটা কুক্কুর প্রভুর মুখ হইতে ত্রকটি বিশেষ শব্দ শুনিবা মাত্র অমনি একটি বিশেষ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইবে; কিন্তু সহস্র কথা কর্ণ গোচর করিয়াও একটি ব্যাকরণ-ঘটিত নিয়মকে কোন কালে আয়ত্ত করিতে পারিবে না। পূর্ব্বোক্ত রূপ বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়-বোধের অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ কার্য্য সম্পাদন করা অন্ধ অভ্যাসেরই গুণে হইয়া থাকে; কিন্তু বিশেষ বিশেষ শব্দ শ্রবণ হইতে ব্যাকরণ-ঘটিত সাধারণ নিয়মে পদ নিক্ষেপ করা সবিশেষ বুদ্ধি চালনা ব্যতিরেকে কোন রূপেই সম্ভব সাধ্য নহে। একটা কুক্কুর শ্রুত শব্দ অনুসারে কার্য্য করে মাত্র; কিন্তু

* Locke, objective.
† Kant, subjective.
‡ Coussin, from subjective to objective from Psychology to Ontology.

এক জন শিশু, কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়া প্রভৃতি ব্যাকরণের নিয়মানুসারে শব্দের অর্থ সংগ্রহ করিয়া লয়। এ দুই ক্রিয়া যে এক নহে, ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। একটি শিশু কেমন আগ্রহের সহিত নূতন নূতন বস্তুর প্রতি মনঃ সমর্পণ করে, এবং কেমন অক্লেশে পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা-সকলের সহিত উপস্থিত ঘটনা-সকলের যোগ সাধন করিয়া জ্ঞান-রাজ্যকে ক্রমশই বিস্তার করিতে থাকে। পরিবার পাঠশালা—মাতা-পিতা যেখানকার শিক্ষক ও ভ্রাতা ভগিনী যেখানকার বয়স্য দল—এই আদিম পাঠশালার শিক্ষা-প্রণালীর প্রতি মনোযোগ করিয়া দেখিলে কোন্ সচেতন ব্যক্তি এ রূপ কথা মুখে আনিতে পারে যে শিশুদিগের অস্ফুট হৃদয়ে মনুষ্যত্বের অধিষ্ঠান নাই! পরিবার পাঠশালার স্নেহময় ক্রোড় হইতে সামাজিক পাঠশালায় প্রবেশ কালে বালকেরা সহজ অবস্থা হইতে কঠোরতায় পদ নিক্ষেপ করে; এক জন বালক পরিবার-পাঠশালায় কোন শৃঙ্খলা ব্যতিরেকেও যে ব্যাকরণ দুই বৎসরে আয়ত্ত করিয়াছে, সামাজিক পাঠশালায় তাহাই আবার শৃঙ্খলা-অনুসারে শিক্ষা করিতে গিয়া চারি বৎসরেও পারিয়া উঠে না। মনুষ্য-শিশুর মনে বাহির হইতে যেমন ইন্দ্রিয়-বোধ কার্য্য করিতে থাকে, অন্তর হইতেও সেই রূপ বুদ্ধির প্রভাব স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে এবং তাহার আরো অভ্যন্তর হইতে প্রজ্ঞার প্রসাদ ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ অবতীর্ণ হইতে থাকে। প্রজ্ঞা ব্যতীত মনুষ্যোচিত উন্নতিশীল বুদ্ধি-ক্রিয়া কি রূপে চলিবে? বুদ্ধি কর্ত্তৃক জ্ঞান উপার্জ্জনের অন্ত নাই—মনুষ্যের মন ক্রমিকই ভাবিতেছে, ক্রমিকই বুদ্ধি প্রয়োগ করিতেছে, ক্রমিকই জ্ঞান উপার্জ্জন করিতেছে, উহা এক দণ্ডও নিশ্চিন্ত নাই। উহা যখন জ্ঞান-পথের এক বার পথিক হইয়াছে, তখন উহা চিরকালই তাহাই থাকিবে; কিন্তু উহার গম্য নিকেতন কোথায়? জ্ঞানের মূল উৎস কোথায়? জ্ঞান পথিকের অবলম্বন-যষ্টি কোথায়? প্রজ্ঞাই জ্ঞানের গম্য স্থান, প্রজ্ঞাই জ্ঞানের মূল উৎস, প্রজ্ঞাই জ্ঞানের অবলম্বন-যষ্টি—প্রজ্ঞা ব্যতীত উন্নতিশীল বুদ্ধি-ক্রিয়া এক পদও চলিতে পারে না। অসীম-উন্নতি-স্পৃহা ব্যতিরেকে মনুষ্য-শিশু কি জন্য নব নব সামগ্রী শিক্ষা করিতে যত্ন পাইবে? একটা পশুকে বেত্রাঘাত পূর্ব্বক শিক্ষা দিতে হয়; কিন্তু মনুষ্য-শিশু যেমন আগ্রহের সহিত স্তন্য পান করে, তেমনি আগ্রহের সহিত জ্ঞান শিক্ষা করে। অসীম ভাব, জ্ঞান-স্পৃহা, আত্মার স্থায়িত্ব, এই সকল ভাব শিশুর মনে অব্যক্ত-ভাবে অবস্থান করে বলিয়া উহাপশু হইতে সমধিক অসহায় হইলেও উহাকে তদপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হয়। মনুষ্য-শিশুর মনে ইন্দ্রিয়-বোধও যে সময় কার্য্য করে, বুদ্ধিও সেই সময় কার্য্য করে, প্রজ্ঞাও সেই সময়ে কার্য্য করে; কিন্তু উহারা অস্ফুট ভাবেই কার্য্য করে। এই জন্য এ সময়ে উহারদিগকে পৃথক্ পৃথক্ রূপে ধরিতে পারা যায় না; পরন্তু এ সময়েও যে উহারা তিনই একত্রে স্ফূর্ত্তি পায়, এ বিষয়ে কিছু মাত্র সংশয় নাই।

স্মৃতি শাস্ত্র।

ভারত বর্ষের প্রসিদ্ধ জাতি-ভেদ-প্রণালী মনু-সংহিতা প্রণয়ন কালে বিশিষ্ট-রূপে প্রচলিত ছিল, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু মনু-সংহিতাতে সেই জাতি-ভেদের যে অদ্ভুত কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার বিষয় এক বার আলোচনা করা আবশ্যক।

মনু-সংহিতাতে আছে যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ব্রহ্মার মুখ, বাহু, উরু ও চরণ হইতে* উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু এই মনু-সংহিতাতেই সৃষ্টি-প্রকরণের যে প্রণালী উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিলে বোধ হয় যে, জাতি-ভেদের এই আশ্চর্য্য কারণটি যেন বল পূর্ব্বক নিবেশিত করা হইয়াছে। সৃষ্টি-প্রকরণ এই রূপ ভাবে আছে যে, "ব্রহ্মা আপনার শরীরকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া অর্দ্ধ ভাগ দ্বারা পুরুষ ও অর্দ্ধ ভাগ দ্বারা নারী হইলেন; সেই পুরুষ সেই নারীতে বিরাট্ পুরুষকে উৎপন্ন করিলেন। সেই বিরাট্ পুরুষ স্বয়ং তপস্যা করিয়া এই সকলের স্রষ্টা মনুকে সৃষ্টি করিলেন। মনু প্রজা সৃষ্টির অভিলাষে অতিদুষ্কর তপস্যা করিয়া প্রথমে মরীচিপ্রভৃতি দশ জন মহর্ষি প্রজাপতিকে সৃষ্টি করিলেন। এই সকল প্রজাপতি আর সাত জন মনু, দেব, দেবলোক, অন্যান্য মহর্ষি, যক্ষ রক্ষ, বিদ্যুৎ বজ্র, কিন্নর বানর ও কৃমি কীট প্রভৃতি স্থাবর জঙ্গম সমুদায় সৃষ্টি করিলেন †।" এই রূপে যখন ব্রহ্মা হইতে বিরাট্, বিরাট্ হইতে মনু, মনু হইতে দশ প্রজাপতি ও দশ প্রজাপতি হইতে আর আর সৃষ্টির কথা ক্রমান্বয়ে উল্লিখিত হইয়াছে; তখন ইহার মধ্যে ব্রহ্মার চারি অঙ্গ হইতে চারি জাতির উৎপত্তির কথা কোন রূপেই স্থান পাইতে পারে না।

ব্রহ্মা কি রূপে উৎপন্ন হইলেন, মনু-সংহিতা অনুসারে তাহার আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রথমে সমুদায় জগৎ অন্ধকারময় ছিল, তৎপরে ভগবান্ স্বয়ম্ভু প্রাদুর্ভূত হইলেন। তিনি স্বীয় শরীর হইতে বিবিধ প্রজা সৃষ্টির অভিলাষে প্রথমে জল সৃষ্টি করিয়া তাহাতে বীজ নিক্ষিপ্ত করিলেন। সেই বীজ স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল ও সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন অণ্ড-রূপ ধারণ করিল; তন্মধ্যে সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা জন্ম গ্রহণ করিলেন। তিনি সেই অণ্ডে সম্বৎসর বাস করিয়া স্বয়ংই আপনার ধ্যান-প্রভাবে তাহাকে দুই-ভাগে বিভক্ত করিলেন, এবং সেই খণ্ড-দ্বয় দ্বারা স্বর্গ ও ভূমণ্ডল, মধ্যে আকাশ, অষ্ট দিক্ ও সমুদ্র সকল নির্ম্মাণ করিলেন*। ইহার মধ্যেও ব্রাহ্মণাদি বর্ণ উৎপত্তির অবকাশ হইতে পারে না।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, ব্রহ্মা আপনার মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগকে কোন্ সময়ে উৎপন্ন করিয়াছিলেন? পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মা আপনার শরীরকে দুই-ভাগ করিয়া অর্দ্ধ ভাগে স্ত্রী ও অর্দ্ধ ভাগে পুরুষ হইয়াছিলেন, এবং সেই স্ত্রী ও পুরুষ হইতে বিরাট্ পুরুষ উৎপন্ন হইলেন। তিনি মনুকে সৃষ্টি করিলেন, মনু মরীচি প্রভৃতি দশ জন প্রজাপতিকে ও সেই দশ জন প্রজাপতি অন্যান্য মনু, দেবতা, মহর্ষি ও যক্ষ, রক্ষ, প্রভৃতিকে সৃষ্টি করিলেন। অতএব ব্রহ্মা স্ত্রী ও পুরুষ-রূপ পরিগ্রহ করিবার পূর্ব্বে অথবা পরে আপনার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ হইতে কি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ উৎপন্ন করিয়াছিলেন? মনুসংহিতার যে স্থলে উল্লিখিত আছে যে—

দ্বিধা কৃত্বাত্মনোদেহমর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ।
অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ॥
১।৩২

---

* লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ॥ ১।৩১
লোকসকলের বৃদ্ধির নিমিত্ত ব্রহ্মা মুখ, বাহু, উরু ও চরণ হইতে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রকে নির্ম্মাণ করিলেন।

† ১ অধ্যায়। সৃষ্টি প্রকরণ।

* ১ অধ্যায়। সৃষ্টি প্রকরণ।

তাহারই অব্যবহিত পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে—

লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ॥
১।৩১

যদি এই ক্রম ধরিয়া ব্রাহ্মণাদি বর্ণকে বিরাট্ প্রভৃতির পূর্ব্বজাত বলিয়া স্থির করা হয়, তাহা হইলে বিরাট্ পুরুষ হইতে ক্রমে ক্রমে সমুদায় জীব জন্তুর সৃষ্টি ও ব্রহ্মার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আবার কতকগুলির সৃষ্টি, এই রূপ দুই প্রকার সৃষ্টি হইয়া উঠে। যদি স্ত্রীপুরুষ-রূপধারী ব্রহ্মা হইতে বিরাট্ প্রভৃতি সৃষ্টি পরম্পরার মধ্যে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের উৎপত্তি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে ঐ চারি বর্ণকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্রহ্মার অঙ্গ সমুত্থিত বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায় না। অতএব মনুসংহিতাতে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ভেদের যে কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে, মনুসংহিতার অনুগত হইয়া তাহা কোন রূপেই সংলগ্ন করা যায় না। মনুসংহিতার বর্ণ-ভেদসূচক ঐ বচনটিকে, মনুসংহিতার নয়, বলাও যায় না; কেন না মনুসংহিতার প্রায় যাবতীয় ব্যবস্থাই বর্ণভেদ-ঘটিত, সুতরাং তৎসমুদায় ঐ বচনের উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। অনেকে অনুমান করেন, মনুসংহিতা প্রণয়নের বহু কাল পূর্ব্ব হইতে বর্ণ ভেদ প্রণালী প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল, মনুসংহিতা প্রণেতা তাহার মূল অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া কুসংস্কারবশত অথবা ইচ্ছাপূর্ব্বক এই রূপ অদ্ভুত কারণের কল্পনা করিয়াছেন।

মনুষ্য শব্দের ব্যুৎপত্তি অনুশীলন করিলে এই প্রতীতি হয় যে, যাবতীয় মনুষ্যই মনুর সন্তান *। ইহা হইতে এই প্রতিপন্ন হয় যে, সকল মনুষ্যই প্রথমে একবর্ণ ছিল। ইতিহাস দ্বারা ইহা এক প্রকার সপ্রমাণ হইয়াছে যে, হিন্দুজাতি ভারতবর্ষের আদিম নিবাসী নহেন। উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে ভারত বর্ষে আসিয়া বাস করেন। তাঁহারা প্রথমে যখন এদেশে আগমন করিয়াছিলেন, তখন এক বর্ণই ছিলেন, তাহা অসম্ভাবিত বোধ হয় না। তৎপরে ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের বংশ যেমন বিস্তৃত হইতে আরম্ভ হইল, সেই সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতারও সঞ্চার হইতে লাগিল, সমাজমধ্যে নানাবিধ কার্য্যের প্রয়োজন হইল; পশুপালন, কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পকর্ম্ম সকল প্রবর্ত্তিত হইতে লাগিল। বিদ্যা, বুদ্ধি, ক্ষমতা অনুসারে তাঁহাদের মধ্যে যিনি যে কর্ম্মের উপযুক্ত হইলেন, এবং যাঁহার পক্ষে যে কর্ম্ম করা আবশ্যক হইয়া উঠিল, তিনি সেই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। যিনি যে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত থাকেন, তাঁহার পুত্র পৌত্রাদি, অনবরত দৃষ্টান্তে ও সংস্রবে সেই ব্যবসায়ের প্রতিই অনুরক্ত হইয়া থাকে। এই কারণে প্রায় অনেকেই স্বাধীনতা সত্ত্বেও পৈতৃক ব্যবসায়েই ব্যাপৃত হইয়া পড়েন। হিন্দু-সমাজে এই রূপ করিয়াই যে এক একটি কর্ম্ম এক এক জাতির জাতীয় ধর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। কালক্রমে সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইয়া উঠিল। তৎপরে শাস্ত্রকারেরা আরও বিশেষ করিয়া চিরকালের নিমিত্ত তাহাদিগকে সেই রূপ বিভাগ করিয়া রাখিলেন, এবং রাজারা স্বীয় স্বীয় অমাত্য শাস্ত্রকারদিগের মন্ত্রণায় দণ্ড সহকারে সেই রূপ বর্ণ বিভাগ সকল রক্ষা করিতে লাগিলেন। এই রূপে ভারতবর্ষের বর্ণভেদ-প্রণালী বদ্ধমূল হইয়া গেল। জাতি-ভেদ-প্রণালীর যে মূল কারণ প্রদর্শিত হইল, তাহা আমাদের কপোল কল্পিত নহে; মনুসংহিতাতে স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দিষ্ট না থাকুক অন্যান্য শাস্ত্রে ইহার প্রমাণ দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকে।

* মনুস্ শব্দ হইতে মনুষ্য শব্দ ব্যুৎপাদিত হইয়াছে।

ন বিশেষোস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্ব-সৃষ্টংহি কর্ম্মণা বর্ণতাং গতং॥
মহাভারত মোক্ষধর্ম্মঃ।

বর্ণ সকলের প্রভেদ নাই; সকলেই ব্রাহ্মণ; প্রথমে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া কর্ম্ম অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ হইয়াছে।

কাম-ভোগ-প্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্তস্বধর্ম্মারক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥
মহাভারত মোক্ষধর্ম্মঃ।

বিষয়ভোগে আসক্ত, উগ্র ও কোপনস্বভাব, সাহস প্রিয়, স্বধর্ম্মচ্যুত রজোগুণ-বিশিষ্ট দ্বিজগণ ক্ষত্রিয় হইলেন।

গোভ্যোবৃত্তিং সমাস্থায় পীতা কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজাবৈশ্যতাং গতাঃ॥
মহাভারত মোক্ষধর্ম্মঃ।

যে সকল দ্বিজ রজোগুণ ও তমোগুণে মিশ্রিত, পশুপালন ও কৃষি যাঁহাদের উপজীবিকা, যাঁহারা স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন না, তাঁহারা বৈশ্য হইলেন।

হিংসানৃতক্রিয়ালুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥
মহাভারত মোক্ষধর্ম্মঃ।

যে সকল দ্বিজ হিংসা ও মিথ্যা কর্ম্মে লুব্ধ, যাঁহারা জীবিকার নিমিত্ত সকল কর্ম্মই করেন, যাঁহারা তমোগুণ বিশিষ্ট ও শৌচাচার ভ্রষ্ট, তাঁহারা শূদ্র হইলেন।

মহাভারতের এই সকল প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, যে একমাত্র ব্রাহ্মণ বর্ণ স্বীয় স্বীয় কর্ম্ম অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে জাতিভেদের যে প্রণালী দৃষ্টি-গোচর হইয়া থাকে পূর্ব্বে এ প্রকার ছিল না। এক্ষণে ব্রাহ্মণপুত্র, কুলোচিত কর্ম্ম সকল অনুষ্ঠান না করিলেও ব্রাহ্মণই থাকেন এবং অন্যান্য জাতি উৎকৃষ্ট কর্ম্ম করিলেও কদাপি ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। পূর্ব্বে এরূপ নিয়ম ছিল না। মনুসংহিতাতে জাতিভেদের প্রকৃত কারণ প্রদর্শিত হয় নাই বটে, কিন্তু মনুসংহিতা প্রণয়ন কালে হিন্দুসমাজে যে সকল আচার ব্যবহার প্রচলিত ছিল, তাহাতে তাহার নিদর্শন অবশ্যই প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে,

শূদ্রোব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাং।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাত্তথৈবচ॥

শূদ্র ব্রাহ্মণ হন ও ব্রাহ্মণ শূদ্র হন। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য পুত্রদিগকেও এই প্রকার জানিবে।

এই বিষয়টি মহাভারতের অনুসাশন পর্ব্বে বিস্তৃত রূপে উল্লিখিত হইয়াছে।

এভিস্তু কর্ম্মভির্দেবি শুভৈরাচরিতৈস্তথা।
শূদ্রোব্রাহ্মণতাং যাতি বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়তাং ব্রজেৎ॥
এতৈঃ কর্ম্মফলৈর্দেবি ন্যূনজাতিকুলোদ্ভবঃ।
শূদ্রোপ্যাগমসম্পন্নোদ্বিজোভবতি সংস্কৃতঃ॥
ব্রাহ্মণোবাপ্যসদ্বৃত্তঃ সর্ব্বসঙ্করভোজনঃ।
ব্রাহ্মণ্যং সমনুৎসৃজ্য শূদ্রোভবতি তাদৃশঃ॥
কর্ম্মভিঃ শুচিভির্দেবি শুদ্ধাত্মা বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
শূদ্রোপি দ্বিজবৎ সেব্যইতি ব্রহ্মানুশাসনং॥
স্বভাবং কর্ম্ম চ শুভং যত্র শূদ্রেপি তিষ্ঠতি।
বিশিষ্টঃ স দ্বিজাতের্ব্বৈ বিজ্ঞেয়ইতি মে মতিঃ॥
ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং নচ সন্ততিঃ।
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণং॥
সর্ব্বোয়ং ব্রাহ্মণোলোকে বৃত্তেন চ বিধীয়তে।
বৃত্তে স্থিতস্তু শূদ্রোপি ব্রাহ্মণত্বং নিয়চ্ছতি॥
ব্রহ্মস্বভাবঃ কল্যাণি সমঃ সর্ব্বত্র মে মতিঃ।
নির্গুণং নির্ম্মলং ব্রহ্ম যত্র তিষ্ঠতি স দ্বিজঃ॥
এতত্তে গুহ্যমাখ্যাতং যথা শূদ্রোভবেদ্দ্বিজঃ।
ব্রাহ্মণো বা চ্যুতোধর্ম্মাৎ যথা শূদ্রত্বমাপ্নুতে॥

হে দেবি! শূদ্র এই সকল শুভ কর্ম্ম ও সদাচার দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে এবং বৈশ্যও ক্ষত্রিয় হইতে পারে। হে দেবি! হীন জাতিতে ও হীন বংশে সমুৎপন্ন শূদ্রও শাস্ত্রজ্ঞ হইয়া এই সকল

কর্ম্ম ফল দ্বারা সংস্কার সম্পন্ন দ্বিজ হইয়া থাকেন। আর ব্রাহ্মণও সেই রূপ দুশ্চরিত্র ও সঙ্করভোজী হইলে ব্রাহ্মণত্ব হইতে বিচ্যুত হইয়া শূদ্র হয়। হে দেবি! শুদ্ধাত্মা জিতেন্দ্রিয় শূদ্রও শুদ্ধাচার নিবন্ধন ব্রাহ্মণের ন্যায় সেবনীয় হন, ব্রহ্মার এই প্রকার অনুশাসন। যে শূদ্রের স্বভাব ও কর্ম্ম পবিত্র হয়, সেই শূদ্রও দ্বিজাতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, আমার এই মত। জন্ম, সংস্কার, শাস্ত্র ও বংশ দ্বিজত্ব লাভের কারণ নহে; এক মাত্র চরিত্রই তাহার কারণ। পৃথিবীতে সকলেই চরিত্র দ্বারা ব্রাহ্মণ হইতে পারে; সুতরাং শূদ্রও সাধুশীল হইলে ব্রাহ্মণ হয়। হে কল্যাণি! আমার মত এই যে, ব্রহ্মের স্বভাব সর্ব্বত্রই সমান; অতএব নির্গুণ নির্ম্মল ব্রহ্ম যাহাতে অবস্থান করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। শূদ্র যে প্রকারে ব্রাহ্মণ হইতে পারে ও ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম-চ্যুত হইয়া যাহাতে শূদ্র হয়, তাহার গূঢ় বৃত্তান্ত তোমাকে বলিলাম।

অন্য অন্য জাতির ব্রাহ্মণত্ব লাভ বিষয়ে মনুসংহিতা ও মহাভারতের যে সকল প্রমাণ প্রদর্শিত হইল, তাহার ভুরি ভুরি উদাহরণও সংগৃহীত হইতে পারে।

ততো ব্রাহ্মণতাং যাতো বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ।
ক্ষত্রিয়ঃ সোঽপ্যথ তথা ব্রহ্মবংশস্য কারকঃ॥

মহাভারতীয় অনুশাসন পর্ব্ব।

সেই মহাতপা বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়াও তৎ পরে ব্রাহ্মণ হইলেন এবং তাঁহা হইতে ব্রাহ্মণ বংশের উৎপত্তি হইল।

প্রতিরথাৎ কণ্বস্তস্যাপি মেধাতিথির্যতঃ কণ্বায়নাদ্বিজাঃ বভূবুঃ।

বিষ্ণু পুরাণ। ৪ অংশ। ১৯ অধ্যায়ঃ।

ক্ষত্রিয় প্রতিরথের পুত্র কণ্ব; কণ্বের পুত্র মেধাতিথি; মেধাতিথি হইতে কণ্বায়ণ ব্রাহ্মণ সকল উৎপন্ন হইয়াছে।

হরিবংশের দ্বাত্রিংশ অধ্যায়েও এই কথা উল্লিখিত আছে।

পুত্রঃ প্রতিরথস্যাসীৎ কণ্বঃ সমভবন্নৃপঃ।
মেধাতিথিঃ সুতস্তস্য যস্মাৎ কণ্বোভবেদ্দ্বিজঃ॥
মহাবীর্য্যাদুরুক্ষয়ো নাম পুত্রোভূৎ। তস্য ত্রয্যারুণপুষ্করিণৌ কপিশ্চ পুত্রত্রয়মভূৎ। তচ্চ ত্রিতয়মপি পশ্চাৎ বিপ্রত্বামুপজগাম।

বিষ্ণু। ৪ অং। ১৯। অ

ক্ষত্রিয় মহাবীর্য্যের পুত্র উরুক্ষয়। উরুক্ষয়ের তিন পুত্র; ত্রয্যারুণ, পুষ্করী, ও কপি। এই তিন জনই পশ্চাৎ ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।

দিবোদাসস্য দায়াদোব্রহ্মর্ষি র্মিত্রযুর্নৃপঃ
মৈত্রায়ণস্ততঃ সোমো মৈত্রেয়াস্তু ততঃ স্মৃতাঃ।

হরিবংশ। ৩২। অ

দিবোদাসের পুত্র রাজা মিত্রয়ু ব্রহ্মর্ষি হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র মৈত্রায়ণ। তাঁহার পুত্র সোম। সোম হইতে মৈত্রেয় ব্রাহ্মণ সকল উৎপন্ন হইয়াছে।

কেবল যে ক্ষত্রিয়েরাই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিল এমন নহে; স্কন্দ পুরাণীয় সহ্যাদ্রি খণ্ডের উত্তর কাণ্ডে কৈবর্ত্তদিগেরও ব্রাহ্মণত্ব লাভের কথা উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়।

অব্রহ্মণ্যে তদা দেশে কৈবর্ত্তান্ প্রেক্ষ্য ভার্গবঃ।
——————যজ্ঞসূত্রমকল্পয়ৎ॥
স্থাপয়িত্বা স্বকীয়ে স ক্ষেত্রে বিপ্রান্ প্রকল্পিতান্।
যামদগ্ন্যস্তদোবাচ সুপ্রীতেনান্তরাত্মনা॥

তখন সেই ব্রাহ্মণ-হীন দেশে কৈবর্ত্তদিগকে দেখিয়া পরশুরাম তাহাদিগকে যজ্ঞসূত্র প্রদান করিলেন। এবং স্বকৃত ব্রাহ্মণদিগকে স্বকীয় ক্ষেত্রে সংস্থাপিত করিয়া প্রীতি চিত্তে কহিলেন।

কেবল যে এক জাতি অন্য জাতি হইয়াছে তাহা নহে, এক বংশ হইতে ব্রাহ্মণাদি চারি জাতি উৎপন্ন হইয়াছে, ইহারও ভুরি ভুরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

করুষাৎ কারুষা মহাবলা ক্ষত্রিয়া বভূবুঃ।
নাভাগোনেদিষ্টপুত্রস্তু বৈশ্যতামগমৎ।
পৃষধ্রস্তু গুরুগোবধাৎ শূদ্রত্বমগমৎ।

বিষ্ণু। ৪ অং। ১ অ

বৈবস্বত মনুর পুত্রগণের মধ্যে করুষ হইতে মহাবল ক্ষত্রিয় কারুষগণ উৎপন্ন হইয়াছে, নেদিষ্টের পুত্র নাভাগ বৈশ্য হইয়াছিলেন, এবং পৃষধ্র গুরুর গোবধ নিবন্ধন শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল।

এই নাভাগ হরিবংশে নাভাগারিষ্ট শব্দে উক্ত হইয়াছে।

নাভাগারিষ্ট পুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ।
করূষস্যতু কারূষাঃ ক্ষাত্রিয়া যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ॥
পৃষধ্রো হিংসয়িত্বা তু গুরোর্গাং জনমেজয়।
শাপাচ্ছূদ্রত্বমাপন্নো।——————

হরিবংশ। ১১ অ

নাভাগারিষ্টের দুই পুত্র বৈশ্য ছিলেন, ব্রাহ্মণ হইলেন। করূষের পুত্র কারূষগণ মহাযোদ্ধা ক্ষত্রিয় হইলেন। পৃষধ্র গুরুর গবী বধ করিয়া শাপে শূদ্র হইলেন।

বিষ্ণু পুরাণে উক্ত হইয়াছে নাভাগ বৈশ্য হইয়াছিলেন, হরিবংশে কথিত হইতেছে যে, নাভাগের পুত্রদ্বয় বৈশ্যত্ব হইতে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন

কাশলেশগৃৎসমদাস্ত্রয়োস্যাভবন্। গৃৎসমদস্য শৌনকশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যপ্রবর্ত্তয়িতা।

বিষ্ণু। ৪ অং। ৮ অ

সুনহোত্রের তিন পুত্র—কাশ, লেশ ও গৃৎসমদ। গৃৎসমদের পুত্র শৌনক হইতে চারি বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছিল।

হরিবংশে এই লেশ শল নামে ও শৌনক শুনক নামে উল্লিখিত হইয়াছে।

সুনহোত্রস্য দায়াদাস্ত্রয়ঃ পরমধার্ম্মিকাঃ।
কাশ শলশ্চ দ্বাবেতৌ তথা গৃৎসমদঃ প্রভুঃ।
পুত্রোগৃৎসমদস্যাপি শুনকো যস্য শৌনকাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈবচ।

২৯ অ

সুনহোত্রের পরম ধার্ম্মিক তিন পুত্র—কাশ, শল ও গৃৎসমদ। গৃৎসমদের পুত্র শুনক; শুনকের পুত্র শৌনকগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হইয়াছিল।

ভার্গস্য ভার্গভূমিরতশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যপ্রবৃত্তিঃ।

বিষ্ণু। ২৯ অ।

ভার্গের পুত্র ভার্গভূমি; ভার্গভূমি হইতে চারি বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে।

এতে ত্বঙ্গিরসঃ পুত্রা জাতাবংশেথ ভার্গবে।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ ভরতর্ষভ।

হরিবংশ। ৩২ অ।

ভৃগুবংশীয় অঙ্গিরার পুত্রগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হইয়াছিলেন।

তথা গৃৎসমতেঃ পুত্রাঃ ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বিশঃ।

হরিবংশ। ৩২ অ।

গৃৎসমতির পুত্রগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য হইয়াছিল।

অতএব যখন মনুসংহিতাতে এক জাতির অন্য জাতি হইবার ব্যবস্থা আছে এবং হরিবংশাদিতে যখন তাহার ভুরি ভুরি উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যাইয়াছে, ও এক বংশ হইতে চারি জাতি উৎপন্ন হইবার কথা স্পষ্ট উল্লিখিত আছে, তখন ইহাই বোধ হয় যে, হিন্দুসমাজ প্রথমে কর্ম্মানুসারেই জাতি প্রাপ্ত হইত। মনু সংহিতাতে ব্রহ্মার অঙ্গ বিশেষ হইতে জাতি বিশেষের উৎপত্তির যে উল্লেখ আছে, তাহা কল্পনা মাত্র সন্দেহ নাই।

বহুবিবাহ।

ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে আমাদের বহু কালের আকাঙ্ক্ষিত একটী মনোরথ সফল হইবার উপক্রম হইয়াছে। যে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকাতে ভারত বর্ষের বহু-বিষয়ে বহুবিধ অনিষ্ট ঘটিতেছে, দেশহিতৈষী মহাত্মাদিগের উদ্যোগে ও প্রযত্নে রাজপুরুষগণ তাহার নিষেধ বিষয়ক নিয়ম বিধিবদ্ধ করিবার নিমিত্ত সচেষ্টিত হইয়াছেন। কিছু দিন পূর্ব্বে একবার এই বিষয়ের উদ্যোগ হইয়াছিল, কিন্তু নানা কারণে তৎকালে ইহা সুসিদ্ধ হইয়া উঠে নাই। বোধ হয় এবারে অবশ্যই কৃতার্থতা লাভ হইবে।

যদিও আমাদের সামাজিক আচার ব্যবহারের মধ্যে রাজপুরুষগণকে প্রবিষ্ট হইতে দিলে ভবিষ্যতে হিন্দুসমাজের অনিষ্ট হইতে পারে, তথাপি বহুবিবাহ দ্বারা

এরূপ অনিষ্ট হইতেছে যে, আমরা বর্ত্তমান উদ্যোগের অনুমোদন না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। জ্ঞান-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রথাটি দিন দিন সংকুচিত হইয়া আসিতেছে যথার্থ বটে কিন্তু যত দিন বর্ত্তমান কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত থাকিবে ও সেই কৌলীন্য প্রথার অন্তর্গত মেল বন্ধনের উপর কুলীন পুত্রদিগের মান সম্ভ্রম নির্ভর করিবে, তত দিন অন্তত কোন কোন সম্প্রদায়কে বাধ্য হইয়া বহুবিবাহ প্রথার অনুসরণ করিতে হইবে। এ অবস্থায় রাজ পুরুষগণের সাহায্য ব্যতীত এই কুপ্রথা আশু নিবারণের উপায়ান্তর নাই। বহুবিবাহের ন্যায় স্ত্রীলোকের অনুমরণও হিন্দু জাতির ধর্ম্ম-ঘটিত প্রথা। কিন্তু যদি তাহা নিবারণের নিমিত্ত রাজপুরুষগণের সাহায্য না লইয়া শিক্ষা-প্রাচারের মুখ চাহিয়া থাকা হইত, তাহা হইলে অদ্যাপি সেই স্ত্রীহত্যা কি নিবারণ করা যাইত? সহমরণ প্রথা নিষিদ্ধ হওয়াতে স্ত্রীলোকদিগকে অপমৃত্যু হইতে রক্ষা করা হইয়াছে, বহুবিবাহ রহিত হইলে কতকগুলিকে জীবন্মৃত্যু হইতে রক্ষা করা হইবে। তদ্ভিন্ন এই অধিবেদন দ্বারা যে সকল অত্যাচার ঘটিয়া থাকে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। ইহা একান্ত ইচ্ছা বটে যে, হিন্দুসমাজ এ সকল বিষয়ে রাজপুরুষগণকে আহ্বান না করেন, কিন্তু আমাদের নির্জ্জীব হিন্দুসমাজ যে কত দিনে মানুষ হইয়া আপনাদের কাজ আপনারা করিবেন, তাহা ভাবিতে গেলে শরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়।

নূতন পুস্তক।

১ নানকের জীবন চরিত। কট সাহেবের সংগৃহীত ইংরাজী পুস্তক হইতে বর্ণাকুলর লিটরেচর কমিটীর আদেশানুসারে শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক অনুবাদিত। যাঁহারা সংক্ষেপে নানকের জীবন চরিত জানিতে চান, এই পুস্তক খানি তাঁহাদের পক্ষে উপকারী হইবে।

২ চিকিৎসক। চিকিৎসা বিদ্যা সম্বন্ধি-বিষয় পূর্ণ সাময়িক পত্র। হিন্দু যন্ত্রে ভক্তেশ্বর নিয়োগী কর্ত্তৃক মুদ্রিত, চিকিৎসক সভা হইতে প্রকাশিত। বাঙ্গলা ভৈষজিক পত্রের অভাব বিমোচন ও নানাবিধ উপায়ে এতদ্দেশীয় ইংরাজি ভাষানভিজ্ঞ চিকিৎসা-বিদ্যার্থী, বিশেষতঃ কলিকাতা মেডিকেল কালেজের বাঙ্গলা বিভাগের ছাত্রদিগের উপকার সাধন করা এই চিকিৎসক পত্রের উদ্দেশ্য। এই পত্র খানি দ্বারা বাঙ্গলা দেশের যে মহোপকার সাধিত হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।

৩ প্রসূতি বিয়োগে তস্যাঃ সুত কাব্য। হিন্দু যন্ত্রে শ্রীভক্তেশ্বর নিয়োগী কর্ত্তৃক মুদ্রিত। গ্রন্থকারের নাম নাই।

৪ টমস পেন, বিশপ ওআটসনের পুস্তক উপলক্ষ্য করিয়া খৃষ্টীয় ধর্ম্মের যে অসারতা প্রতিপাদন করিয়াছিল, তাহাই অবিকল ইংরাজিতে স্কুলবুক যন্ত্রে পুনর্ম্মুদ্রিত হইয়াছে। প্রকাশকের নাম নাই।

৫ দায়ভাগার্থ দীপিকা। প্রতি পৃষ্ঠার ঊর্দ্ধভাগে শ্রীযুক্ত রঘুরাম শিরোমণি ভট্টাচার্য্য কৃত মূল ও নিম্নে তাহার বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদ। শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক কলিকাতা নিউ বেঙ্গল প্রিন্টিং যন্ত্রে মুদ্রিত। দায় ঘটিত বিবাদের মীমাংসা বিষয়ে এই পুস্তক খানির যথেষ্ট আনুকূল্য পাওয়া যাইবে।

৬ নারীচরিত। কলিকাতা ফিমেল নর্ম্যাল ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভূত-পূর্ব্ব চাত্রী ও কোণনগর বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী শ্রীসৌদামিনী সিংহ কর্ত্তৃক ইংরাজি ভাষা হইতে বাঙ্গলা ভাষায় সংগৃহীত। কাব্য প্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত। এই পুস্তক খানির বিষয় ও রচনা অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

THE MORAL PERFECTION OF JESUS.

The argument of Jesus concerning the tribute to Cæsar is so dramatic, as to strike the imagination and rest on the memory; and I know no reason for doubting that it has been correctly reported. The book of Deuteronomy (xvii. 15) distinctly forbids Israel to set over himself as king any who is not a native Israelite; which appeared to be a religious condemnation of submission to Cæsar. Accordingly, since Jesus assumed the tone of unlimited wisdom, some of Herods's party asked him, whether it was lawful to pay tribute to Cæsar, Jesus replied: "Why tempt ye me, hypocrites? Show me the tribute money." When one of the coins was handed to him, he asked: "Whose image and superscription is this?" When they replied: "Cæsar's," he gave his authoritative decision: "Render *therefore to Cæsar the things that are Cæsar's.*"

In this reply not only the poor and uneducated, but many likewise of the rich and educated, recognize "majesty and sanctity:" yet I find it hard to think that my strong-minded friend will defend the justness, wisdom and honesty of it. To imagine that because a coin bears Cæsar's head, *therefore* it is Cæsar's property, and that he may demand to have as many of such coins as he chooses paid over to him, is puerile, and notoriously false. The circulation of foreign coin of every kind was as common in the Mediterranean then as now; and everybody knew that the coin was the property of the *holder*, not of him whose head it bore. Thus the reply of Jesus, which pretended to be a moral decision, was unsound and absurd: yet it is uttered in a tone of dictatorial wisdom, and ushered in by a grave rebuke, "Why tempt ye me, hypocrites?" He is generally understood to mean, "Why do you try to implicate me in a political charge?" and it is supposed that he prudently *evaded* the question. I have indeed heard this interpretation from high Trinitarians; which indicates to me how dead is their moral sense in everything which concerns the conduct of Jesus. No reason appears why he should not have replied, that Moses forbade Israel *voluntarily* to place himself under a foreign king, but did not inculcate fanatical and useless rebellion against overwhelming power. But such a reply, which would have satisfied a more commonplace mind, has in it nothing brilliant and striking. I cannot but think that Jesus shows a vain conceit in the cleverness of his answer: I do not think it so likely to have been a conscious evasion. But neither does his rebuke of the questioners at all commend itself to me. How can any man assume to be an authoritative teacher, and then claim that men shall not put his wisdom to the proof? Was it not their *duty* to do so? And when, in result, the trial has proved the defect of his wisdom, did they not perform a useful public service? In truth, I cannot see the Model Man in his rebuke.—Let not my friend say that the error was merely intellectual: blundering self-sufficiency is a moral weakness.

I might go into detail concerning other discourses, where error and arrogance appear to me combined. But, not to be tedious,—in general I must complain that Jesus purposely adopted an enigmatical and pretentious style of teaching, unintelligible to his hearers, and needing explanation in private. That this was his systematic procedure, I believe because, in spite of the great contrast of the fourth gospel to the others, it has this peculiarity in common with them. Christian divines are used to tell us that this mode was *peculiarly instructive* to the vulgar of Judæa; and they insist on the great wisdom displayed in his choice of the lucid parabolical style. But in Matth. xiii. 10-15, Jesus is made confidentially to avow precisely the opposite reason, viz. that he desires the vulgar *not* to understand him, but only the select few to whom he gives private explanations. I confess I believe the Evangelist rather than the modern Divine. I cannot conceive how so strange a notion could ever have possessed the companions of Jesus, if it had not been true. If really this parabolical method had been peculiarly intelligible, what could make them imagine the contrary? Unless they found it very obscure themselves, whence came the idea that it was obscure to the multitude? As a fact, it *is* very obscure, to this day. There is much that I most imperfectly understand, owing to unexplained metaphor: as: "Agree with thine adversary quickly, &c. &c.:" Whoso calls his brother* a fool, is in danger of hell fire:" "Every one must be salted with fire, and every sacrifice salted with salt. Have salt in yourselves, and be at peace with one another." Now every man of original and singular genius has his own forms of thought; in so far as they are natural, we must not complain, if to us they are obscure. But the moment *affectation* comes in, they no longer are reconcilable with the perfect character: they indicate vanity, and incipient sacerdotalism. The distinct notice that Jesus avoided to expound his parables to the multitude, and made this a boon to the privileged few; and that without a parable he spake not to the multitude; and the pious explanation, that this was a fulfilment of Prophecy, "I will open my mouth in parables, I will utter dark sayings on the harp," persuade me that the impression of the disciples was a deep reality. And it is in entire keeping with the general narrative, which shows in him so much of mystical assumption. Strip the parables of the imagery, and you find that sometimes one thought has been dished up four or five times, and generally, that an idea is dressed into sacred grandeur. This

* I am acquainted with the interpretation, that the word "More" is not here Greek. *i. e., fool*, but is Hebrew, and means *rebel*, which is stronger than "Raca," *silly fellow*. This gives partial, but only partial relief.

mystical method made a little wisdom go a great way with the multitude ; and to such a mode of economizing resources the instinct of the uneducated man betakes itself, when he is claiming to act a part for which he is imperfectly prepared.

It is common with orthodox Christians to take for granted, that unbelief of Jesus was a sin, and belief a merit, at a time when no rational grounds of belief were as yet public. Certainly, whoever asks questions with a view to *prove* Jesus, is spoken of vituperatingly in the gospels ; and it does appear to me that the prevalent Christian belief is a true echo of Jesus's own feeling. He disliked being put to the proof. Instead of rejoicing in it, as a true and upright man ought,—instead of blaming those who accept his pretensions on too slight grounds,—instead of encouraging full inquiry and giving frank explanations, he resents doubt, shuns everything that will test him, is very obscure as to his own pretensions, (so as to need probing and positive questions, whether he *does* or *does not* profess to be Messiah,) and yet is delighted at all easy belief. When asked for miracles, he sighs and groans at the unreasonableness of it ; yet does not honestly and plainly renounce pretension to miracle, as Mr. Martineau would, but leaves room for credit to himself for as many miracles, as the credulous are willing to impute to him. It is possible that here the narrative is unjust to his memory. So far from being the picture of perfection, it sometimes seems to me the picture of a conscious and wilful impostor. His general character is too high for *this* ; and I therefore make deductions from the account. Still, I do not see how the present narrative could have grown up, if he had been realy simple and straight-forward, and not perverted by his essentially false position. Enigma and mist seem to be his element ; and when I find his high satisfaction at all personal recognition and bowing before his individuality, I almost doubt whether, if one wished to draw the character of a vain and vacillating pretender, it would be possible to draw anything more to the purpose than this. His general rule (before a certain date) is, to be cautious in public, but bold in private to the favoured few. I cannot think that such a character, appearing now, would seem to my friend a perfect model of a man.

No precept bears on its face clearer marks of coming from the genuine Jesus, than that of *selling all and following him.* This was his original call to his disciples. It was enunciated authoritatively on various occasions. It is incorporated with precepts of perpetual obligation, in such a way, that we cannot without the greatest violence pretend that he did not intend it as a precept* to *all* his disciples. In Luke xii. 22-40, he addresses the disciples collectively against Avarice ; and a part of the discourse is : " Fear not, little flock ; for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. *Sell that ye have and give alms* : provide yourselves bags that wax not old ; a treasure in the heavens that faileth not, &c. . . . . Let your loins be girded about, and your lights burning," &c. To say that he was not intending to teach a universal morality,† is to admit that his precepts are a trap; for they then mix up and confound mere contingent duties with universal sacred obligations, enunciating all in the same breath, and with the same solemnity. I cannot think that Jesus intended any separation. In fact, when a rich young man asked of him what he should do, that he might inherit eternal life, and pleaded that he had kept the ten commandments, but felt that to be insufficient, Jesus said unto him : " *If thou wilt be perfect,* go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven :" so that the duty was not contingent upon the peculiarity of a man possessing apostolic gifts, but was with Jesus the normal path for all who desired perfection. When the young man went away sorrowing, Jesus moralized on it, saying : " How hardly shall a rich man enter into the kingdom of heaven :" which again shows, that an abrupt renunciation of wealth was to be the general and ordinary method of entering the kingdom. Hereupon, when the disciples asked : " Lo ! we *have* forsaken all, and followed thee : what shall we have *therefore* ?" Jesus, instead of rebuking their self-righteousness, promised them as a reward, that they should sit upon twelve• thrones, judging the twelve tribes of Israel. A precept thus systematically enforced, is illustrated by the practice, not only of the twelve, but apparently of the seventy, and what is stronger still, by the practice of the five thousand disciples after the celebrated days of the first Pentecost. There was no longer a Jesus on earth to itinerate with, yet the disciples in the fervour of first love obeyed his precept : the rich sold their possessions, and laid the price at the apostle's feet.

The mischiefs inherent in such a precept rapidly showed themselves, and good sense corrected the error. But this very fact proves

* Indeed we have in Luke vi. 20-24, a version of the Beatitudes so much in harmony with this lower doctrine, as to make it an open question, whether the version in Matth. v. is not an improvement upon Jesus, introduced by the purer sense of the collective church. In Luke, he does not bless the poor *in spirit,* and those who hunger *after righteousness,* but absolutely the " poor" and the " hungry," and all who honour *Him* ; and in contrast, curses *the rich* and those who are full.

† At the close, is the parable about the absent master of a house ; and Peter asks, " Lord ! (Sir !) speakest thou this parable unto *us,* or also unto *all* ?" Who would not have hoped an ingenuous reply, " To you only," or, " To every body" ? Instead of which, so inveterate is his tendency to muffle up the simplest things in mystery, he replies, " Who then, is that faithful and wise steward," &c., &c., and entirely evades reply to the very natural question.

• This implied that Judas, as one of the twelve, had earned the heavenly throne by the price of earthly goods.

most emphatically that the precept was pre-apostolic, and came from the genuine Jesus ; otherwise it could never have found its way into the gospels. It is undeniable, that the first disciples, by whose tradition alone we have any record of what Jesus taught, understood him to deliver this precept to *all* who desired to enter into the kingdom of heaven,—all who desired to be perfect . why then are we to refuse belief, and remould the precepts of Jesus till they please our own morality ? This is not the way to learn historical fact.

That to inculcate religious beggary as the *only* form and mode of spiritual perfection, is fanatical and mischievous, even the church of Rome will admit. Protestants universally reject it as a deplorable absurdity ;—not merely wealthy bishops, squires and merchants, but the poorest curate also. A man could not preach such doctrine in a Protestant pulpit without incurring deep reprobation and contempt ; but when preached by Jesus, it is extolled as divine wisdom,—and disobeyed.

Now I cannot look on this as a pure intellectual error, consistent with moral perfection. A deep mistake as to the nature of such perfection seems to me inherent in the precept itself ; a mistake which indicates a moral unsoundness. The conduct of Jesus to the rich young man appears to me a melancholy exhibition of perverse doctrine, under an ostentation of superior wisdom. The young man asked for bread, and Jesus gave him a stone. Justly he went away sorrowful, at receiving a reply which his conscience rejected as false and foolish. But this is not all. Jesus was necessarily on trial, when any one, however sincere, came to ask questions so deeply probing the quality of his wisdom as this : " How may I be perfect ?" and to be on trial was always disagreeable to him. He first gave the reply, " Keep the commandments ;" and if the young man had been satisfied, and had gone away, it appears that Jesus would have been glad to be rid of him : for his tone is magisterial, decisive and final. This, I confess, suggests to me, that the aim of Jesus was not so much to *enlighten* the young man, as to stop his mouth, and keep up his own ostentation of omniscience. Had he desired to enlighten him, surely no mere dry dogmatic command was needed, but an intelligent guidance of a willing and trusting soul. I do not pretend to certain knowledge in these matters. Even when we hear the tones of voice and watch the features, we often mistake. We have no such means here of checking the narrative. But the best general result which I can draw from the imperfect materials, is what I have said.

After the merit of " selling all and following Jesus," a second merit, not small, was, to receive those whom he sent. In Matt. x., we read that he sends out his twelve disciples, (also seventy in Luke,) men at that time in a very low state of religious development,—men who did not themselves know what the Kingdom of Heaven meant,—to deliver in every village and town a mere formula of words : " Repent ye : for the Kingdom of Heaven is at hand." They were ordered to go without money, scrip or cloak, but to live on religious alms ; and it is added,—that if any house or city does not receive them, *it shall be more tolerable for Sodom and Gomorrha in the day of judgment* than for it. He adds, v., 40 : " He that receiveth *you,* receiveth *me,* and he that receiveth *me,* receiveth HIM that sent me."—I quite admit, that in all probability it was (on the whole) the more pious part of Israel which was likely to receive this ignorant missionaries ; but inasmuch as they had no claims whatever, intrinsic or extrinsic, to reverence, it appears to me a very extravagant and fanatical sentiment thus emphatically to couple the favour or wrath of God with their reception or rejection.

A third, yet greater merit in the eyes of Jesus, was, to acknowledge him as the Messiah predicted by the prophets, which he was not, according to my friend. According to Matthew (xvi. 13), Jesus put leading questions to the disciples in order to elicit, a confession of his Messiahship, and emphatically blessed Simon for making the avowal which he desired ; but instantly forbade them to tell the great secret to any one. Unless this is to be discarded as fiction, Jesus, although to his disciples in secret he confidently assumed Messianic pretensions , had a just inward misgiving, which accounts both for his elation at Simon's avowal, and for his prohibition to publish it.

In admitting that Jesus was not the Messiah of the prophets, my friend says, that if Jesus were *less* than Messiah, we can reverence him no longer ; but that he was *more* than Messiah. This is to me unintelligible. The Messiah whom he claimed to be, was not only the son of David, celebrated in the prophets, but emphatically the Son of Man of Danial vii., who shall come in the clouds of heaven, to take dominion, glory and kingdom, that all people, nations and languages shall serve him,—an everlasting kingdom, which shall not pass away. How Jesus himself interprets his supremacy, as Son of Man, in Matt. x., xxiii., xxv., and elsewhere, I have already observed. To claim such a character, seems to me like plunging from a pinnacle of the temple. If miraculous power holds him up and makes good his daring, he is more than man ; but if otherwise, to have failed will break all his bones. I can no longer give the same human reverence as before to one who has been seduced into vanity so egregious ; and I feel assured *a priori* that such presumption *must have* entangled him into evasions and insincerities, which *naturally* end in crookedness of conscience and real imposture, however noble a man's commencement, and however unshrinking his sacrifices of goods and ease and life.

The time arrived at last, when Jesus felt that he must publicly assert Messiahship; and this was certain to bring things to an issue. I suppose him to have hoped that he was Messiah, until hope and the encouragement given him by Peter and others grew into a persuasion strong enough to act upon, but not always strong enough to still misgivings. I say, I suppose this; but I build nothing on my suppositon. I however see, that when he had resolved to claim Messiahship publicly, one of two results was inevitable, *if* that claim was ill-founded:—viz., either he must have become an impostor, in order to screen his weakness; or, he must have retracted his pretensions amid much humiliation, and have retired into privacy to learn sober wisdom. From these alternatives *there was escape only by death*, and upon death Jesus purposely rushed.

All Christendom has always believed that the death of Jesus was *voluntarily* incurred; and unless no man ever became a wilful martyr, I cannot conceive why we are to doubt the fact concerning Jesus. When he resolved to go up to Jerusalem, he was warned by his disciples of the danger; but so far was he from being blind to it, that he distinctly announced to them that he knew he should suffer in Jerusalem the shameful death of a malefactor. On his arrival in the suburbs, his first act was, ostentatiously to ride into the city on an ass's colt in the midst of the acclamations of the multitude, in order to exhibit himself as having a just right to the throne of David. Thus he gave a handle to imputations of intended treason.—He next entered the temple courts, where doves and lambs were sold for sacrifice, and—(I must say it to my friend's amusement, and in defiance of his kind but keen ridicule,) committed a breach of the peace by flogging with a whip those who trafficked in the area. By such conduct he undoubtedly made himself liable to legal punishment, and probably might have been publicly scourged for it, had the rulers chosen to moderate their vengeance. But he "meant to be prosecuted for treason, not for felony," to use the words of a modern offender. He therefore commenced the most exasperating attacks on all the powerful, calling them hypocrites and whited sepulchres and vipers' brood; and denouncing upon them the "condemnation of hell." He was successful. He had both enraged the rulers up to the point of thirsting for his life, and given colour to the charge of political rebellion. He resolved to die: and he died. Had his enemies contemptuously let him live, he would have been forced to act the part of Jewish Messiah, or renounce Messiahship.

If any one holds Jesus to be not amenable to the laws of human morality, I am not now reasoning with such a one. But if any one claims for him a human perfection, then I say that his conduct on this occasion was neither laudable nor justifiable; far otherwise. There are cases in which life may be thrown away for a great cause; as when a leader in battle rushes upon certain death, in order to animate his own men; but the case before us has no similarity to that. If our accounts are not wholly false, Jesus knowingly and purposely exasperated the rulers into a great crime,—the crime of taking his life from personal resentment. His inflammatory addresses to the multitude have been defended as follows:

"The prophetic Spirit is sometimes oblivious of the rules of the drawing-room; and inspired Conscience, like the inspiring God, seeing a hypocrite, will take the liberty to say so, and act accordingly. Are the superficial amenities, the soothing fictions, the smotherings of the burning heart, ... really paramount in this world, and never to give way? and when a soul of *power, unable to refrain*, rubs off, though it be with rasping words, all the varnish from rottenness and lies, is he to be tried in our courts of compliment for a misdemeanor? Is there never a higher duty than that of either pitying or converting guilty men,—the duty of publicly exposing them? of awakening the popular conscience, and sweeping away the conventional timidities, for a severe return to truth and reality? No rule of morals can be recognized as just, which prohibits conformity of human speech to fact, and insists on terms of civility being kept with all manner of iniquity."

I certainly have not appealed to any conventional morality of drawing-room compliment, but to the highest and purest principles which I know; and I lament to find my judgment so extremely in opposition. To me it seems that *inability to refrain* shows weakness, not *power*, of soul, and that nothing is easier than to give vent to violent invective against bad rulers. The last sentence quoted, seems to say, that the speaking of Truth is never to be condemned: but I cannot agree to this. When Truth will only exasperate, and cannot do good, silence is imperative. A man who reproaches an armed tyrant in words too plain, does but excite him to murder; and the shocking thing is, that this seems to have been the express object of Jesus. No good result could be reasonably expected. Publicly to call men in authority by names of intense insult, the writer of the above distinctly sees will never convert them; but he thinks it was adapted to awaken the popular conscience. Alas! it needs no divine prophet to inflame a multitude against the avarice, hypocrisy, and oppression of rulers, nor any deep inspiration of conscience in the multitude to be wide awake on that point themselves. A Publius Clodius or a Cleon will do that work as efficiently as a Jesus; nor does it appear that the poor are made better by hearing invectives against the rich and powerful. If Jesus had been aiming, in a good cause, to excite rebellion, the mode of address which he assumed seems highly appropriate; and in such a calamitous necessity, to risk exciting murderous enmity would be the act of a hero: but as the account stands, it seems to me the deed of a fanatic. And it is to me manifest that he overdid his attack, and failed to command it to the conscience of his hearers. For up to this point the multitude was in his favour. He was notoriously so acceptable to the many, as to alarm the rulers; indeed the belief of his popularity had shielded him from prosecution. But after this fierce address he has no more popular support. At his public trial the vast majority judge him to deserve punishment, and prefer to ask free forgiveness for Barabbas, a bandit who was in prison for murder. We moderns, nursed in an arbitrary belief concerning these events, drink in with our first milk the assumption that Jesus alone was guiltless, and all the other actors in this sad affair inexcusably guilty. Let no one imagine that I defend for a moment the cruel punishment which raw resentment inflicted on him. But though the rulers felt the rage of Vengeance, the people, who had suffered no personal wrong, were moved only by ill-measured Indignation. The multitude love to hear the powerful exposed and reproached, up to a certain limit; but if reproach go clearly beyond all that they feel to be deserved, a violent sentiment reacts on the head of the reviler: and though popular indignation (even when free from the element of selfishness) ill fixes the due *measure* of Punishment, I have a strong belief that it is righteous, when it pronounces the verdict Guilty.

Does my friend deny that the death of Jesus was wilfully incurred? The "orthodox" not merely admit, but maintain it. Their creed justifies it by the doctrine, that his death was a "sacrifice" so pleasing to God, as to expiate the sins of the world. This honestly meets the objections to self-destruction; for how better could life be used, than by laying it down for such a prize? But besides all other difficulties in the very idea of atonement, the orthodox creed startles us by the incredible conception, that a voluntary sacrifice of life should be unacceptable to God, unless offered by ferocious and impious hands. If Jesus had "authority from the Father to lay down his life," was he unable to stab himself in the desert, or on the sacred altar of the Temple, without involving guilt to any human being? Did He, who is at once "High Priest" and Victim, when "offering up himself" and "presenting his own blood unto God," need any justification for using the sacrificial knife? The orthodox view more clearly and unshrinkingly avows, that Jesus deliberately goaded the wicked rulers into the deeper wickedness of murdering him; but on my friend's view, that Jesus was *no* sacrifice, but only a Model man, his death is an unrelieved calamity. Nothing but a long and complete life could possibly test the fact of his perfection; and the longer he lived, the better for the world.

In entire consistency with his previous determination to die, Jesus, when arraigned, refused to rebut accusation, and behaved as one pleading Guilty. He was accused of saying that if they destroyed the temple, he would rebuild it in three days; but how this was to the purpose, the evangelists who name it do not make clear. The fourth however (without intending so to do) explains it; and I therefore am disposed to believe his statement, though I put no faith in his long discourses. It appears (John ii. 18—20) that Jesus after scourging the people out of the temple-court, was asked for a sign to justify his assuming so very unusual authority: on which he replied: "Destroy this temple, and in three days I will raise it up." Such a reply was regarded as a manifest evasion; since he was sure that they would not pull the temple down in order to try whether he could raise it up miraculously. Now if Jesus really meant what the fourth gospel says he meant;—if he "spoke of *the temple of his body*;"—how was any one to guess that? It cannot be denied, that such a reply, *prima facie*, suggested, that he was a wilful impostor: was it not then his obvious duty, when this accusation was brought against him, to explain that his words had been mystical and had been misunderstood? The form of the imputation in Mark xiv. 58, would make it possible to imagine,—if the *three days* were left out, and if his words were *not* said in reply to the demand of a sign,—that Jesus had merely avowed that though the outward Jewish temple were to be destryed, he would erect a church of worshippers as a spiritual temple. If so, "John" has grossly misrepresented him, and then obtruded a very far-fetched explanation. But whatever was the meaning of Jesus, if it was honest, I think he was bound to explain it; and not leave a suspicion of imposture to rankle in men's minds.* Finally, if the whole were fiction, and he never uttered such words, then it was his duty to deny them, and not remain dumb like a sheep before its hearers.

After he had confirmed by his silence the belief that he had used a dishonest evasion indicative of consciousness that he was no real Messiah, he suddenly burst out with a full reply to the High Priest's question; and avowed that he *was* the Messiah, the Son of God; and that they should hereafter see him sitting on the right-hand of power, and coming in the clouds of heaven,—of course to enter into judgment on them all. I am the less surprized that this precipitated his condemnation, since he himself seems to have designed precisely that result. The exasperation which he had succeeded in kindling led to his cruel death; and when men's minds had cooled, natural horror possessed them for such a retribution on such a man. His *words* had been met with *deeds*: the provocation he had given was unfelt to those beyond the limits of Jeru-

* If the account in John is not wholly false, I think the reply in every case discreditable. If literal, it all but indicates wilful imposture. If mystical, it is disingenuously evasive; and it tended, not to instruct, but to irritate, and to move suspicion and contempt. Is this the course for a religious teacher?—to speak darkly, so as to mislead and prejudice; and this, when he represents it as a matter of spiritual life and death to accept his teaching and his supremacy?

salem; and to the Jews who assembled from distant parts at the feast of Pentecost he was nothing but the image of a sainted martyr.

I have given more than enough indications of points in which the conduct of Jesus does not seem to me to have been that of a perfect man: how any one can think him a Universal Model, is to me still less intelligible. I might say much more on this subject. But I will merely add, that when my friend gives the weight of his noble testimony to the Perfection of Jesus, I think it is due to himself and to us that he should make clear what he means by this word "Jesus." He ought to publish—(I say it in deep seriousness, not sarcastically)—an expurgated gospel; for in truth I do not know how much of what I have now adduced from the gospel as *fact*, he will admit to be fact. I neglect, he tells me, "a higher moral criticism," which, if I rightly understand, would explode, as evidently unworthy of Jesus, many of the representations pervading the gospels: as, that Jesus claimed to be an oracular teacher, and attached spiritual life or death to belief or disbelief in this claim. My friend says, it is beyond all serious question *what* Jesus *was*: but his disbelief of the narrative seems to be so much wider than mine, as to leave me more uncertain than ever about it. If he will strike out of the gospels all that he disbelieves, and so enable me to understand *what* is the Jesus whom he reveres, I have so deep a sense of his moral and critical powers, that I am fully prepared to expect that he may remove many of my prejudices and relieve my objections: but I cannot honestly say that I see the least probability of his altering my conviction, that in *consistency* of goodness Jesus fell far below vast numbers of his unhonoured disciples.

F. W. NEWMAN.

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের

কার্য্যনির্ব্বাহার্থে

১৭৮৮ শকের জন্য নিম্ন লিখিত কর্ম্মচারী সকল নিযুক্ত হইলেন।

অধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত বাবু কাশীশ্বর মিত্র
শ্রীযুক্ত বাবু হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী

সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীযুক্ত বাবু সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী

বিজ্ঞাপন

১—১৭৮৬ শকের ১ পৌষ অবধি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে যে সকল দান সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা ব্রাহ্মসমাজের ও ব্রাহ্মধর্ম্মের উপকারার্থে ব্যয় করিবার ভার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীযুক্ত কাশীশ্বর মিত্র ও শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী এই তিন জনের উপর সমর্পিত হয়, ইহাঁদের অধিকাংশের মতে উহা ব্যয়িত হইবে।

২—ভবিষ্যতে কেহ বিশেষ নির্দ্দেশ না করিয়া কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে যাহা কিছু দান করিবেন, উপরোক্ত মহাশয়েরাই ব্রাহ্মসমাজের উপকারার্থে তাহা ব্যয় করিবেন।

৩—উপরোক্ত তিন জনের মধ্যে কেহ অবসৃত হইলে যাঁহারা অবশিষ্ট থাকিবেন, তাঁহারা তৎপদে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

১ বৈশাখ ১৭৮৭ শক

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীবিজয়গোপাল মিত্র
শ্রীহরিদাস শ্রীমাণি
শ্রীরাজকুমার মল্লিক
শ্রীতারকনাথ দত্ত
শ্রীবিহারিলাল ভট্টাচার্য্য
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাতুরে ঘাটা)
শ্রীহরনাথ ঠাকুর
শ্রীচন্দ্রকুমার দত্ত
শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীরাজারাম মুখোপাধ্যায়
শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
শ্রীপার্ব্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীবনমালি সেন
শ্রীবলরাম দে
শ্রীরামসেবক দে
শ্রীরামমোহন দে
শ্রীসাগরলাল দত্ত
শ্রীকমলাকান্ত সেন
শ্রীসুবলদাস সেন
শ্রীহরিমোহন নন্দী
শ্রীশিবচন্দ্র নন্দী
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীঅভয়াচরণ গুপ্ত
শ্রীহেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীসারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীবিশ্বেশ্বর ঘোষ
শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ

বিজ্ঞাপন।

নূতন ও পুনর্ম্মুদ্রিত বিক্রেয় পুস্তক।

তাৎপর্য্যসহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম—মূল্য ১।০

গত বৎসর সাম্বৎসরিক সমাজের দিবস যে পুস্তক লাল কালো অক্ষরে উভয় খণ্ড একত্রে মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা দুষ্প্রাপ্য হওয়াতে পুনর্ব্বার মুদ্রিত করা হইয়াছে।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান।

প্রথম প্রকরণ—মূল্য ।৷০ আট আনা।
দ্বিতীয় প্রকরণ—মূল্য ।৷০ আট আনা।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয় কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের এক একটী শ্লোকের যেরূপ ব্যাখ্যা দ্বারা সাধারণকে উপদেশ প্রদান করেন, তাহার কতকগুলি লইয়া প্রথম প্রকরণ নামে পূর্ব্বে পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়, সম্প্রতি তাহার অবশিষ্ট গুলি একত্রিত করিয়া দ্বিতীয় প্রকরণ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রকরণে পারলৌকিক সাধনের বিশেষ উল্লেখ আছে।

ব্রহ্মোপাসনা—মূল্য ৵০ একআনা

ব্রাহ্মসমাজে সাপ্তাহিক উপাসনা কালে যে পদ্ধতি অনুসারে উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, তৎসমুদায় সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। তাহাতে ব্রাহ্মদিগের ব্রহ্মোপাসনার বিশেষ সাহায্য হইতে পারিবে।

ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস-মূল্য ।৷০

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয় কলিকাতা ব্রহ্মবিদ্যালয়ে ১৭৮১। ৮২ শকে যে দশ উপদেশ দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস ব্যক্ত করেন, তাহা গ্রন্থবদ্ধ হইয়া পূর্ব্বে মুদ্রিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা নিঃশেষিত হওয়াতে পুনর্ব্বার মুদ্রিত হইয়াছে।

ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উপদেশ।

মূল্য ।০ চারি আনা।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয় ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে যে কয়েকটী উপদেশ দ্বারা তথাকার ছাত্রদিগের অন্তঃকরণে ব্রাহ্মধর্ম্মের নিগূঢ় ভাব সকল সহজ রূপে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছিলেন, সেই সকল উপদেশ একত্রিত করিয়া পুস্তকাকারে প্রচার করা হইয়াছে।

মাঘোৎসব—মূল্য ১ এক টাকা।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের প্রথমাবধি গত বৎসর পর্য্যন্ত সাম্বৎসরিক সমাজের উৎসবে যে সকল বক্তৃতা হইয়াছিল, তৎসমুদায় একত্রিত করিয়া সর্ব্বসাধারণের সুলভার্থে পুস্তকাকারে মুদ্রিত করা হইয়াছে। যে সকল মহাত্মারা সাম্বৎসরিক উৎসবের বিবরণ একত্রে অবগত হইতে বাসনা করেন, তাঁহারা ঐ পুস্তকে তাহার সমুদয় দেখিতে পাইবেন।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের

১৭৮৭ শকের চৈত্র মাসের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	২০২ ৵০
যন্ত্রালয়	১২২৷৷৵১০
পুস্তক বিক্রয়	৬৮৷৷৵০
ডাক মাসুল	১৯।১০
পুস্তক পাঠ	৩৷৷০
দান	২৫
পুস্তক বিক্রয়ের কমিশন	১০৸৵১০
গচ্ছিত	৩১৫।৵০
	৭৭০।৵১০

ব্যয়	
পত্রিকা মুদ্রাঙ্কন ও কাগচ ক্রয়	১৫৭৷৷৶১০
মাসিক বেতন	১৪০৷৶০
যন্ত্রালয়	২৫১৸১০
ডাক মাসুল	২০৷৷৶১০
আলোকের ব্যয়	৩৮৷৶১০
পুস্তক মুদ্রাঙ্কন	৬৪
পুস্তক বন্ধন	১১৶০
বিবিধ ব্যয়	৩৪৷১৫
গচ্ছিত	৫২৸১০
	৭৭১৶৫
আয়	৭৭০৷৶১০
পূর্ব্বকার স্থিত	৬৯৷৶৫
	৮৩৯৷৶১৫
ব্যয়	৭৭১ ৶৫
স্থিত	৬৮৷৷৶১০

শ্রী সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

১৭৮৭ শকের চৈত্র মাসের দানের আয় ব্যয় বিবরণ।

প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ ঘোষ	১০
" মধুসূদন ঘোষ	৬৷০
" কাশীশ্বর মিত্র	৫
" প্রতাপচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ..	৩
" গোকুলকৃষ্ণ সিংহ	২
	২৬৷০
দানাধারে প্রাপ্ত	১৷১৫
	২৭৷৷১৫
আয়	২৭৷৷১৫
পূর্ব্বকার স্থিত ..] ..	১২২৷৶১৫
	১৪৯৸১০

ব্যয়	
আগরা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত জন্য পাঠান যায় কোং	১০০
	৪৯৸১০

শ্রী সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গ্রাহকগণের মধ্যে যাঁহাদিগের অগ্রিম মূল্য নিঃশেষিত হইয়াছে, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক ১৭৮৮ শকের অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহাদিগের নিকট তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার দ্বাদশ মাসের মূল্য অনাদায় আছে, তাঁহারা জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে তৎ সমুদায় অনুগ্রহ করিয়া পরিশোধ করিবেন।

শ্রী আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।
সহকারী সম্পাদক।

আগামী ৭ জ্যৈষ্ঠ রবি বার প্রাতঃকালে ৭৷৷০ সাড়ে সাত ঘন্টার সময়ে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা পুস্তকাকারে প্রকাশ জন্য মুদ্রিত হইতেছে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সার মর্ম্ম ইংরেজীতে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে। হয়ত গ্রাহকগণ এক কালে উক্ত দুইখানি পুস্তক প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

শ্রী ঈশানচন্দ্র বসু
মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাকমাসুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২৩। কলিগতাব্দ ৪৯৩৭। ১ বৈশাখ শনিবার।

একমেবাদ্বিতীয়ং
ষষ্ঠ কল্প
চতুর্থ ভাগ
জ্যৈষ্ঠ ১৭৮৮ শক।
২৭৪ সংখ্যা
৩৭ ব্রাহ্মসম্বৎ

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদসংহিতা।

প্রথমমণ্ডলস্য ত্রয়োদশানুবাকে অষ্টমং সূক্তং।

গোতমঋষিঃ পংক্তিশ্ছন্দঃ ইন্দ্রোদেবতা।

৮৬৪

১ ইন্দ্রো মদায় বাবৃধে শবসে বৃত্রহা নৃভিঃ। তমিন্মহৎস্বাজিষূতেমর্ভে হবামহে সবাজেষু প্রনোঽবিষৎ।

১ 'বৃত্রহা' বৃত্রস্যাবরকস্য বৃষ্টিনিরোধকস্য মেঘস্যাস্তুরস্য বা হন্তা যদ্বা আবরকাণাং শত্রূণাং হন্তা 'ইন্দ্রঃ' 'মদায়' হর্ষার্থং 'শবসে'। বলনামৈতৎ। বলার্থং চ 'নৃভিঃ' যজ্ঞস্য নেতৃভির্ঋত্বিগ্ভিঃ 'বাবৃধে' স্তোত্রশস্ত্ররূপাভিঃ স্তুতিভিঃ প্রবর্দ্ধিতোবভুব। স্তুত্যাহি দেবতা প্রাপ্তবলা সতী প্রবর্ধতে। 'তমিৎ' তমেবেন্দ্রং 'মহৎসু' প্রভূতেষু 'আজিষু' সংগ্রামেষু 'হবামহে' অস্মাকং রক্ষণায়াহ্বয়ামহে। 'উত' অপিচ 'ইং' এনং 'অর্ভে' অল্পে সংগ্রামে হবামহে। অস্মাভিরাহূতঃ 'সঃ' চেন্দ্রঃ 'বাজেষু' সংগ্রামেষু 'নঃ' অস্মান্ 'প্রাবিষৎ' প্রাবতু প্রকর্ষেণ রক্ষতু।

১ ঋত্বিক্‌গণ বৃত্রহা ইন্দ্রের হর্ষ ও বল বর্দ্ধিত করিয়াছেন। আমরা সেই ইন্দ্রকেই কি ঘোরতর কি স্বল্পতর উভয়বিধ সংগ্রামে আহ্বান করিয়াথাকি। তিনি সংগ্রামে আমাদিগকে সম্যক রূপে রক্ষা করুন।

৮৬৫

২ অসি হি বীর সেন্যোঽসি ভূরি পরাদদিঃ। অসি দভ্রস্য চিদ্বৃধো যজমানায় শিক্ষসি সুন্বতে ভূরি তে বসু।

২ হে 'বীর' শত্রুক্ষেপণকুশলেন্দ্র ত্বং 'সেন্যোঽসি' সেনার্হো ভবসি। ত্বমেকোঽপি সেনাসদৃশোভবসীত্যর্থঃ 'হি' যস্মাদেবং তস্মাৎ 'ভূরি' প্রভূতং শত্রূণাং ধনং 'পরাদদিঃ' পরাদাতা শত্রূণাং পরাঙ্মুখং যথা ভবতি তথা দাতা 'অসি' ভবসি। 'দভ্রস্য চিৎ' অল্পনামৈতৎ। অল্পস্যাপি তব স্তোতুঃ 'বৃধঃ' বর্ধয়িতা 'অসি'। তথা 'যজমানায়' যাগং কুর্ব্বতে 'সুন্বতে' সোমাভিষবং কুর্ব্বতে পুরুষায় 'শিক্ষসি' অপেক্ষিতং ধনং দদাসি। শিক্ষতির্দ্দানকর্ম্মা। যস্মাৎ 'তে' তব 'বসু' ধনং 'ভূরি' বহুলং অক্ষয়ং ধনং বিদ্যতে তস্মাৎ দদাসীতি ভাবঃ।

২ হে বীর! তুমি একাকী সৈন্যসমষ্টির সমকক্ষ; তুমি শত্রুগণকে বিমুখ করিয়া তাহাদিগকে প্রভূত ধন দান করিয়া থাক। যে তোমাকে অল্পমাত্র স্তব করে, তুমি তাহাকেও সমুন্নত কর; তুমি সোমসংস্কারক যজমানকে তাহার অভিলসিত ধন দিয়া থাক; যে হেতু তোমার ধন যথেষ্ট।

৮৬৬

৩ যদ্ভূদীরত আজযো ধৃষ্ণবে ধীযতে ধনা। যুক্ষ্বা মদচ্যুতা হরী কংহনঃ কংবসৌ দধোহস্মাঁ ইন্দ্র বসৌ দধঃ।

৩ অত্রেদমাখ্যানং। বৃহূগণপুত্রোগোতমঃ কুরুসৃঞ্জযানাং রাজ্ঞাং পুরোহিতআসীৎ। তেষাং রাজ্ঞাং পরৈঃ সহ যুদ্ধে সতি সঋষিরণেন সূক্তেনেন্দ্রং স্তুত্বা স্বকীযানাং জযং প্রার্থযামাসেতি। তস্য চ তৎপুরোহিতত্বং বাজসনেযিভিরাম্নাতং। গোতমো হবৈ রাহূগণউভযেষাং কুরুসৃঞ্জযানাং পুরোহিতআসীদিতি। 'যৎ' যদা 'আজযঃ' সংগ্রামাঃ 'উদীরতে' উদাচ্ছন্তি উৎপদ্যন্তে তদানীং 'ধনা' ধনং 'ধৃষ্ণবে' যোধৃষ্ণু ধর্ষযিতা শত্রূণাং জেতা ভবতি তস্মৈ 'ধীযতে' নিধীযতে জযতো ধনং ভবতীত্যর্থঃ। হে 'ইন্দ্র' ত্বং তাদৃশেষু যুদ্ধেষু প্রবৃত্তেষু 'মদচ্যুতা' শত্রূণাম্ মদস্য গর্ব্বস্য চ্যাবযিতারৌ 'হরী' ত্বদীযাশ্বৌ 'যুক্ষ্ব' রথে যোজয। যোজযিত্বাচ 'কং' কঞ্চিদ্রাজানং তব পরিচরণমকুর্ব্বন্তং 'হনঃ' হন্যাঃ 'কং' কঞ্চন ত্বাং পরিচরন্তং 'বসৌ' বসূনি ধনে 'দধঃ' স্থাপযসি। অতোজযপরাজযযোস্ত্বমেব কারযিতাসি। তস্মাৎ হে ইন্দ্র 'অস্মান্' অস্মদীযান্ রাজ্ঞঃ 'বসৌ' ধনে 'দধঃ' স্থাপয।

৩ সংগ্রাম উপস্থিত হইলে জেতারই ধন লাভ হয়। তুমি শত্রুগণের দর্পহারী অশ্বদ্বয় রথে যোজনা করিয়া কাহাকেও বিনষ্ট কর এবং কাহাকেও ধনদান করিয়াথাক। অতএব হে ইন্দ্র! তুমি আমাদিগকে ধন প্রদান কর।

৮৬৭

৪ ক্রত্বা মহাঁ অনুষ্বধং ভীম আ বাবধে শবঃ। শ্রিয ঋষ্ব উপাকযোর্নি শিপ্রী হরিবান্দধে হস্তযো র্বজ্রং মাযসং।

৪ 'ক্রত্বা' কর্ম্মণা প্রজ্ঞযা বা 'মহান্' সর্ব্বাধিকঃ 'ভীমঃ' শত্রূণাং ভযঙ্করঃ ইন্দ্রঃ 'অনুষ্বধং'। স্বধেত্যন্ননাম। স্বধাযাং। বিভক্ত্যর্থেঽব্যযীভাবঃ। সোমলক্ষণস্য অন্নস্য পানে সতীত্যর্থঃ। 'শবঃ' আত্মীযং বলং 'আববৃধে' আভিমুখ্যেন প্রাবর্ধযত। তদনন্তরং 'ঋষ্বঃ' দর্শনীযঃ 'শিপ্রী' শিপ্রে হনূ নাসিকে বা তদ্যুক্তঃ 'হরিবান্' হরিনামকাশ্বোপেতঃ ইন্দ্রঃ 'উপাকযোঃ' অন্তিকনামৈতৎ সমীপবর্ত্তিনোঃ 'হস্তযোঃ' বাহ্বোঃ 'আযসং' অযোময়ং 'বজ্রং' 'শ্রিযে' সম্পদর্থং 'নিদধে' নিদধাতি স্থাপযতি। সোমপানেন হৃষ্টঃ প্রবলঃ ইন্দ্রঃ শত্রূণাং হননায হস্তে বজ্রং গৃহ্ণাতীতি তাৎপর্য্যার্থঃ।

৪ কর্ম্মদ্বারা মহান্, শত্রুগণের ভয়ঙ্কর, দর্শনীয়, সুনাসিক, অশ্ববান্ ইন্দ্র সোমরস পান করিয়া বলবান হইয়া স্বীয় হস্তে লৌহময় বজ্র গ্রহণ করেন।

৮৬৮

৫ আ পপ্রৌ পার্থিবং রজো বদ্বধে রোচনা দিবি। ন ত্বাবাঁ ইন্দ্র কশ্চন ন জাতো ন জনিষ্যতে ইতি বিশ্বং বযাম্মথ।

১।৬।১।

৫ ইন্দ্রঃ স্বতেজসা 'পার্থিবং' পৃথিব্যাঃ সম্বন্ধি বস্তুজাতং 'রজঃ' অন্তরিক্ষলোকঞ্চ 'আপপ্রৌ' আপূরযতি। তথা 'দিবি' দ্যুলোকে 'রোচনা' রোচমানানি দীপ্তানি নক্ষত্রাণি 'বদ্বধে' ববন্ধ স্থাপিতবান্। অতো হে ইন্দ্র 'ত্বাবান্' ত্বৎসদৃশঃ 'কশ্চনঃ' 'ন জাতঃ' নোৎপন্নোঽস্তি 'ন' চ 'জনিষ্যতে' উৎপৎস্যমানোঽপি নাস্তি। তাদৃশস্ত্বং 'বিশ্বং' সর্ব্বং রক্ষিতব্যং জগৎ 'অতি' 'ববক্ষিথ' অতিশযেন বোঢ়মিচ্ছসি। সর্ব্বস্য জগতোনির্ব্বাহকোভবসীত্যর্থঃ। ১।৩।১।

৫ ইন্দ্র স্বীয় তেজ দ্বারা পার্থিব বস্তুজাত ও অন্তরিক্ষ পরিপূর্ণ করিয়া আছেন এবং দ্যুলোকে দীপ্যমান নক্ষত্র সকল বন্ধন করিয়াছেন, অতএব হে ইন্দ্র! তোমার সদৃশ কেহ জন্মে নাই এবং জন্মিবেও না। তুমি সমুদায় জগতের নির্ব্বাহক। ১। ৬। ১।

নব বর্ষের ব্রাহ্মসমাজ।

প্রাধান আচার্য্যের উপদেশ।

১ বৈশাখ ১৭৮৮ শক।

এক বৎসর কাল পরিবর্ত্ত হইয়া গেল, গত বৎসর অনন্ত-কালে বিলীন হইল; কিন্তু সূর্য্যের রশ্মি যেমন তেমনি রহিল, কিছু মাত্র তাহা মলিন হইল না। অদ্য নব বর্ষ সমুদিত; নব বর্ষের প্রথম সূর্য্য পুনর্ব্বার আমারদের নয়নের আলোক হইয়া উদিত হইয়াছে—এই তরুণ ভানু ঈশ্বরের মহিমা গান করিতে করিতে আবার অদ্য পূর্ব্ববৎ অচেতন জগৎকে সচেতন করিয়াছে, শিশিরার্দ্র পবিত্র পুষ্প-রাজিকে সহস্র বর্ণে রঞ্জিত ও চিত্রিত করিয়াছে। গত বৎসরের সেই পুরাতন সূর্য্য নির্ব্বাণ হয় নাই। যে সূর্য্য বিগত সমস্ত বৎসর আমারদের মস্তকের উপর দিয়া তিন শত পঁয়ষট্টি বার যাতায়াত করিয়াছে; সেই সূর্য্যই অদ্য বৈশাখের প্রথম দিনে উৎসাহ-সহকারে উদিত হইয়াছে, সেই সূর্য্যই গগনে স্বীয় সহস্র কর বিস্তার করিয়া অদ্য বিরাজ করিতেছে। গত বৎসরের গর্ভে এই নূতন বর্ষ ছিল, অদ্য ইহা প্রসূত হইয়াছে—ঈশ্বরের কল্যাণকর নিয়মে ইহা পুরাতন বৎসরকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইয়াছে। যেমন গত বৎসরের গর্ভ হইতে এই নূতন বৎসরের সূর্য্য সমুদিত হইয়াছে, আমারদের আত্মা তেমনি ইহ-কালের জরা-জীর্ণ শরীরের অবসান হইলে পর-কালে পর-লোকে নূতন হইয়া উত্থিত হইবে। সেই মহানাত্মার গর্ভে আমারদের আত্মা প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে—সেই অনির্দ্দেশ্য নিরালম্ব পরমেশ্বরের গর্ভেতে আত্মা পরিপালিত হইতেছে; জরায়ুশায়ী গর্ভেতে মাতৃ-শরীরের রক্ত-সঞ্চারের ন্যায় আমারদের আত্মাতে তাঁর জ্ঞান, তার ধর্ম্ম, তাঁর পবিত্রতা বহমান হইতেছে। এই আত্মা অনন্ত কাল তাঁর আলোকে বিচরণ করিবে। অদ্যকার নূতন দিবসে ঈশ্বর আমারদের শুভ বুদ্ধিতে এই আশাকর উৎসাহকর সত্য প্রেরণ করিতেছেন যে আমারদের আত্মার বিনাশ নাই। তিনি বলিতেছেন—জ্ঞান অর্জ্জন কর, ধর্ম্ম সঞ্চয় কর, পবিত্রতা লাভ কর; আমি তোমাকে ক্রোড়ে লইয়া দিব্য-ধামে গমন করিব। ভয় নাই, লোকের নিষ্ঠুরতাতে কাতর হইও না, আমি তোমার সহায়, আমাকে অবলম্বন কর; এই সংসারের পর-পারে অমৃত-ধামে নির্ব্বিঘ্নে উত্তীর্ণ হইবে! "ওমিত্যেবং ধ্যাযথ আত্মানং স্বস্তি বঃ পারায় তমসঃ পরস্তাৎ।" 'ওঙ্কার প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মকে ধ্যান কর এবং নির্ব্বিঘ্নে তোমরা অজ্ঞান-তিমিরাবৃত সংসারের পর-পারে উত্তীর্ণ হও।' ঈশ্বর আমারদিগকে এই অঙ্গীকার দিতেছেন—তিনি ক্ষুদ্র মনুষ্যের ন্যায় বিশ্বাসঘাতী নন—তিনি আমারদের আত্মাতে যে বিশ্বাস প্রেরণ করিতেছেন, অবশ্যই তাহা পূর্ণ করিবেন। হে পরমাত্মন্! তুমি প্রতি বৎসর সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই আশা প্রেরণ করিতেছ, যে এই পৃথিবীর শরীর পৃথিবীতে পরিত্যাগ করিয়া আত্মা অনন্ত জীবনে উন্নত হইবে—এ আশা হইতে আর অধিক কিছুই নাই। এই আশা মৃত্যুর মধ্যে জীবন; মৃত্যুর মধ্যে অমৃত। এই আশা না থাকিলে পৃথিবীর কীট হইয়া থাকিতাম; সম্পদে প্রফুল্ল হইতাম না, বিপদ্ ভূমিসাৎ করিত। এই আশা বৎসরে বৎসরে তুমি প্রেরণ করিতেছ—এই আশা জীবনের অন্ন হইয়াছে। এই আশাতে নির্ভয় হইয়া এ সংসারে থাকিয়া 'যে কিছু যাতনা পাই, সব তোমারে জানাই, দুঃখে সুখী হই দুঃখ জানাইয়া'। হে প্রভো! এই আশাতে পৃথিবীর দুঃখে সুখী হই, লোকের অপবাদ তিরস্কার তুচ্ছ করি। তুমি এই আশা আমারদের প্রত্যেকের হৃদয়ে স্বহস্তে রোপন করিয়াছ, ইহা অবশ্যই ফলবতী হইবে—এই আমার বিশ্বাস।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

কার্ত্তিক ১৭৮৭ শক।

যস্যৈষমহিমা ভুবি দিব্যে।

তাঁহার মহিমা এই ভূলোকে ও দ্যুলোকে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। সকল দেশে সকল কালে ও সকল স্থানেই সেই ঈশ্বরের আশ্চর্য্য মহিমা বিদ্যমান রহিয়াছে। কে বা সে মহিমার ইয়ত্তা করিতে পারে? তাঁহার জগতের কার্য্য সমুদায় আলোচনা করিলে কেবল ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহার মহিমার আর পার নাই, অন্ত নাই। অদ্যাপি কেহই তাঁহার মহিমার বিষয় আলোচনা করিয়া শেষ করিতে পারে নাই এবং ভবিষ্যতেও যে কেহ তাহার শেষ করিতে পারিবে তাহার সম্ভাবনা নাই। তাঁহার মহিমা সকল স্থানে ও সকল কালে সমান রূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। তাঁহার মহিমা যেমন প্রকাণ্ডকায় মাতঙ্গশরীরে প্রকাশমান তেমনি এক ক্ষুদ্র কীটেতেও বর্ত্তমান। গগনমণ্ডলে সূর্য্য চন্দ্র ও অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্র যেমন তাঁহার মহিমা ঘোষণা করে তেমনি এক ক্ষুদ্র শিশির বিন্দু ও সুকোমল কুসুমদামও তাঁহার মহিমা পরিব্যক্ত করে। সকল জগৎ ও সকল স্থান তাঁহার স্তুতিরবে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। যখন বাত্যাকুলিত মহাসমুদ্র গম্ভীর নির্ঘোষে উত্তাল তরঙ্গ সকল ভীষণ রূপে সমুত্থিত করে তখন সে যেমন ঈশ্বরের মহিমা উচ্চৈঃস্বরে নিনাদিত করে, তেমনি সে যখন পুনরায় শান্তমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক একটি সুবিস্তীর্ণ স্থির পুষ্করিণীর ন্যায় অবস্থিতি করিয়া নীলোজ্জ্বল মনোহর বর্ণে নয়নের প্রীতি উৎপাদন করে তখনও সে তাঁহারি যশঃ ঘোষণা করে। সূর্য্য যখন তাহার পূর্ব্বদিকস্থ গৃহ হইতে উজ্জ্বল লোহিত বর্ণে আকাশমণ্ডলকে ভূষিত করত নির্গত হয়, তখন সে যেমন ঈশ্বরের আশ্চর্য্য মহিমা প্রকাশ করে, সেই রূপ চন্দ্রমা যখন সুকোমল মধুর রশ্মি বিকীর্ণ করত জগৎকে সুধার ধামে পরিণত করে, তখনও সে ঈশ্বরের নিরুপম মহিমার পরিচয় প্রদান করে। ধাতুরাজ্য, উদ্ভিদরাজ্য, পশুরাজ্য, ক্ষুদ্র জগৎ মনুষ্য, দ্যুলোকের উজ্জ্বল ঐশ্বর্য্য, ঈশ্বরের মহিমা অহর্নিশ উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেছে। সকল কালে, সকল স্থানে, সকল ঘটনাতে, সেই ঈশ্বরের অপার মহিমা দেদীপ্যমান রহিয়াছে। আমাদের কর্ত্তব্য যে আমরা যখন যে বিদ্যা শিক্ষা করি সেই বিদ্যার মধ্যে ঈশ্বরের মহিমা অবগত হই, যেহেতু সকল বিদ্যাই ঈশ্বরের মহিমা পরিব্যক্ত করে। সকল বিদ্যার প্রকৃত উদ্দেশ্য এই যে আমরা তদ্দ্বারা ঈশ্বরের মহিমা অবগত হইব। যদি ঈশ্বরের মহিমা না জানা যায়, তাহা হইলে সকল বিদ্যাই অর্থশূন্য ও বৃথা হইয়া পড়ে। সকল বিদ্যার চরম গতি তিনি। বিদ্যা দ্বারা যাহা কিছু প্রতিপন্ন হয়, তাহা যদি তাহার সৃষ্টিকর্ত্তাকে স্মরণ না করাইয়া দেয়, তাহা হইলে সে বিদ্যা শিক্ষা করা বিফল। আর যদ্যপি প্রত্যেক বিদ্যা প্রতিক্ষণে সেই ঈশ্বরকে স্মরণ করাইয়া দেয়, তাহা হইলে সেই বিদ্যা শিক্ষার সময়েই ঈশ্বরের উপাসনা হয় ও সে বিদ্যার আলোচনা সার্থক হয়। একজন বিখ্যাত চিকিৎসক এই কথা বলিয়া গিয়াছেন, যে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষাকালে শবচ্ছেদ সময়ে ঈশ্বরকে স্মরণ হইলে প্রত্যেক শবচ্ছেদই ঈশ্বরের স্তব স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। বস্তুত সকল বিদ্যাতেই

ঈশ্বরের মহিমা গান অন্তর্ভূত আছে। এক একবার আমার এই রূপ মনে হয় যেন সকল বিদ্যা একত্রিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ঈশ্বরের স্তব করিতেছে। প্রাণিবিদ্যা এই প্রকারে কৃতাঞ্জলিপুটে ঈশ্বরের স্তব করিতেছে;—জয় জয় জগদীশ! তোমার মহিমা কে ব্যক্ত করিয়া শেষ করিতে পারে? কত প্রকার পশুপক্ষীকীট পতঙ্গাদি জীব জন্তু তোমার এই বিশ্বরাজ্যে লালিত পালিত হইতেছে তাহা নিরূপণ করা কাহার সাধ্য? ভীষণমূর্ত্তি সমুদ্র-কল্পনকারী তিমি, ও প্রকাণ্ডকায় মাতঙ্গ এবং অন্যান্য উগ্র ও শান্ত প্রকৃতি কত অসংখ্য জীব তোমার এই জগৎমধ্যে বিচরণ করিতেছে। বিচিত্র বিহঙ্গমকুল এবং কত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কীট পতঙ্গ কেমন স্বচ্ছন্দে ইতস্ততঃ গমন করিয়া তাহাদের মনের আনন্দ ব্যক্ত করিতেছে। জগদীশ! কে তোমার সৃষ্ট প্রাণিপুঞ্জের ইয়ত্তা করিতে সমর্থ হয়? উদ্ভিদ বিদ্যা কৃতাঞ্জলিপুটে এই প্রকারে ঈশ্বরের স্তব করিতেছে; জয় জয় জগদীশ! তোমার মহিমা কি প্রকারে ব্যক্ত করিব? উদ্ভিদরাজ্য ও প্রাণিরাজ্য মধ্যে কি আশ্চর্য্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। অসংখ্য প্রকারে ঐ রূপ সম্বন্ধ এমনি নিবদ্ধ আছে যে উদ্ভিদ না থাকিলে প্রাণীদিগের পৃথিবীতে অবস্থিতি করা হইত না। কত প্রকার আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য উদ্ভিদ তোমার অনির্ব্বচনীয় মহিমা প্রকাশ করে, তাহা কে নির্ণয় করিতে সমর্থ হইবে? এক গহনবৎ প্রতীয়মান অডেন্সিনিয়া বৃক্ষ, কূজনধ্বনি নিনাদিত বহুকুঞ্জনিকুঞ্জকারী বট বৃক্ষ, কুম্ভ বৃক্ষ, পর্য্যটক মিত্র, রোটিক বৃক্ষ, নবনীত বৃক্ষ তোমার আশ্চর্য্য মহিমা প্রকাশ করিতেছে। কত প্রকার উদ্ভিদে তোমার কত অদ্ভুত কীর্ত্তি প্রকাশিত রহিয়াছে; কে তোমার মহিমা বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারিবে? শারীরতত্ত্ব কৃতাঞ্জলি হইয়া এই রূপে ঈশ্বরের স্তব করিতেছে—জয় জয় জগদীশ! তোমার সৃষ্ট এই জীবশরীর কি আশ্চর্য্য কৌশলময়! এই মানবদেহে তুমি কত কৌশল প্রকাশ করিয়াছ! মনুষ্যের শরীরের রক্ত এক স্থান হইতে উদ্গত হইয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা দ্বারা কেমন আশ্চর্য্য রূপে সর্ব্ব-শরীরে সঞ্চারিত হয় এবং শরীরস্থ দূষিত পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া কেমন চমৎকার নিয়মানুসারে আর একস্থানে প্রত্যাগত ও শোধিত হইয়া পুনরায় পূর্ব্বের মত কার্য্য করিতে থাকে। কি আশ্চর্য্য নিয়মানুসারে মনুষ্যের পরিপাক ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হয়! মনুষ্য যে সকল বস্তু আহার করে, সে সকলই একস্থানে প্রবেশ করে এবং পরে সেই সকল নানা প্রকার বস্তু একপ্রকার বস্তুরূপে পরিণত হয়। পরে তাহাহইতে দুগ্ধবৎ এক প্রকার বস্তু নিঃসৃত হইয়া তাহাই অবশেষে রক্ত হয়। সেই রক্ত সর্ব্বশরীরে সঞ্চারিত হইয়া শরীরের পুষ্টি সাধন করে। মস্তিষ্কের সহিত বুদ্ধির কি চমৎকার সম্বন্ধ! মস্তিষ্করূপ যন্ত্র সহকারে বুদ্ধির কার্য্য কি অভাবনীয় সুকৌশলে সম্পন্ন হইয়া থাকে। হে জগদীশ! একমাত্র মনুষ্য-শরীর তোমার যে মহিমা ব্যক্ত করে, তাহারি সমুদায় তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া মানব-বুদ্ধির অসাধ্য। ভূতত্ত্ব বিদ্যা কৃতাঞ্জলি পুটে এই রূপে স্তব করিতেছে—জয় জয় জগদীশ! তোমার মহিমা আমি কি প্রকারে প্রকাশ করিব? পৃথিবীর অন্তরস্থ প্রত্যেক স্তরে অবিনশ্বর অক্ষরে তোমার স্তোত্রসূচক গীত লিখিত রহিয়াছে। এই পৃথিবী প্রথমে জ্বলন্ত ও তরল অগ্নিরাশিমাত্র ছিল, তুমি তাহাকে জীবের অবস্থানোপযোগী করিয়া

তুলিলে। প্রথমাবস্থায় যে সকল জীব জন্মিয়াছিল, তাহার বিনাশ হইলে তাহার উপর আর এক স্তর লিখিত হইল। সেই স্তরে পূর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর জীব ও উৎকৃষ্টতর উদ্ভিদের উৎপত্তি হইল। এই রূপে পৃথিবী স্তরে স্তরে রচিত হইতে লাগিল এবং ক্রমশঃ উৎকৃষ্টতর প্রাণীপুঞ্জ ও তাহাদের আহারের উপযোগী উৎকৃষ্টতর উদ্ভিদ সকলের উৎপাদন করিয়া তোমার নূতন নূতন মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিল। এই রূপে সেই অগ্নিময় পৃথিবী ক্রমে সমুদ্র পর্ব্বত ও গ্রাম নগরে পরিণত হইয়া এক্ষণে মনুষ্যের বাসোপযোগী হইয়াছে; এক্ষণে মনুষ্য ইহার জীবশ্রেণীর শিরোভূষণ স্বরূপ হইয়াছে। হে জগদ্বিধাতা! কি আশ্চর্য্য কৌশলানুসারে এবং কি অচিন্ত্য প্রকারে তুমি পৃথিবীর সৃজন ও ইহার উন্নতি সাধন করিতেছ আমি তাহার কিইবা বর্ণন করিতে সমর্থ হইব? হে জগদীশ! কে তোমার মহিমা বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারে? জ্যোতির্ব্বিদ্যা কৃতাঞ্জলি হইয়া এই রূপে ঈশ্বরের স্তুতি করিতেছে—জয় জয় জগদীশ! তোমার মহিমার আর সীমা কোথা? এই অনন্ত আকাশে সূর্য্যের পর সূর্য্য, গ্রহের পর গ্রহ এবং নক্ষত্রের পর নক্ষত্র সমস্বরে তোমারি অপার মহিমার বিষয় উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেছে। এমন দূরে শুভ্র মেঘের ন্যায় বিশাল জ্যোতিষ্করাশি প্রতিভাত হয়, যাহার পরিমাণ বা সংখ্যা স্থির করা মানব-শক্তির অসাধ্য। যেমন এক রাত্রিতে ক্ষেত্রমধ্যে নূতন নূতন তৃণ সকল প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তেমনি এক রাত্রি মধ্যে কত শত নূতন নূতন গ্রহ নক্ষত্র নভোমণ্ডলে সৃষ্ট হয়। এই সীমাশূন্য আকাশে তোমার বিশ্বরাজ্য যে কত দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তাহার কেবা ইয়ত্তা করিতে সমর্থ হইবে? এই সমুদায় জ্যোতিষ্ক পুঞ্জের মধ্যে কোন কোনটী এই পৃথিবী হইতে এত দূরে সংস্থিত হইয়া আছে যে তাহার কিরণ হয়ত অদ্যাপি এখানে আসিয়া পতিত হইতে পারে নাই। এই দৃশ্যমান জগতের চতুষ্পার্শস্থ গাঢ় তিমির সাগরের পর পারেও তোমার আর এক নূতন জগতের চিহ্ন লক্ষিত হয়! ধন্য হে জগদীশ! ধন্য তোমার কীর্ত্তি এবং ধন্য তোমার মহিমা!

এই রূপে সকল বিদ্যা সমস্বরে সেই বিশ্বাধিপের অনন্ত মহিমার বিষয় চিরকাল ঘোষণা করিয়া আসিতেছে এবং চিরকাল ঘোষণা করিতে থাকিবে। সমস্ত বিদ্যার ইহাই প্রধান গৌরব যে তাহারা ঈশ্বরের গুণগান করে। ব্রহ্মবিদ্যা সকল বিদ্যার পর্য্যাপ্তি ও সকল বিদ্যার শিরোভূষণ স্বরূপ। "ব্রহ্মবিদ্যা সর্ব্ব বিদ্যা প্রতিষ্ঠা।" ব্রহ্মবিদ্যা সকল বিদ্যার প্রতিষ্ঠা। যেমন নদীসকল চারিদিক হইতে প্রবাহিত হইয়া এক সাগরে গিয়া মিলিত হয়, সেই রূপ সকল বিদ্যা পরিশেষে এক ব্রহ্মবিদ্যাতে গিয়া পর্য্যাপ্ত হয়। আমাদের কর্ত্তব্য যে আমরা বিদ্যালোচনার সময়ে ঈশ্বরকে সকল সময়ে স্মরণ করি। তিনিই এই সুকৌশলময় বিশ্বরাজ্যের রচয়িতা। আমরা সৃষ্টির তত্ত্ব যাহা কিছু অবগত হই, সে সকলি তাঁহারই অনুপম কীর্ত্তি। সৃষ্টির সকল বস্তু তাহার সৃজন কর্ত্তার গুণ গান করিতে ত্রুটি করে না; তাহারা জিহ্বাহীন হইয়াও নিজ নিজ রচয়িতার মহিমা নিরন্তর ঘোষণা করিতেছে। তবে আমরা কেন বিস্মৃত হই? আমরা কেন অকৃতজ্ঞ ও অধম হইয়া থাকি? যিনি আমাদিগকে জ্ঞান দিয়াছেন, বুদ্ধি দিয়াছেন এবং কত প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি দিয়া অন্যান্য জীবদিগের হইতে আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ করিয়াদিয়াছেন, আইস আমরা তাঁহার অনন্ত যশঃ উচ্চৈঃস্বরে অহর্নিশ ঘোষণা করি এবং তাঁহার প্রদত্ত আধ্যাত্মিক সুধা পান করিয়া জীবনকে সার্থক করি।

হে পরমাত্মন্! তুমি আমাদের সকল জ্ঞানের ও সকল বিদ্যার মূল। তুমি যেমন আমাদের জ্ঞানদাতা ও বুদ্ধিদাতা, তেমনি তুমিই আবার আমাদের জ্ঞানের বিষয় ও সকল বিদ্যার প্রতিষ্ঠাভূমি। তোমাকে জানিলে আমাদের আর সকল জ্ঞান সার্থক হয় এবং তোমাকে জানিলেই আমাদের আর সকল জ্ঞান লাভ হয়। তোমার মহিমা এই দ্যুলোক ও ভূলোকে জাজ্জ্বল্যতর প্রকাশিত রহিয়াছে; যে তোমাকে জানে, তাহার নিকটে সকল বস্তুই তোমার অনন্ত মহিমার পরিচয় প্রদান করে। আহা! সেই ব্যক্তি কি সুখী যে চারি দিকে অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত তোমার অনন্ত নাম পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হয়। হে অখিল বিশ্বের অধিপতি! তুমি আমাদের এক মাত্র গুরু এবং এক মাত্র জ্ঞানদাতা। তুমি আমাদের হৃদয়ে তোমার আত্ম স্বরূপ প্রকাশ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

তত্ত্ববিদ্যা।

তৃতীয় অধ্যায়।

শৈশবাবস্থা হইতে মনুষ্যের বয়ঃক্রম যত বৃদ্ধি হয়, ততই বিষয়াকর্ষণ একদিকে প্রবল হয়, আত্মার প্রভাব অপর দিকে উদ্দীপ্ত হয় এবং ক্রমে ক্রমে পরমাত্মার সুমঙ্গল মহিমা সর্ব্বোপরি প্রকাশমান হয়। এক্ষণকার এ অবস্থায় ইন্দ্রিয়-বোধ, বুদ্ধি এবং প্রজ্ঞা, তিনকে পৃথক্ পৃথক্ রূপে অনায়াসে অবধারণ করা যাইতে পারে; কিন্তু কোন অবস্থাতেই এ রূপ হইতে পারে না যে উহারা পরস্পরের সহিত একেবারেই সম্পর্ক রহিত। আমাদের যদি ইন্দ্রিয়-বোধ না থাকে, তবে বুদ্ধি মাত্র দ্বারা আমরা কি অবগত হইব? যদি বুদ্ধি না থাকে, তবে ইন্দ্রিয়-বোধ সকলকে কিরূপে জ্ঞানে আয়ত্ত করিব? যদি প্রজ্ঞা না থাকে, তবে সর্ব্বভুক্ সংশয়-গ্রাস হইতে কি রূপে রক্ষা পাইব? অতএব প্রজ্ঞা, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়-বোধ, ইহারা সকল অবস্থাতেই এক যোগে কার্য্য করে, কখনই ইহার অন্যথা হয় না। কিন্তু প্রজ্ঞার পদবী, সকল হইতে উচ্চতম; ইন্দ্রিয় যেখানে যাইতে পারে না, বুদ্ধি যেখানে নিরস্ত হয়, প্রজ্ঞা সেই খানে থাকিয়া বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়-বোধ উভয়কেই নিয়মিত করিতেছে। ইন্দ্রিয়-বোধ এবং বুদ্ধি-ক্রিয়া, উভয়ই কতকগুলি সার্ব্বভৌমিক নিয়মের অধীন এবং প্রজ্ঞা হইতেই সেই সকল নিয়ম অবতীর্ণ হইতেছে। অতএব এরূপ কখনই নহে যে প্রজ্ঞা, বুদ্ধি প্রভৃতি সকলকে উপেক্ষা করিয়া উদাসীনের ন্যায় উচ্চ প্রদেশে অবস্থান করিতেছে। প্রজ্ঞা যেমন আপন স্বরূপে অবস্থিতি করে, সেই রূপ আবার বুদ্ধির মধ্যেও উহা কার্য্য করে এবং সকলের প্রান্ত-স্থিত ইন্দ্রিয়-বোধ পর্য্যন্তও উহার প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এতদনুসারে মূল-তত্ত্ব সকলকে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে—ইন্দ্রিয়-ঘটিত, বুদ্ধি-ঘটিত ও প্রজ্ঞা-ঘটিত। যে কোন মূল তত্ত্ব অনুসারে ইন্দ্রিয়-ব্যাপার প্রবৃত্ত হয়, তাহাই ইন্দ্রিয়-ঘটিত মূলতত্ত্ব; যদনুসারে বুদ্ধি-ক্রিয়া প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাই বুদ্ধি-ঘটিত মূলতত্ত্ব; যদনুসারে প্রজ্ঞা আপন স্বরূপে স্থিতি করে, তাহাই প্রজ্ঞা-ঘটিত মূলতত্ত্ব।

ইন্দ্রিয়-ঘটিত মূলতত্ত্ব।

একটা কোন বস্তুকে যখন আমরা ইন্দ্রিয় মাত্র দ্বারা প্রত্যক্ষ করি, তখন এ কথা জিজ্ঞাসা করি না যে ইহা কি রূপে হইয়াছে? কি অবলম্বন করিয়া থাকিতেছে? অন্যান্য ইন্দ্রিয়-বোধের সহিত ইহার সম্বন্ধ কি? কেন না প্রত্যক্ষ বস্তু-বিশেষ ইন্দ্রিয় সমক্ষে আপাততঃ যে রূপ দেখা যায়, তাহা লইয়াই ইন্দ্রিয়ের যাহা কিছু প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত কথিত বস্তু কেমন করিয়া কাহার কর্ত্তৃত্বে ওরূপ দেখাইতেছে, কেমন করিয়া কি প্রকরণ দ্বারা ঘটনা-সকল ঘটিতেছে; ইহার সহিত ইন্দ্রিয়ের কোন সংস্রব নাই। আমি পদ-ব্রজে চলিতেছি—এ স্থলে চলন-রূপ বাহ্য-ব্যাপার বহিরিন্দ্রিয়ের বিষয় বটে, এবং চলিবার প্রবৃত্তি-রূপ যে এক আন্তরিক অবস্থা, তাহাকে অন্তরিন্দ্রিয় বা অন্তঃকরণের বিষয় বলিলেও বলা যাইতে পারে; কিন্তু আমি যে আপন কর্ত্তৃত্বে শেষোক্ত প্রবৃত্তি উদ্দীপন করত পূর্ব্বোক্ত কার্য্য সাধন করিতেছি, ইহা কোন ইন্দ্রিয়েরই গম্য হইতে পারে না। অতএব ইন্দ্রিয়-বোধ যে বিষয়ীর অধিকারবর্ত্তী কিম্বা উহা যে বিষয়-মূলক, ইত্যাদি আন্দোলন-সকল এখানকার কোন অংশেই উপযোগী নহে। পশ্চাতে জানা যাইবে যে বুদ্ধি যখন নানা ইন্দ্রিয়-বোধের মধ্যে কর্ত্তৃত্ব-মূলক কোন না কোন রূপ সম্বন্ধ অবধারণ করিতে যায়, তখনই বিষয়ী এবং বিষয়ের আবশ্যকতা প্রজ্ঞাতে প্রতীয়মান হয়; কিন্তু এক্ষণে জানা আবশ্যক যে কোন একটি ইন্দ্রিয়-বোধ আমারদের সমক্ষে বিচ্ছিন্ন-রূপে সমাগত হইলে—তাহা কি রূপে আইল, তাহার সহিত অন্য ইন্দ্রিয়-বোধের কি রূপ সম্বন্ধ, তাহার মর্ম্ম কি; এ সকল বিষয়ের প্রতি আমরা যত উদাসীন থাকি, ততই ইন্দ্রিয়-বোধকে বুদ্ধি হইতে পৃথক্ রূপে বিবেচনা করিতে যোগ্যতা প্রাপ্ত হই। মনে কর যে রামায়ণের কোন একটি বৃত্তান্ত একটা পটে চিত্রিত রহিয়াছে এবং তাহার নিম্নে বিজ্ঞাপন-স্বরূপ উক্ত চিত্র-রচনার মর্ম্ম লিখিত আছে; এতদবস্থায় এক জন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি উক্ত চিত্র-পট দৃষ্টে উহার কিছুই বুঝিতে পারিবে না, কিন্তু নিম্নের বিজ্ঞাপন পাঠ করিলে তাহার নিকটে সকলই সুস্পষ্ট হইবে। পূর্ব্বাবস্থায় দর্শকের নয়নে যে কতকগুলি বর্ণময় আকৃতি প্রকাশ পাইতেছিল, তাহাই কেবল ইন্দ্রিয়ের বিষয়; কিন্তু শেষোক্ত অবস্থায় চিত্রকরের মনের ভাবানুসারে উহারদের মধ্যে যে পরস্পর সম্বন্ধ অবধারিত হইল, এই রূপ রচনার আকর হইতে রচনার যে ভাব সংগ্রহ করা হইল, ইহা বুদ্ধি-চালনা ব্যতিরেকে ইন্দ্রিয় মাত্র দ্বারা কোন রূপেই সম্ভবে না। এই বুদ্ধিকে আপাততঃ সম্বৃত রাখিয়া, এখন কেবল ইন্দ্রিয়-বোধ মাত্র সংঘটন-পক্ষে যে যে মূলতত্ত্ব আবশ্যক, তাহারই প্রতি মনোনিবেশ করা যাইতেছে।

অন্তরের অবস্থা পরিবর্ত্তন এবং বাহিরের স্থান অধিকরণ, এই দুইটি ব্যাপার সকল ইন্দ্রিয়-বোধের সঙ্গেই অবিচ্ছেদ্য দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ণ-বিশেষ দৃষ্ট হইবা মাত্র আমারদের অন্তঃকরণের অবস্থান্তর ঘটে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ পায় যে উহা বাহিরে স্থিতি করিতেছে; শব্দ বিশেষ শ্রুত হইবা মাত্র ঐ রূপেই অন্তঃকরণের অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে উহা কর্ণ-কুহর-গামী রূপে বহির্দ্দেশে অনুভূত হয়। কাল ব্যতিরেকে অন্তরে পরিবর্ত্তন সম্ভবে না, দেশ ব্যতিরেকে বাহিরে অবস্থান সম্ভবে না; এই হেতু দেশ এবং

কাল এই দুই উপকূলের মধ্যেই তাবৎ ইন্দ্রিয়-ব্যাপার সাধিত হইয়া থাকে।

বহির্ব্বিষয়কে আমরা যদিও দেশ এবং কাল উভয়েতেই প্রত্যক্ষ করি, তথাপি উহার বহির্ভাব যে টুকু, তাহা কেবল দেশেরই প্রসাদাৎ, কালের তাহাতে হস্ত নাই; এবং আমারদের অন্তঃকরণের ব্যাপার যে টুকু, তাহাতে দেশের কোন অধিকার নাই, তাহাতে কেবল কালেরই প্রাদুর্ভাব। এক অনেক, কার্য্য কারণ, ইত্যাদি দ্বন্দ্ব সকল যে রূপ সাম্বন্ধিক, অন্তর বাহির শব্দও সেই রূপ সাম্বন্ধিক; সুতরাং দেশ কালকেও সাম্বন্ধিক বলিতে হইবে। অতএব আমারদের অন্তঃকরণের অবস্থা-সম্বন্ধেই বহির্ব্বিষয় দেশে অবস্থান করে, এবং বহির্ব্বিষয়-সম্বন্ধেই আমারদের অন্তঃকরণের অবস্থা কালে প্রবর্ত্তিত হয়। দেশ কালের সাম্বন্ধিকতা-বিষয়ে স্পষ্ট-রূপে বুঝিতে হইলে গতি-ক্রিয়ার প্রতি এক বার মনোনিবেশ করিলেই তাহাতে কৃত-কার্য্য হইতে পারা যায়। একটা গতিশীল বস্তু যত দ্রুত চলে, দেশ বিশেষে উহা তত অল্প-কাল থাকিতে পায় এবং যত মন্দ চলে তত অধিক কাল থাকিতে পায়; এই রূপ দেশ বিশেষে অধিক কাল থাকাতেই আপেক্ষিক স্থিরতা, অল্পকাল থাকাতেই আপেক্ষিক দ্রুততা—সুতরাং বস্তু-সকল যে পরিমাণে দেশ-বিশেষে থাকে, সেই পরিমাণে উহা স্থির থাকে এবং যে পরিমাণে উহা দেশ-বিশেষে বদ্ধ না থাকে, সেই পরিমাণে উহা দ্রুত চলে; অতএব স্থিরতার ভাব মুখ্য-রূপে দেশেরই সহিত সংলগ্ন হয় এবং প্রবাহের ভাব মুখ্য-রূপে কালেরই সহিত সংলগ্ন হয়।

দেশ কালে অবস্থিত বিষয়-সকলকে আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করি বটে; কিন্তু দেশ কাল স্বয়ং আমারদের ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে। আকাশ-স্থিত বায়ুকে আমরা স্পর্শ দ্বারা অবগত হই বটে; কিন্তু সাক্ষাৎ আকাশকে আমরা কদাপি সে রূপে অবগত হইতে পারি না। আকাশ-স্থিত আলোককে আমরা দৃষ্টি দ্বারা উপলব্ধি করি বটে; কিন্তু সাক্ষাৎ আকাশকে সে রূপ করিয়া কখনই প্রাপ্ত হইতে পারি না। এই রূপ কালবর্ত্তী ঘটনা-প্রবাহকে আমরা অন্তঃকরণে অনুভব করি বটে; কিন্তু শূন্য কালকে আমরা সে রূপে কখনই আয়ত্ত করিতে পারি না—এবং পূর্ব্বে ইহা পুনঃ পুনঃ প্রদর্শিত হইয়াছে যে, অসীম দেশ কালকে আমরা বুদ্ধি দ্বারা উপাজ্জন করি নাই। কি রূপেই বা করিব? বস্তু-সকলের সীমা-বিশিষ্ট আয়তন হইতে অসীম দেশে আমরা কি প্রকারে নিঃসংশয়-রূপে উপনীত হইব? বুদ্ধি দ্বারা এই পর্য্যন্ত নিশ্চয় হইতে পারে যে, যে সকল ভৌতিক বস্তুকে আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাই দেশ ব্যাপিয়া স্থিতি করিতেছে; কিন্তু সমুদায় ভৌতিক বস্তুই যে দেশ ব্যাপিয়া থাকিবে, এ রূপ যৎপরোনাস্তি নিশ্চয় বাণি বুদ্ধির মুখ হইতে কোন রূপেই বাহির হইতে পারে না; সুতরাং উক্ত মূলতত্ত্বটি প্রজ্ঞা হইতেই অবতীর্ণ হইতেছে। অসীম-দেশ-কাল-সম্বন্ধীয় অনিবার্য্য নিশ্চয়তা সাক্ষাৎ পরমাত্মা হইতেই আমারদের আত্মাতে নিঃশ্বসিত হইতেছে; কেন না অন্য কুত্রাপি হইতে ও রূপ হওয়া অসম্ভব।

দীর্ঘ, প্রস্থ, বেধ, এই তিনটি দেশের অবয়ব; ভূত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ, এই তিনটি কালের অবয়ব; এবং দেশ কালের সম্বন্ধ-ঘটিত—অথবা অন্তঃকরণ-গোচর দৈহিক

অবস্থা এবং বহিরিন্দ্রিয়-গোচর ভৌতিক আবির্ভাব, এ দুয়ের সম্বন্ধ-ঘটিত—ইন্দ্রিয়-বোধ-সকলের মূলে গতি, বিস্তৃতি এবং ঘনত্ব, এই তিনটি তত্ত্ব অবিচ্ছেদে পাওয়া গিয়া থাকে; ও এই তিনের একটিকে লঙ্ঘন করিয়া কোন বাহ্য বিষয়ই ইন্দ্রিয়-গোচর হইতে পারে না। ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে বিস্তৃতি ও ঘনত্ব ব্যতিরেকে ইন্দ্রিয়ের কোন বিষয়ই যথোচিত পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয় না—ইহাও ঐ রূপ সত্য যে গতি ব্যতিরেকে ইন্দ্রিয়ের সহিত বাহ্য বিষয়ের কোন রূপেই সম্বন্ধ ঘটিতে পারে না। যখন কোন কিছু আমারদের শরীরকে স্পর্শ করে—যখন আলোক চক্ষুতে নিপতিত হয়, শব্দ শ্রবণে আহত হয়, গন্ধ নাসিকায় প্রবেশ করে, রসনাতে আস্বাদের সঞ্চার হয়, ইত্যাদি তাবৎ ইন্দ্রিয়-ব্যাপারের সঙ্গেই কোন না কোন প্রকার গতি একান্তত আবশ্যক; নতুবা বাহ্য বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সহিত, দেশের সহিত কালের সহিত, কি রূপে যোগ সম্ভব হইবে? যখন কেবল একটা স্তব্ধ পাষাণকেও আমরা সম্মুখে অবলোকন করি, তখনো আলোকের গতি অনুসারেই আমরা ও রূপ করিতে সমর্থ হইতেছি। যদি এ রূপ মনে করা যায় যে আলোকের সহিত গতির কোন সম্পর্ক নাই; তাহা হইলে তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে যে আলোক বাহির হইতে অন্তরে নহে, কিন্তু একেবারেই আমাদের অন্তরে কার্য্য করিতেছে—সুতরাং ও রূপ হইলে উহা যে অন্তর হইতে আসিতেছে না কিন্তু বাহির হইতেই আসিতেছে, এ তথ্যটির বিপর্য্যয় দশা উপস্থিত হয়। অতএব গতি, বাহ্য-বিষয় এবং ইন্দ্রিয়-ব্যাপার এ দুয়ের মধ্যস্থিত সেতু স্বরূপ; সুতরাং ইন্দ্রিয়-ব্যাপার-সম্বন্ধে উহা অলঙ্ঘনীয়, ইহাতে আর সংশয় নাই। গতি-ক্রিয়ার সহিত দেশ কালের এই রূপ সম্বন্ধ যে গতি সমাধা হইতে গেলে কাল অতীত হওয়া চাই এবং দেশ দীর্ঘে লঙ্ঘিত হওয়া চাই; অতএব কালের অতীত অবয়ব এবং দেশের দীর্ঘ অবয়ব, গতি-ক্রিয়াতে এই দুইটি অবয়ব একত্রে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ বিস্তৃতির সহিত দেশ কালের সম্বন্ধ এই রূপ যে, বর্ত্তমান মুহূর্ত্তেই বস্তু-সকলের প্রস্থ-গত বিস্তৃতি উপলব্ধি হইয়া থাকে—এক মুহূর্ত্তের পর অন্য মুহূর্ত্ত, ইত্যাদি ক্রমে কাল অতীত না হইলে যেমন গতি গ্রাহ্য হইতে পারে না, ইহা সে রূপ নহে। অতএব কালের বর্ত্তমান অবয়ব এবং দেশের প্রস্থ অবয়ব, বিস্তৃতির সহিত এই দুইটি অবয়ব একত্রে পাওয়া যায়। তৃতীয়তঃ একটা প্রাচীরকে প্রস্থে বিস্তৃত দেখিয়া তাহার প্রতি আমরা যখন হস্ত ক্ষেপ করি এবং তাহাতে যখন আমারদের হস্তের গতি বাধা প্রাপ্ত হয়; তখন আমরা নিশ্চয়ই অনুমান করি যে উক্ত প্রাচীরের ঘনত্ব আছে। একটা চিত্র-স্থিত প্রাচীর আপাততঃ ঘন-রূপে প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু তাহার প্রতি হস্তার্পণ করিবা মাত্র উপযুক্ত বাধা প্রাপ্তির অভাবে উক্ত ভ্রম অমনি সংশোধিত হইয়া যায়; বর্ত্তমান ক্ষণ অতীত হইলেই ভবিষ্যৎ আইসে। অতএব যখন আমরা দেখি যে বস্তু-বিশেষ বর্ত্তমানে বিস্তৃত রহিয়াছে, এবং তদীয় বাধা অতিক্রম করিতে সময় অতীত হইতেছে; তখন উক্ত বস্তুর বেধ-স্থিত পরমাণু-পুঞ্জ যে ভবিষ্যতে অনাবৃত হইতে পারে, ইহাতে আর সংশয় থাকে না। অতএব কালের ভবিষ্যৎ অবয়ব এবং দেশের বেধ অবয়ব ঘনত্বে এই দুইটি একত্রে পাওয়া যায়। যাহা বলা হইল, তাহা নিম্নের লতা দেখিলে স্পষ্ট হইবে।

কাল	দেশ	সম্বন্ধ
ভূত	দীর্ঘ	গতি
বর্ত্তমান্	প্রস্থ	বিস্তৃতি
ভবিষ্যৎ	বেধ	ঘনত্ব

সংস্কৃত সাহিত্য *।

পূর্ব্বতন মনুষ্যদিগের সহিত ইদানীন্তন মনুষ্যের অবস্থাগত তারতম্য নির্দ্দেশ করাই ভাষাতত্ত্বের এক মাত্র উদ্দেশ্য। আমরা ভাষাতত্ত্বের নিগূঢ় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া সেই মহান্ উদ্দেশ্য সাধনে অধ্যবসায়ারূঢ় হইতেছি। পূর্ব্ব কালে যে সমস্ত গ্রন্থ প্রণীত ও প্রচারিত হইয়াছে, তৎসমুদায়ের অসার ভাগ হইতে সার সঙ্কলন করাই এই অধ্যবসায়ের কার্য্য। যদিও আমরা বহুকাল গাঢ়তর পরিশ্রম করিয়া প্রার্থিত ফল লাভে বঞ্চিত হই, যদিও পূর্ব্বতন ভাষা-তত্ত্ব হইতে আদিম বৃত্তান্ত সমুদায় সম্যক্ অবগত হইতে না পারি, তথাচ আমরা কখনই উৎসাহ-শূন্য ও লজ্জিত হইব না। প্রকৃত বিজ্ঞানে কোন বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া যদি শূন্য হৃদয়ে প্রতি নিবৃত্ত হই, তাহাও একটি ফল সন্দেহ নাই।

মানব জাতির ইতিবৃত্তের সহিত ভাষা-তত্ত্বের সবিশেষ সম্বন্ধ আছে, সুতরাং আমাদিগের অবলম্বিত এই প্রস্তাব ইতিবৃত্তমূলক হইবে। সংস্কৃত সাহিত্যের সাহায্য অবলম্বন করিয়া আদি হইতে ভারতবর্ষীয়দিগের ক্রমশ উন্নতির বিষয় যতদূর পারা যায়, আবিষ্কৃত করাই আমাদিগের এই প্রস্তাবের অভিপ্রেত। পদার্থ বিদ্যার মত এই যে, যে কোন বিষয় হউক না কেন আমরা তাহার মূল প্রকৃতি ও প্রারম্ভ অগ্রে অনুধাবন করিব; কারণ যখন বস্তুর মূলতত্ত্ব প্রকৃত রূপ অবগত হওয়া যায়, তখন তদ্বিষয়ে আর কোন সংশয়ই উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে না। যাঁহারা সংস্কৃত সাহিত্যের অনুশীলন করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের ইহা অবশ্যই প্রতীতি হইবে যে, ভারতবর্ষবাসীরা যাহাকে আপনাদিগের ধর্ম্ম-জ্ঞানের মূল বলিয়া স্বীকার করেন, সেই বেদের বিরুদ্ধ কোন শাস্ত্র সঙ্কলিত হইলে তাহা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় হইয়া থাকে। কি ধর্ম্মশাস্ত্র, কি পদার্থ বিজ্ঞান, কি ব্যবস্থা শাস্ত্র, কি জ্যোতিষ্, কি ব্যাকরণ, কি ছন্দোবিজ্ঞান, কোন শাস্ত্রই বেদ-বিরুদ্ধ হইলে তাহা জন-সমাজে আদরের সহিত পরিগণিত ও পরিগৃহীত হয় না। ভাষা-তত্ত্বের যদি প্রাকৃতিক ও ইতিবৃত্ত মূলক বিষয় সমূহের অনুসরণ করা উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে এক্ষণে বেদকে অবলম্বন করাই শ্রেয়স্কর হইতেছে। বেদ ভারতবর্ষীয় ইতিবৃত্তের উপর এতদূর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে—সাহিত্যের প্রত্যেক অংশ বৈদিক ইতিবৃত্তের সহিত এতদূর সংশ্রব রাখিয়াছে—বেদমূলক ধর্ম্ম ও নীতির ভাব ভারতবর্ষীয়দিগের চিত্ত-ক্ষেত্রে এতদূর বদ্ধমূল হইয়াছে—জীবনের প্রত্যেক বাহ্য ও আন্তরিক কার্য্য এই প্রাচীন ঐতিহাসিক উপদেশ দ্বারা এতদূর পরিচালিত হইতেছে যে, বেদে সম্পূর্ণ অধিকার না থাকিলে ভারতবর্ষীয়দিগের কি ধর্ম্ম, কি নীতি, কি সাহিত্য, কোন বিষয়ই প্রকৃত রূপ বিচার করা নিতান্ত দুষ্কর ও একান্ত অসম্ভব হইয়া থাকে।

যে সমস্ত গ্রন্থে বেদকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ বলিয়া উদ্ধৃত করা হইয়াছে, সেই সমস্ত গ্রন্থ হইতে ইহাই অনুমিত হইতেছে যে, বেদ শব্দটি একখানি গ্রন্থের প্রতিপাদক নহে। এই বাক্য এক প্রকার সপ্রমাণ যে বৈদিক সময়ে যে সমস্ত ধর্ম্ম-

* ভট্ট মোক্ষ মূলরের প্রণীত সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক ইতিহাস হইতে সঙ্কলিত।

BLEED THROUGH.

গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে, তৎসমুদায়েরই নাম বেদ। ঐ সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে অনেকই এক্ষণে এক কালে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এমন কি বোধ হয় তৎকালে তৎসমুদায় লিখিতও হয় নাই। তথাচ এক্ষণে যে সকল গ্রন্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার সংখ্যাও অল্প নহে। বেদ নিতান্ত দুরূহ। টীকার সাহায্য গ্রহণ না করিলে বেদ-মূলক অনেক বিষয়ের মীমাংসা করা অতিশয় দুষ্কর হইয়া উঠে। যাহাই হউক এক্ষণে আমরা বেদের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া বেদ কতদূর সপ্রমাণ, কত কাল বেদের সৃষ্টি হইয়াছে এবং কত সময় অন্তর প্রত্যেক বৈদিক গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল, এই সমস্ত বিষয় নিরূপণে প্রবৃত্ত হইলাম। বেদের এমন কতগুলি বিষয় আছে, যাহা নিশ্চয় রূপে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে এবং কতগুলি বিষয় এই রূপ আছে যে, তাহা সবিশেষ উপযোগী হইলেও তাহার প্রকৃত রূপ মীমাংসা করা নিতান্ত সুকঠিন হইয়া উঠে। যাহাই হউক বৈদিক কাল নিরূপণ করা এই প্রস্তাবের একটি মুখ্য উদ্দেশ্য। বৈদিক কাল বলিলে এস্থলে বর্ত্তমান কাল হইতে বৈদিক কালের কেবল অন্তরটি বুঝাইবে না কিন্তু বৈদিক সময়ে মনুষ্য দিগের বুদ্ধিবৃত্তি নীতিবৃত্তি এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তি কিরূপ ছিল এবং অন্য সময়েই বা ঐ সমস্ত কি প্রকার হইয়াছে, এই উভয়ের অন্তর অবধারণ করাকেও বুঝিতে হইবে।

যাঁহারা ভারতবর্ষের ইতিবৃত্ত সম্যক্ অবগত আছেন, তাঁহারা ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণদিগের সহিত অন্যান্য জাতির এক-কাল-গত সাদৃশ্য কিছুই দেখিতে পাইবেন না। যে সমস্ত আর্য্যেরা সমগ্র ইউরোপকে সুসভ্য করিয়াছেন, যদিও ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ জাতি সেই আর্য্য দিগেরই বংশোদ্ভব, তথাচ বহুকাল অতীত হইল উহাঁরা পরস্পর পৃথক হইয়াছেন। সুতরাং বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ দিগের যে সময়ে যে রূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল, সেই সময়ে অন্যান্য জাতির কি রূপ অবস্থা ছিল, তাহা নিরূপণ করা নিতান্ত সহজ নহে। আর্য্যবংশীয়েরা ভুখারা প্রভৃতি স্থান হইতে হিমালয় পার হইয়া কাশ্মীর পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে বাস করেন। উহাঁরা যে কি নিমিত্ত ঐ সমস্ত স্থানে আসিয়া বাস করেন, কোন পুরাবৃত্তবিদই তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। যখন কোন প্রামাণিক পুরাবৃত্ত প্রস্তুত হয় নাই, যখন সেলট্, জরমন, শ্লাভোনীয়, রোমক, গ্রিশীয়েরা ইউরোপে পাদ নিক্ষেপ করে নাই, তৎকালে এই বিশাল উপনিবেশ পঞ্জাবাদি প্রদেশ অধিকার করিয়াছিল। যদিও এই উপনিবেশের কারণ নির্দ্দেশ করা সুকঠিন, তথাচ আমারদিগের বোধ হইতেছে যে, যে কারণে সেল্ট্ জাতি আটলাণ্টিক সমুদ্র পার হইয়া আমেরিকায় গিয়াছিল, ইহাও সেই রূপ হইবে। যখন স্বদেশীয়েরা স্থানান্তরে গমন করে বা ভিন্ন দেশীয়েরা স্বদেশকে আক্রমণ করে, তদ্বিষয়ে উপেক্ষা করা—হয় প্রগাঢ় ইচ্ছা, না হয় যার পর নাই আলস্য—এই উভয়ের মধ্যে অন্যতর একটিকে প্রধান কারণ বলিয়া উপলব্ধি করিতেই হইবে। ফলত যখন এক দেশ হইতে দেশান্তরে গমন করিবার সময় উপস্থিত হয়, তখন আর কেহই অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু যাঁহারা আমাদিগের ভাষা ব্যবহার করেন এবং আমাদিগেরই দেবগণের আরাধনা করেন, যে স্থানে গমন করিলে সেই সমস্ত লোকের সহিত আর পুনরায় সাক্ষাৎকার লাভের সম্ভাবনা নাই, সেই স্থানে যাওয়া কি রূপ লোকের কার্য্য? যাঁহাদিগের আত্ম নির্ভরের ভাব অতিশয় প্রগাঢ়, তাঁহারা ব্যতিরেকে বোধ হয় এই রূপ স্বতন্ত্রতা অবলম্বন আর কাহারই সাধ্যায়ত্ত নহে। ভারতবর্ষের আর্য্য ব্রাহ্মণ ও পারসীকেরাই ইহার এক নিদর্শন স্থল।

আর্য্যজাতি গিরিবর হিমালয়কে উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক দক্ষিণাভিমুখী হইয়া সর্ব্বাগ্রে পঞ্জাবের শতদ্রু চন্দ্রভাগা বিপাসা ইরাবতী বিতস্তা সরস্বতী ও সিন্ধু এই সাত নদীর উপকূলে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। তদবধি এই সুবিস্তীর্ণ ভারতবর্ষ তাঁহাদিগেরই বাস-ভূমি বলিয়া প্রথিত আছে। ভারতবর্ষে বাস করিবার পূর্ব্বে ইহাঁরা গ্রীশীয় ইটালীয় স্লাভোনীয় জর্ম্মন ও সেলট জাতিদিগের পূর্ব্ব পুরুষের সহিত একত্রে হিমালয় পর্ব্বতের উত্তরে বাস করিতেন। ভাষা অনুসন্ধান করিয়া যে প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা অভ্রান্ত ও অখণ্ডনীয়; বিশেষত যখন পুরাবৃত্তের সৃষ্টি হয় নাই, তখন ভাষাতত্ত্বের প্রমাণে সবিশেষ সমাদর করা কর্ত্তব্য হইতেছে। ভারতবর্ষীয় দিগের সহিত ইউরোপীয় দিগের কোন সম্পর্ক আছে কি না ইহা অন্য কোন রূপ প্রমাণ দ্বারা নির্ণয় করা নিতান্ত অসম্ভব কিন্তু এই দুই জাতির ভাষাগত সামঞ্জস্য নিরীক্ষণ করিলে তদ্বিষয়ে এক প্রকার নিঃসংশয় হওয়া যায়। যখন গ্রীশ দেশে গ্রীশীয়েরা এবং ভারতবর্ষে ভারতবর্ষীয়েরা অধিবাস করেন নাই, তখন এই উভয় জাতির পরস্পর সম্পর্ক বিষয়ে ভাষা ভিন্ন অন্য কোন রূপ প্রমাণের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। গ্রীশীয়েরা এবং ভারতবর্ষীয় রাজা পুরু এক পূর্ব্ব-পুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং এই উভয় দেশীয়েরা এক দেবদেবীরই উপাসনা করিত। আর ভারতবর্ষীয়দিগের শিরায় যে শোণিত প্রবাহিত হইতেছে, ইংরাজদিগের শিরা সমূহে তাহাই সঞ্চার করিতেছে। ইংরাজ ও গ্রীশীয়দিগকে এই দুইটি হৃদয়ঙ্গম করাইতে হইলে ভাষা ভিন্ন আর কি রূপ প্রমাণ সবিশেষ আদরণীয় হইবে? বলিতে কি এক্ষণে এমন কেহ বিচক্ষণ নাই, যিনি ভাষাতত্ত্বের প্রমাণ সুস্পষ্ট পরীক্ষা করিয়া হিন্দু, গ্রীশীয় ও টিউটনদিগের এক বংশোদ্ভব বলিয়া যে বিলক্ষণ একটি সম্বন্ধ আছে, তাহার উচ্ছেদ সাধনে কৃতকার্য্য হইবেন। আজিও ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডে ভাষাগত এই রূপ সাদৃশ্য আছে যে তাহাই আর্য্যেরা যে এক সময়ে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন তাহার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। যদি ইহা তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা কর, তথাচ এই অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিতে পারিবে না। ঈশ্বর, গৃহ, পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, হৃদয়, অশ্রু, বাসি ও বৃক্ষ প্রভৃতি কতক গুলি শব্দ ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডে এক রূপ ভাষার রীতিতে ব্যবহার হইয়া থাকে। সুতরাং এক্ষণে স্পষ্টাক্ষরে ইহাই নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, যে এক জন অপরিজ্ঞাত ব্যক্তিকে আহ্বান করিলে যদি তিনি গ্রীক জর্মন বা ভারতবর্ষীয় ভাষায় উত্তর প্রদান করেন, আমরা অবশ্যই তাঁহাকে আমাদিগেরই এক জন মনে করিব। যদি এই বিষয়ে ইতিবৃত্ত বেত্তারা অনুমোদন না করেন, যদিও কবিগণ ইহাকে অপসিদ্ধান্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, যদিও প্রাণিবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা ইহা সংশয়াত্মক বলিয়া স্বীকার না করেন, তথাচ ভাষাতত্ত্ব যে রূপ বলিতেছে, তাহাতে সকলকেই মস্তক অবনত করিতে হইবে। অতি পূর্ব্বকালে এমন একটি সময় ছিল, যে সময়ে সেলট্ জরমন্ স্লাভোনীয় গ্রীশীয় ইটালীয় পারসীক এবং হিন্দুদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা এক স্থানে একত্রে বাস করিতেন। কেহ কেহ কহেন যে সেমিটিক ও টিউরেনিয় জাতী-

য়েরা উহাঁদিগের সহিত বাস করিত কিন্তু তাহার কোন বিশেষ প্রমাণই প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

অন্যান্য সহবাসীরা পশ্চিম দিকে গমন করিলে হিন্দুজাতি পরিশেষে দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে আসিয়াছিলেন। ইহাঁরা যে সর্ব্বশেষে আসিয়াছিলেন, তাহার এক প্রকার প্রমাণও প্রাপ্ত হওয়া যায়। জরমন ও গ্রীক ভাষার সহিত ইহাঁদিগের ভাষার বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে, জরমন ও গ্রীক ভাষায় ইহাঁদের ব্যাকরণ ও ভাষার রীতির অনেকাংশ গৃহীত হইয়াছে; কিন্তু জর্মন ও গ্রীক ভাষা অন্যান্য ভাষা হইতে এক প্রকার স্বতন্ত্র; অন্যান্য ভাষার সহিত ইহার তাদৃশ সৌসাদৃশ্য নাই। ইহা দ্বারাই এক প্রকার নির্ণীত হইতেছে যে সহবাসী আর্য্যেরা স্থানান্তরিত হইলে কিয়ৎকাল বিলম্বে ইহাঁরা হিন্দুস্থানে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই।

থিওডোর পার্কর।

২৭২ সংখ্যক পত্রিকার ২৫৮ পৃষ্ঠার পর।

ধর্ম্মভাব, নির্ভরের ভাব ও অনন্ত ভাবের অস্তিত্বই ইহার বিষয়ীভূত ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিতেছে। আমাদিগের এই সমস্ত ভাব ও ইহার বিষয়ীভূত ঈশ্বর এই উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধে বিশ্বাস মানবপ্রকৃতি হইতে অপ্রতিহতভাবে উৎপন্ন হয়। মনুষ্যের যত গুলি অভাব আছে, সেই অভাব পূর্ণ হইবার তত গুলি বিষয়ও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। আমাদের যেমন দর্শনেন্দ্রিয় আছে এবং তাহার বিষয় বাহ্য পদার্থ ও দর্শন-ক্রিয়া-সম্পাদক আলোকও রহিয়াছে; যেমন প্রীতি ও স্নেহ আছে এবং পুত্র কলত্র প্রভৃতি উহার বিষয়ও দেদীপ্যমান রহিয়াছে; সেই রূপ আমাদিগের অন্তরে যে ধর্ম্মভাব নিহিত আছে, তাহা চরিতার্থ হইবার বিষয় অবশ্যই বিদ্যমান রহিয়াছে। যখন এই ধর্ম্ম ভাবকে নির্ভরের ভাব বলিয়া স্বীকার করা যাইতেছে, তখন যাঁহাতে এই নির্ভরটি অর্পিত হয়, এমন এক স্বতন্ত্র আমাদিগের অনায়ত্ত বিষয় ইহা দ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে। এইটি যতদূর সত্য, ইহা অপেক্ষা স্থিরতর সত্য আর কিছুই নাই।

যখন বাহ্য কারণ উপস্থিত হয়, তখন বাহ্য ইন্দ্রিয়ের ন্যায় আধ্যাত্মিক বৃত্তি সমুদায় সমবেত হইয়া কার্য্য করে। সহজ জ্ঞান আমারদিগের পূর্ব্বচিন্তা ও ইচ্ছার বশীভূত নহে; সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমরা যাঁহার উপর নির্ভর করি, এমন একটি পুরুষের ভাব আনয়ন করিয়া দেয়। আমরা সেই পুরুষকেই ঈশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করি। এক্ষণে ইহা সুস্পষ্টই নির্দ্দিষ্ট হইতেছে যে ধর্ম্মভাব—নির্ভরের ভাব ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্পষ্ট রূপে প্রকাশ করিয়া থাকে এবং সহজ জ্ঞান সেই অস্তিত্ব পরিস্ফুট রূপে প্রতিপন্ন করে।

মনুষ্যের এই ভাবটি সর্ব্বাগ্রেই উপস্থিত হইয়া থাকে। আমাদিগের অন্তরে যে অন্যান্য ভাবের আবির্ভাব হয়, ইহাই তৎসমুদায়ের মূল। যদি আমাদিগের জ্ঞানের উপাদান স্বরূপ এই ভাবটি না থাকিত, তাহা হইলে আর কোন ভাবই আমরা উপলব্ধি করিতে পারিতাম না। ইন্দ্রিয়গণ আমাদিগের শরীরের বাহ্য আলোকাদি পদার্থ প্রকাশ করিয়া দেয়। সেই আলোকাদি পদার্থ শরীরের আয়ত্ত নহে কিন্তু শরীরই উহাদের অধীন। যদিও ইন্দ্রিয়গণ তৎসমুদায় প্রকাশ করিয়া দিতেছে কিন্তু তাহারা যে কি, তাহা ইন্দ্রিয়ের গম্য নহে।

সেই রূপ জ্ঞান কেবল আত্মাকে নহে কিন্তু আত্মার আশ্রয় স্থান পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়া দিতেছে। কিন্তু সেই আশ্রয়টি যে কি পদার্থ, তাহা জ্ঞানের আয়ত্ত নহে। বাহ্য কার্য্য আমাদিগকে এই রূপ একটি কারণ উপস্থাপিত করিয়া দেয়, যদ্দ্বারা আমরা ঈশ্বরের ভাব লাভ করিতে পারি কিন্তু বাহ্য কার্য্য স্বয়ং ঐ ভাব উৎপন্ন করিতে সমর্থ হয় না। ইহা মনুষ্যের প্রকৃতি দ্বারাই আনীত হইয়া থাকে। এই কারণে কেহ কেহ ইহাকে অন্তর্নিহিত ভাব বলিয়া ব্যক্ত করেন এবং কেহ কেহ বা কহিয়া থাকেন যে আত্মা দেহের আশ্রয় গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে জীবনের উন্নত অবস্থাতে যাহা অবগত হইবে, ইহা তাহারই স্মারক। যাহাই হউক মানবপ্রকৃতি যে ঈশ্বরের ভাব উপলব্ধি করিতেছে, এই উভয় অভিপ্রায়ই সেই সত্যের অন্যরূপ বর্ণনা মাত্র। ফলত ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস যে মনুষ্যের প্রকৃতিসিদ্ধ, তাহাতে আর কোন সংশয়ই নাই। দর্শন ক্রিয়া দ্বারা যেমন আলোকের অস্তিত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে, আমরা বিদ্যমান রহিয়াছি বলিয়াই যেমন আমাদিগের অস্তিত্বে ভ্রান্তি উপস্থিত হইতেছে না, সেইরূপ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস ধর্ম্মভাব ও আত্ম প্রত্যয় দ্বারা অপ্রতিহত ভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঈশ্বরের এই অস্তিত্ব জ্ঞান পদার্থবিদ্যানুসারে সহজ জ্ঞান এবং পূর্ব্বতন ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে ঐশিক প্রত্যাদেশ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

এক্ষণে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে ভৌতিক জগতের কার্য্য কারণের শৃঙ্খলা, সার্থকতা ও সৌন্দর্য্য দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে বিশ্বাস উৎপন্ন হইতেছে না এবং আধ্যাত্মিক জগৎ ও অনন্ত ভাবও উহা উৎপন্ন করিতেছে না। এই বিশ্বাস উৎপন্ন হইবার নিমিত্ত কোন তর্কেরই আবশ্যকতা নাই, ইহা একমাত্র জ্ঞানেরই আয়ত্ত। আপনার অস্তিত্ব জ্ঞান যেমন স্বভাবত শীঘ্র উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই রূপ এই বিশ্বাসটি মনুষ্যের সহসা আপনা হইতে উপস্থিত হয়। যখন আমরা স্বাধীন নহি, যখন কোন এক অলৌকিক শক্তির উপর আমাদিগকে নির্ভর করিতে হয়, তখন এই বিশ্বাস কদাচই আমাদিগের অপনীত হইবার নহে।

যদিও ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক জগতের রচনা চাতুরী ও মাধুরী ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ক এই বিশ্বাস উৎপাদন করিতেছে না কিন্তু ভৌতিক জগৎ এই বিশ্বাস সংস্থাপন ও আধ্যাত্মিক জগৎ উহা সমধিক সমর্থন করিতেছে। আমরা মনোবিজ্ঞান ও পদার্থ বিদ্যা অনুশীলন করিবার পূর্ব্বে কদাচই ঈশ্বরের অস্তিত্ব জ্ঞান-শূন্য থাকি না, সুতরাং চিন্তাশক্তি উদ্রিক্ত করিয়া যে এই জ্ঞানটি উপার্জ্জন করিতে হয়, ইহা নিতান্ত অবিশ্বাস্য ও অশ্রদ্ধেয়। ঈশ্বরের এই অস্তিত্ব জ্ঞান এই রূপ একটি নিয়ম দ্বারা আপনা হইতে উপস্থিত হইয়া থাকে, যাহার গতি সর্ব্বাগ্রে আমরা কিছুই অবগত হইতে সমর্থ হই না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব জ্ঞান সপ্রমাণ হইবার পূর্ব্বে তদ্বিষয়ক একটি বিশ্বাস উৎপন্ন হয়। আত্মপ্রত্যয় ঐ বিশ্বাসকে সমর্থন করিবার নিমিত্ত বুদ্ধিবৃত্তির সম্মুখে উপস্থাপিত করে। আত্মপ্রত্যয় ব্যতিরেকে ঈশ্বরজ্ঞান লাভ হওয়া কোন রূপেই সম্ভব হয় না। বুদ্ধিবৃত্তি হইতে যত কেন তর্ক বিতর্ক উত্থিত হউক না, ঈশ্বরের অস্তিত্ব জ্ঞান কখনই উৎপন্ন করিতে সমর্থ হইবে না; কিন্তু সহজ জ্ঞান সাহায্যে ইহা আনীত হইলে তৎসমুদায় দ্বারা সম-

র্থিত হইয়া থাকে। যদি তর্কের মূল সত্যটি স্বীকার করা না যায়, তাহা হইলে সমুদায় তর্কই নিরর্থক হইয়া থাকে। যদি শিষ্যের হৃদয়ে ঈশ্বরের ভাব না থাকে, তাহা হইলে উপদেষ্টার তর্কশক্তি কদাচই উহা উৎপাদন করিতে পারে না। জন্মান্ধ ও বধিরের দৃশ্য বস্তু ও শব্দের স্বরূপ জ্ঞান নাই, সুতরাং তাহাদিগের নিকট দৃশ্য বস্তু ও শব্দের অস্তিত্বের বিষয় উল্লেখ করিলে তাহাদিগকে উহার ভাব হৃদয়ঙ্গম করান নিতান্ত সুকঠিন হইয়া উঠে। সেই রূপ যদি শিষ্যের সহজ জ্ঞান না থাকে, তাহা হইলে উপদেষ্টা আপনার তর্কশক্তির প্রাখর্য্য তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তির গোচর করিতে পারেন কিন্তু ঈশ্বরের ভাব কদাচই সঞ্চারিত করিতে সমর্থ হন না। সহজ-জ্ঞান-মূলক অনুভব না থাকিলে মনোবিজ্ঞান-সঙ্গত তর্ক কেবল ঈশ্বরের জ্ঞান ও শক্তির পরিচয় প্রদান করিতে পারে। অনুসন্ধান-পর তর্ক সংকীর্ণ ও অসম্পূর্ণ কার্য্যের নিমিত্ত একটি সংকীর্ণ ও অসম্পূর্ণ কারণ নির্ম্মাণ করিয়া দেয়; কিন্তু পূর্ণ সনাতন ব্রহ্মকে কখনই অভিব্যক্ত করিতে সমর্থ হয় না।

ঈশ্বরজ্ঞান সমস্ত বাহ্য কারণকে অতিক্রম করিয়া সহজ-জ্ঞান দ্বারা উৎপন্ন হইতেছে। এই জ্ঞান উৎপন্ন হইবার কালে কোন প্রতিবন্ধকই উপস্থিত হয় না এবং ইহা পূর্ণ অখণ্ড ভাবে উত্থিত হইয়া থাকে। যখন আত্মা প্রকৃত অবস্থায় অবস্থিত থাকে, যখন উহার স্বাধীন গতি প্রতিরুদ্ধ না হয়, তখনই আমরা অনন্তশক্তি অনন্তজ্ঞান পূর্ণমঙ্গল ঈশ্বরের ভাব লাভ করিয়া থাকি। কিন্তু যখন আত্মার প্রকৃত অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করা না হয়, তখন মনুষ্য ঈশ্বরের সঙ্কীর্ণ ও অসম্পূর্ণ ভাব উপলব্ধি করিয়া থাকে। তৎকালে অন্তর হইতে অবিনশ্বর ঈশ্বরের আদিম ভাবটি তিরোহিত হইয়া যায়। তখন মনুষ্য মুখে যেরূপ ঈশ্বরের ভাব অভিব্যক্ত করে, তাহা একান্ত অসম্পূর্ণ, নিতান্ত অসম্ভব এবং যারপর নাই বিষম্বাদী। মনুষ্যোচিত কার্য্য, মনুষ্যোচিত চিন্তা, মনুষ্যোচিত বোধ ও মনুষ্যোচিত রিপু এবং বিনশ্বর মনুষ্যের সমস্ত পরিমিত ভাব ঐশিক ভাবে আরোপিত হয়। ইহার প্রকৃত বিশুদ্ধতা ও সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হইয়া যায়। যাহারা ইহার বিষম্বাদিতা প্রদর্শন করিয়া তদ্বিষয়ে অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকে, তাহাদিগকে নাস্তিক বলিয়া নির্দেশ করা হয়। পূর্ব্বতন খ্রিষ্টধর্ম্মাবলম্বী এবং অন্যান্য সুবিখ্যাত ধর্ম্মপরায়ণ তত্ত্ববিৎ ঈশ্বরের এই পরিমিত ভাবে বিশ্বাস করেন নাই বলিয়া নাস্তিক নামে প্রথিত হইয়াছেন।

এক্ষণে আমরা যেরূপ ঈশ্বরের ভাব নির্দ্দেশ করিলাম, তাহা এক প্রকার অভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। অপূর্ণ জীব পূর্ণ ঈশ্বরের প্রকৃত ভাব কদাচই গ্রহণ করিতে পারে না। মনুষ্যের মনের প্রত্যেক ভাব দেশ কাল ও বাহ্য কারণে আবদ্ধ আছে কিন্তু অনন্ত ঈশ্বর এই সকল সীমাই অতিক্রম করিয়া আছেন। মনুষ্য অপূর্ণ ভাব ব্যতীত কখনই পূর্ণ-ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের পক্ষে যেমন এক রেণু বালুকা, সেই রূপ সেই অনন্ত পূর্ণ পুরুষের পক্ষে অপূর্ণতা। পূর্ণতা ও অপূর্ণতা এই উভয়ের যে কত অন্তর তাহা অনুভব করা যায় না। মনুষ্যের ভাব ঈশ্বরকে আপনার আকারে পরিণত করিয়া ফেলে। কিন্তু যে ভাব অনিয়ত এবং যাহা প্রকৃত বিশ্বাস উৎপাদন না করিয়া নিয়ত সংশয় উদ্রিক্ত করিয়া দেয়, তদ্বিষয়ে নির্ভর না করিয়া আমাদিগের প্রকৃতিতে ঈশ্বরের যে আদিম ভাব উপলব্ধ হয়—তিনি জ্ঞান শক্তি প্রভৃতি সমুদায় বিষয়ে অনন্ত—এই যে অভ্রান্ত ভাব আবির্ভূত হয়, আমাদিগের তাহাই অঙ্গীকার করা কর্ত্তব্য। এই ভাব সর্ব্বতোভাবে সঙ্গত। এই ভাব ঈশ্বরের স্বরূপকে সংকীর্ণ করিতেছে না এবং ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। অনেকানেক ধর্ম্ম-পরায়ণ মহাত্মা ঈশ্বরের এই প্রকৃত ভাব অবগত হইয়া সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন; ইহা বুদ্ধিবৃত্তি ও বিশ্বাস এই উভয়েরই প্রীতিকর বলিয়া অবগত হন এবং কেহ গাঢ়তর অনুসন্ধান দ্বারা ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ জানিতে পারেন না, হৃদয়ের সহিত এই পূর্ব্বতন বাক্যে অনুমোন করেন। কেহ কেহ বা আপনার সংকীর্ণতা ঈশ্বরের স্বরূপে আরোপ করিয়া তাঁহাকে আপনার ন্যায় প্রস্তুত করে। ধর্ম্মশাস্ত্র যে রূপে ঈশ্বরের স্বরূপ নিরূপণ করিতেছে, ইহা দ্বারা তাহার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম উপস্থিত হয়। যাঁহারা ঈশ্বরের এই প্রকার অপ্রাকৃত অসঙ্গত স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে যান, তাঁহারা আপনার কল্পনার একটি ছায়া প্রস্তুত করিয়া সেই ছায়াকে ঈশ্বর বলিয়া আহ্বান করিয়া থাকেন। মনুষ্যের প্রকৃতিতে ঈশ্বরের যে ভাবটি নিবদ্ধ রহিয়াছে, যাহা ঈশ্বরের প্রকৃত ও সঙ্গত স্বরূপ অভিব্যক্ত করিতেছে, তাহা চিরস্থায়ী ও সকল আত্মাতেই সমভাবে অবস্থান করিতেছে। ঈশ্বর-জ্ঞান যদিও আমাদিগের অন্তরে নিহিত আছে, তাহা কদাচই অপনীত হইবার নহে, সকলেই তাহা অধিকার করিতে পারে। কিন্তু ঈশ্বরের অখণ্ড অবিকৃত জ্ঞানলাভ ও বাক্যে তাহা অভিব্যক্ত করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে এবং স্বরূপত উহা অসম্ভব। সেই সর্ব্বব্যাপী যে কি, তাহা তিনিই বিলক্ষণ অবগত আছেন।

পৌত্তলিকতা।

যাহা কিছু ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হয়, পৌত্তলিকতা তন্মধ্যে একটি প্রধান। সত্যের সহিত মিথ্যার যে প্রভেদ, ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত পৌত্তলিকতার সেই প্রভেদ। ঈশ্বর মনুষ্যের আত্মাতে যে সনাতন ধর্ম্মের ভাব সংস্থাপন করিয়া দিয়াছেন, তাহাই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আদর্শ; আর ঈশ্বরকে পদ-চ্যুত করিয়া তাঁহার আসন অন্যকে সমর্পণ করাই পৌত্তলিকতা। দোষ-গুণ-বিশিষ্ট পরিমিত ক্ষুদ্র বস্তুকে ধর্ম্মের আদর্শ করা হইতেই পৌত্তলিকতা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম অন্যবিধ পদার্থ। সংসারে ইহার আদর্শ নাই—যাঁহার জ্ঞান সমুদায় বেদ্য বস্তুকে জানিতেছে, যাঁহার প্রীতি সমুদয় সংসারকে আনন্দ-রসে সিক্ত করিয়া রাখিয়াছে, এবং যাঁহার মঙ্গলময়ী ইচ্ছা অনবরত কল্যাণ-পরম্পরা প্রসব করিতেছে; তিনিই পবিত্র ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের এক মাত্র আদর্শ। কি মর্ত্ত্য লোকে, কি দিব্য লোকে, যেখানে যত উন্নত আত্মা থাকুন, সকলেই ব্রাহ্মধর্ম্মের নিম্নে অবস্থান করিতেছেন। এমন উন্নত ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে কেহ অধস্তন মর্ত্ত্য আদর্শের অধীন করিবার চেষ্টা করিতে গেলে আমারদের মনে দুঃসহ মনস্তাপ আসিয়া উপস্থিত হয়! ঘোর পৌত্তলিক ভিন্ন আর কেহই কোন মৃত বা জীবন্ত মনুষ্যকে ধর্ম্মের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না।

এক দিকে বৈদিক, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক পৌত্তলিকতা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের পথে বিঘ্ন দিতেছে, আর দিকে বাইবলিক পৌত্তলি-

কতা নানাবিধ বিভীষিকা প্রদর্শন করিতেছে। এ দেশীয় পৌত্তলিকতা এক প্রকার নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়িয়াছে এবং ইউরোপের ভাব দেখিয়াও বোধ হইতেছে যে, তথাকার বাইবলিক পৌত্তলিকতাও মুমূর্ষু দশায় উপনীত হইতেছে। এক্ষণে সেখানকার বুদ্ধিমান্ লোকেরা আর বাইবলিক পৌত্তলিকতাতে পরিতৃপ্ত হইতে পারেন না। ইহা অতি আহ্লাদের বিষয় যে হিন্দুসমাজে পৌত্তলিকতার যে রূপ অবস্থা, ইউরোপেও বাইবলিক পৌত্তলিকতার অবিকল সেই রূপ অবস্থা ঘটিয়াছে। এ দেশের শিক্ষিত দলের ন্যায় তথাকার অনেকেই কেবল ভীরুতা বশত আপনারদিগকে কৃত্রিম দেবতা য়ীশু খৃষ্টের উপাসক বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেছেন। ইহা পৌত্তলিকতার দুরবস্থা-বিষয়ে সামান্য নিদর্শন নহে। রোমান ক্যাথলিকেরাই খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রকৃত দৃষ্টান্ত। য়িশুখৃষ্ট যে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিয়া যান, রোমান্ ক্যাথলিকদিগের মধ্যেই তাহা অবিতথ রূপে পরিগৃহীত হইয়াছে। বিবাহ না করিয়া চিরজীবন সন্ন্যাসী হইয়া অবস্থান করা প্রভৃতি ক্রাইষ্টের আচরণ-সকল রোমান্ ক্যাথলিক পুরোহিতেরাই অনুকরণ করিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়, এবং ইউরোপের অধিকাংশ স্থানেই এই মত প্রতিপালিত হইতেছে। প্রটেষ্ট্যাণ্ট, কোয়েকর, বা ইউনিটেরিয়ানেরা যে পরিমাণে খৃষ্টীয় ধর্ম্মকে সংশোধন করিয়া লইয়াছেন; সেই পরিমাণে প্রকৃত খৃষ্টীয় ধর্ম্ম হইতে তাহাঁরা দূরবর্ত্তী হইয়াছেন। প্রথমে রোমান্ ক্যাথলিকদিগের মধ্যে বাইবলিক পৌত্তলিকতার যে রূপ প্রবলতা ছিল, প্রটেষ্টাণ্টেরা তাহার কিয়দংশ রহিত করিয়া দিয়াছেন; আবার প্রটেষ্টাণ্টদিগের মধ্যে যে সকল পৌত্তলিকতা আছে, ইউনিটেরিয়ানেরা তাহার কিয়দংশ বাদ দিয়া চলেন। ইউনিটেরিয়ানদিগের মধ্যে যে সকল পৌত্তলিকতা আছে, তাহার দ্বারাই ইউনিটেরিয়ানেরা অদ্যাপি খৃষ্টীয়ান্ বলিয়া পরিচিত হইতেছেন; সে টুকু সংশোধন করিতে গেলে ইউনিটেরিয়ান্ ধর্ম্মের আর খৃষ্টীয়ত্ব কিছুই থাকে না। বাস্তবিক আমরা যাহা বলিতেছি, ইউরোপে তাহাই ঘটিতেছে। এক্ষণে ইউরোপে অনেকেই ক্রাইষ্টের নাম গন্ধ উঠাইয়া দিয়া আত্ম-গত উদার ধর্ম্ম-ভাব অনুসারে সত্যের আশ্রয় লইয়াছেন, এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম তাঁহাদিগের নিকট মধুময় বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে।

কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে সম্প্রতি এখানকার কেহ কেহ ক্রাইষ্টের প্রতি নিতান্ত পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছেন। ক্রাইষ্টের যে রূপ চরিত্র প্রসিদ্ধ আছে, বোধ হয় সেই রূপ চরিত্র ইহাঁরা ভাল বাসেন বলিয়া ক্রাইষ্টের প্রতি এত অনুরক্ত হইয়াছেন। বাইবলে ক্রাইষ্টের চরিত্র যে রূপ বর্ণিত আছে, তাহার অধিকাংশই অসম্ভব ও মিথ্যা বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে; অবশিষ্ট ভাগ কত দূর নির্দ্দোষ, তাহার বিচার করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। যদিও সেই গুলিকে উৎকৃষ্ট বলিয়া গ্রহণ করা যায়; তথাপি মহম্মদ, নানক ও চৈতন্য অপেক্ষা ক্রাইষ্টকে অধিক সম্মান করিতে গেলেই পক্ষপাত হইয়া উঠে। সামান্য লোকদিগের মধ্যে যতগুলি ধর্ম্ম-সংস্কারকের উদয় হইয়াছিল, তন্মধ্যে এই চারি জন অধিক প্রসিদ্ধ, ইহা স্বীকার করি। তথাপি এখানকার প্রসিদ্ধ প্রচারক শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দ যে শ্রেণীর লোক, ইহাঁরদিগকে সে শ্রেণীতেও গ্রহণ করা যাইতে পারে না। ইহাঁরদের হৃদয়ে ঈশ্বরেতে প্রগাঢ় ভক্তি-ভাব ছিল বটে; কিন্তু বিদ্যা বুদ্ধিতে ইঁহারা অতি সামান্য লোক ছিলেন। রামমোহন রায় আবার আর এক শ্রেণীর লোক; যে শ্রেণীর উচ্চ পদবীতে পূর্ব্বকালের সাক্রেটিস, প্লেটো; কঠ, তলবকার ও শঙ্করাচার্য্য ছিলেন এবং এক্ষণকার নিউমেন, পার্কর, মহাত্মা কুজন ও ব্রহ্মবাদিনী কবকেও গ্রহণ করা যাইতে পারে। রামমোহন রায় যেমন উপনিষদের মহা বাক্যে শ্রদ্ধা করিতেন, তেমনি ক্রাইষ্টেরও উপদেশ ভাল বাসিতেন; কিন্তু বাইবল-সম্মত তাহার অলৌকিক ঐশী শক্তি অঙ্গীকার করিতেন না, তাহার সকল চরিত্রকেও বিশুদ্ধ বলিতেন না, এবং তাহাকে পুণ্য-পাপ-বিশিষ্ট মনুষ্য বলিয়াই জানিতেন—নিষ্পাপ বলিয়া জানিতেন না। তিনি সর্ব্ব প্রকার পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে শুদ্ধ অপাপ-বিদ্ধ কেবল একমাত্র পরব্রহ্মের উপাসনার জন্য কলিকাতাতে এই ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। তাঁহার সংস্থাপিত ব্রাহ্মসমাজ-গৃহের অধিকার-পত্রে লিখিত আছে যে "কেবল এই বিশ্বের স্রষ্টা, পাতা ও নিত্য, অচিন্ত্য, ধ্রুব, পরমেশ্বরের পূজা ও উপাসনার জন্য এই গৃহ স্থাপিত হইল—নাম-রূপ-উপাধি-বিশিষ্ট কোন জীবের উপাসনার জন্য নহে, যাহাকে কোন লোক বা কোন সম্প্রদায় উপাসনা করে" *। তলবকার মহর্ষির এই ভাবের বচনও ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থে উদ্ধৃত আছে। "যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে"। "যিনি বাক্যের বচনীয় নহেন, বাক্য যাঁহার দ্বারা প্রেরিত হয়, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান—লোকেরা যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে, তাহা কখনো ব্রহ্ম নহে"। কিন্তু আশ্চর্য্য যে ইউরোপ প্রদেশের এত বড় দর্শনকার বিখ্যাত কুজন, কেবল রোমান ক্যাথলিক দেশে জন্ম হওয়া প্রযুক্ত, ক্রাইষ্টকে একেবারে ঈশ্বরের পুত্র ও অবতার বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। তিনি তাঁহার দর্শন-শাস্ত্রে ঈশ্বরের মঙ্গল ভাবের এই উদাহরণ দিয়াছেন যে, ঈশ্বর এমত করুণাময় যে তিনি আপনার সবে একটি মাত্র পুত্র যীশু খ্রীষ্টকে বলিদানের জন্য দিয়াও মনুষ্যের হিত-সাধন করিয়াছেন। মহা পণ্ডিত কুজনের মুখ হইতে এমত অমূলক ও অসম্ভব কথা কি তীব্র-রূপে আমারদের কর্ণে প্রবিষ্ট হয়! হায়! বাল্য-সংস্কারের কি আশ্চর্য্য বল! পৌত্তলিকতার কি দুর্জ্জয় মোহ!

* For the worship and adoration of the eternal unsearchable and immutable Being who is the Author and Preserver of the universe but not under or by any other name designation or tittle peculiarly used for and applied to any particular being or beings by any man or set of men whatsoever.—Trust deed.

RESURRECION OF JESUS.

"The Cross was the banner under which madmen assemble to glut the earth with blood."

THE history of the life of an ordinary man terminates commonly with his death; but it is different with a Man-God who has the power of raising himself from the dead, or whom his adherents have the faculty of making rise at will. This happened to Jesus: thanks to his apostles or evangelists, we see him still playing a considerable part even after his decease.

The moment Christ was arrested, his disciples, as we have narrated, dispersed themselves in Jerusalem and the neighbourhood, with the exception of Simon Peter, who did not lose sight of him during his examination at the house of the high priest. This apostle was anxious, for his own interest, to know the result of it. Encouraging themselves on finding that Jesus had not criminated them in his examinations, the disciples re-assembled, concerted measures, and determined, as their master was dead, or reputed so, to take advantage of the notions which he had diffused during his mission. Accustomed for so long a period to lead a wandering life under his command, and subsist at the expense of the public by means of preaching, exorcisms, and miracles, they resolved to continue a profession more easily exercised, and incomparably more lucrative than their original occupations. They had enjoyed an opportunity of observing that it

was better to catch men than fish. But how could the disciples of a man who was punished as an impostor, make themselves listened to? It was necessary to give out that their master having, during his life, raised others from the dead, had, after his own death, raised himself, in virtue of his omnipotence. Jesus had predicted it; it was therefore necessary to accomplish the prediction. The honour of the master and his disciples thereby acquired a new lustre; and the sect, far from seeing itself annihilated or disgraced, was enabled to acquire new partizans in this credulous nation.

In consequence of this reasoning, the good apostles had only to make the body of their master, dead or alive, to disappear, which, if it had remained in the tomb, would have borne evidence against them. They did not even wait till the three days and three nights in the pretended prophecy were expired. The dead body disappeared on the second day; and thus the second day after his decease, our hero, triumphing over hell and the grave, found himself revivified.*

If Christ was not yet dead of his punishment, his resurrection had nothing surprising in it. If he was actually dead, the cave, where his body was deposited, might very probably have secret passages, through which they could enter and come out, without being observed or stopt by the enormous stone with which, they had affected to block up its entrance, and near which the guards had been placed. Thus the dead body might have been carried off either by force or by stratagem. and perhaps it had never been deposited in the tomb at all. In whatever manner the affair was transacted, a report was circulated that Jesus was risen, and his body not to be found.

Nothing is of more importance to a Christian, than to ascertain satisfactorily the resurrection of Christ. St. Paul tells us, that "if Jesus be not risen, our hope is vain." Indeed without this miracle of Omnipotence, intended to manifest the superiority of Christ over other men, and the Interest the Diety took in his success, Jesus must appear only as an adventurer, or weak fanatic, punished for having given umbrage to the priests of his country.

It is therefore requisite to examine seriously a fact, on which alone the belief of every Christian is founded. In doing this it is necessary to satisfy ourselves of the quality of the witnesses who attest the fact, whether they were acute, disinterested, and intelligent, persons; if they agree in the narratives they give, or in the circumstances they relate. Such are the precautions usually employed to discover the degree of probability or evidence of facts. They are also the more necessary, when it is intended to examine *supernatural* facts, which, to be believed, require much stronger proofs than ordinary facts. On the unanimous testimony of some historians, we readily believe that Cæsar made himself master of Gaul; the circumstances of his conquest would be less established, were we to find them related by himself only, or his adherents; but they would appear incredible, if we found in them prodigies or facts contrary to the order of nature. We would then have reason to believe, that it was intended to impose on us; or, if we judged more favourably of the authors, we would regard them as enthusiasts and fools.

Agreeably to these principles, adopted by sound criticism, let us consider who are the witnesses that attest the marvellous, and consequently the least probable facts which history can produce. They are apostles—But who are these apostles? They are adherents of Jesus. Were these apostles enlightened men? Every thing proves that they were ignorant and rude, and that an indefatigable credulity was the most prominent trait in their character. Did they behold Jesus rising from the dead?—No;—no one beheld this great miracle The apostles themselves did not see their master coming out of the grave; they merely found that his tomb was empty; but this by no means proves that he had risen. It will however be said, the apostles saw him afterwards and conversed with him, and that he likewise shewed himself to some women, who knew him very well. But these apostles and these women, did they see distinctly? Did not their prepossessed imaginations make them see what did not exist? Is it absolutely certain that their master was dead before they laid him in the tomb?

In the *second* place, were these witnesses *disinterested?* The apostles and disciples of Jesus were doubtless interested in the glory of the master they had followed during the course of his mission. Their interests were confounded with those of a man who enabled them to subsist without toil. Several among them expected to be recompensed for their attachment, to him, by the favours which he promised to bestow on them in the kingdom he was about to establish. Finding these hopes destroyed by the death, real or supposed, of their chief, most of the apostles, persuaded, that all was over, lost courage; but others, less daunted, concieved that it was not necessary *to throw the handle after the hatchet* that they might profit still by the impressions which the preaching of Christ and his wonders had made on the people. They believed that their master might again return, or, if they supposed him dead, they could feign that he had foretold he would rise again. They therefore agreed that it was proper to circulate the report of his resurrection; to say that they had seen him and to assert that Jesus had triumphantly come out of the tomb: which would appear very

* The ancient framers of the Gosples have fabricated one which they have ascribed to Nicodemus. In it we learn how Christ passed his time after his death till his resurrection, his journey to hell, the deliverance of the patriarchs, the discomfiture of Satan, &c. All these details are attested by two dead persons who came purposely from the other world, to acquaint Annanias, Caiphas, and the doctors of Judea of these events. Codex, Apocryph. N. T. Tome 1. p. 238, &c.

credible in the case of a personage who had evinced himself capable of raising others from the dead. Knowing the imbecility of those they had to deal with, they presumed that the people were prepared long beforehand to believe the marvellous wonder which they intended to announce. They conceived, that, in order to subsist, it was necessary to continue preaching the doctrine of a man who would not have attracted an audience, if it had not been taken for granted that he was risen again. They felt that it was necessary to preach the resurrection of Christ, or consent to perish with hunger. They foresaw, moreover, that it was necessary to brave chastisement and even death, rather than renounce an opinion or doctrine on which their daily subsistence and welfare absolutely depended. Hence unbelievers conclude, that the witnesses of the resurrection of Christ were any thing but disinterested, and were spurred on by the principle, that *he who risks nothing, gains nothing.*

In the *third* place, are the witnesses of the resurrection of Christ *unanimous* in their evidence? Much more, are they consistent with themselves in the narratives they give? We find neither the one nor the other. Though Jesus, according to some of the evangelists, had foretold in the most positive manner, that he would rise again,* St. John makes no mention of this prediction, but expressly declares, that the disciples of Jesus *knew not that he must rise again from the dead.*† This denotes in them a total ignorance of that great event, said however, to have been announced by their master; and creates a suspicion that these predictions of Christ were piously invented afterwards, and inserted in process of time into the text of St. Matthew, St. Mark, and St. Luke. Yet nothing can be more positive than the manner in which St. Matthew speaks of the prediction; he supposes it so well known by the public, that he affirms, the priests and Pharisees went to Pilate, and told him, *We remember this deceiver said while he was yet alive, that after three days he would rise again*‡. We do not, however, find in any of the evangelists a passage where this resurrection is foretold in so public and decided a manner. St. Matthew himself relates only the answer of Jesus to those who demanded of him a sign; it consisted, as we have elsewhere said, in referring them to "Jonas, who was three days and three nights in the belly of the whale; so," said he, "shall the Son of man be three days and three nights in the heart of the earth."§ Now Jesus, having died on Friday, at the ninth hour or mid-day, and risen again the second day early in the morning, was not, as we have already remarked, "three days and three nights in the heart of the earth." Besides, the obscure manner in which Christ expressed himself in this pretended prediction, could not enable the priests and Pharisees to conclude that Jesus must die and rise again, or to excite their alarm, unless it is pretended, that, on this occasion, these enemies of Christ received by a particular revelation the interpretation of the mysterious prediction..

St. John tells us, that when Jesus was taken down from the cross by Joseph of Arimathea. Nicodemus, in order to embalm him, brought a mixture of aloes and myrrh, weighing about a hundred pounds and that he afterwards took the body, wrapt it in a clean linen cloth, furnished spices according to the custom practised by the Jews in their funeral ceremonies, and laid it in the tomb*. Thus was Jesus embalmed, carried away, and buried. On the other hand St. Matthew and St. Luke tell us that this sepulture and embalming were performed in presence of Mary Magdalene and Mary the mother of Jesus†, who, consequently must have known what Nicodemus had done; yet St. Mark, forgetting all this, tells us, that these same women *brought sweet spices* (aromatics) *in order to embalm his body*, and came for that purpose early in the morning of the day subsequent to the Sabbath‡. St. Luke has no better memory, and informs us, that these ladies came also to embalm a dead body, which according to St. John, had already received *a hundred pounds weight* of aromatics, and was inclosed in a sepulchre, the entrance of which was blocked up by a massy stone, which embarrassed the women as much at finding it as the incredulous are with these contradictions of our evangelists§.

These ladies, however, who dreaded the obstacle of the stone, did not dread the obstacle of the guard which St. Matthew placed at the entrance of the tomb. But if these women knew that Christ was to rise again at the end of three days, why were they so careful in embalming his body?—unless indeed we suppose that Jesus made a secret to his mother and the tender Magdalane of an event which it is asserted was publicly predicted, and which was perfectly well known not only by his disciples, but also by the priests and Pharisees, of whose extraordinary precautions we are informed by St. Matthew. According to this evangelist, these precautions were founded on the fear the priests were under, that the disciples of Jesus "should come and carry away his body, and afterwards say unto the people, that he is risen from the dead; an error, which, in their opinion, would be more dangerous than the first." Nevertheless we find some women and disciples continually roaming about the tomb, going and coming freely, and offering to embalm the same dead body twice. It must be acknowledged that all this surpasses human understanding‖

It is not more easy to conceive the conduct of the guards placed near the tomb at the solicitation of the priests or that

* St. Matt. xxvi. 32. St. Mark, xvi. 28.
† St. John, xx. 9.
‡ St. Matt, xxvii, 63,
§ St. Matt. xii, 38, &c,

* St, John, xix, 39—40,
† St. Matt, xxvii, 61, St, Mark, xv, 47, St, Luke, xxii55.
‡ St, Mark, xvi. 1,
§ St, Luke. xxiv, 1,
‖ St. Matt, xxvii, 62—66,

of the priests themselves. According to St. Matthew, these guards, terrified at the resurrectron of Christ, ran to Jerusalem to tell the priests, "that the angel of the Lord had descended from heaven, and taken away the stone which blocked up the tomb; and that at the sight of him they had nearly expired through fear." On this the priests, not at all doubting the truth of the relation of the guards, enjoined them to say publicly that the disciples of Jesus had carried away his body during the night, and while they were asleep. They also gave the soldiers money to speak in this manner, and promised to pacify the governor, if he wished to punish them for their negligence*

As to this narrative, it is proper to observe, that the guards did not say they had seen Jesus rise from the dead; they pretended merely to have seen "the angel of the Lord, descending from heaven, and rolling away the stone which was at the entrance of the tomb." Thus this history announces *an apparition* only, and not *a resurrection*. We might explain it in a manner natural enough by supposing that during the night, while the guards were buried in sleep, the adherents of Jesus came by the light of flambeaus, with an armed force, to open the tomb and intimidate the soldiers taken unawares, who in the alarm they experienced imagined they had seen their prey taken out of their hands by a preternatural power, and that they afterwards affirmed all this in order to justify themselves.

The most singular circumstnnce is the conduct of the priests, who believed in earnest the relation of the guards, and consequently gave credit to a miracle strong enough to convince them of the power of Jesus. But far from being moved by the prodigy which they thus believed, they gave money to the soldiers to engage them to tell, not the incident as it occurred, but that the disciples of Jesus came by night to take away the body of their master. On the other hand, the guards, who must have been more dead than alive through terror at the spectacle they had witnessed, accepted money for publishing a falsehood: a conduct for which the angel of the Lord might very properly have punished them. Far, however, from dreading punishment, these soldiers for a sum of money consented to betray their consciences. But could the Jewish priests, however base we may suppose them, be silly enough to imagine that these men, after having witnessed so terrible a miracle, would be very faithful in preserving the secret? It must have been an insignificant miracle indeed which could make no impression either on the soldiers who had seen it, or on the priests who believed it on the relation of these soldiers. If the priests were convinced of the reality of the miracle, was it not natural that they should recognise Jesus for the Messiah, and that they should unite with him in labouring to deliver their country from the yoke of idolaters?

On this occasion indeed, the angel of the Lord seems to have bungled the affair, by so terrifying the soldier that they fled without having time to see Jesus rising from the dead whose resurrection, however, was the object of all this pompous preparation. Very far from allowing it to be seen by any one, this awkward angel chased away the guards who ought to have been the witness of the mighty wonder.

It appears in fact, that the transaction of Jesus' resurrection was seen by nobody. His disciples did not see it: the soldiers, who guarded his tomb, did not see it; and the priests and Jews did not hold this fact to be so memorable as some persons who beheld no part of it. It was only after his resurrection that Jesus shewed himself. But to whom did he shew himself? To disciples interested in saying that he was risen again; to women, who to the same interest joined also weak minds and ardent imaginations, disposed to form phantoms and chimeras.

These remarks will enable us to judge of all the pretended appearances of Jesus after his resurrection. Besides, the evangelists are not unanimous as to these appearances. St. Matthew relates, that Jesus shewed himself to Mary Magdalene and the other Mary; while St. John makes mention of Mary Magdalene singly. St. Matthew tells us, that Jesus shewed himself to the two Marys on the road whilst returning from the sepulchre on purpose to apprise the disciples of what they had seen. St. John informs us, that Mary Magdalene, after visiting the sepulchre, went and carried the news to the disciples, and thereafter returned to this same sepulchre, where she beheld Jesus in the company of angels. St. Matthew affirms, that the two Marys embraced the feet of Jesus. St. John says, Jesus forbade Magdalene to touch him. St. Matthew informs us, that Jesus bade the two Marys tell his disciples *that he was going into Galilee*. St. John says, Jesus ordered Mary to acquaint his disciples, *that he was going to his Father*; that is, to heaven.—But it is more singular still, that, according to St. Mark, the disciples themselves were not inclined to credit the apparition of Christ to Magdalene; agreeably to St. Luke, they treated all that she told them of angels as reveries. According to St. John, Magdalene herself did not at first believe that she had seen him, whom she took for the gardener.*

There is no greater certainty in the apparition of Jesus to St. Peter and John. These two apostles went to the sepulchre, but they did not find their dear master. According to St. John, he himself saw neither Jesus nor the angels. From St. Luke it appears, that these apostles arrived after the angels were gone; and from St. John, before the angels had arrived. The witnesses are indeed very little unanimous as to these angels, who seem to have been seen only by the good ladies, whom

* St, Matt, xxviii,

* St. Matt, xxviii, St, John xx, St, Luke, xxiv,11 St, Mark xvi,

they charged to announce to the disciples the resurrection of Jesus. St. Matthew makes mention of one angel only whom St. Mark calls *a young man*. St. John affirms, that there were two.

It is said, that Jesus shewed himself again to two disciples of Emaus, called *Simon and Cleophas*; but they did not recognize him, though they had lived familiarly with him. They proceeded a long while in his company without suspecting who he was—a circumstance which, undoubtedly, evinced a very strange failure of memory. It is true, St. Luke tells us that their *eyes were as if shut*. Is it not very singular that Jesus should shew himself in order not be known again? They, however, recognized him afterwards; but immediately dreading, as it would seem, to be seen too nearly, the phantom disappeared. The two disciples went immediately and announced the news to their brethren assembled at Jerusalem, where Jesus arrived fully as soon as they.

St. Matthew, St. Mark, and St. Luke, agree in telling us that when the disciples were informed of the resurrection of Jesus, they saw him for the first and last time. But the authors of the Acts of the Apostles, St. John and St. Paul, contradict this assertion, for they speak of several other appearances, which afterwards occurred. St. Matthew and St. Mark inform us that the disciples received order to go and join Jesus in Galilee; but St. Luke and the author of the Acts (i, e, the same St. Luke) says, that the disciples were ordered not to go out of Jerusalem, With respect to this last apparition, St. Matthew places it on *mountain in Galilee* where Jesus had fixed the rendezous for the evening of the day of his resurrection Whilst St. Luke informs us, that it was at Jerusalem, and tells us, that immediately thereafter Christ ascended into heaven, and disappeared for ever. Yet the author of the Acts of the Aposles is not of this opinion; he maintains against himself, that Jesus tarried still forty days with his disciples, in order to instruct them.

There still remain to be considered two appearances of Jesus to his apostles, the one at which Thomas was not present, and refused to believe those who assured him of their having seen their master, and the other when Thomas recognised his master, who shewed him his wounds. To render one of these apparitions more marvellous, they assure us, that Jesus was seen in the midst of his disciples, *whilst the doors were shut*. But this will not appear surprising to those who know that Christ, after his resurrection, had an *immaterial* or *incorporeal* body, which consequently could make itself a passage through the smallest orifices. His disciples took him for a *spirite* yet this *spirite* had wounds, was palpable, and took food. But perhaps all this was only chimerical, and those apparitions mere illusions of sense. Indeed, how could the apostles be assured of the reality of what they saw? A being who has the power of changing the course of nature can destroy all the rules by which we judge of certainty: and on this supposition the apostles could never be certain of having seen Christ after his resurrection.

St. John speaks of several appearances of Jesus to his disciples, of which no mention is made by the other evangelists: hence we see that his testimony destroys theirs, or that theirs destroy his. As to apparitions of Jesus which St. Paul mentions, he was not a witness of them, and knew them only by hearsay, we find him accordingly speaking of them in a manner very little exact. He says for example, that Jesus shewed himself "to the twelve," while it is evident, that. by the death of Judas, the apostolic college was reduced to eleven. We are surprised to see these inaccuracies in an inspired author; they may render suspicious what he likewise says of the apparition of Jesus to five hundred of the brethren at once.* As to himself we know that he never saw his master but in a *vision*.† and considering the testimonies on which the resurrection of Jesus is founded, perhaps we may say as much of the other apostles and disciples. They were Jews, enthusiasts, and prophets; and consequently subject to dreaming even while awake. The incredulous consider this to be the most favourable opinion they can form of witnesses who attest the resurrection of the Saviour, on which however the Christian religion is solely establi-hed.

It appears indeed most certain, from nature of the testimonies we have examined, that Providence has in a singular manner neglected to give to an event so memorable and of such great importance, the authenticity it seemed to require. Laying aside faith, which never experiences any difficulty about proofs, no man can believe facts, even the most natural, from, vouchers so faulty, proofs so weak, relations so contradictory, and testimonies so suspicious as those which the evangelists furnish us on the most incredible and marvellous occurrence that was ever related. Independent of the

* 1 Cor, xv, 6.

† St. Paul himself informs us that he was ravished up to the third heaven But why was he transported thither, and what did he learn by his journeys?—*Things unspeakable, which no man could comprehend.* What advantage are mankind to derive from all this? In the Acts of the Apostles, we find that this same Paul was guilty of a falsehood in saying before the High Priest, that he was persecuted *because he was a Pharisee and on account of the resurrection*. Here, in fact, are two untruths: First, Paul was not a Pharisee at the time, but a most zealous apostle of the Christian religion, and consequently a Christian. Secondly, the accusations brought against him did not refer to his opinion on the resurrection. If we know that the apostles sometimes wandered from the truth, how shall we believe them on other occasions? We indeed find this great apostle continually changing his counsels and conduct. At Jerusalem he strenuously opposed Peter because he favoured Judaism, while he himself shortly after complied with Jewish rites; and boasted that he always accommodated himself to the circumstances of the times, *and became all things to all men*. By this he set an example to the Jesuits in India, who were reproached with having united the worship of the Pegans to that of Christ.

visible interest these historians had in establishing the belief of the resurrection of their master, and which ought to put us on our guard against them, they seem to have written merely to contradict one another, and reciprocally weaken their testimonies. To adopt relations, in which we have only a tissue of inconclusiveness, contradictions, improbable facts, and absurdities, calculated to destroy all confidence in history, requires indeed grace from above. Yet Christians do not for a moment doubt the resurrection; and their belief in this respect is founded on *a rock* that is according to infidels, on prejudices they have never examined, and to which, from early infancy, their spiritual guides have prudently attached the greatest importance. They teach them to immolate on the alter of faith, reason, judgment, and good sense:—After this sacrifice, it is no longer difficult to make them acknowledge, without enquiry, the most palpable absurdities for truths, on which it is not permitted even to be sceptical.

It is in vain, that people of sense demonstrate the falsity of these pretended truths; it is in vain, that an intelligent critic stands up against interested testimonies, visibly suggested by enthusiasm and imposture; it is in vain, that humanity exclaims against wars, massacres, and horrors without number, which absurd disputes on absurd dogmas have occasioned. They silence people by saying, that "it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and will bring to nought the understanding of the prudent.—Where is the wise? Where are the scribes? (the doctors of the law). Hath not God made foolish the wisdom of this world by causing the foolishness of the gospel to be preached*?" It is by such declamations against reason and wisdom, that fanatics and impostors have succeeded in banishing good sense from the earth, and fashioning slaves who make a merit of subjecting reason to faith, of extinguishing a sacred torch, which would conduct them with certainty, on purpose to lead them astray in the darkness these interested guides know how to infuse into minds. To degrade reason is an outrage against God its author; and it is an outrage against man who is thereby reduced to the condition of brutes.

ECCE HOMO.

* Cor, i, 9, &c,

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৪ আষাঢ় রবিবার প্রাতঃকালে ৭৷৷০ সাড়ে সাত ঘণ্টার সময়ে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে দান সংগ্রহ।

উড়িষ্যায় যে রূপ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে বোধ হয় তাহা কাহারই অবিদিত নাই। সম্প্রতি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে এই দুর্ভিক্ষে সাহায্য দান করিবার নিমিত্ত ৩১ বৈশাখ রবিবার প্রাতঃকালে দান সংগ্রহ হইয়া গিয়াছে। ঐ দিবস যত অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে তাহা হইতে ২৫০ টাকা আপাতত কটক ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে। অবশিষ্ট যে টাকা সঞ্চিত রহিয়াছে তাহার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া অবিলম্বে তথায় প্রেরণ করিতে হইবে। যে কেহ দয়ার্দ্র হৃদয়ে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক যাহা কিছু উৎকল বাসীদিগের সাহায্য নিমিত্তে এই সমাজে প্রেরণ করিবেন, তাহা আমরা আদরের সহিত গ্রহণ করিব।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান।

প্রথম প্রকরণ—মূল্য ৷৷০ আট আনা।
দ্বিতীয় প্রকরণ—মূল্য ৷৷০ আট আনা।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয় কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের এক একটী শ্লোকের যেরূপ ব্যাখ্যা দ্বারা সাধারণকে উপদেশ প্রদান করেন, তাহার কতকগুলি লইয়া প্রথম প্রকরণ নামে পূর্ব্বে পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়, সম্প্রতি তাহার অবশিষ্ট গুলি একত্রিত করিয়া দ্বিতীয় প্রকরণ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রকরণে পারলৌকিক সাধনের বিশেষ উল্লেখ আছে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাকমাসুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২৩। কলিগতাব্দ ৪৯২৭। ১৫ জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

একমেবাদ্বিতীয়ং
ষষ্ঠ কল্প
চতুর্থ ভাগ
আষাঢ় ১৭৮৮ শক।
২৭৫ সংখ্যা
৩৭ ব্রাহ্মসম্বৎ

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদসংহিতা।

প্রথমমণ্ডলস্য ত্রয়োদশানুবাকে অষ্টমং সূক্তং।

গোতমঋষিঃ পংক্তিশ্ছন্দঃ ইন্দ্রোদেবতা।

৮৬৯

৬। যো অর্য্যো মর্ত্তভোজনং পরাদদাতি দাশুষে। ইন্দ্রো অস্মভ্যং শিক্ষতু বি ভজা ভূরি তে বসু ভক্ষীয় তব রাধসঃ।

৬। 'অর্য্যঃ' স্বামী পালয়িতা 'যঃ ইন্দ্রঃ' 'মর্ত্তভোজনং' সর্ব্বেষাং মনুষ্যরূপভোজ্যমন্নং 'দাশুষে' চরুপুরোডাসাদীনি দত্তবতে যজমানায় 'পরাদদাতি' প্রযচ্ছতি। সঃ ইন্দ্রঃ 'অস্মভ্যং' 'শিক্ষতু' তাদৃশমন্নং দদাতু। হে ইন্দ্র অস্মভ্যং দাতুং ধনং 'বিভজ' বিভক্তং কুরু। যতঃ 'তে' তব 'বসু' ধনং 'ভূরি' বহুলমসংখ্যাতং। অতঃ 'তব' 'রাধসঃ' ধনস্যৈকদেশং 'ভক্ষীয়' ভজেয় প্রাপ্নুয়াং।

৬। যে প্রতিপালক ইন্দ্র যজমানকে মনুষ্যগণের উপভোগ্য অন্ন প্রদান করিয়া থাকেন, তিনি আমাদিগকে অন্ন প্রদান করুন। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদিগকে দান করিবার নিমিত্ত ধন বিভাগ কর। তোমার ধনের সংখ্যা নাই। এই নিমিত্ত আমরা তোমার ধনের একদেশ প্রার্থনা করি।

৮৭০

৭। মদে মদে হি নো দদি যূথা। গবামৃজুক্রতুঃ। সংগৃভায় পুরূ শতোভয়াহস্ত্যা বসু শিশীহি রায আভর।

৭। 'মদে মদে' সোমপানেন হর্ষে হর্ষে সতি 'ঋজুক্রতুঃ' ঋজুকর্ম্মা সঃ ইন্দ্রঃ 'নঃ' অস্মভ্যং 'গবাং' 'যূথা' যূথানি 'দদিহি' গোযূথানাং দাতা ভবতু। হে ইন্দ্র স ত্বং 'পুরূ' পুরূণি প্রভূতানি 'শতা' শতসংখ্যাকানি অপরিমিতানীত্যর্থঃ। 'বসু' বসূনি ধনানি 'উভয়া হস্ত্যা' উভাভ্যাং হস্তাভ্যাং 'সংগৃভায়' অস্মভ্যং দাতুং সম্যক গৃহাণ। 'শিশীহি' অস্মাংস্তিক্ষ্ণী কুরু। নিশিতবুদ্ধিযুক্তান কুর্ব্বিত্যর্থঃ। 'রায়ো' ধনানি হস্তযোঃ স্থিতানি 'আভর'। আহর প্রযচ্ছ।

৭। সেই অকুটিলকার্য্যনিরত ইন্দ্র সোমপান দ্বারা চিত্তের প্রফুল্লতা উৎপন্ন হইলে আমাদিগকে গোযূথ প্রদান করিয়া থাকেন। এক্ষণে তিনি অপরিমিত অর্থ দুই হস্তে গ্রহণ ও আমাদিগকে প্রদান করুন এবং আমাদিগকে সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন করিয়া দিন।

৮৭১

৮। মাদয়স্ব সুতে সচা শবসে শূর রাধসে। বিদ্মা হি ত্বা পুরুবসুমুপ কামান্ সসৃজ্মহেঽথা নোঽবিতা ভব।

৮। হে 'শূর' শৌর্য্যবন্নিন্দ্র 'সুতে' সোমে অভিষুতে সত্যাগত্য 'সচা' অস্মাকং সখা সন্ 'মাদয়স্ব' তেন সোমেন তৃপ্তো ভব। কিমর্থং। 'শবসে' বলার্থং 'রাধসে' অস্মাকং ধনার্থ চ। 'ত্বা' ত্বাং 'পুরুবসুং' বহুধনং 'বিদ্ম হি' বয়ং জানীম খলু। অতোঽস্মদীয়ান 'কামান' মাত্রা গবা বৎসানিব ত্বয়া 'উপসসৃজ্মহে' 'হি'। ত্বয়া খলুকীর্ম্মঃ। 'অথ' অনন্তরং 'নঃ' অস্মাকং 'অবিতা' অভিলষিতফলপ্রদানেন রক্ষিতা 'ভব'।

৮। হে বীর! সোমরস সংস্কৃত হইলে তুমি আগমন পূর্ব্বক আমাদিগের সখা হইয়া তোমার বলাধান ও আমাদিগকে অর্থ দানের নিমিত্ত তদ্দ্বারা তৃপ্তি লাভ কর। আমরা তোমাকে প্রভূত ধন-শালী বলিয়া জ্ঞাত আছি। এই নিমিত্ত আমরা প্রার্থনা সমুদয় তোমাকে অবগত করিতেছি। তুমি আমাদিগের রক্ষক হও।

৮৭২

৯। এতে ত ইন্দ্র জন্তবো বিশ্বং পুষ্যন্তি বার্যং। অন্তর্হিখ্যো জনানামর্যো বেদো অদাশুষাং তেষাং নো বেদ আ ভর। ১। ৬। ২।

৯। হে 'ইন্দ্র' 'তে' তব স্বভূতাঃ 'এতে' 'জন্তবঃ' যজমানলক্ষণাজনাঃ 'বিশ্বং' সর্ব্বং 'বার্য্যং' সর্ব্বৈঃ সম্ভজনীয়ং হবিঃ 'পুষ্যন্তি'। বর্ধয়ন্তি। 'অদাশুষাং' হবির্দানদাতৃণাং জনানাং 'অন্তঃ' মধ্যে বিদ্যমানং 'বেদঃ' ধনং 'অর্য্যঃ' সর্ব্বেষাং স্বামী ত্বং 'খ্যোহি' পশ্যসি হি জানাসীত্যর্থঃ। 'তেষাং' অযজমানানাং 'বেদঃ' ধনং নোঽস্মভ্যং 'আভর' আহর। প্রযচ্ছেতি যাবৎ। অযজমানেষু বিদ্যমানং ধনং যাগানুপযুক্তত্বাদ্ব্যর্থমেব ভবেৎ অতস্তস্য ধনস্য স্বার্থকত্বায় তদীয়ং ধনং অপহৃত্য যজমানেভ্যঃ প্রযচ্ছেতি তাৎপর্য্যার্থঃ। ১। ৬। ২।

৯। হে ইন্দ্র! তোমার এই যজমানেরা সকলের স্পৃহনীয় হবি পরিবর্দ্ধিত করিতেছেন। হে প্রভো! যাহারা হবি প্রদান করে না, তাহাদিগের যে ধন বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা তুমি জ্ঞাত হইতেছ, অতএব তাহাদিগের ধন আমাদিগকে প্রদান কর। ১। ৬।২।

কলিকাতা মাসিক ব্রাহ্ম সমাজ।

৩ বৈশাখ রবি বার ১৭৮৮ শক।

প্রধান আচার্য্যের উপদেশ।

আমরা এই সংসারের মোহ-কোলাহলের মধ্যে সেই ব্রহ্মের শরণাপন্ন হইয়াছি। চতুর্দ্দিকে মোহ-কোলাহল, বিবাদ, বিসম্বাদ, অসূয়া, পরনিন্দা; তার মধ্যে আমরা বিগত-বিবাদ পবিত্র-স্বরূপ পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়াছি। দ্বেষ, গ্লানি, পাপ-তাপের মধ্যে—সংসারের কুটিলতার মধ্যে আমরা ধর্ম্মাবহ পাপনুদ পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়াছি। যখন দেখি ধর্ম্মের নামে চতুর্দ্দিকে অধর্ম্ম আচরিত হইতেছে, যখন দেখি হাস্যোল্লাসে দিবা-রাত্রি অতিবাহিত হইতেছে; তখনি আমরা পবিত্র-স্বরূপের শরণাপন্ন হইয়া পরিত্রাণ পাইয়াছি। আমরা এই প্রত্যাশায় তাঁর নিকটে আসিয়াছি, যে অন্তরের মোহ-কোলাহল হইতে আত্মা মুক্ত হইবে, বিদ্বেষ গ্লানি হইতে আত্মা মুক্ত হইবে, অপবিত্রতা হইতে আত্মা মুক্ত হইবে—এই ভরসায় আমরা সেই পবিত্র-স্বরূপের শরণাপন্ন হইয়াছি, আমাদের আর কিছুরই প্রার্থনা নাই। কেবল এই মাত্র প্রার্থনা, যাহাতে সেই পবিত্র-স্বরূপ পরমেশ্বরকে পবিত্র হইয়া উপাসনা করিতে পারি, যাহাতে একাগ্রমনে পবিত্র হৃদয়ে প্রীতি ভক্তি তাঁহাতে অর্পণ করিতে পারি, যাহাতে ব্রহ্মের শরণাপন্ন হইয়া ব্রাহ্ম হইতে পারি। এই আশ্বাসে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি, ব্রাহ্মধর্ম্মও আমারদিগকে আশার অতীত ফল প্রদান করিতেছেন। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গঙ্গা নদীর ন্যায় আমারদিগকে সকল সময়ে সংসার-তাপ হইতে শীতল করিতেছেন, আমারদিগের জ্ঞান তৃষ্ণা শান্তি করিতেছেন—ব্রাহ্মধর্ম্ম গঙ্গা-স্রোতের ন্যায় আনন্দ-প্রবাহ আমারদের আত্মাতে চিরকাল বিধান করিতেছেন। আমরা ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া অবধি তাঁরি আনন্দে আনন্দিত হইতেছি। তাঁর নিকটে গিয়া আত্মা পবিত্র হইতেছে, তাঁর উপাসনায় আত্মা বলী হইতেছে। আমরা ক্ষুধিত হইয়া তাঁর নিকট চাহিয়াছি, তিনি জ্ঞানের অন্ন সত্য দিয়া আমারদের ক্ষুধা শান্তি করিয়াছেন। যখনি পাপে মলিন হইয়া পবিত্রতার জন্য সন্তপ্ত হৃদয়ে তাঁর নিকট দণ্ডায়মান হইয়াছি, তিনি পাপ-মলিনতা হইতে মুক্ত করিয়াছেন; যখনি দুর্ব্বল হইয়া আত্মার বীর্য্যের নিমিত্তে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়াছি, তিনি দুর্ব্বল আত্মাতে বলাধান করিয়াছেন। তিনি আমারদের সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন—এমন সুহৃদ্ এমন বন্ধু আর কে কোথায় দেখিয়াছে? আমরা যাহার জন্য তাঁর নিকট আসিয়াছিলাম, তিনি তাহা সম্পূর্ণ-রূপে দিয়াছেন। তিনি গুরু হইয়া জ্ঞান দিয়াছেন, পিতা হইয়া অন্ন দিয়াছেন, মাতা হইয়া স্নেহ দিয়াছেন—কাহার সাধ্য, তাঁহা হইতে আমারদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে। আমরা তাঁর সঙ্গে আত্মার যোগে যে আনন্দ-রস পান করিতেছি, তাঁর দক্ষিণ মুখ দর্শন করিয়া যে ধর্ম্ম-বল লাভ করিতেছি; তাহা হইতে আমারদিগকে আর কে বঞ্চিত করিবে? আমরা যখন তাঁহাকে আমারদের হৃদয়ে দেখিতেছি, আত্মার অধিপতি-রূপে তাঁহাকে দেখিতেছি; তখন আমারদের কি ভয়, কি শোক, কি মোহ। তিনি চির কাল আমারদিগকে দুঃখ বিপদ হইতে উদ্ধার করিতেছেন, পাপ-তাপ হইতে মুক্ত করিতেছেন। যে আশা করিয়া আমরা তাঁর শরণাপন্ন হইয়াছিলাম, তিনি তাহা হইতে সহস্র গুণে অধিক ফল বিতরণ করিতেছেন। তিনি আপনি গুরু হইয়া প্রতি দিন জ্ঞান শিক্ষা দিতেছেন—তিনি আমারদের বুদ্ধিতে সত্য প্রেরণ করিতেছেন, তিনি আমারদের হৃদয়ে পবিত্রতা বিধান করিতেছেন, তিনি আমারদের আত্মাকে উন্নত করিয়া আপনার পবিত্র মঙ্গল-রাজ্যে গ্রহণ করিতেছেন। যখন প্রথম আসিয়া, তাঁর শরণাপন্ন হইয়াছিলাম, অন্ধকারের মধ্যে তাঁহাকে পাইবার জন্যে ব্যস্ত হইয়াছিলাম—তখন এত ফল পাইব, জানিতাম না। ক্রমে যত দেখিতেছি, দেখিতেছি তাঁহার করুণার শেষ নাই—তিনি মাতার ন্যায় নিয়ত করুণা বর্ষণ করিতেছেন। তাঁহার সম্মুখে বিপদের মধ্যে আমারদের আত্মা সহস্র-গুণ বল ধারণ করে, মৃত্যু আমারদিগকে ভয় দিতে পারে না, শোক সন্তাপে আমরা মুহ্যমান হই না। এখানে চতুর্দ্দিকে বাক্-বিতণ্ডা হউক, আমরা ঈশ্বরের দিকে চাহিয়া আছি। তাঁর প্রেম-দৃষ্টির উপর চাহিয়া থাকিলে সকল সত্য প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, তাঁহাকে হৃদয় দিলে হৃদয় পবিত্র হয়—কার সাধ্য, সে পবিত্রতা অপহরণ করিতে পারে। যদি শত্রু আসিয়া এ শরীর হইতে হৃদয়কে কাটিয়া ফেলিয়া দেয়, সে হৃদয় ঈশ্বরের ক্রোড়েই সুখে সুপ্ত থাকে; যদি শিরশ্ছেদন করে, প্রাণ প্রাণের প্রাণকে লইয়া তাঁহার মহিমা ব্যক্ত করে। যে অনন্ত প্রভা দ্যুলোক হইতে দ্যুলোককে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে, তাহার মূল

এই আত্মাতে প্রাণ-রূপে সন্নিবিষ্ট আছে—শিরশ্ছেদন করিলেও আত্মাতে সেই প্রাণ-স্বরূপ পরমেশ্বরের সত্তা থাকিবে; আমারদের হৃদয়কে শরীর হইতে দূরে নিঃক্ষেপ করিলেও সেই হৃদয়ে তাঁহার করুণা প্রকাশিত রহিবে। আমারদের প্রাণে তাঁহার করুণা এত বদ্ধমূল হইয়াছে যে শরীর-নাশেও এই প্রাণের উপর তাঁর করুণার হ্রাস হইবে না। আমরা তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া ভয় হইতে মুক্ত হইয়াছি। সেই পরমেশ্বর দিন দিন সত্য আমারদিগের নিকটে প্রেরণ করিতেছেন। প্রথমে আমরা তত কিছুই জানিতাম না। আমরা তাঁহারই প্রসাদে তাঁহাকে জানিলাম। তিনিই আমারদের মনে তাঁহার অনুরাগ প্রেরণ করিলেন এবং তিনিই স্বয়ং তাহার বিষয় হইয়া আমারদের জ্ঞানেতে প্রকাশ পাইলেন। গ্রন্থে যে সত্য পাই নাই, সে সত্য তখন তাঁহার উপদেশে লাভ করিলাম। তখন জ্ঞান তৃপ্ত হইল, হৃদয়-সরোবর পূর্ণ হইল, সকল স্থানে তাঁহার মহিমা দর্শন করিতে লাগিলাম। তখন বুঝিলাম, যিনি আমার ঈশ্বর; তিনি সকল দেশের ঈশ্বর, তিনি সকল কালের ঈশ্বর—তিনি সকলের গুরু, সকলের পিতা, সকলের মাতা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

কলিকাতা মাসিক ব্রাহ্ম সমাজ।

৭ জ্যৈষ্ঠ রবি বার ১৭৮৮ শক।

হে পরমাত্মন্! তুমি আমারদের আত্মার অভ্যন্তরে থাকিয়া আত্মাকে নিয়মিত করিতেছ, জগৎ সংসারের অভ্যন্তরে থাকিয়া জগৎকে নিয়মিত করিতেছ। তুমি অজ আত্মা, মহানাত্মা। তোমার আশ্রয়ে সকলে আপনাপন কর্ম্মে নিযুক্ত রহিয়াছে। তোমার কর্ম্মে যার অভিরুচি, তার কর্ম্ম পরিশুদ্ধ। তোমার হস্ত যে সর্ব্বত্র দেখিতেছে, তোমার কার্য্য যে সর্ব্বত্র পরীক্ষা করিয়াছে, সে তোমাকে ছাড়িয়া কোন কর্ম্ম করিতে চায় না; আপনার ক্ষুদ্র ভাব তার নিকট কুৎসিত ভাব ধারণ করে, তোমারই মহান্ ভাব তার নিকটে সৌন্দর্য্য প্রকাশ করে। আপনার পাপাসক্ত আত্মাকে দেখি, হৃদয় গ্লানিযুক্ত হয়; তোমার পবিত্রতা দেখিয়া হৃদয় পরিষ্কৃত হয়। আপনার দুঃখ শোকে আত্মা ম্রিয়মাণ হয়, তোমার আনন্দভাব দেখিয়া আত্মা আনন্দিত হয়। হে পরমাত্মন্! তুমি আমারদের সর্ব্বস্ব। আমরা তোমার হস্ত, তোমার কার্য্য দেখিয়া তোমাকে অনুসরণ করি; তোমার মঙ্গলভাবের অনুকরণ যতটুকু করিতে পারি, তাহাতেই আমারদের আনন্দ। তোমার সঙ্গে আত্মার নিত্য যোগ—তুমি সর্ব্বদাই হৃদয়ে মধুময় উপদেশ প্রদান করিতেছ। যাহাতে আমারদের সকলি মঙ্গলে পরিণত হয়, তুমি এই প্রকার উপদেশ নিয়ত প্রদান করিতেছ। আমরা এখানে মর্ত্ত্য জীব হইয়া—রোগে আতুর শোকে কাতর হইয়াও যে তোমার উপদেশ-বাক্য শুনিয়া দিন দিন উন্নত হইতেছি, ইহা হইতে আমারদের সৌভাগ্য আর কি আছে। যখন তোমার কথা শুনিতে পাইতেছি, তখন কেন পরের কথা শুনিতে যাইব। তুমি যখন নিজে সেই সত্য বাক্য, বিশুদ্ধ মঙ্গল বাক্য, আমারদের বুদ্ধিতে প্রেরণ করিতেছ; তখন কেন তাহা স্তব্ধ হইয়া না শুনিব? কর্ণকে সেই দিকে কেন না নিযুক্ত রাখিব? যখন যত্ন করিলেই জানিতে পারি, তখন তোমারি মুখ হইতে সত্য ভাব কেন না জানিতে চেষ্টা করিব? তুমি নিয়তই উপদেশ প্রদান করিতেছ, নিয়তই ধর্ম্ম-বল প্রেরণ করিতেছ, তাহাতেই আমরা দণ্ডায়মান আছি; নতুবা যষ্টির ন্যায় ভূমিতে পতিত হইতাম। তুমি যে উপদেশ প্রদান কর, তাহাই আমারদের শিক্ষণীয়; তুমি যে কর্ম্মে আমারদিগকে নিযুক্ত কর, তাহাই আমারদের পালনীয়। পরিত্যাগ করিও না, হে পরমেশ্বর! এই বিষম সংসারে আমারদিগকে পরিত্যাগ করিও না। তোমার আশ্রয় লইতেছি, তোমার শরণাপন্ন হইতেছি, আমারদিগকে তোমার মাতৃ-ক্রোড়ে গ্রহণ কর—মহা বিঘ্ন বিপত্তি কোলাহল তোমা হইতে আমারদিগকে বিযুক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছে। হে করুণাময়! রক্ষা কর, যেন তোমা হইতে আমারদিগকে কেহই বিচ্যুত করিতে না পারে, যেন তোমাকে সাক্ষাৎ পিতা মাতা জানিয়া তোমারই কর্ম্ম করিতে থাকি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

তত্ত্ববিদ্যা।

তৃতীয় অধ্যায়।

বুদ্ধি-ঘটিত মূলতত্ত্ব।

বুদ্ধি দ্বারা জ্ঞান-বিশেষ উপার্জ্জন করিতে গেলে—জ্ঞাতা বিষয়ী আছে এবং জ্ঞাতব্য বিষয় আছে—এই দুইটি প্রত্যয় অলঙ্ঘনীয় রূপে আবশ্যক। ইন্দ্রিয়-ব্যাপার সংঘটন-পক্ষে দেশ কালে প্রত্যয় করা যেমন আবশ্যক, বুদ্ধি-ক্রিয়া সংসাধন-পক্ষে বিষয় বিষয়ীতে প্রত্যয় করা সেই রূপ আবশ্যক। যে জানিতেছে, সেই মুখ্য রূপে বিষয়ী ও যাহাকে জানা হইতেছে, তাহাই মুখ্য রূপে বিষয়। যাহাকে আমরা চক্ষু দ্বারা দেখিতেছি তাহা বিষয়ী নহে, কিন্তু যে চক্ষু দ্বারা দেখিতেছে সেই বিষয়ী; যাহাকে আমরা দেহান্তর্গত অবস্থা বিশেষ

বলিয়া অন্তঃকরণে অনুভব করিতেছি তাহা বিষয়ী নহে, কিন্তু যে উক্ত প্রকার অনুভব করিতেছে সেই বিষয়ী; সুখের অবস্থা বিষয়ী নহে, কিন্তু আপন সুখের অবস্থাকে যে জানিতেছে সেই বিষয়ী; ভয়ের অবস্থা বিষয়ী নহে, কিন্তু ভয়ের অবস্থাকে যে জানিতেছে সেই বিষয়ী—এই রূপ দেখা যাইতেছে যে ভৌতিক বস্তু দূরে থাকুক, অন্তঃকরণের কোন অবস্থা বিশেষও বিষয়ী পদবীর যোগ্য নহে। তাহাই বিষয়ী, যাহা আন্তরিক তাবৎ অবস্থারই মূলে জ্ঞাতা রূপে অবস্থান করে। বিষয়ী আছে অর্থাৎ আমাদের স্ব স্ব আত্মা আছে, ইহা একটি যৎপরোনাস্তি অবিতথ সত্য। "আমি আছি" ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। যে ব্যক্তি বলে যে "আমি নাই" সে যদি বাস্তবিকই না থাকে, তবে "আমি নাই" একথা কে বলিতেছে? যদি "আমি" না থাকে তবে "আমারও" কাযে কাযে থাকিতে পারে না। আমি নাই অথচ যে কথা উক্ত হইল তাহা আমার কথা, আমি নাই অথচ এটি আমার—এ দুইটি বিরোধী কথা একত্রে কিরূপে রক্ষা পাইতে পারে? অতএব আমি আছি, ইহা একেবারেই সংশয় রহিত। বহির্ব্বস্তু আছে, ইহাও ঐ প্রকার সংশয়রহিত; কেন না ইহা একেবারে অবশ্যম্ভাবী যে, বিষয়ী বিষয়ের মধ্যে বিভিন্নতা নির্দ্দেশ ব্যতিরেকে বুদ্ধি-ক্রিয়া এক মুহূর্ত্তও চলিতে পারে না। এরূপ নহে যে এ তত্ত্বটি কোন কোন স্থলে সংলগ্ন হয়, এবং কোথায়ও কোথায়ও নাও সংলগ্ন হইতে পারে; উহা পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নহে; সুতরাং উহা যে একটি প্রজ্ঞা-নিহিত মূল তত্ত্ব, ইহাতে আর সংশয় হইতে পারে না। এই মূলতত্ত্ব অনুসারে ইহা

একান্ত আবশ্যক যে এককে জানিতে হইলে অনেককেও সঙ্গে সঙ্গে জানা চাই, বিষয়ীকে জানিতে হইলে বিষয়কেও সঙ্গে সঙ্গে জানা চাই, ইত্যাদি; কেন না এক অনেক হইতে বিভিন্ন ও অনেক এক হইতে বিভিন্ন, এই রূপ বিভিন্নতা থাকাতেই এক এবং অনেক উভয়েরই অর্থ হইতে পারিতেছে। এতদ্ব্যতীত এক হইতে অভিন্ন অনেক, অথবা অনেক হইতে অভিন্ন এক; বিষয়ী হইতে অভিন্ন বিষয় অথবা বিষয় হইতে অভিন্ন বিষয়ী; ইহা কোন প্রকারেই বোধ সাধ্য নহে। যখন আমরা জানিতেছি যে আত্মা আছে, তখন সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানিতেছি যে এমন ও সকল বস্তু আছে যাহা আত্মা হইতে বিভিন্ন; এইটি আত্মা এবং এইটি আত্মা নহে—এই রূপেই আত্মার নির্দ্দেশ; সুতরাং আত্মা আছে কিন্তু বহির্ব্বস্তু নাই, ইহা অসম্ভব।

এখানে এই একটি আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে কথিত বিভিন্নতার নিয়ম যদি সর্ব্বথা অলঙ্ঘনীয় হয়, তবে ইহা কি রূপে সম্ভব হইল যে পূর্ব্বে কেবল এক পরব্রহ্ম মাত্র ছিলেন, তদ্ভিন্ন আর কিছুই ছিল না? ইহার প্রত্যুত্তর এই যে ইহা অবশ্য সত্য বলিতে হইবে যে বর্ত্তমান সময়ে ঈশ্বর আপনাকে সৃষ্ট জগৎ হইতে বিভিন্ন রূপে জানিতেছেন; ইহাও সেই রূপ সত্য যে সৃষ্টির পূর্ব্বেও ঈশ্বর আপনার সংকল্প-গত ভাবি সৃষ্ট জগৎ হইতে আপনাকে বিভিন্ন রূপে জানিতেন। ঈশ্বর কোন কালেই অসাড় ভাবে ছিলেন না, কেন না জ্ঞান, ইচ্ছা, উদ্যম, সংকল্প, এ সকলকে ঈশ্বর হইতে বিযুক্ত করিয়া লইলে কি আর অবশিষ্ট থাকে? ঈশ্বরের নিকট ভূত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ সকল কালই সমান; অর্থাৎ তাঁহার যে মঙ্গল সংকল্প তাহা পূর্ব্বে যেমন ছিল এখনও তেমনি আছে এবং পরেও তেমনি থাকিবে; অতএব ঈশ্বর আপন মঙ্গল-সংকল্প-সমুদ্ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান অথবা ভূত জগৎ হইতে চিরকালই আপনাকে বিভিন্ন করিয়া জানিতেছেন, তাহাতে আর কিছু মাত্র সংশয় নাই।

বিষয়ীর অবয়ব তিনটি—জ্ঞান, ভাব এবং ইচ্ছা; বিষয়-বিশেষকে জানিবার সময় এই তিন অবয়বই কার্য্যে লাগে। জ্ঞাতব্য বিষয়ের ইয়ত্তা থাকা (অর্থাৎ একত্ব অনেকত্ব থাকা) জ্ঞানের পক্ষে মুখ্য রূপে আবশ্যক; জ্ঞাতব্য বিষয়ের লক্ষণ (যথা সুলক্ষণ বা কুলক্ষণ) থাকা ভাবের পক্ষে মুখ্য রূপে আবশ্যক; জ্ঞাতব্য বিষয়ের শক্তি (যথা ভাল করিবার ক্ষমতা অথবা মন্দ করিবার ক্ষমতা) থাকা ইচ্ছার পক্ষে মুখ্য রূপে আবশ্যক। কাষ্ঠ লোষ্ট সদৃশ যে বস্তুর লক্ষণ এবং শক্তি আমাদের নিকটে নিতান্তই উপেক্ষণীয়, তাহা এক বা অনেক ইহা জানাতে কেবল জানা মাত্রই হয়, কেবল জ্ঞানই চরিতার্থ হয়, পরন্তু ভাব বা ইচ্ছার পক্ষে কিছুই ফল দর্শে না। আমরা যখন বস্তু-বিশেষের লক্ষণ অবগত হই, তখনই ভাব বিশেষের উদ্দীপন হয়—সুলক্ষণ দেখিলেই আমাদের মনে আনন্দ উপস্থিত হয়, কুলক্ষণ দেখিলেই ঘৃণা উপস্থিত হয়। একত্ব অনেকত্ব অনুসারে আমরা বস্তু-বিশেষকে সংক্ষেপে অথবা বাহুল্য-রূপে জ্ঞানে ধারণ করি, সুলক্ষণ কুলক্ষণ অনুসারে তাহাকে হেয় বা উপাদেয় রূপে ভাবে অনুভব করি; উদাহরণ—অশ্বগবাদি নানা জন্তুকে আমরা পশু বলিয়া সংক্ষেপে জানি, অথবা অশ্বগবাদির প্রত্যেককে সবিশেষে জানিয়া পশু-বিষয়ে বাহুল্য রূপে জ্ঞান লাভ করি; সুগন্ধ লক্ষণকে আমরা উপাদেয় রূপে অনুভব করি, দুর্গন্ধ লক্ষণকে আমরা হেয় রূপে অনুভব করি। আমরা যখন বস্তু-বিশেষের শক্তি-বিশেষ অবগত হই, তখনই ইচ্ছা আপন লক্ষ সাধনে তৎপর হয়। সুরাপায়ীর পক্ষে সুরা অতীব উপাদেয় হইলেও উক্ত ব্যক্তি যখন জানিতে পারে যে সুরাতে আয়ুঃ শোষিণী শক্তি অবস্থান করে, তখন ইচ্ছা অমনি সুরাপানের প্রতিবাদী হইয়া দণ্ডায়মান হয়; যখন রোগী ব্যক্তি জানিতে পারে যে তিক্ত ঔষধ-বিশেষে আরোগ্যদায়িনী শক্তি অবস্থান করে, তখন উক্ত সামগ্রী রসনাতে অতীব হেয় হইলেও ইচ্ছা তাহা সেবন করিতে অগ্রসর হয়। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে জ্ঞানের পক্ষে ইয়ত্তা যেমন আবশ্যক, ভাবের পক্ষে লক্ষণ তেমনি আবশ্যক, ইচ্ছার পক্ষে শক্তি তথৈব আবশ্যক। ইহার এই একটি স্পষ্ট উদাহরণ—আমরা জ্ঞান মাত্র দ্বারা আত্মাকে উহার লক্ষণ এবং শক্তি হইতে পৃথক্ করিয়া উহাকে কেবল "এক" বলিয়া অবধারণ করিতে পারি এবং এই রূপ উহাকে এক বলিয়া না জানিলে উহাকে জানাই হয় না; কিন্তু এ রূপ জানাতে আমাদের ভাবে আনন্দও উদয় হয় না, ইচ্ছাতে স্বাধীনতাও প্রকাশ পায় না; পরন্তু এ-রূপ জানা কেবল জানা মাত্র সার। কিন্তু যখন আমরা আত্মাকে সত্য-পরায়ণ, ঋতজ্ঞ, সাধু, পবিত্র, ইত্যাদি সর্ব্ব-সুলক্ষণযুক্ত বলিয়া অনুভব করি, তখন আমারদের ভাবে আনন্দ আবির্ভূত হয়; এবং যখন ইন্দ্রিয়াদির উপরে আত্মার শক্তির প্রাদুর্ভাব উপলব্ধি করি, তখন আমারদের ইচ্ছাতে স্বাধীনতা আবির্ভূত হয়। এই রূপ ইয়ত্তা, লক্ষণ এবং শক্তি; এই তিনের সম্বন্ধে জ্ঞান, ভাব এবং ইচ্ছার পৃথক্ পৃথক্ প্রাধান্য স্পষ্টই দেখা যাইতেছে।

ইয়ত্তা-বিষয়ে বিষয়ীর সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ এই যে, একই বিষয়ী নানা বিষয় জ্ঞাত হয়—এক বিষয়ের সহিত অন্য বিষয়ের বিভিন্নতা নির্দ্দেশ করিতে না পারিলে উভয়ের কোনটিকেই জানা হইতে পারে না। একটা বৃক্ষকে জানিতে হইলে মৃত্তিকা, পাষাণ, জীব জন্তু প্রভৃতি এমন একটা কোন সামগ্রীকে জানা আবশ্যক, যাহা বৃক্ষ হইতে বিভিন্ন; সুতরাং জ্ঞানের সম্বন্ধে বিষয় অনেক না হইলে কোন রূপেই নিস্তার নাই। অতএব আমাদের জ্ঞানের সম্বন্ধে বিষয়ী এক ও বিষয় অনেক—সুতরাং বিষয়ের সম্বন্ধে বিষয়ী এক এবং বিষয়ীর সম্বন্ধে বিষয় অনেক। দ্বিতীয়তঃ বিষয় এবং বিষয়ী উভয়ের সম্বন্ধ-মূলক যে জ্ঞান, তাহাতে একত্ব অনেকত্ব উভয়ই বিদ্যমান; বিষয়ের গুণে জ্ঞানকে যেমন অনেক বলিয়া গণ্য করিতে হয়, বিষয়ীর গুণে সেই রূপ উহাকে এক বলিয়া নিশ্চয় করিতে হয়। এক দিকে অশ্ব জ্ঞান, হস্তি জ্ঞান, প্রভৃতি নানা জ্ঞান, অপর দিকে একই আত্মজ্ঞান। এই রূপ সকল জ্ঞানেরই এই এক অবশ্যম্ভাবী লক্ষণ যে উহারা অনেকে এক সূত্রে গ্রথিত; সুতরাং বিষয় এবং বিষয়ীর সম্বন্ধ-মূলক যে জ্ঞান, তাহা এক এবং অনেক উভয়েরই সন্ধিস্থল, তাহা সমষ্টি শব্দের বাচ্য। অতএব ইয়ত্তা বিষয়ে বুদ্ধি-ঘটিত মূলতত্ত্ব এই তিনটি—বিষয়ের সম্বন্ধে বিষয়ী এক, বিষয়ীর সম্বন্ধে বিষয় অনেক, এবং উভয়ের সম্বন্ধ মূলক যে জ্ঞান, তাহা সমষ্টি-বদ্ধ।

দ্বিতীয়তঃ—লক্ষণ-বিষয়ে বিষয়ের সহিত বিষয়ীর এই রূপ সম্বন্ধ যে বিষয়ীতেই জ্ঞান-

লক্ষণের সত্তা এবং বিষয়েতে উক্ত লক্ষণের অভাব অবস্থান করে; অতএব জ্ঞান-সম্বন্ধে বিষয় অভাবাত্মক, বিষয়ী ভাবাত্মক; সুতরাং বিষয়ীর সম্বন্ধে বিষয় অভাবাত্মক, বিষয়ের সম্বন্ধে বিষয়ী ভাবাত্মক। দ্বিতীয়তঃ বিষয় এবং বিষয়ীর সম্বন্ধ-মূলক যে জ্ঞান তাহা এক দিকে আত্মাকে জানে এক দিকে বিষয়কে জানে। আলোককে জানা সম্বন্ধে আপেক্ষিক অন্ধকারকে জানা যেমন অভাবাত্মক, বিষয়ীকে জানা সম্বন্ধে বিষয়কে জানাও সেই রূপ অভাবাত্মক; সুতরাং জ্ঞান, এক দিকে যেমন ভাবাত্মক, অপর দিকে উহা তেমনি অভাবাত্মক; এক অনেক এ দুয়ের সন্ধিস্থলে যেমন সমষ্টি, ভাবাত্মক এবং অভাবাত্মক এ দুয়ের সন্ধিস্থলে সেই রূপ সীমাত্মক। উদাহরণ যথা—সূর্য্যের তুলনায় প্রদীপে আলোকের অভাব আছে, এবং খদ্যোতের তুলনায় উহাতে আলোকের সত্তা আছে; এ অবস্থায় ইহা যেমন বলা যাইতে পারে না যে প্রদীপে আলোকের অভাব আছে, ইহাও সেই রূপ বলা যাইতে পারে না যে প্রদীপে আলোকের অভাব নাই; প্রত্যুত ইহাই বলা যাইতে পারে যে উহাতে আলোকের সীমা আছে। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে সীমাত্মকতাই ভাব এবং অভাব দুয়ের সন্ধিস্থল। অতএব লক্ষণ-বিষয়ে বুদ্ধি-ঘটিত মূলতত্ত্ব এই তিনটি—যথা বিষয়ী বিষয়ের সম্বন্ধে ভাবাত্মক, বিষয় বিষয়ীর সম্বন্ধে অভাবাত্মক, এবং উভয়ের সম্বন্ধ মূলক যে জ্ঞান, তাহা সীমাত্মক।

তৃতীয়তঃ—শক্তি-বিষয়ে বিষয়ীর সহিত বিষয়ের এই রূপ সম্বন্ধ যে বিষয়ী আপনা কর্ত্তৃক জ্ঞাত হয়, এবং বিষয় অন্য কর্ত্তৃক (অর্থাৎ বিষয়ী কর্ত্তৃক) জ্ঞাত হয়। "জানা" একটি ক্রিয়া, এবং জ্ঞাত হওয়া সেই ক্রিয়ার কার্য্য অথবা ফল, ও যে শক্তি দ্বারা জ্ঞান-ক্রিয়া প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাই জ্ঞান-শক্তি। বিষয়ী আপনারই জ্ঞান-শক্তি দ্বারা জ্ঞাত হয়, বিষয় অন্যের জ্ঞান-শক্তি দ্বারা জ্ঞাত হয়; সুতরাং জ্ঞাত হওয়া সম্বন্ধে বিষয়ী আপনার উপর নির্ভর করে, বিষয় অন্যের উপর নির্ভর করে। অতএব বিষয়ের সম্বন্ধে বিষয়ী স্বাধীন অর্থাৎ আপনার অধীন এবং বিষয়ীর সম্বন্ধে বিষয় পরাধীন। পুনশ্চ আমরা যে কোন বস্তুকে জানি, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে জানিতেই হয়। যখন একখান পুস্তককে জানিতেছি, তখন ইহাও সঙ্গে সঙ্গে জানিতেছি যে আমিই উক্ত পুস্তককে জানিতেছি। আমারদের জ্ঞান কখনও অশ্বকে জানিতেছে, কখন নাও জানিতেছে; কখনো হস্তিকে জানিতেছে, কখনো নাও জানিতেছে; কিন্তু উহা আপনাকে সর্ব্বদাই জানিতেছে; কেননা জ্ঞান যাহা কিছু জানে, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই উহা আপনাকে জানে। এরূপ হইতে পারে যে এক ব্যক্তির অশ্ব জ্ঞান নাই, অথচ তাহার আত্ম-জ্ঞান আছে; কিন্তু ইহা কদাপি হইতে পারে না যে এক ব্যক্তির আত্ম-জ্ঞান নাই অথচ তাহার অশ্ব জ্ঞান আছে। অতএব আত্ম-জ্ঞান আপনারই গুণে স্থিতি করিতেছে; সুতরাং ইহা স্বাধীন এবং এই আত্ম জ্ঞানেরই গুণে অন্যান্য বিশেষ বিশেষ জ্ঞান স্থিতি করিতেছে; সুতরাং ইহারা পরাধীন। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে বিষয় এবং বিষয়ী উভয়ের সম্বন্ধ-মূলক যে জ্ঞান, তাহাতে স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা উভয়ই যোগ-বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। স্বাধীন এবং পরাধীন দুয়ের সংযোগকে পরস্পরাধীন বলা যাইতে পারে। যথা—কোন সমাজ-ভুক্ত কতিপয় ব্যক্তিকে পরস্পরাধীন বলিলে ইহাই বলা হয় যে উহারা প্রত্যেকে উক্ত সমাজের অধীন; সুতরাং সমাজান্তর্গত অন্যান্য ব্যক্তির অধীন এবং সমাজান্তর্গত আপনার অধীন; সুতরাং প্রত্যেকেই এক দিকে যেমন স্বাধীন, অন্যদিকে তেমনি পরাধীন। অতএব শক্তি-বিষয়ে বুদ্ধি-ঘটিত মূলতত্ত্ব এই তিনটি—যথা, বিষয়ের সম্বন্ধে বিষয়ী স্বাধীন, বিষয়ীর সম্বন্ধে বিষয় পরাধীন, এবং উভয়ের সম্বন্ধ-মূলক যে জ্ঞান, তাহা পরস্পরাধীন। যাহা বলা হইল, তাহা নিম্নের লতা দৃষ্টে সুন্দর-রূপে অবধারিত হইবে।

বিষয়ী	বিষয়	সম্বন্ধ
এক	অনেক	সমষ্টি
ভাবাত্মক	অভাবাত্মক	সীমাত্মক
স্বাধীন	পরাধীন	পরস্পরাধীন

এতক্ষণে ইহা সুস্পষ্ট হইল সন্দেহ নাই যে, একত্ব অনেকত্ব, ভাব অভাব, কার্য্য কারণ, এ সকল ভাব আমরা পরীক্ষা দ্বারা অর্জ্জন করি নাই, পরন্তু অমায়িক প্রজ্ঞার প্রসাদেই আমরা উহারদিগকে উপভোগ করিতে পাইতেছি। উহারা আমারদের স্বোপার্জ্জিত বিত্ত নহে, উহারা আমারদের পৈতৃক ধন; পরমপিতার করুণা-স্রোতেই উহারা প্রেরিত হইতেছে "ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ;"। যিনি আমারদের সাক্ষাৎ পিতা, যিনি আমাদের পুরাতন পিতামহ, তিনি স্বয়ং গোপনে গোপনে উক্ত ধন-সকল আমারদের হস্তে নিহিত করিতেছেন; আমরা প্রার্থনা করি নাই, অথচ আমাদের কিসে মঙ্গল হয় এই জন্য তিনি ব্যস্ত রহিয়াছেন।

একত্ব অনেকত্ব প্রভৃতি ভাব-সকল যদি স্বতঃ-সিদ্ধ-রূপে আমারদের আত্মাতে না থাকিত, তাহা হইলে আমরা সহস্র পরীক্ষা করিয়াও জানিতে পারিতাম না যে আমি এক এবং বহির্ব্বিষয় অনেক—আমাতে যাহার অভাব নাই, বহির্ব্বিষয়ে তাহার অভাব আছে—আমি স্বাধীন কারণ, বহির্ব্বিষয় পরাধীন কার্য্য; এবং এই কয়টি মূলতত্ত্ব অগ্রে স্বতঃ-সিদ্ধ-রূপে না জানিলে আমরা কোন কিছুই পরীক্ষা করিতে পারিতাম না। অতএব উক্ত তত্ত্ব-সকল পরীক্ষা দ্বারা অর্জ্জিত হওয়া দূরে থাকুক, উহারা থাকাতেই পরীক্ষা মুহূর্ত্ত কাল বর্ত্তিয়া থাকিতে পারিতেছে; সুতরাং উহারা সকল পরীক্ষারই মূলীভূত নিবন্ধন-স্বরূপ।

সংস্কৃত সাহিত্য।

২৭৪ সংখ্যক পত্রিকার ৩৮ পৃষ্ঠার পর।

যে সমস্ত আর্য্য জাতি ভূখারা প্রভৃতি স্থান হইতে উত্তরপশ্চিম প্রদেশে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই আসিয়া ও ইউরোপের উত্তরপশ্চিম বিভাগের প্রধান জাতি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। ইহাঁরা ইতিবৃত্তরূপ রঙ্গস্থলের প্রধান অভিনেতা। যদ্দ্বারা আমাদিগের প্রকৃতি অলঙ্কৃত হইয়াছে, ইহাঁরাই সেই কার্য্যক্ষম জীবনের উপাদান পূর্ণভাবে বহন করিয়াছিলেন। এই জাতীয়েরা জনসমাজ প্রস্তুত করিয়া নীতি প্রবর্ত্তিত করিয়া যান। ইহাঁরাই সাহিত্য, শিল্পকার্য্য, শিল্পকৌশল, বিজ্ঞান ও পদার্থ বিদ্যার বীজ নিক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন; আমরা এক্ষণে তাহা হইতেই অনেকাংশে শিক্ষা লাভ করিতেছি। এই উত্তর-পশ্চিম-বাহিনী জাতির মধ্যে পরস্পর নানা সূত্রে মতান্তর উপস্থিত হইয়াছিল এবং ইহাঁরাই সেম বংশীয় ও তুরান জাতিদিগের সহিত নিরবচ্ছিন্ন বিবাদ কলহে প্রবৃত্ত হন। ইতিবৃত্ত পাঠে ইহা সুস্পষ্ট জ্ঞাত হওয়া যায় যে, সভ্যতা, বাণিজ্য ও ধর্ম্ম-সূত্রে পৃথিবীস্থ সমস্ত জাতিকে আবদ্ধ করাই ইহাঁদিগের একমাত্র কার্য্য ছিল। এই সমস্ত শ্রেয়স্কর কার্য্যে

ইহাঁদিগের জীবনের সমুদায় যত্ন ও পরিশ্রম অপ্রতিহতভাবে ব্যয়িত হইত। ফলত ইহাঁদিগের এই রূপ দেশহিতকর কার্য্য দৃষ্ট হইয়া থাকে বলিয়াই ইহাঁরা ইতিবৃত্তে বর্ণিত হইবার সম্যক্ উপযোগিতা লাভ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

যখন আর্য্য বংশীয়দিগের মধ্যে কতকগুলি ভুখারা হইতে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে এই রূপ প্রশংসনীয় কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন, তৎকালে তাঁহাদিগের আর একটি দল এই ভারতবর্ষের উত্তর সীমায় আগমন করেন। ইহাঁরা প্রথমত হিমালয়ের সংকীর্ণ পথ অতিক্রম করিয়া অনায়াসে তত্রত্য আদিম জাতিদিগকে পরাজিত ও স্থানান্তরিত করিয়া দেন এবং পঞ্জাবের চন্দ্রভাগা বিতস্তা প্রভৃতি সাত নদীর অতি সুন্দর উর্ব্বর অন্তরাল ভুমিতে গৃহ প্রস্তুত করিয়া বাস করেন। সেই অবধি বহুকাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে আর নূতন উপনিবেশ সংস্থাপিত হয় নাই। যাঁহারা আসিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপে ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, যাঁহাদিগের শোণিতাক্ষরে লিখিত নাম সকল অদ্যাপি ইতিবৃত্তে পাঠ করা যায়, সেই সমস্ত সেসষ্ট্রিস সেমিরেমিশ ও নেবুকড্‌নেজার প্রভৃতি পূর্ব্বতন দিগ্বিজয়ীদিগের মধ্যে কেহই ইহাঁদিগের শান্তিভঙ্গে প্রবৃত্ত হন নাই। এই সমস্ত আর্য্য জাতি সর্ব্বাগ্রে আপনাদিগের অধিকৃত নূতন পৃথিবীতে বাস করিয়া কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। তৎকালে তাঁহারা কেবল গাঢ়তর চিন্তায় নিরন্তর আক্রান্ত ও অভিভূত হইয়াছিলেন। ঐ সময় ভারতবর্ষে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। প্রাচীন বংশ সমুদায় উচ্ছিন্ন ও নূতন রাজ্য সকল প্রতিষ্ঠিত হয়। তথাচ ইহাঁদিগের মনের ভাব কিছুতেই পরিবর্ত্তিত হয় নাই। পদ্মপলাশে জলসেক হইলে সে যেমন পূর্ব্ববৎই থাকে সেই রূপ ইহাঁদের চিত্ত কোনরূপেই বিচলিত হয় নাই। উহা পূর্ব্ববৎ সহিষ্ণু, চিন্তানিরত, শান্ত ও বিশ্বস্তই ছিল।

এই উর্ব্বর সর্ব্বজনমনোহর ভারতবর্ষে শান্ত প্রকৃতি অধিবাসীদিগের বিবাদের তিনটি কারণ উপস্থিত হইয়াছিল। প্রথমতঃ সমাজস্থ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পরস্পরের প্রাধান্য লাভের চেষ্টা; দ্বিতীয়তঃ ভারতবর্ষের দক্ষিণ ও অন্যান্য প্রদেশে অসভ্য জাতিদিগকে বশীভূত করিবার উদ্যোগ; তৃতীয়তঃ যাঁহারা সর্ব্বশেষে আসিয়া ভারতবর্ষের উত্তরে অধিবাস করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের দক্ষিণ দিগ্বিভাগস্থ ভুপতিগণের প্রতি আক্রমণের উপক্রম।

অতি পূর্ব্ব কালে ভারতবর্ষে তিনটি সমরানল প্রজ্বলিত হয়। এই রূপ যুদ্ধ উপস্থিত হইলে অনেকেরই উদ্যম উৎসাহ প্রভৃতি বৃত্তি সমুদায় উত্তেজিত হইয়া থাকে, কিন্তু ভারতবর্ষীয়দিগের তাহা হয় নাই। গ্রিশ দেশেও এই কারণে যে যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তদ্দ্বারা গ্রিশিয়েরা যার পর নাই উন্নতি ও দক্ষতা লাভ করিয়াছিল, কিন্তু ভারতবর্ষে সেই প্রকার যুদ্ধ হিন্দুদিগের মনে কেমন বিভিন্ন ফল উৎপন্ন করে! গ্রিশ দেশে বিভিন্ন শ্রেণি মধ্যে প্রাধান্যলাভচেষ্টা সংগ্রামানল উদ্দীপ্ত করিয়া নিকৃষ্ট শাসনপ্রণালীর উচ্ছেদ সাধন পূর্ব্বক পূর্ণাবয়ব প্রজাতন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছিল, কিন্তু ভারতবর্ষে মহাবীর পরশুরামের বলবিক্রমে ক্ষত্রিয় কুল উন্মূলিত হইয়া একমাত্র ব্রাহ্মণ দিগেরই জয়শ্রী হস্তগত হয়*।

* বিষ্ণু পুরাণে কথিত আছে মহাবীর পরশুরাম এক বিংশতি বার এই পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়া ক্ষত্রিয়-শোণিতে সমন্তপঞ্চক নামে পাঁচটি অতিবিস্তীর্ণ হ্রদ প্রস্তুত করত তাহাতে আপনার পূর্ব্ব পুরুষ ভৃগুবংশীয়দিগের

ভারতবর্ষে অসভ্য দাক্ষিণাত্যদিগের বিপক্ষে দ্বিতীয় প্রকার যে যুদ্ধ উপস্থিত হয়, মহর্ষি বাল্মীকি তাহা দুরাত্মা অসুর ও রাক্ষসদিগের সহিত এক দৈবশক্তিসম্পন্ন বীরের যুদ্ধ রূপে বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষে যেমন এই যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল, গ্রিশ দেশেও পারসীকদিগের সহিত এই রূপ এক যুদ্ধ হয়। ঐ যুদ্ধে এক মাত্র স্বদেশানুরাগ-প্রদীপ্ত সাহসের নিকট মহাবলপরাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের পরাজয় প্রদর্শিত হইয়াছে। ইতিবৃত্তলেখক মহাত্মা হিরোডোটসের প্রণীত গ্রন্থ গ্রিশিয়দিগের রামায়ণ।

গ্রিশ ও ভারতবর্ষে তৃতীয় প্রকার যুদ্ধের ফলগত বৈষম্য অল্প বিস্ময়কর নহে। গ্রিশ দেশে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের মধ্যে জাতিগত একটি ঈর্ষার ভাব সঞ্চারিত হইয়াছিল। আমরা দেখিতে পাই, যৎকালে একটি জাতি আর একটি জাতির ক্ষমতার উন্মূলন চেষ্টা করিতেছে,—যখন সকলেই দেশের সর্ব্বনাশের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছে, তখন তত্রত্য ভিন্ন ভিন্ন জাতিদিগের কেমন সাহস, কেমন বক্তৃতা শক্তি, কেমন রাজনীতিজ্ঞতার পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছিল। এদিকে ভারতবর্ষে কুরু-পাণ্ডবদিগের এক যুদ্ধ হইয়াছিল, বোধ হয় পিলপনিসিয় যুদ্ধ অপেক্ষা তাহাতে অল্প শোণিত ব্যয়িত হয় নাই; কিন্তু এমন ভীষণ বীরচরিত সমুদায় ব্রাহ্মণদিগের হস্তে কেমন উপদেশপূর্ণ আখ্যায়িকা রূপে পরিণত হইয়াছে।

গ্রিশ ও ভারতবর্ষে আর্য্যজাতির ঐতিহাসিক উৎকর্ষ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। গ্রিশিয়েরা জীবদ্দশাকেই সত্য বলিয়া বিবেচনা করেন, কিন্তু হিন্দু জাতীয়েরা ইহাকে স্বপ্ন ও মোহ বলিয়া পরিগণিত করিয়া থাকেন। গ্রিশীয়দিগের যেখানে জন্ম সেই স্থানেই অবস্থান; স্বদেশ অধিকার করিয়াই তাঁহাদের সমুদায় পৌরুষ প্রদর্শিত হইত; তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়াই উন্নতি ও অবনতির অংশ গ্রহণ করিতেন এবং স্বদেশের স্বাধীনতা ও গৌরব রক্ষা করিবার নিমিত্ত আপনাদিগের জীবন বিসর্জন করিতেও প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু হিন্দু জাতীয়েরা উদাসীনের ন্যায় একটি প্রদেশে প্রবেশ করেন; পরলোকের নিমিত্তই তাঁহাদিগের মনোবৃত্তি নিরন্তর ব্যাপৃত ছিল; এমন কি, কর্ম্মক্ষেত্রে যে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাঁহারা তাহা কিছুই করিতেন না এবং এই জীবন হইতে মুক্তি লাভের জন্যই জীবন পরিত্যাগ করিতেন।

হিন্দু জাতীয়েরা ইতিবৃত্তে আপনাদিগের নামের গৌরব সম্পাদনের নিমিত্ত যে কিছু মাত্র যত্ন করেন নাই—সামাজিক ও রাজনীতির যে অল্পই অনুশীলন করিয়াছিলেন—সাংসারিক কার্য্যের ও সৌন্দর্য্যের ভাব যে তাঁহাদিগের অল্পই পরিজ্ঞাত ছিল, ইহা নিতান্ত বিস্ময়কর নহে। যাহাই হউক হিন্দুদিগের যে রূপ ভাব ছিল, গ্রিশিয়েরা তাহা কল্পনাপথেও উপনীত করিতে পারিতেন না এবং হিন্দুরাও গ্রিশিয়দিগের ন্যায় কার্য্যানুষ্ঠানে অসমর্থ ছিলেন। তাঁহারা এই কর্ম্মক্ষেত্র প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগতের প্রতি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যে জগৎ চিন্তার বিষয় এবং যাহাতে বিশ্রাম লাভ করিতে পারিবেন বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, তাহাতেই চক্ষু সম্পূর্ণ উন্মীলিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইহাঁদিগের জীবন অনন্ত কালের নিমিত্তই উৎসুক ছিল। ই-

তর্পণ করিয়াছিলেন। তৎপরে মহর্ষি কশ্যপকে এই সসাগরা পৃথিবী প্রদান করিয়া স্বয়ং মহেন্দ্র পর্ব্বতে গিয়া বাস করেন। তিনি অদ্যাপি সেই স্থলে জীবিত রহিয়াছেন। মহাভারতে এই রূপ উল্লিখিত আছে যে পৃথিবীর অনুরোধে পরশুরাম সমরানল উদ্দীপ্ত করিয়া ক্ষত্রিয়কুল উন্মূলিত করেন।

হাঁরা যাঁহা হইতে এই জীবন বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিয়াছে বিবেচনা করিতেন, সেই পরমাত্মাতে পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হইবার নিমিত্তই যাহা কিছু কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন। ইহাঁরা যথার্থ বিদ্যমান এক পুরুষের প্রতি বিশ্বাস করিয়া এই দৃশ্যমান জগতের অস্তিত্বে কদাপি বিশ্বাস করিতেন না। যদি একটি থাকে, তাহা হইলে দ্বিতীয়টির সদ্ভাব কেবল ভ্রম মাত্র—যদি ইহাঁরা একের উপর বাস করেন, তাহা হইলে অপরের উপর বাস নিতান্ত অসম্ভব হয়; এই রূপ বোধ করিতেন। পৃথিবীতে অবস্থান ইহাঁদের পক্ষে সংশয়াত্মক কিন্তু অনন্ত জীবনই ইহাঁদের অভ্রান্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইত। আত্মার সহিত পরমাত্মার সংযোগ পুনঃস্থাপন করাই ইহাঁদিগের ধর্ম্মের একমাত্র উদ্দেশ্য—মায়াবলে অসত্যকে সত্য বলিয়া যে ভ্রান্তি উপস্থিত হইতেছে, সেই ভ্রান্তি দ্বারা পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যে অভেদ জ্ঞান আচ্ছন্ন হইয়া আছে, তাহাকে পুনরায় প্রকাশ করাই ইহাঁদিগের ধর্ম্মের এক মাত্র লক্ষ্য*। ইহাঁরা আত্মার অবিনশ্বর ভাবে সন্দেহ বা তন্নিবন্ধন তদ্বিষয়ে কখন প্রমাণ প্রয়োগ করেন নাই† কিন্তু শেষাবস্থায় তর্ক ও বিজ্ঞানের অনুরোধে কখন কখন তাহাতে সন্দেহ ও কখন কখন তাহা সপ্রমাণও করিতে গিয়াছেন*। কেবল ইহাঁদের ধর্ম্ম নয়, সাহিত্য নয়, কিন্তু ইহাঁদের ভাষাও ব্রহ্মলোক এবং এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান মর্ত্ত্যলোক এই উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধ প্রতিদিন স্মরণ করাইয়া থাকে। আত্মা বা ত্মা এই শব্দ শারীরিক জীবন বলিয়া বেদে ব্যবহৃত আছে। ঋগ্বেদে সুররাজ ইন্দ্রের স্তুতিবাদে এক স্থলে কীর্ত্তিত হইয়াছে "হে ইন্দ্র! সমুদায় পৃথিবীতে সলিলের ন্যায় আমাদিগের আহরণীয় খাদ্য সামগ্রী পরিবর্দ্ধিত করিয়া দেও। হে শূর! বৃক্ষে যেমন রস সঞ্চরিত হইয়া থাকে, সেই রূপ ইহা দ্বারাই আমাদিগের দেহে আত্মার সঞ্চার হইতেছে†।" এই স্থলে আত্মা শব্দ জীবনকে স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিতেছে। আর এক স্থলে বলি প্রদানার্থোপনীত অশ্বকে সম্বোধন করিয়া এই রূপ অভিহিত হইয়াছে "মাত্মা তপতু প্রিয় আত্মা পিয়ং তং" এক্ষণে তুমি দেবগণের নিকট বলিপ্রদানার্থ উপনীত হইতেছ; অতএব তোমার প্রিয় আত্মা যেন তোমাকে পরিতপ্ত না করে। আরও আমরা স্থানে স্থানে দেখিতে পাই যে আত্মা শব্দ ইহা অপেক্ষাও বিস্তীর্ণ ভাব অভিব্যক্ত করিয়া দিতেছে। "সূর্য্য আত্মা জগত স্তস্থুষশ্চ" সূর্য্য স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগতের আত্মা‡। যাহাই হউক আত্মা

* ঋগ্বেদে উল্লিখিত আছে "সতোবন্ধু মসতি নিরবিন্দন হৃদি প্রতীষ্য কবয়ো মনীষা।" কবিগণ অনেক চিন্তা করিয়া সৎ ও অসতের সংযোগ আবিষ্কৃত করিয়াছেন।

† বেদে মৃত্যুর পর জীবনের বিষয় অতি-অল্পই উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু পার্থিবসুখ বল দীর্ঘআয়ু, পুত্র পশু ও আহার সামগ্রীর নিমিত্ত দেবগণের নিকট সততই প্রর্থনা করা হইয়াছে। মৃত্যুর পর দেবত্ব লাভ হওয়াই ধার্ম্মিকের এক মাত্র পুরস্কার। ঋগ্বেদে এক স্থলে কাক্ষীবান কহিয়াছেন, যিনি দাননিরত তিনি স্বর্গের উন্নত স্থান অধিকার করেন এবং দেবগণের মধ্যে পরিগণিত হন। আর এক স্থলে দীর্ঘতমা যাহারা ধনী হইয়াও দান করে না এবং যাহারা দেব পূজক নহে তাহাদিগকে নিন্দা করিয়া কহিয়াছেন, দেবলোকে যাঁহারা মহত্ত্ব লাভ করিয়াছেন, দয়ার্দ্র ব্যক্তি তাঁহাদের অপেক্ষাও মহৎ। হে অগ্নি! আমরা নিরন্তর যেন তোমারই অর্চ্চনা করি।

* প্রেত্যভাব এই শব্দটি বেদান্তাদি দর্শন শাস্ত্রে প্রায়ই উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা মৃত্যুর পর আত্মার অবস্থানকে প্রায়ই বুঝাইয়া থাকে। আমরা এই পৃথিবীতে এখন যেরূপ জীবিত রহিয়াছি, মৃত্যুর পর ঠিক এই রূপ যে অবস্থা উপস্থিত হইবে, তাহাকেই প্রেত্যভাব বলে। প্রাচীন শাস্ত্রকারদিগের মতে ভাব অর্থ বর্ত্তমান জীবন এবং প্রেত্য মৃত্যুর পর।

† ত্বং ত্যাং ন ইন্দ্র দেব চিত্রামিষমাপো ন পীপয়ঃ পরিজ্মন্। যয়া শূর প্রত্যস্মভ্যং যংসি ত্মনমূর্য্যং নং বিশ্বধ ক্ষরধ্যৈ। ১ খ ৩৩ সূক্ত ৮ ঋক্।

‡ ঋগ্বেদে সূর্য্যকে জীব অশ্ব শব্দে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। "উদীর্ঘ্বং জীবো অসুর্ং আগাদপ প্রাগাতমম আজ্যোতি রেতি" হে জীবগণ! তোমরা শয়নতল পরিত্যাগ কর, আমাদিগের জীবাত্মা আগমন করিয়াছেন এবং অন্ধকারও অতিক্রান্ত হইয়াছে।

ত্মা শব্দ আমি এই কথায় সতত ব্যবহার হইয়া থাকে। যেমন আমার আত্মা প্রশংসা করিতেছে—আমার আত্মা আনন্দিত হইতেছে—অর্থাৎ আমি প্রশংসা করিতেছি ও আমি আনন্দিত হইতেছি। আধুনিক সংস্কৃত ভাষায় আত্মা শব্দের এই রূপই ব্যবহার হইয়া থাকে। আবার আত্মা শব্দে যাঁহা হইতে জগতের সমস্ত বস্তুর সদ্ভাব নিঃসৃত হইয়াছে, যাঁহাতে সমস্ত বস্তু প্রতিগমন করিবে এবং এই ক্ষুদ্র আত্মা যাঁহার অংশ, সেই জগতের আত্মা পরমাত্মাকেও নির্দ্দেশ করা যায়। এক জন হিন্দু আপনার আত্মার বিষয় বলিতে গিয়া অপরিজ্ঞাত ভাবে জগতের আত্মার বিষয়ও বলিয়া থাকেন এবং তাঁহার পক্ষে আপনার আত্মাকে জানাতেই আপনার আত্মা ও জগতের আত্মা এই উভয়কেই জানা হয়, অথবা জগতের আত্মাকে জানিলেই আপনার আত্মাকে জানা হয়।

থিওডোর পার্কর।

২৭৪ সংখ্যক পত্রিকার ৪১ পৃষ্ঠার পর।

জগতে যে সমস্ত ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে, অন্তর্নিহিত ধর্ম্মভাবই তৎসমুদায়ের মূল কারণ। যদি মনুষ্যকে কেবল বহির্ব্বিষয় হইতেই ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে হইত—যদি মনুষ্যের অন্তরে ধর্ম্মের ভাব না থাকিত, তাহা হইলে পশুপক্ষীর নৃত্য ও বাক্যপ্রয়োগ অভ্যাস করিবার ন্যায় ধর্ম্ম তাহার পক্ষে উদাসীন হইয়া থাকিত; তাহার ধর্ম্মজ্ঞতা ও ধর্ম্ম পরায়ণতা কিছু মাত্র দৃষ্টি গোচর হইত না, এবং তাহাকে স্বীয় প্রকৃতি ও পূর্ণ ভাব হইতে পরিভ্রষ্ট ও ধর্ম্মশূন্য পামর অপেক্ষাও নিকৃষ্ট হইতে হইত। আমাদিগের প্রকৃতিতে যদি নীতির বীজ না থাকিত, তাহা হইলে আমরা মনুষ্যের প্রতি কোন কর্ত্তব্যই সাধন করিতে সমর্থ হইতাম না—যদি আমাদের প্রকৃতিতে ধর্ম্মের বীজ না থাকিত, তাহা হইলে ঈশ্বরের প্রতি কোন কর্ত্তব্যের ভাবই আসিত না। কিন্তু যখন মনুষ্য ও ঈশ্বরের প্রতি একটি কর্ত্তব্যের ভাব আমাদিগের অন্তরে জাগ্রত রহিয়াছে, তখন নীতি ও ধর্ম্মের মূলপ্রকৃতি যে আমাদিগের আত্মাতে নিহিত আছে, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যদি আমাদিগের আত্মাতে ধর্ম্মপ্রকৃতির অস্তিত্ব স্বীকার করা না যায়, তাহা হইলে অলৌকিক বা অন্য কোন রূপ প্রত্যাদেশই আমাদিগকে ধর্ম্মশীল করিতে পারে না। বাইবলের পত্র ও ধর্ম্মোপদেশের কণিকা দৈনিক খাদ্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া একটি মেষশাবককে ভক্ষণ করাইলে সে কি ধার্ম্মিক হইতে পারে? কখনই নহে। মনুষ্য এবং অন্যান্য জীবজন্তুর নিয়ম, কর্ত্তব্য ও নিয়তি ঈশ্বর স্বহস্তে উহাদের অভ্যন্তরে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং ধর্ম্মের উপাদান আমাদিগের অন্তরেই নিহিত আছে এবং ইহাই ধর্ম্মকে মানবজাতির কর্ত্তব্য, অধিকার ও মঙ্গলের নিদান রূপে পরিণত করিতেছে। সুতরাং ধর্ম্ম যে মনুষ্য জাতির একটি অযৌক্তিক পদার্থ তাহা নহে; অথবা মনুষ্য সম্বন্ধে যা কিছু আবশ্যক, সমুদায় সমাহিত হইলে, পরিশেষে ঈশ্বর সবিশেষ অনুধাবন করিয়া কৌশলে ইহা যে মনুষ্যের কার্য্যমধ্যে মিশ্রিত করিয়া দিয়াছেন, তাহাও নহে। ধর্ম্মভাব একটি মানব-প্রকৃতির আদিম অভাব। ইহা অতি গভীর এবং মনুষ্যের ভিত্তিমূলে রোপিত আছে।

ধর্ম্মের উপাদান সাধারণকে অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ইহা যে, সকল ব্যক্তিতে সমান রূপে আছে, তাহা নানা প্রকারে প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ সকল জা-

ভিতে সকল কালে ও সকল দেশেই মনুষ্যের প্রকৃতি একই রূপ। একটি মনুষ্যের মূলপ্রকৃতিতে যা কিছু আছে, বিভিন্ন পরিমাণে হউক, কিন্তু তাহাই প্রত্যেক মনুষ্যে বিদ্যমান থাকিবে। কেবল জল বায়ুর তারতম্য, বিভিন্ন অবস্থা, শিক্ষা এবং জাতি, বংশ ও ব্যক্তিবিশেষে তাহার কার্য্যগত রূপান্তর দৃষ্ট হইয়া থাকে। জাতি, বংশ ও ব্যক্তিগত প্রভেদ বিশেষ বিশেষ বৃত্তির বিভিন্ন পরিমাণে অধিকার, এবং তৎসমুদায়ের উন্নতি সাধন বা তদ্বিষয়ে ঔদাসীন্যের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করে। সুতরাং যখন ইহা প্রদর্শিত হইল যে, ধর্ম্মভাব এক জন মনুষ্যের মূলপ্রকৃতিরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন যে সমস্ত মনুষ্য উৎপন্ন হইতেছে, হইবে ও হইয়াছে, তাহাদিগের সকলেরই প্রকৃতির একরূপতা নিবন্ধন উহা একরূপই হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, ধর্ম্মভাব যে মনুষ্যসাধারণ, তাহা ইতিবৃত্তমূলক যুক্তি দ্বারাও সমর্থন করা যাইতে পারে। যে স্থলে মনুষ্যের বসতি আছে, সেই খানেই ধর্ম্মের মূর্ত্তি নিরীক্ষিত হইয়া থাকে। মনুষ্যের কি অসভ্যাবস্থা কি সভ্যাবস্থা সকল অবস্থাতেই তাহা তুল্য রূপে দৃষ্ট হয়। কি নবজিলণ্ডের নরমাংস-লোলুপ রাক্ষস, কি বাবিলনের ভোগাভিলাষী বিলাসী, কি গ্রিনলাণ্ডের জালিক, কি পারস্যের দর্শনবিৎ সকল মনুষ্যই কোন না কোন ধর্ম্মের রমণীয় মূর্ত্তি লোকসমক্ষে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। ফলত মানবজাতির ইতিবৃত্ত ইহা সুস্পষ্ট প্রতিপন্ন করিতেছে যে এই জীবলোকে এমন সময়ই ছিল না যে সময়ে, ধর্ম্মের মূর্ত্তি কোন না কোন রূপে প্রদর্শিত হয় নাই। মনুষ্য মনের সহিত ঈশ্বরকে পূজা করিয়া থাকে। সে আপনাকে কাহারও অধীন বলিয়া অনুভব করে, সে আত্মকৃত কার্য্যে আপনিই দায়ী তাহা বিলক্ষণ স্বীকার করে এবং বাহ্য জগতে আপনার অন্তর্গত ধর্ম্মভাবের চিহ্নও প্রদর্শন করিয়া থাকে। মনুষ্য যার পর নাই অসভ্য হইলেও এই বিষয়ে কদাচ উদাসীন নহে এবং সভ্যতার উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিলেও ইহা অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং দূরদৃষ্টি এবং মানবপ্রকৃতি হইতে যুক্তিসিদ্ধ অভ্রান্ত অনুমান এই উভয়ই ধর্ম্মভাব যে জাতি সাধারণ ইহা সবিশেষ প্রতিপাদন করিতেছে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

এই সিদ্ধান্তে আপাতত বিপ্রতিপত্তি দোষ লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু তাহা যে নিতান্ত অমূলক, তাহা স্থির চিত্তে এক বার অনুধ্যান করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। কোন কোন সময়ে কোন কোন ব্যক্তি প্রাদুর্ভূত হইয়া নাস্তিক নামে পরিগণিত হইয়া থাকেন। তাঁহারা আপনাদের ধর্ম্মভাব এবং নির্ভরের ভাব সুস্পষ্টই স্বীকার করিয়া থাকেন; কিন্তু এই ধর্ম্মভাব ও নির্ভরের ভাব আপনাদের প্রকৃতিতে আরোপ না করিয়া এই রূপ কহেন, যে, ইহা আত্মার বিকার, শিক্ষার প্রভাব ও ধাত্রীদিগের প্রবর্ত্তনা হইতে উৎপন্ন হয়। তাঁহারা আরও কহিয়া থাকেন যে মনুষ্যে যে এই রূপ ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা চিত্তের দুরপনেয় ব্যাধি, এবং বাল্যাবধি বদ্ধমূল কুসংস্কার বৈ আর কিছুই নহে। কেহ কেহ বা মনুষ্যের ধর্ম্মভাবে সন্দিহান হইয়া এক কালে তাহার অস্তিত্ব অস্বীকারই করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা দ্বারাও জাতিসাধারণ ধর্ম্মভাবের কিছু মাত্র ব্যাঘাত উপস্থিত হইতেছে না। যদি একটি শিশু দৈবাৎ একহস্তবিশিষ্ট হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়, তাহা হইলে তদ্দর্শনে সাধারণ

মনুষ্যেরই যে এক হাত, ইহা কখনই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না!

কোন কোন পর্য্যটক কহিয়া থাকেন যে, কোন কোন জাতির ঈশ্বর নাই ধর্ম্মযাজক নাই এবং উপাসনাদিও নাই, সুতরাং তাহাদিগের অন্তরে যে ধর্ম্মভাব বিদ্যমান আছে, তাহার কোন নিদর্শনই দৃষ্ট হইতেছে না। কোন কোন অসভ্য জাতির বাহ্যে যে ধর্ম্মের কোন চিহ্নই দৃষ্ট হয় না ইহা যথার্থ বটে, কিন্তু এই বলিয়াই যে তাহাদের অন্তরে ধর্ম্মভাবের অভাব আছে, তাহা কিছুতেই স্বীকার করিতে পারি না। এ স্থলে এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে বালকের ন্যায় উহাদের ধর্ম্মপ্রকৃতি নিতান্ত প্রচ্ছন্ন ভাবে রহিয়াছে; উপযুক্ত অবসর উপস্থিত হইলেই উহাদিগের ধর্ম্মের কার্য্য প্রদর্শিত হইতে পারে। কিন্তু যে সমস্ত পর্য্যটক ধর্ম্মকার্য্যের নিদর্শন দেখিতে না পাইয়া, কোন কোন অসভ্য জাতির ধর্ম্ম ভাবের এককালে অসদ্ভাব স্বীকার করেন, তাঁহারা বিষম ভ্রমে নিপতিত হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। তাঁহারা ঐ সমস্ত অসভ্য জাতির আচার ব্যবহার যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহা বাহ্য, কিছুই আভ্যন্তরিক নহে, এবং তাঁহাদিগের চক্ষু কুসংস্কারে এক প্রকার অন্ধ হইয়া আছে। তাঁহারা জনসমাজে নিয়মিত উপাসনা, ধর্ম্মযাজক, দেবমন্দির, দেবপ্রতিমা এবং ধর্ম্মসংক্রান্ত নানাপ্রকার অনুষ্ঠান দর্শন করিয়া থাকেন; কিন্তু ধর্ম্মোন্নতি সাধনের এমন এক রঙ্গভূমি আছে, যথায় এই সমস্ত ধর্ম্মসংক্রান্ত বাহ্য কার্য্যের কিছুই নাই, অথচ তথায় ধর্ম্মভাব পূর্ণভাবে কার্য্য করিয়া থাকে। যাহাই হউক, ঐ সমস্ত পর্য্যটকেরা উপাসনার কোন নির্দ্দিষ্ট নিদর্শন না দেখিয়া উপাসনার স্থায়িত্ব এবং জাতিগত ধর্ম্মভাবের স্থায়িত্ব স্পষ্ট অস্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু যদি এক ব্যক্তি সূপশাস্ত্রে নিতান্ত অনভিজ্ঞ এবং দ্রব্যসংস্কারের উপকরণ শূন্য হয়, তাহা হইলে তাঁহারা এই ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত দর্শনে কি এই রূপ সিদ্ধান্ত করিতে পারেন যে, মানবজাতি পানাহার করে না। পূর্ব্ব কালে পৌত্তলিক ও খ্রিষ্টিয়ানেরা যে পরস্পর পরস্পরকে নাস্তিক বলিয়া বিশ্বাস করিত, ইহাই তাহার কারণ সন্দেহ নাই।

বাহ্যে ধর্ম্মসংক্রান্ত কার্য্যের চিহ্ন না থাকিলেও অন্তরে যে ধর্ম্মভাব বিদ্যমান থাকে আপাতত কোনস্থলে এই নিয়মেরও ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। মনে কর, এক ব্যক্তি শৈশবাবধি জনসমাজ হইতে কোন এক নিভৃত প্রদেশে নিঃসঙ্গ অবস্থায় পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে স্বজাতীয় কাহারই সহিত তাহার ক্ষণকালের নিমিত্তও সাক্ষাৎ হয় নাই। এই অবস্থায় সেই ব্যক্তি স্বীয় নৈসর্গিক ধর্ম্মভাবের কোন চিহ্নই বাহ্যে প্রদর্শন করিতে পারে না; কেবল ধর্ম্মভাব নয়, তৎকালে তাহার হাস্য এবং সুস্পষ্ট বাক্য প্রয়োগের ইচ্ছা প্রভৃতি অন্যান্য জাতিসাধারণবৃত্তিও যার পর নাই দুর্ব্বল হইয়া থাকে। কিন্তু যখন ঐ মন্দভাগ্যকে পুনরায় জনসমাজে আনয়ন করা হয়, তখন উহার ধর্ম্মপ্রবৃত্তি অন্যান্য বৃত্তির ন্যায় ক্রমশ উন্মেষিত হইতে থাকে। এই কারণেই আমরা এই রূপ সিদ্ধান্ত করিতেছি যে, ধর্ম্ম প্রবৃত্তি স্বীয় উন্নতির প্রকৃত অবস্থা প্রাপ্ত না হইলেই গূঢ়ভাবে অবস্থান করে, কিন্তু কোন অবস্থায় ইহার একান্ত অসদ্ভাব কদাচ দৃষ্টি-গোচর হয় না। এক্ষণে আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে এই তিনটি প্রতিকূল দৃষ্টান্তও মনুষ্যের অন্যান্য বৃত্তির ন্যায় ধর্ম্মপ্রবৃত্তি যে জাতিসাধারণ তাহা প্রতিপাদন ও সবিশেষ সমর্থন করিতেছে, তাহার আর কোন সংশয় নাই।

জাতি বিশেষ, বংশবিশেষ ও ব্যক্তি-বিশেষ এই ধর্ম্মভাব অন্যান্য মানসিক বৃত্তির ন্যায় বিভিন্ন পরিমাণে অধিকার করিয়া থাকে এবং পৃথিবীর কোন বিশেষ কালে ইহার প্রভাব অপেক্ষাকৃত সমধিক দৃষ্টিগোচর হয়। জগৎ স্রষ্টা জগদীশ্বর দুইটি জাতি, দুইটি বংশ ও দুইটি মনুষ্যকে তুল্যগুণসম্পন্ন করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। উভয় জাতি, উভয় বংশ এবং এক জাতীয় ও এক বংশীয় উভয় ব্যক্তিরও আকারগত বৈলক্ষণ্যের ন্যায় বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তিগত এত অন্তর আছে যে, দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। উহাদের কেবল অবস্থা ভেদে যে এই ভেদটি উপস্থিত হইয়াছে তাহা নহে, কিন্তু উহাদের মূলপ্রকৃতি একবিধ হইলেও উহারা তাহার পরিমাণগত বৈলক্ষণ্য লইয়া যে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহা হইতেই এই ভেদটি উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমরা ইতিবৃত্ত মধ্যে মানবজাতির উন্নতির বিষয় আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিতে পাই যে, এক জাতি মনো-বৃত্তির অসাধারণ উন্নতি লাভ করিয়া বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিল্প শাস্ত্রের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছে; এক জাতি যুদ্ধের সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি ও রাজনীতির উন্নতি করিতেছে; আর এক জাতি বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, যুদ্ধ ও রাজনীতির উন্নতি সাধনে উপেক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক কেবল ধর্ম্মকে পরিবর্দ্ধিত করিতেছে এবং ইহাদের ধর্ম্মভাবের বিশুদ্ধতাও অপেক্ষাকৃত সমধিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।

পৃথিবীর ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিলে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, একেশ্বর-প্রতিপাদক ধর্ম্ম কালসহকারে তিন প্রকার হইয়া আসিয়াছে। তন্মধ্যে এক্ষণে দুইটির উপাসক অন্যান্য ধর্ম্মের উপাসক সংখ্যা অপেক্ষা সমধিক দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং ঐ দুই ধর্ম্মই এক্ষণে এই পৃথিবীতে অপেক্ষাকৃত সভ্যতা বিস্তার করিতেছে। উক্ত ত্রিবিধ ধর্ম্ম হইতে ইহুদী, খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমান এই তিন সম্প্রদায় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাঁদের মধ্যে সকলেই মনুষ্যের ধর্ম্মপ্রকৃতিতে বিশ্বাস করেন—সকলেই ঈশ্বরকে অদ্বিতীয় এবং সকলেই ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ বিষয়ে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। যাঁহারা প্রকার ভেদে এক রূপ ভাষা ব্যবহার ও এক দেশে বাস করিতেন এবং যাঁহাদিগের আচার ব্যবহার ও শাসন প্রণালী একই রূপ ছিল, এই রূপ মনুষ্যগণের পরিবার হইতে এই তিন সম্প্রদায়ই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই তিন সম্প্রদায় এক পরিবার হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াও ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। ইউরোপের বন্য জাতিদিগের সুবিস্তীর্ণ অতি অদ্ভুত ধর্ম্ম একেশ্বর-প্রতিপাদক ধর্ম্মের অনেকাংশে সাদৃশ্য প্রদর্শন করিতেছে। যে ধর্ম্ম গ্রিশ দেশকে দেবমন্দির প্রভৃতি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়াছিল, যাহা ভূমধ্য সাগরের দ্বীপপুঞ্জকে অতিগভীর সঙ্গীত দ্বারা প্রতিধ্বনিত করিত, সেই ধর্ম্মও এই ধর্ম্ম হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। যে ধর্ম্ম স্বর্গ হইতে জীবলোকে অবতীর্ণ হইয়াছে, গ্রিশিয়েরা সেই একেশ্বর-প্রতিপাক ধর্ম্মকেই রূপান্তরিত, পরিবর্দ্ধিত ও বিভূষিত করিয়া লইয়াছিলেন। যে জাতীয়েরা এক্ষণে সভ্যতম বলিয়া পরিগণিত হইতেছেন, তাঁহারা যে এক অভিনব ধর্ম্ম প্রস্তুত করিয়া লইয়াছেন, তাহা নিতান্ত অসম্ভব। এক্ষণে ইহাঁদিগের যত প্রকার উপাসনা পদ্ধতি দৃষ্টিগোচর হয়, ইহাঁরা তৎসমুদায় অন্যান্য জাতি হইতে অধিকার করিয়াছেন, এবং এক জাতি হইতে অন্য জাতিতে সংক্রান্ত

হইয়াছে বলিয়া ইহাঁদের ধর্ম্ম হইতে প্রকৃত ধর্ম্মের অনেক অংশ বিলুপ্তও হইয়া গিয়াছে। এই সমস্ত জাতি ধর্ম্ম অপেক্ষা বিজ্ঞানেরই সবিশেষ সমাদর করেন—মনের সহজ গতি দ্বারা যাহা উপলব্ধ হয়, তদপেক্ষা বুদ্ধিশক্তিবিহিত বিষয়েই সমধিক অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকেন; ইহাঁদের সাংসারিক কার্য্যফলের প্রতিই অধিক লক্ষ্য কিন্তু ভক্তি শ্রদ্ধার প্রতি তাদৃশ নহে। আমরা ইতিবৃত্ত অনুশীলন করিয়া ইহা সুস্পষ্টই দেখিতে পাই যে, এই জাতীয়েরা কোন রূপ নূতনবিধ ধর্ম্মের সৃষ্টি করেন নাই। ইহাঁদের বিশ্বাসটি অন্য জাতি হইতে সমানীত এবং বিদেশজাত বৃক্ষের ন্যায় স্থানান্তরে রোপিত হইলেও বহুফলপ্রদ হইয়াছে। আমরা যত গুলি জানি তন্মধ্যে এই সমস্ত জাতি সবিশেষ বুদ্ধিমান্ এবং কাব্য, বিজ্ঞান ও শিল্প শাস্ত্রে পারদর্শী। কিন্তু সেমবংশীয়েরা অন্যবিধ, উহাঁরা অন্যান্য ধর্ম্মপরায়ণ জাতি মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। কিন্তু অন্যান্য সম্প্রদায় অপেক্ষা ইহাঁদিগের বিদ্যা বুদ্ধি ও সংখ্যা অল্প। ইহাঁদিগের হইতেই পূর্ব্বোল্লিখিত তিনটি সম্প্রদায় উদ্ভূত হইয়াছে। এ ক্ষণে ঐ তিন সম্প্রদায় হইতেই পৃথিবীর ধর্ম্ম-রাজ্যের সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। গ্রিশীয় ও ইজিপ্টীয়েরা মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি উত্তেজিত করিয়া দিয়াছিল এবং উহাদিগের দ্বারাই আমাদিগের সুপ্রশস্ত সুন্দর অন্তর্নিহিত বৃত্তি সমুদায়ের প্রিয়তা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে; কিন্তু এই সেমবংশীয়েরা আপনাদিগের ধর্ম্মভাবে মনুষ্যের আত্মাকে স্পর্শ করিয়াছে এবং পবিত্রস্বরূপ মঙ্গলসঙ্কল্প পরম সুন্দর এবং প্রতি আত্মার অতি গভীরতম প্রদেশে বিরাজিত রাজাধিরাজ ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিকে উত্তেজিত করিয়া দিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া প্রদেশ বাসী কএকটি জাতির ধর্ম্মপ্রবৃত্তি অতি অস্পষ্টই দৃষ্ট হইয়া থাকে। কেবল তাহাদিগের নহে, সামান্যত অসভ্য জাতিদিগেরই অন্যান্য উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তির ন্যায় ধর্ম্মপ্রবৃত্তিও নিতান্ত অপরিণত অবস্থায় রহিয়াছে। কিন্তু মনুষ্য যে পরিমাণে আপনার প্রকৃতিকে উন্নত করে, সেই পরিমাণে তাহার ধর্ম্মপ্রবৃত্তিও উন্নত হইয়া থাকে সন্দেহ নাই।

পৃথিবী ও মনুষ্য।

২৭২ সংখ্যক পত্রিকার ২৫৬ পৃষ্ঠার পর।

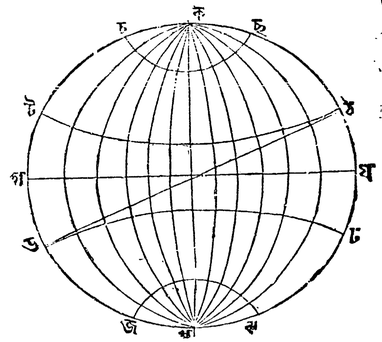

আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবে ক্রমপ্রবণ ভূমির বিষয় বিবৃত করিয়াছি, এক্ষণে বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন প্রকার মালভূমি, সমতল প্রদেশ ও পর্ব্বতের বিষয় উল্লেখ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। পৃথিবীর এই তিন প্রকার আকার বিদ্যমান থাকাতেই জল বায়ু উদ্ভিজ্জ এবং মনুষ্যের স্থিতি ও বৃদ্ধি কএক বিষয়ের সবিশেষ উন্নতি হইতেছে। সুতরাং এই তিন প্রকার ভূমি কোন্ প্রদেশে কি রূপ আছে, সর্ব্বাগ্রে তাহা নির্ণয় করা নিতান্ত নিরর্থক বোধ হয় না।

প্রাচীন পৃথিবীতে মালভূমি ও পর্ব্বতের ভাগই অধিক। এমন কি, আসিয়া ও আফ্রিকার ন্যায় কোন প্রদেশেই উন্নত

ও বিস্তীর্ণ বহুসংখ্য ভুমি দৃষ্টিগোচর হয় না। আসিয়ার মধ্য বিভাগে চারিটি বিস্তীর্ণ পর্ব্বতশ্রেণী আছে। এই চারিটি পর্ব্বত থাকাতেই তথায় মালভুমির সৃষ্টি হইয়াছে। ঐ সমস্ত ভুমি ৫০০০ পাদ হইতে ১৪০০০ পাদ পর্য্যন্ত উচ্চ এবং ইহা অন্যূন ২৪০০ মাইল বিস্তীর্ণ এবং ১৫০০ মাইল প্রশস্ত। আসিয়ার পশ্চিম দিকে প্রায় সমস্তই মালভুমি। তৎ সমুদায় প্রায় ৩০০০ হইতে ৬০০০ পাদ পর্য্যন্ত উচ্চ। এ দিকে আবার আফ্রিকায় সাহারার দক্ষিণে কেবলই উচ্চ ভুমি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ইহা নির্ণীত হইয়াছে যে পর্ব্বত ও মালভুমি আসিয়ার বিস্তার ভাগের সাত অংশের পাঁচ অংশ এবং সমতল ক্ষেত্র সাত অংশের দুই অংশ মাত্র অধিকার করিতেছে। কিন্তু আফ্রিকার মালভুমি ঐ প্রদেশের বিস্তার ভাগের তিন অংশের দুই অংশ এবং সমতল ক্ষেত্র তিন অংশের একাংশ মাত্র অধিকার করিতেছে। এই প্রাচীন পৃথিবীতে সমতল ভুমিরও অভাব নাই। ইউরোপ ও আসিয়ার উত্তরে অতি বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্র দৃষ্টিগোচর হয়। এমন কি হলাণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া জর্ম্মণি রুসিয়া কাস্পিয়ান সাগরের সন্নিহিত প্রদেশ সমুদায় এবং সাইবিরিয়া পর্য্যন্ত অন্যূন ছয় হাজার মাইল পরিসর প্রায় সমতল ক্ষেত্র। আফ্রিকাতে সাহারা প্রদেশে সকলই সমতল ভুমি। উহার বিস্তার ২৫০০০ মাইল এবং প্রস্থ ১০০০ মাইল। প্রাচীন পৃথিবীর সমতল ক্ষেত্র শীতমণ্ডল হইতে উষ্ণমণ্ডল পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ। এক দিকে দুরন্ত শীত ও আর এক দিকে প্রবল উত্তাপ, এই উভয়ের সহযোগিতায় এই সুবিস্তীর্ণ স্থানটি পূর্ণমঙ্গল সঙ্কল্প জগৎ প্রসবিতা অতিশয় উপযোগী করিয়াছেন।

নূতন পৃথিবীতে অধিকাংশই সমতল ক্ষেত্র। এমন কি, উহা নূতন পৃথিবীর তিন ভাগের দুই ভাগ, আর মালভুমি ও পর্ব্বত তিন ভাগের এক ভাগ মাত্র অধিকার করিয়া রহিয়াছে। আমেরিকার পশ্চিম পার্শ্বে কেবল উচ্চ ভুমি দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাও প্রস্থে অতি অল্প, কিন্তু উহার পূর্ব্ব ভাগে সমতল ক্ষেত্রও আছে। এই ক্ষেত্র উত্তর কেন্দ্র হইতে দক্ষিণ কেন্দ্র পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ। হিমসাগর হইতে মেক্‌সিকোর উপসাগর পর্য্যন্ত যে স্থান দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা প্রায় ২৪০০ মাইল বিস্তীর্ণ। এই বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যে অতি অল্পই উচ্চ ভুমি আছে। অরিওনোকো নদীর তট হইতে লাপ্লাটা পর্ব্বত পর্য্যন্ত তিন হাজার মাইল নিম্ন ভুমি আছে, ইহার মধ্যে কেবল পশ্চিম ব্রাজিলে অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভুমি দৃষ্টিগোচর হয়। এই উচ্চ ভুমি আমেরিকার দক্ষিণ প্রান্ত পাটাগোনিয়া পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ। মারানন নদী যে স্থান দিয়া প্রবাহিত হইতেছে, তাহার পরিসর ১৬০০ মাইল। স্বাস্থ্যকর জলবায়ু, উর্ব্বর ভুমি, আশ্চর্য্য তরু গুল্ম, এই স্থানেই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এই স্থান হইতেই দেশের সমধিক শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে এবং আমেরিকা যে ভবিষ্যতে অসম্ভাবিত উন্নতি পদবীতে আরোহণ করিবে, এই স্থান হইতেই তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ উপলব্ধ হইতেছে।

নূতন ও প্রাচীন পৃথিবী এই রূপে পরস্পর সম্পূর্ণ বিভিন্ন রূপ ধারণ করিতেছে। ইউরোপের পশ্চিমে রুসিয়া ভিন্ন অন্য স্থানে যে সমস্ত পর্ব্বত আছে, তাহার সন্নিকটে উচ্চ ভুমি নাই। পশ্চিম ইউরোপের এইটি বিশেষ লক্ষণ।

আত্মোৎকর্ষ বিধান।

২৭২ সংখ্যক পত্রিকার ২৫৪ পৃষ্ঠার পর।

রাজনীতিকে অত্মোৎকর্ষ বিধানের উপায় বলিয়া বিবেচনা করিবার প্রসঙ্গে সংবাদ পত্র সকলের উল্লেখ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া উচিত হয় না; কেননা এই সমস্তই পঠনাভিজ্ঞ প্রজাগণমধ্যে অধিকাংশের প্রধান পাঠ্য হইয়া থাকে। সংবাদ পত্র সাধারণ সকল প্রজাপুঞ্জের সাহিত্য শাস্ত্র; পরন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে তৎ সমুদায়ের উপযোগিতা ও গৌরব এ পর্য্যন্ত কাহারও বিশিষ্ট রূপ হৃদয়ঙ্গম হইতেছে না;—সমাজের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মনীতি বিষয়ক উৎকর্ষ সাধনে উহাদিগের যে সহকারিতা আছে, তাহা প্রায়ই বিবেচিত হইতেছে না। সংবাদ পত্রের সম্পাদক হওয়া সামান্য লোকের কর্ম্ম নহে। স্বার্থপরায়ণ অদূরদর্শী অনুদার মনুষ্যেরা সংবাদ পত্র সম্পাদনের পাত্র হইতে পারে না; উহা অসামান্য-ধীভাগ্য-সম্পন্ন উন্নতমনা মানবগণের কার্য্য। যোগ্য লোকে উহাতে হস্ত ক্ষেপ করিবেন, এবং তাঁহার আয় এরূপ হইবে যে তদ্দ্বারা তিনি আপনার সদৃশ বিচক্ষণ বিবুধগণের বিদ্যাখনি হইতেও অমূল্য জ্ঞানরত্ন সকল অবাধে সংকলন করিতে পারিবেন, তাহা হইলেই সংবাদ পত্র রত্নহার হইবে;—তাহা হইলেই উহার যথার্থ প্রতিভা প্রকাশ পাইবে। এ ক্ষণে সংবাদ পত্র সকলের যে রূপ অবস্থা চলিতেছে, তদনুসারেই আমাদিগকে উহাদের গুণাগুণ নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হইবে। যাঁহার আত্মোৎকর্ষ বিধানে সমধিক ঔৎসুক্য আছে, তিনি এক্ষণকার সর্ব্বোৎকৃষ্ট সংবাদ পত্র সংগ্রহ করিতে পারিলে অভিপ্রেত সিদ্ধি বিষয়ে বিস্তর আনুকূল্য প্রাপ্ত হইবেন। যে সকলেতে দ্বেষ, হিংসা, গ্লানি, প্রভৃতি বিষবৎ বিষয় সমুহের বিবরণ অথবা কুৎসিত পরিহাসরসের প্রাচুর্য্য থাকে, তৎসমুদায়কে মারাত্মক সংক্রামক রোগের ন্যায় জ্ঞান করিয়া তাঁহার গৃহ হইতে নিষ্কাসিত করা বিধেয়। সংবাদ পত্র মনোনীত করিবার সময়ে উহার সম্পাদকের অভিজ্ঞতা ও রচনা-নৈপুণ্যের প্রতি তাঁহাকে যত না দৃষ্টি রাখিতে হইবে, উহার ঔদার্য্য, বীর্য্য, ভাবগাম্ভীর্য্য এবং ন্যায়, সত্য ও সারল্য প্রভৃতি প্রকৃত সৌন্দর্য্যের প্রতি তাঁহার চতুর্গুণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সংবাদ পত্রের দলাদলি স্থলে তিনি যদি সত্যজিজ্ঞাসু হন, তবে উভয় পক্ষেই কর্ণপাত করিবেন। একের আক্রমণ ও অন্যের আত্মসংরক্ষণ উভয়ই তাঁহাকে পাঠ করিতে হইবে, কেবল এক পক্ষের জল্পনায় নিরবচ্ছিন্ন চিত্তনিবেশ করিলে চলিবে না। আধুনিক জগতে আত্মপ্রশংসা ও পরগ্লানি প্রভৃতি নিকৃষ্ট বৃত্তি সকলেরই অধিক প্রাদুর্ভাব; অতএব কেহ কাহারো কুৎসা বা দোষ কীর্ত্তন করিলে আমরা বিচার বিনির্ম্মুখে তাহার বাক্যেই প্রত্যয় করিয়া যদি অন্যের আত্মশোধন প্রস্তাব শ্রবণে পরাঙ্মুখ হই, তাহা হইলে আমাদিগকে অবশ্যই পক্ষপাত দোষে দূষিত হইতে হইবে।

সৌভাগ্য ক্রমে অধুনা সংবাদ পত্র সকলের বিস্তর বিশুদ্ধি হইয়াছে। পাঠক বর্গের চিত্তরঞ্জনার্থে শ্রাদ্ধ ও বিবাহাদির সমারোহ বর্ণন, অদ্ভুত জনশ্রুতি সকলের উদ্ঘোষণ, জাতিবিচার ব্যভিচার পানাসক্তি দলাদলি প্রভৃতির অনুকূল আন্দোলন, দুষ্প্রবৃত্তি পরিপোষক অশ্লীল কাব্যকলাপের প্রকটন এবং চিরপ্রসিদ্ধ ঔষধাবলির বারংবার নিরর্থক গুণ কথন প্রভৃতি অসার পদার্থনিকরে উহাদের উদর পূরণ

প্রায়ই নয়নগোচর হইতেছে না। এক্ষণে সামাজিক রীতি নীতির পরিশোধন, জাতি সাধারণ শুভাবহ বহুবিধ স্পৃহনীয় প্রস্তাব সমূহের আন্দোলন, বিদ্যা শিক্ষা জ্ঞানোন্নতি ও ধর্ম্ম সমৃদ্ধির উপায় নির্দ্ধারণ, পুরাকালীন জ্ঞান ধর্ম্মাদির পরিচায়ক পুরাণাদি প্রবন্ধ সমুদায়ের সংকলন, অভিনব পুস্তক সমস্তের সমালোচন, দণ্ডনীতি ও রাজকীয় ব্যবস্থা পদ্ধতির পর্য্যবেক্ষণ, রাজপুরুষদিগের কার্য্য সংক্রান্ত উৎকর্ষাপকর্ষ ও ঔচিত্যানৌচিত্যের সমবধারণ প্রভৃতি সুরুচির উপাদেয় বিষয় সমস্তই উহাদের উপজীব্য হইতেছে। এতাদৃশ হৃদ্যতর সুপথ্যের উপযোগে সংবাদ পত্র সকলের অনাময় ও চিরজীবন সম্ভোগ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। মঙ্গলসংকল্প বিশ্ববিধাতার মঙ্গলময়ী ইচ্ছার উহারা চির কাল বিশ্বজনীন কল্যাণ-নিবহের উদ্ভাবন এবং তদ্দ্বারা মানবপ্রকৃতির ক্রমশ উৎকর্ষ সম্পাদন করিতে থাকে, ইহাই একান্ত প্রার্থনীয়।

নূতন পুস্তক।

১। সর্ব্বার্থ সংগ্রহ। আমরা ইহার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার স্থানে স্থানে পাঠ করিয়া দেখিলাম, ইহাতে যে সমস্ত বিষয় আছে, তৎসমুদায় দ্বারা সাহিত্য-সংসারের সবিশেষ উপকার দর্শিতে পারে।

২। আসিয়াটিক সোসাইটির জর্নাল। আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে ইহার তিন খণ্ড আনুপূর্ব্বিক উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি।

৩। মিউজিক অব দি এন্‌সিএনটস্‌। আর্থর হুইটেন কলিকাতা নরম্যাল স্কুলে পূর্ব্বতন লোকদিগের সঙ্গীত বিদ্যার বিষয়ে ইংরাজিতে একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া পুস্তকাকারে প্রচারিত করিয়াছেন। আমরা তাহার এক খণ্ড উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। অবসর ক্রমে এই ক্ষুদ্র পুস্তকের উপর আমাদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিব।

উদ্ধৃত

ব্রহ্মসাধন।

ব্রহ্মসাধনের প্রথম সোপান।—মৃত্যুকে সর্ব্বদা স্মরণ করা।

এই মৃত্যু স্মরণ না করাতেই আমাদের যত অনর্থ ঘটিতেছে। মৃত্যু আমাদিগকে সর্ব্বদাই শিক্ষাদিতেছে যে তোমরা অতি অল্প দিনের নিমিত্তই এখানে আছ, কখন্‌ তোমাদিগকে পরকালে যাইতে হইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। আমরাও তাহা কতবার শ্রবণ করিতেছি; কিন্তু কার্য্যের সময়ে সে সকলই ভুলিয়া গিয়া আমরা আমাদের সমস্ত আশা ভরসা এই সংসারেই বদ্ধ করিয়া রাখি। তখন সংসার আমাদের সর্ব্বস্ব জ্ঞান হয়; পরকাল ও ঈশ্বরের প্রতি তখন আমরা উদাসীন হইয়া পড়ি। কিন্তু আমাদিগের প্রত্যেকের পক্ষে ইহা মনে করা কর্ত্তব্য যে, আমাদিগের মধ্যে যাহার যত বয়ঃক্রম হইয়াছে, তাহার আয়ু হইতে তত বৎসর অপহৃত হইয়াছে। কি জানি অদ্য রাত্রিতে মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলে "তোমাকে এখনই যাইতে হইবে।" এখনই যাইতে হইবে! কি ভয়ঙ্কর বাক্য! এই অপ্রস্তুত অসংশোধিত অনুন্নত আত্মার সহিত পরকাল রূপ অনন্ত সমুদ্রে ভাসমান হইতে হইবে! কি ভয়ানক কথা!! যদি এই ভাব আমাদিগের অন্তঃকরণে জাগরূক থাকে, তাহা হইলে পরকালের জন্য প্রস্তুত হইতে মন সর্ব্বদা ব্যগ্র হয়। তখন আমরা এখানে আপনাদিগকে পান্থনিবাসির ন্যায় প্রতীতি করি এবং যাহা লইয়া পরকালে যাইব, তাহারই উন্নতি সাধন করিতে সচেষ্ট হই।

ব্রহ্মসাধনের দ্বিতীয় সোপান।—বৈরাগ্য।

সংসারের সকল বস্তু অস্থায়ী ও অসার; যে পর্য্যন্ত না এই সত্য মনে উজ্জ্বলরূপে প্রতীত হইয়া বৈরাগ্যের উদয় হয়, যে পর্য্যন্ত না সংসারের সকল বস্তুর প্রতি অত্যন্ত আশক্তি পরিত্যক্ত হয়, সে পর্য্যন্ত কখন আধ্যাত্মিক বিষয়ের প্রতি অভিরুচির উদয় হয় না। অতএব আমাদিগকে

বৈরাগ্য অভ্যাস করিতে হইবে। সাংসারিক বস্তুর অস্থায়িত্ব অসারত্ব আমরা যত প্রতীতি করিব, তাহাদের প্রতি আসক্তি তত ক্ষীণ হইতে থাকিবে, ইন্দ্রিয়গণের প্রবলতা তত খর্ব্ব হইতে থাকিবে ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের প্রতি অনুরাগ তত বর্দ্ধিত হইবে।

ব্রহ্মসাধনের তৃতীয় সোপান।—মুক্তির ইচ্ছা।

এই কষ্টময় অনিত্য সংসার হইতে নিত্য ও মাধুর্য্য রসের এক মাত্র আধার, সেই অমৃত নিকেতন ঈশ্বরে আশ্রয় লইবার ইচ্ছাকে মুক্তির ইচ্ছা বলা যায়। এমন অনেকে দৃষ্ট হন, যাঁহাদের সংসারের প্রতি অতৃপ্তি ও তজ্জন্য বৈরাগ্য জন্মিয়াছে কিন্তু তাহাদের যথার্থ মুক্তির ইচ্ছা নাই। তাহা হইলে আমাদের কি হইল? যদ্যপি দুঃখের কশাঘাত প্রাপ্ত হইয়াও মনে তাহা হইতে বিমুক্তির ইচ্ছার উদয় না হয়, যদ্যপি আমরা নানা ক্লেশ দ্বারা সর্ব্বক্ষণ আক্রান্ত থাকিয়া ও সংসারের অসারতা জানিয়াও সংসারের একান্ত অনুসরণ করি, তাহা হইলে আমরা ব্রহ্ম প্রাপ্তির কখন উপযুক্ত হইতে পারি না। অতএব মুক্তির ইচ্ছা মনে বলবতী করিতে থাকিবে, মুক্তির ইচ্ছা হইলে মন প্রাণ ঈশ্বরের জন্য ধাবিত হয়। কেননা সেই প্রাণ-আরাম ঈশ্বর ভিন্ন তৃপ্তিস্থল আরামের স্থল দ্বিতীয় নাই।

ব্রহ্মসাধনের চতুর্থ সোপান।—ঈশ্বরের সহবাসের জন্য ব্যাকুলতা।

যখন সংসারের প্রতি বৈরাগ্য ও মুক্তির ইচ্ছা মনে উদিত হয়, তখন ঈশ্বরের জন্য আমাদিগের একটী ব্যাকুলতা উপস্থিত হয়। তৃষিত শুষ্ক-তালু মৃগ যেমন জলের জন্য ব্যগ্র, তেমনি আত্মা ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হয়। পতঙ্গ যেমন দীপাগ্নির নিকট গমন করিতে ব্যগ্র হয়, তেমনি আত্মা ঈশ্বরের মুখজ্যোতিঃ দেখিবার জন্য ব্যগ্র হয়। তাঁহাকে কি প্রকারে জানিব? কেমন করিয়া তাঁহার সহবাস লাভ করিব? তখন আত্মার এই প্রকার অনুসন্ধান উপস্থিত হয়। জনতার মধ্যে মাতাকে হারাইলে শিশু সন্তান যেমন ব্যাকুল হয়, তেমনি ঈশ্বরের জন্য আত্মা ব্যাকুল হয়। "বল কে তাঁরে জানে। কোথাগেলে দরশন পাব প্রাণের প্রাণে?" এই প্রকার উক্তি আত্মার অন্তরতম গভীরতম প্রদেশ হইতে উত্থিত হইতে থাকে। কিন্তু মোহমেঘ এখন আত্মাকে পরিত্যাগ করে না, সে সর্ব্বদা হৃদয়ে আসিয়া ঈশ্বরের নিমিত্ত ব্যাকুলতার প্রভাকে ক্ষীণ তেজ করিবার চেষ্টা করে। অতএব সর্ব্বদা চেষ্টা করিবে যাহাতে সেই ব্যাকুলতা মোহ-মেঘের আবরণে বিলুপ্ত না হইয়া উত্তরোত্তর প্রখর হইতে থাকে। ব্যাকুলতা উপস্থিত হইলে ঈশ্বর লাভের পথ পরিস্ফুত হয়। ঈশ্বর ব্যাকুল আত্মাকেই শীঘ্র আলিঙ্গন করেন।

এখানে ইহা বুঝিতে হইবে যে এই ব্যাকুলতার মূল ঈশ্বরের প্রতি সেই প্রগাঢ় প্রীতি, যে প্রীতি দুঃখের কঠোর পরীক্ষা সহ্য করিতে সক্ষম। ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা আমাদিগকে তাঁহার প্রীতিতে উপনীত করিতে পারে কিন্তু সাংসারিক উপকার জন্য কৃতজ্ঞতাতে সাংসারিক মোহ থাকিতে পারে, ও কেবল তজ্জনিত প্রীতি দুঃখের কঠোর পরীক্ষা সহ্য করিতে অক্ষম হয়। কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি সম্পদেও যেমন, বিপদেও তেমনি, বরং বিপদের সময় আরো বর্দ্ধিত হয়। এই প্রকার প্রীতিজনিত ব্যাকুলতাই সাধনের সোপান। সাংসারিক সকল বস্তু অসার ও ঈশ্বরই একমাত্র সার, এই প্রকার উজ্জ্বল প্রতীতি অর্থাৎ বৈরাগ্যভাবই সেই প্রীতির জনয়িতা। মনে বৈরাগ্য ভাবের উদয় না হইলে ঈশ্বরের প্রতি প্রকৃত প্রীতির উদয় হয় না। এই প্রীতি কেবল ব্যাকুলতা রূপ সাধনের সোপানেই অন্তর্ভূত আছে এমত নহে, কিন্তু সাধনের সকল সোপানেরই অন্তর্ভূত আছে।

ব্রহ্মসাধনের পঞ্চম সোপান।—আত্মাকে পবিত্র করা।

আমাদিগের আত্মা বস্তুতঃ নির্ম্মল পদার্থ। কিন্তু পাপের সহিত জড়িত হইয়া সে মলিন হইয়া পড়ে। পাপ হৃদয়ের মলস্বরূপ, তাহাকে ধৌত করিতে হইবে। তাহার তিনটী উপায় আছে। প্রথম পাপবোধ, দ্বিতীয় তজ্জন্য অনুতাপ,

তৃতীয় তাহা পরিহার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা ও আত্ম-চেষ্টা।

প্রথম, পাপ-বোধ।—আমাদের কতক গুলি গূঢ় পাপ আছে। মোহ বশতঃ আমাদের সে সকলকে পাপ বলিয়া বোধই হয় না। অতএব ঈশ্বরের পবিত্র ভাবের সহিত আপনার হৃদয়ের ভাবের সর্ব্বদা তুলনা করিবে। ঈশ্বর নির্ব্বিকার, অপাপবিদ্ধ, নির্ম্মল ও পবিত্র স্বরূপ। তাঁহার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে আপনার সমস্ত পাপ-মলা সুস্পষ্ট রূপে উপলব্ধি হইবে। তখন আত্মার এমন সকল গূঢ় পাপ প্রকাশিত হইয়া পড়িবে যাহাকে পূর্ব্বে কখনই পাপ বলিয়া চিনিতে পারা যায় নাই, অথবা যাহা আদৌ মনশ্চক্ষুর সম্মুখে প্রকাশিত হয় নাই।

দ্বিতীয়, পাপের জন্য অনুতাপ।—ঈশ্বরের নিমিত্ত ব্যাকুল আত্মার পাপ-বোধ হইলেই তজ্জন্য ভয়ানক অনুতাপ উপস্থিত হয়। আবার যে ব্যক্তি ঈশ্বরের জন্য যত ব্যাকুল তাহার পাপ তাহাকে ততই অনুতপ্ত করে। তাহাই সাধকের পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ। অনুতাপের সময় সাধকের কষ্টের সীমা থাকে না। তখন তিনি চারি দিক্ অন্ধকার দেখেন, কিছুতেই একটু আরাম প্রাপ্ত হন না। তখন তাঁহার সম্বন্ধে সকলি দুঃখময়, সকলি যন্ত্রণাময়, সকলি বিষময়রূপে প্রতীতি হয়। সাধকের নিকট অনুতাপের যন্ত্রণা সহস্র নরক যন্ত্রণা অপেক্ষাও অধিক কষ্টকর।

তৃতীয়, পাপ পরিহার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা ও আত্মচেষ্টা।—পাপের জন্য অনুতাপ-অগ্নিতে দগ্ধ হইতে হইলে সেই সকল পাপবিকার হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য একটী প্রবল ইচ্ছা জন্মে। কিন্তু অনেক দিনের বদ্ধমূল পাপকে উন্মূলন করা সহজ কথা নহে। অতএব তখন ঈশ্বরের নিকট ধর্ম্মবলের জন্য প্রার্থনা করিবে। ঈশ্বরের করুণাতে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া সরল মনে প্রার্থনা করিলে তিনি ধর্ম্মবল প্রদান করেন। সেই বল পাপ পরিত্যাগের প্রধান উপায় হয়। পাপপ্রবৃত্তি যত বার ধর্ম্ম প্রবৃত্তিকে পরাস্ত করিয়া বলীয়ান হউক না কেন, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলে এমন বল পাওয়া যায় যে, যত্ন করিলেই সমস্ত পাপকে বিদূরিত করিতে পারা যায়। আমাদের এমন অবস্থা কখনই হইতে পারে না, যে অবস্থায় ঈশ্বর আমাদিগকে অসৎশোধনীয় বিবেচনা করিয়া পরিত্যাগ করিবেন। তিনি আমাদিগকে উদ্ধার করিতে সর্ব্বদাই ব্যগ্র। তিনি "পতিত জন পাবন।" অতএব একান্ত বিশ্বস্ত চিত্তে তাঁহার নিকট প্রার্থনা কর, পুনরায় বল প্রাপ্ত হইবে, পুনরায় পাপ দমনে কৃতকার্য্য হইবে। একবারে না হয় শত বার প্রার্থনা কর, শত বার চেষ্টা কর; এক সময় সকল পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিবেই পারিবে, তাহার সন্দেহ নাই। এই রূপে প্রার্থনার সঙ্গে আত্মচেষ্টার সংযোগ করিয়া হৃদয়ের পাপমলা সকল প্রক্ষালন করিলে আত্মা নির্ম্মল হইবে। পাপই আমাদের ঈশ্বর লাভের পথের ভয়ানক প্রতিবন্ধক। পাপের সহিত ঈশ্বরের বিপরীত সম্বন্ধ। আমরা যখন পাপের দিকে যাই তখন ঈশ্বর হইতে দূরে যাই। যতটুকু পাপ পরিত্যাগ করি, ততটুকু ঈশ্বরের সমীপবর্ত্তী হই। পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের অতি যত্নের ধন। পবিত্র আত্মাই ঈশ্বরের প্রিয় নিকেতন।

THE CHRISTIAN MYTHOLOGY.

God made the earth for the residence of man, whom he created in his own image. Scarcely had this man, the prime object of the labours of the Almighty, seen the light, when his creator set a snare for him, into which God undoubtedly knew that he must fall. A serpent, which speaks, seduces a woman, who is no way surprised at this phenomenon. Being persuaded by the serpent, she solicits her husband to eat of a fruit forbidden by God himself. Adam, the father of the human race, by this light fault draws upon himself and his innocent posterity innumerable evils, which are followed but not terminated by death. By the offence of only one man, the whole human race incurs the wrath of God; and they are at length punished for involuntary faults with an universal deluge. God repents having peopled the earth, and he finds it easier to drown and destroy the human race, than to change their hearts.

A small number of the just, however, escaped this destructive flood; but the deluged earth, and the destruction of mankind, did not satiate the implacable vengeance of their Creator: a new generation appeared. These, though descended from the friends of God, whom he had preserved in the general shipwreck of the world, incense him by new crimes. The Almighty is represented as having been incapable of rendering his creatures such as he desired them: a new torrent of corruption carries away mankind, and wrath is again excited in the bosom of Jehovah!

Partial in his affections and preferences God, at length, casts his eyes on an *idolatrous* Assyrian. He enters into an alliance with this man, and covenants that his posterity shall be multiplied to the number of the stars of Heaven, or the sands of the sea, and that they shall for ever enjoy the favour of God. To this chosen race he reveals his will: for them, regardless of his justice, he destroys whole nations. Nevertheless this favoured race is not the more happy, or more attached to their God. They fly to strange gods, from whom they seek succours which are denied to them by their own. They frequentiy insult the God who is able to exterminate them. Sometimes he punished, sometimes consoles them; at one period he hates them without a cause; and at another he caresses them with as little reason. At last, finding it impossible to reclaim this perverse people, for whom he continues to feel the warmest tenderness, he sends amongst them his own son. To this son they will not listen, What do I say?—this beloved son, equal to God his father, is put to an ignominious death by his favourite nation! His father at the same time finds impossible to save the human race without the sacrifice of his own son. Thus an innocent God becomes the victim of a just God, by whom he is beloved: both consent to this strange sacrifice judged necessary by a God who knows that it will be useless to an hardened nation which nothing can reclaim.

We should expect that the death of this God, being useless to Israel, must serve at least to expiate the sins of the rest of the human race. Notwithstanding the eternal alliance with the Hebrews, solemnly sworn to by the Most High, and so many times renewed, that favourite nation find themselves at last deserted by their God who could not reduce them to obedience. The merits of the sufferings and death of his son, are applied to the nations before excluded from his bounty. These are reconciled to Heaven, now become more just in regard to them, and return to grace. Yet in spite of all the efforts of God, his favours are lavished in vain: mankind continue to sin, to enkindle the divine wrath, and to render themselves worthy of the eternal punishment previously prepared and destined for the greater part of the human race.

BOULANGER.

কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের

১৭৮৮ শকের বৈশাখ ও জৈষ্ঠ মাসের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	৩৬৩
পুস্তকালয়	১৭৪৷৶১০
যন্ত্রালয়	৪০১৴১৫
ডাক মাসুল	৪৪৸৶০
দানপ্রাপ্ত	৩৪
হাওলাত	৪০০
দুর্ভিক্ষে দান প্রাপ্ত	৩৭৩৷৷০
গচ্ছিত	১০২।৶০
	১৮৯৩।৶৫

ব্যয়	
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	৫০৮।১০
মাসিক বেতন	২৩২
যন্ত্রালয়	১৫৭৷৷০
ডাক মাসুল	৫২৸১০
পুস্তকালয়	১০১।৫
অনিরূপিত	৩০৷৷৵০
হাওলাত শোধ	১৭৪৷৷৵০
আলোকের ব্যয়	১৮
গৃহসংস্কারের ব্যয়	১০০
দুর্ভিক্ষের উপশমার্থ কটকে প্রেরিত	২৫০
গচ্ছিত	১০৫৸০
	১৭৩০৸৵৫
আয় .. .. .. ১৮৯৩।৵৫	
পূর্ব্বকার স্থিত ৬৮৷৷৵১০	
	১৯৬১৸৵১৫
ব্যয়	১৭৩০৸৵৫
স্থিত	২৩১৵১০

শ্রী সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

১৭৮৮ শকের বৈশাখ ও জৈষ্ঠ মাসের দানের আয় ব্যয় বিবরণ।

প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৫
" কামাখ্যাচরণ মুখোপাধ্যায়	৫
" মণিলাল মল্লিক	৪
" গোপালচন্দ্র মল্লিক	২
" নৃপালচন্দ্র মল্লিক	২
" রামদয়াল মুখোপাধ্যায়	৬।০
" হরচন্দ্র রায়	১
" নবীনচাঁদ বড়াল	১
" কুঞ্জবিহারী চক্রবর্ত্তি	২৵০
" বনমালী চন্দ্র	১
	৪৯।৵০

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩০
" কামাখ্যাচরণ মুখোপাধ্যায়	১
" চন্দ্রকুমার দত্ত	২
	৩৩
দানাধারে প্রাপ্ত	২।৵১০
আগরা ব্যাঙ্ক হইতে আনান যায় ..	৪০০
	৪৮৪৸১০

ব্যয়	
পত্রিকার কাগজ খরিদ জন্য হাওলাত দেওয়া যায়	৪০০
দাতার অভিপ্রায় অনুসারে সমাজের প্রচলিত ব্যয়ে দান	৩০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার জন্য মেদিনীপুর সমাজে দান	১০
	৪৪০
আয়	৪৮৪৸১০
পূর্ব্বকার স্থিত	৪৯৸৵১০
	৫৩৪৸০
ব্যয়	৪৪০
স্থিত	৯৪৸০

শ্রী সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

এক্ষণে ডাকের নিয়ম পরিবর্ত্ত হওয়াতে দুই খণ্ড পত্রিকা আর এক আনায় যায় না। অতএব যাঁহাদিগের দুই খণ্ড পত্রিকা একত্রে যায়, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া শীঘ্র আর এক খণ্ডের মাসুল পাঠাইবেন।

বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম, মূল্য ।।০ আনা।

ব্রাহ্মধর্ম্মের বাঙ্গলা অনুবাদ ও তাহার তাৎপর্য্য একত্রে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে, যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা অবগত নহেন, তাঁহারদিগের বোধ সুলভার্থে কেবল বাঙ্গলা অনুবাদ সহিত তাৎপর্য্য একত্র প্রকাশ করা গেল; ইহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের মর্ম্ম জ্ঞান লিপ্সু ব্যক্তি মাত্রেরই বিশিষ্ট রূপ উপকার দর্শিতে পারিবে।

ভবানীপুর চতুর্দ্দশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা, মূল্য ৵০ এক আনা।

গত ৯ আষাঢ় শুক্রবার ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের চতুর্দ্দশ সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ব্রাহ্মধর্ম্মের স্বরূপ বিষয়ে যে বক্তৃতা পাঠ করেন, তাহাই পুস্তকাকারে প্রচারিত হইয়াছে।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।
সহকারী সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাসুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২৩। কলিগতাব্দ ৪৯৩৭। ২৩ আষাঢ় শুক্রবার।

একমেবাদ্বিতীয়ং
ষষ্ঠ কল্প
চতুর্থ ভাগ
শ্রাবণ ১৭৮৮ শক।
২৭৩ সংখ্যা ৩৭ ব্রাহ্মসম্বৎ

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদসংহিতা।

প্রথমমণ্ডলস্য ত্রয়োদশানুবাকে নবমং সূক্তং।

গোতমঋষিঃ পংক্তিশ্ছন্দঃ ইন্দ্রোদেবতা।

৮৭৩

১। উপো যু শৃণুহী গিরো মঘবন্মাতথা ইব। যদা নঃ সূনৃতাবতঃ কর আদর্থযাস ইদ্যোজা ন্বিন্দ্র তে হরী।

১। হে 'মঘবন্' ধনবন্ ইন্দ্র 'গিরঃ' অস্মদীয়াঃ স্তুতীঃ 'উপো' উপৈব 'সু' 'শৃণুহি' উপগত্য সম্যক্ শৃণু। 'অতথা ইব' পূর্ব্বং যথাবিধস্ত্বং তদ্বিপরীতঃ মা 'ভূঃ'। অস্মাসু পূর্ব্বং যথানুগ্রহবুদ্ধিযুক্তস্তথাবিধএব ভবেত্যর্থঃ। অপিচ 'নঃ' অস্মান্ 'সূনৃতাবতঃ' প্রিয়সত্যাত্মিকা বাক্ সূনৃতা। তযা স্তুতিরূপযা বাচা যুক্তান্ যদা 'করঃ' করোষি। 'আৎ' অনন্তরং ত্বং অপি 'অর্থযাস ইৎ' অর্থয়সে এব বাচ্যসে এব। ন তদাসূসে অস্মাভিঃ প্রযুক্তাঃ স্তুতীস্তুমপি স্বীকরোষীত্যর্থঃ। অতঃ হে 'ইন্দ্র' 'তে' 'হরী' তদীযৌ অশ্বৌ 'যু' ক্ষিপ্রং 'যোজ' রথে যোজয়।

১। হে মঘবন্! তুমি এই স্থানে আগমন করিয়া আমাদিগের স্তুতি-বাক্য শ্রবণ ও পূর্ব্ববৎ আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন কর। তুমি আমাদিগকে সত্য ও প্রিয় বাক্য প্রয়োগে সমর্থ করিয়াছ, এই নিমিত্তই আমরা তোমার নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকি। হে ইন্দ্র! এ ক্ষণে তুমি স্বীয় রথে শীঘ্র অশ্বদ্বয় যোজনা কর।

৮৭৪

২। অক্ষন্নমীমদন্ত হব প্রিযা অধূষত। অস্তোষত স্বভানবো বিপ্রা নবিষ্ঠযা মতী যোজা ন্বিন্দ্র তে হরী।

২। হে ইন্দ্র ত্বযা দত্তানি অন্নানি 'অক্ষন্' যজমানাঃ ভুক্তবন্তঃ। ভুক্ত্বা চ 'অমী' 'মদন্ত' 'হি' তৃপ্তাশ্চাসন্। 'প্রিযাঃ' স্বকীযাঃ তনূঃ 'অব' 'অধূষত' অকম্পযন্ অতিশযিতরসাস্বাদনেন বহুমশক্নুবন্তঃ শরীরাণ্যকম্পযন্। তদনন্তরং 'স্বভানবঃ' স্বাযতদীপ্তযঃ 'বিপ্রাঃ' মেধাবিনস্তে 'নবিষ্ঠযা' নবিতৃতমযা 'মতী' মত্যা স্তুত্যা 'অস্তোষত' অস্তবন্। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ যোজ্যং।

২। যাজ্ঞিকেরা ত্বদ্দত্ত অন্ন ভোজন পূর্ব্বক পরিতৃপ্ত হইয়া কলেবর কম্পিত করিয়াছিলেন। পরে সেই সমস্ত তেজস্বী বিপ্রেরা উৎকৃষ্ট স্তুতি-বাক্যে তোমাকে স্তব করেন। হে ইন্দ্র! এ ক্ষণে তুমি স্বীয় রথে অশ্বদ্বয় যোজনা কর।

৮৭৫

৩। সু॒সং॒দৃশং॑ ত্বা ব॒যং মঘ॑বন্বং-দিষী॒মহি॑। প্র নূ॒নং পূ॒র্ণব॑ংধুরঃ স্তু॒তো যা॑হি॒ বশাঁ॒ অনু॒ যোজা॒ ন্বি॑ন্দ্র তে॒ হরী॑।

৩। হে 'মঘবন্' ইন্দ্র 'সুসংদৃশং' সুষ্ঠ্বনুগ্রহদৃষ্ট্যা সর্ব্বস্য দ্রষ্টারং 'ত্বা' ত্বাং 'বয়ং' 'বন্দিষীমহি' স্তবামহি। স্তুতিকর্ত্তারোভূযাস্মেত্যাশাস্যতে। অস্মাভিঃ বন্দিভিঃ 'স্তুতঃ' ত্বং 'পূর্ণবংধুরঃ' স্তোতৃভ্যঃ দেয়ৈঃ ধনৈঃ পূরিতেন রথেন যুক্তঃ সন্ 'বশান্' কাময়মানান্ অন্যান্ যজমানান্ প্রতি 'নূনং' 'প্র' 'যাহি' অবশ্যং প্রতিষ্ঠস্ব। যোজেত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

৩। হে ইন্দ্র! তুমি সানুগ্রহ দৃষ্টিপাত দ্বারা সকলকে দর্শন করিয়া থাক। এক্ষণে আমরা তোমার স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তুমি সংস্তুত হইয়া রথ-মধ্যে অর্থিদিগকে প্রদানার্থ প্রচুর অর্থ লইয়া তাহাদিগের নিকট গমন কর। হে ইন্দ্র! এক্ষণে তুমি স্বীয় রথে শীঘ্র অশ্বদ্বয় যোজনা কর।

৮৭৬

৪। স ঘা॒ তং বৃষ॑ণং॒ রথ॒মধি॑ তিষ্ঠাতি গো॒বিদ॑ং। যঃ পাত্র॑ং হারিযোজ॒নং পূণমি॑ন্দ্র॒ চিকে॑ততি॒ যোজা॒ ন্বি॑ন্দ্র তে॒ হরী॑।

৪। 'সঃ' 'ঘ' সঃ খলু ইন্দ্রঃ 'বৃষণং' কামাভিবর্ষকং 'গোবিদং' গবাং লম্ভয়িতারং 'তং' 'রথং' 'অধিতিষ্ঠাতি' ঈদৃশে রথে অধিতিষ্ঠতু আরূঢ়োভবতু। হে 'ইন্দ্র' 'যঃ' রথঃ 'হারিযোজনং' এতৎ সজ্জকং ধানামিশ্রিতং 'পূর্ণং' সোমেন পূণং 'পাত্রং' 'চিকেততি' জ্ঞাপয়তি তং রথং অধিতিষ্ঠেতি পূর্ব্বেনান্বয়ঃ। অধিষ্ঠায চ ত্বদীযৌ অশ্বৌ ক্ষিপ্রং যোজয।

৪। হে ইন্দ্র! হারিযোজন নামক সোম রসপূর্ণ পাত্র সংযুক্ত গোধন-প্রদ বাসনা-পূরক রথে আরোহণ পূর্ব্বক উহাতে অশ্বদ্বয় যোজনা কর।

৮৭৭

৫। যু॒ক্তস্তে॑ অস্তু॒ দক্ষি॑ণ উ॒ত স॒ব্যঃ শ॑তক্রতো। তেন॑ জা॒য়া-মুপ॑ প্রি॒যাং ম॑ন্দা॒নো যা॒হ্যংধ॑সো॒ যোজা॒ ন্বি॑ন্দ্র তে॒ হরী॑।

৫। হে 'শতক্রতো' বহুকর্ম্মবন্নিন্দ্র 'তে' ত্বদীযে রথে 'দক্ষিণঃ' দক্ষিণপার্শ্বস্থঃ অশ্বঃ 'যুক্তঃ' 'অস্তু'। 'উত' অপিচ 'সব্যঃ' বামপার্শ্বস্থোপি যুক্তঃ অস্তু। 'তেন' রথেন 'অংধসঃ' সোমলক্ষণস্য অন্নস্য পানেন 'মংদানঃ মত্তঃ ত্বং 'প্রিযাং' প্রীণযিত্রীং 'জাযাং' 'উপযাহি' সা যত্র বর্ত্ততে তত্র গচ্ছেত্যর্থঃ। তদর্থং হে 'ইন্দ্র' ত্বদীযৌ অশ্বৌ রথে ক্ষিপ্রং যোজয। অনযোত্তরযাচ পীতসোমস্য ইন্দ্রস্য স্বগৃহং প্রতি প্রস্থানং প্রতিপাদ্যতে।

৫। হে ইন্দ্র! তোমার রথের দক্ষিণ ও বামে অশ্বদ্বয় যোজিত হউক। তুমি সোমরস পানে হৃষ্ট হইয়া সেই রথে আরোহণ পূর্ব্বক প্রিয়তমার নিকট গমন কর। অতএব তোমার রথে শীঘ্র অশ্বদ্বয় যোজনা করিয়া দেও।

জগতী ছন্দঃ।

৮৭৮

৬। যু॒নজ্মি॑ তে॒ ব্রহ্ম॑ণা কে॒শিনা॒ হরী॒ উপ॒ প্র যা॑হি দধি॒ষে গভ॑স্ত্যোঃ। উত্ত্বা॑ সু॒তাসো॑ রভ॒সা অ॑মংদিযুঃ পূষ॒ন্বান্ব॑জ্রি॒ন্সমু॒ পত্ন্যা॑মদঃ। ১। ৬। ৩।

৬। হে ইন্দ্র 'কেশিনা' কেশযুক্তৌ শিখাবন্তৌ 'তে' 'হরী' ত্বদীযৌ অশ্বৌ 'ব্রহ্মণা' স্তোত্ররূপেণ মন্ত্রেণ 'যুনজ্মি' রথে সংযোজযামি। তেন রথেন 'উপ প্রযাহি'। ত্বদ্গৃহমুপগচ্ছ। 'গভস্ত্যোঃ' বাহুনামৈতৎ। বাহ্বোঃ অশ্ববন্ধকান্ রশ্মীন্ 'দধিষে' ধারযস্ব। 'ত্বা' ত্বাং 'সুতাসঃ' যজ্ঞে অভিষুতাঃ সোমাঃ 'রভসাঃ' বেগবন্তঃ তীব্রাঃ ক্ষিপ্রং মদকারিণইত্যর্থঃ। 'উদমংদিষুঃ' উৎকৃষ্টমদযুক্তমকার্ষুঃ। হে 'বজ্রিন্' অতঃ ত্বং স্বগৃহং গত্বা 'পূষণ্বান্' অত্র পূষণ্ শব্দঃ পুষ্টৌ বর্ত্ততে। পুষ্টির্ব্বৈ পূষা। পুষ্টিমেবাবরুন্ধ ইতিশ্রুতেঃ। সোমপানজনিতযা পুষ্ট্যা যুক্তঃ সন্ 'পত্ন্যা' স্বভার্য্যযা সহ 'সমু অমদঃ' সম্যগেব তৃপ্তোভব। ১। ৬। ৩।

৬। হে ইন্দ্র! আমি তোমার রথে মন্ত্র দ্বারা কেশর-জাল-সমলঙ্কৃত অশ্বদ্বয় যোজনা করিয়া দিতেছি। তুমি সেই রথে আরোহণ ও বাহু দ্বারা রশ্মি গ্রহণ করিয়া

গৃহে গমন কর। যজ্ঞে সংস্কৃত হর্ষজনক সোমরস সমুদায় তোমাকে শীঘ্র হৃষ্ট করুক। হে বজ্রধর! তুমি সোম-পান-জনিত পুষ্টি সম্পন্ন হইয়া প্রিয়তমার সহিত তৃপ্তি লাভ কর। ১। ৬। ৩।

কলিকাতা মাসিক ব্রাহ্ম সমাজ।

৪ আষাঢ় রবিবার ১৭৮৮ শক।

প্রধান আচার্য্যের উপদেশ।

প্রার্থনা না করিতে করিতে তিনি পিতা-মাতার ন্যায় এখানেই সম্মুখে বর্ত্তমান, এখনি তিনি আমারদিগকে অভয় দান করিতেছেন। নিদাঘ-গ্রীষ্মের পর এই প্রাতঃকালে যেমন বিন্দু বিন্দু বারি-ধারা বর্ষণ করিয়া তিনি এই জগৎকে শীতল করিতেছেন, তেমনি তাঁর অমৃত বিন্দু বর্ষণ করিয়া আমারদের সন্তপ্ত আত্মাকে সুস্নিগ্ধ করিতেছেন। ভয়ে ব্যাকুল ছিলাম, তিনি অভয় দান করিলেন; এখন নির্ভয় হইলাম। তিনি নির্জ্জনে আমারদের হৃদয়ে প্রকাশ পান, তিনি মোহ-কোলাহলের মধ্যে আইসেন না। যেমন মেঘাচ্ছন্ন সূর্য্যকে দেখিতে পাই না, সেই রূপ মোহ-কোলাহলের মধ্যে পরমেশ্বরকে আমরা দেখিতে পাই না। পরীক্ষা দ্বারা জানিয়াছি—যখন শান্ত-হৃদয় হইয়া বসি, তখনই সেই শান্ত-স্বরূপ আমারদের নিকটে আবির্ভূত হন। মধ্যে মধ্যে এই সমাজে অনেক সমারোহ হইয়া গিয়াছে, হয়তো সেই উৎসাহকর উৎসবের মধ্যেও আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই—আজি এই প্রশান্ত সুশীতল প্রাতঃকালে তাঁহার পবিত্র সন্নিকর্ষ কেমন উপলব্ধি করিতেছি, এই কয় জন সুহৃদে মিলে কেমন শান্ত হৃদয়ে পবিত্র ভাবে তাঁহার উপাসনা করিতেছি, আমারদের প্রতি-জনের আত্মাতে এখন তিনি কেমন আনন্দ-রূপে অমৃত-রূপে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার মাতৃ-স্নেহ-পূর্ণ দৃষ্টি আমারদের চক্ষুর উপরে কেমন স্থির-ভাবে এখন নিপতিত রহিয়াছে, এই শুভ ক্ষণে মোহহর পবিত্র আনন্দ অন্তর্জলা নিঃশব্দ নদীর ন্যায় আমারদের অন্তরে কেমন বহমান হইতেছে, এ আনন্দের স্বর্গীয় ভাব কেমন অনুভব হইতেছে—এ আনন্দ চিরকালের আনন্দ, এ যোগ অমৃত যোগ। আমারদের প্রাণকে যে হরণ করে, সে বিষ; আমারদের প্রাণের প্রাণকে যে হরণ করে, সে মোহ। অতএব বিষ হইতেও পাপ-মোহ আমারদিগের সাংঘাতিক শত্রু। হে পরমাত্মন্! এই ভয়ানক পাপ-মোহ হইতে রক্ষা করিয়া তোমার সহিত আমারদের যোগানন্দ প্রেমানন্দকে সংবর্দ্ধন কর, যাহাতে আমরা অমৃতত্ব লাভ করিতে পারি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

ভবানীপুর চতুর্দ্দশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

৯ আষাঢ় শুক্রবার ১৭৮৮ শক।

উদ্বোধন।

"সমুদয় আকাশ যাঁহার গুরু ভার বহন করিতে পারে না, সেই পরমেশ্বর এখনি এখানে অধিষ্ঠান করিতেছেন। এই উপাসনা-মণ্ডপের মধ্যে এই আকাশে আমারদের সম্মুখে সেই বিশ্বাধিপ বিরাজ করিতেছেন, এই দীপ-মালার মধ্যে তাঁর জ্যোতি প্রকাশ পাইতেছে, হৃদয়ের উৎসাহের মধ্যে সেই উৎসাহ-দাতাকে আমরা অনুভব করিতেছি। তিনি আমারদের চক্ষুর চক্ষু, তিনি আমারদের শ্রোত্রের শ্রোত্র, তিনি আমারদের মনের মন, তিনি আমারদের প্রাণের প্রাণ। তিনি

এখনি আমারদের সকলকে দেখিতেছেন। যিনি চক্ষু দিয়াছেন, তিনি কি আমাদিগকে এখন দেখিতেছেন না? যিনি কর্ণ দিয়াছেন, তিনি আমারদের বাক্য কি এখন শুনিতেছেন না? যিনি আমারদের সকল মনোবৃত্তির সহিত আত্মাকে সৃজন করিয়াছেন, তিনি কি আমারদের মনের ভাব এখন অবগত নহেন? সেই পরমেশ্বর এখনি এখানে আমারদের সকলকে দেখিতেছেন, আমাদের সকল কথা শুনিতেছেন, আমারদের মনের নিগূঢ় সকল ভাব জানিতেছেন। সেই চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, প্রাণের প্রাণ, শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পরমেশ্বর এখানে আনন্দ-রূপে অমৃত-রূপে প্রকাশ পাইতেছেন; শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি উদ্দীপন করিয়া তাঁহার উপাসনাতে প্রবৃত্ত হই।"

এই উদ্বোধনের পর ব্রহ্ম সঙ্গীত হইয়া উপাসনা আরম্ভ হইল। স্বাধ্যায়ান্ত ব্রহ্মোপাসনা সমাপ্ত হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মোক্ত কয়েকটি শ্রুতি তাৎপর্য্যের সহিত পঠিত হইল। অনন্তর শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় স্বরচিত প্রবন্ধ দ্বারা সময়োচিত এই উপদেশ প্রদান করিলেন—

আজ আবার পূর্ণ এক বৎসর পরে এই পবিত্র উপাসনা-মণ্ডপে সর্ব্ব-মঙ্গলালয় পরমেশ্বরের পূজা করিতে আমরা একত্রিত হইয়াছি। যাঁহা হইতে দেহ, মন, আত্মা, ও জ্ঞান ধর্ম্ম, সকলই লাভ করিয়াছি; আজ সেই বিশ্ব-বিধাতা অখিল মাতাকেই কৃতজ্ঞতা উপহার দিতে এখানে এই সুখের সায়ংকালে সকলে সম্মিলিত হইয়াছি। প্রতি দিন, প্রতি সপ্তাহে, প্রতি পক্ষ, প্রতি মাসে যিনি আমারদিগের আত্মাকে ব্রাহ্মধর্ম্মের সুশীতল ছায়ায় রক্ষা করিয়া জ্ঞান প্রীতি পবিত্রতাতে উন্নত করিতেছেন, আজ তাঁর যশোগান করিতেই এখানে এই উৎসব-দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্মই এই উৎসব-আনন্দের এক মাত্র কারণ—পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মই এই অরূপ অতীন্দ্রিয় পূর্ণ-জ্ঞান পূর্ণ-পক্তি পূর্ণ-মঙ্গল পরমেশ্বরের পূজার এক মাত্র প্রবর্ত্তক। যত দিন ব্রাহ্মধর্ম্ম উজ্জ্বল বেশে এখানে প্রকাশিত হইয়াছেন, তত দিন অবধিই বঙ্গ ভূমিতে ঈদৃশ অনুপম স্বর্গীয় উৎসবের সূত্র-পাত হইয়াছে। দিব্য-ধামে দেবগণ সম্মিলিত হইয়া যে শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পরব্রহ্মের উপাসনা করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম আসিয়া পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ব-প্রথমে এই ভারত ভূমির বঙ্গ দেশেতেই সেই পবিত্র ব্রহ্ম-পূজার সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর উপাসনা-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিলেন। সর্ব্ব-প্রথমে যেমন এখানকার আর্য্য জাতির মধ্যেই ধর্ম্মভাব প্রস্ফুটিত হইবার রাশি রাশি নিদর্শন ইতিহাস ও পুরাবৃত্তে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তেমনি সর্ব্বাগ্রেই সেই আর্য্য-বংশেরই ধর্ম্মোন্নতির মহত্তর চিহ্ন-সকল এক্ষণেও প্রত্যক্ষ হইতেছে। পৃথিবীর মধ্যে কোন দেশে শিল্প-সাহিত্যের উন্নতি হইতেছে, কুত্রাপি বা কৃষি-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে; কোন স্থানে বা রণ-বিদ্যা ও চিকিৎসা-বিদ্যার অভাবনীয় প্রাদুর্ভাব, কোন দেশে বা ভাষা-তত্ত্ব ও বিজ্ঞান-শাস্ত্রের ভূয়সী আলোচনা—কোন জাতি বা দিগ্‌বিজয়ে প্রবৃত্ত হইয়া স্বকীয় বল-বিক্রমের প্রতাপে সমুদয় ভূমণ্ডলকে প্রকম্পিত করিয়া তুলিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে চারি দিকে এই সমস্ত উন্নতি ও আন্দোলনের মধ্যে ধর্ম্মপরায়ণ এক-নিষ্ঠ আর্য্য-বংশীয়েরা হিমালয় প্রদেশ হইতে গঙ্গানদীর ন্যায় প্রবাহিত হইয়া এই নির্ব্বীর্য্য বঙ্গ দেশে আসিয়া পরাধীনতার উপর পরাধীনতা সত্ত্বেও অ-

টল-ভাবে ধর্ম্ম-পথেই অগ্রসর হইতেছেন—ঈশ্বরেরই সন্নিকর্ষ লাভ করিতেছেন, আত্মার স্বাধীনতা বর্দ্ধন করিতেছেন। বর্ত্তমান সময়ে এখানে আর্য্য-সন্তান-সকল যদিও কোন রূপ বৈষয়িক ব্যাপারের কীর্ত্তি-কলাপ বিস্তার করিতে পারিতেছেন না, তথাপি তাঁহারদিগের বংশ-পরম্পরা-অনুষ্ঠিত ধর্ম্মোন্নতির জয়স্তম্ভ-স্বরূপ ব্রহ্ম-মন্দির এই গঙ্গা-স্রোতের উপর সংস্থাপন করিয়া "একমেবাদ্বিতীয়ং" জয়-পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন—ইহাতেই তাঁহারা পৃথিবীর সকল জাতির সকল প্রকার কীর্ত্তি অতিক্রম করিয়াছেন এবং সমগ্র ভূমণ্ডলের সমুদায় সভ্য জাতিকে সচকিত করিয়া তুলিয়াছেন। বঙ্গবাসিগণ কেবল এক মাত্র ধর্ম্ম-নিষ্ঠার প্রভাবে আত্মার গভীরতর প্রদেশে অবতরণ করত তথা হইতে সমুজ্জ্বল ধর্ম্ম-রত্ন উত্তোলন করিয়া স্বীয় জাতির গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। ভূমণ্ডলের যে দেশে জ্ঞান ধর্ম্মের যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছে, পৃথিবীর যে স্থানে ঈশ্বর ও পরকাল বিষয়ে যাহা কিছু সত্য প্রকাশিত হইয়াছে; ভারত ভূমির বঙ্গ-ভূমির ব্রাহ্মধর্ম্ম-রূপ মহা-বৃক্ষের সহিত তুলতা করিলে ইহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক উন্নত বলিয়া সকলকেই মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে।

ভূমণ্ডল-মধ্যে সকল জাতিই আপনাপন ধর্ম্ম-গ্রন্থকে ঈশ্বর-প্রণীত, এবং মনুষ্য-বিশেষকে ঈশ্বর-অবতার ও ঈশ্বরের দূত বলিয়াও স্বীকার করেন। তাঁহারদের মতে অরূপ অতীন্দ্রিয় ঈশ্বর কোন না কোন রূপ ধারণ পূর্ব্বক পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন; কখনো তিনি পরিমিত-বুদ্ধি পরিমিত-শক্তি অপরিণামদর্শী মনুষ্যের ন্যায় শোক-দুঃখে বিপত্তি-বিষাদে অভিভূত হইয়া বিলাপ ও ক্রন্দন করিয়াছিলেন; কখনো বা মনুষ্যের কৃতঘ্নতা দেখিয়া ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া সৃষ্টি নাশ করিতে—কুত্রাপি বা করুণা-পরবশ হইয়া জাতি-বিশেষের দাসত্ব অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ঈদৃশ প্রলাপোত্থিত বাক্য-সকলকে অনেকানেক ধর্ম্ম-সম্প্রদায় অভ্রান্ত বলিয়া অঙ্গীকার করেন। কোন জাতি বা মনুষ্য-বিশেষকে জ্ঞান ধর্ম্মের প্রীতি পবিত্রতার পূর্ণ আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করেন, কেহ বা মরণানন্তর অনন্ত নরকের কল্পনা করিয়া আত্মার অনন্ত উন্নতির পথে ভয়ানক কণ্টক-সকল আরোপ করেন। বনবাসী অসভ্য জাতির কথা দূরে থাকুক, বর্ত্তমান সময়েও এমন একটী সভ্য জাতিকে দেখিতে পাওয়া যায় না যে তাঁহারদিগের বিদ্যা বুদ্ধির সমধিক প্রাদুর্ভাব সত্ত্বেও সামান্য মনুষ্যকে আপনাদের জ্ঞান ধর্ম্মের পরিশুদ্ধ পূর্ণ আদর্শ বলিয়া অঙ্গীকার না করেন। ব্রাহ্মধর্ম্মই কেবল "একমেবাদ্বিতীয়ং" পরব্রহ্মকে সমুদায় মানব-কুলের জ্ঞান ধর্ম্মের একমাত্র পূর্ণ আদর্শ বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছেন। এই বঙ্গ ভূমির আর্য্য-সন্তানেরা সমুদায় পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ব-প্রথমে ব্রাহ্মধর্ম্মেরই প্রভাবে মনুষ্য-আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরকেই পূর্ণ বিশুদ্ধ আদর্শ-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাকেই কেবল ধর্ম্মপথের একমাত্র নেতা ও উপদেষ্টা বলিয়া পূজা করিতেছেন। অপরাপর সকল ধর্ম্ম-গ্রন্থই ঈশ্বরের প্রণীত বলিয়া ঘোষিত হইতেছে, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন "ব্রহ্ম-প্রতিপাদক বাক্য যে কোন গ্রন্থে পাওয়া যায়, তাহাই আদরণীয় তাহাই সেবনীয়; কিন্তু জীবন্ত ধর্ম্ম কোন গ্রন্থ-বিশেষে আবদ্ধ নহে।" বিশ্বতশ্চক্ষু ধর্ম্মাবহ পরমেশ্বর সকলেরই প্রভু, সকলেরই সুহৃদ্; অতএব তিনি সকলের আত্মাতেই

ব্রহ্মজ্ঞান-রূপ স্বর্গীয় অগ্নি নিহিত করিয়াছেন। তিনি আপনার বিশুদ্ধ অনন্ত মঙ্গল রূপ এবং ধর্ম্ম-নিয়ম-সকল এই তাবৎ ভৌতিক পদার্থে ও মনুষ্যের মানস-পটে এবং আত্মার গভীরতর প্রদেশে, অবিনশ্বর অক্ষরে, চির মুদ্রিত করিয়া রাখিয়াছেন। অপরাপর ধর্ম্ম-গ্রন্থে যেমন কোন মনুষ্য-বিশেষকে ঈশ্বর-প্রতিনিধি বা ঈশ্বর-অবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করে, পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহা স্বীকার করেন না; ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মতে স্বর্গের কুঞ্চিকা আর কাহারও হস্তে সমর্পিত নাই। ঈশ্বর স্বয়ংই ব্রাহ্মদিগের পাপত্রাতা, ও মুক্তি-দাতা, সকলই। কি জড় জগৎ, কি ধর্ম্ম-রাজ্য; সকলেরই শাসন তাঁহারই হস্তে। তিনিই বিশ্বরাজ্যের স্রষ্টা, বিশ্বরাজ্যের পাতা, পাপের শাস্তা পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা, শুভবুদ্ধির প্রেরয়িতা ও ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক; এবং তিনিই কেবল উন্নত ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের এক মাত্র নেতা। সঙ্কীর্ণ কূপ হইতে প্রশস্ত ক্ষেত্রে উপনীত হওয়া, পরিমিত হইতে অপরিমিত-স্বরূপে গমন করা, ক্ষুদ্র হইতে ভুমা ঈশ্বরকে আশ্রয় করা, দেব-মনুষ্যের উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া ঐহিক পারত্রিক মঙ্গলের জন্যে ঈশ্বরেরই পূজা করিয়া কেবল তাঁহারই পদে প্রণত হওয়া দেব-সেব্য ব্রাহ্মধর্ম্মের মহান্ উদ্দেশ্য। সংসারের দুর্গতি হইতে মনুষ্যের আত্মাকে অনন্ত উন্নতির পথে লইয়া যাওয়াই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রধান সঙ্কল্প।

যাঁহারা অনন্ত-জ্ঞান অনন্ত-শক্তি অনন্ত-মঙ্গল অশরীর একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকে সকলের আদি-কারণ এবং বিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা পাতা ও সংহর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস করেন, ঈশ্বরকে প্রীতি করা ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই যাঁহারা তাঁহার উপাসনা বলিয়া অঙ্গীকার করেন, এবং কেবল এক মাত্র তাঁহার উপাসনাতেই যাঁহারা ঐহিক পারত্রিক সকল প্রকার মঙ্গলেরই প্রত্যাশা করেন; তাঁহারাই সেই পরব্রহ্মের উপাসক, তাঁহারাই কেবল ব্রাহ্ম শব্দের বাচ্য। যে দেশীয় যে কোন ব্যক্তি হউন, যিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ-চতুষ্টয়ে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন, তিনিই ব্রাহ্ম উপাধির উপযুক্ত। নতুবা ইহার মধ্যে একের প্রতি অনাস্থা করিয়া অপর কয়েকটীর প্রতি আস্থা স্থাপন করিলেও তিনি ব্রাহ্ম নামের যোগ্য হন না। যদি কোন ব্যক্তি ঈশ্বরকে সকলের আদি-কারণ ও অশরীর অতীন্দ্রিয় বলিয়া স্বীকার করত তাঁহাকে পরিমিত ভাবে পূজা করেন, তিনি যেমন ব্রহ্মের উপাসক নহেন; তেমনি যদি কোন ব্যক্তি মরণানন্তর অনন্ত স্বর্গ না মানিয়া অনন্ত নরকের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, অথচ ঈশ্বরকে "শান্তং শিবমদ্বৈতং" পূর্ণ-মঙ্গল বলিয়া স্বীকার করেন; তিনিও ব্রাহ্ম শব্দের বাচ্য হইতে পারেন না। ঈশ্বরকে প্রীতি করা ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা—এই স্বতঃসিদ্ধ সত্যে বিশ্বাস সংস্থাপন করত যদি কোন মনুষ্যকে বা কৃত্রিম দেবতা-বিশেষকে সকল বিষয়ে মানব কুলের বিমল পূর্ণ আদর্শ বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া তাহার অনুসরণ ও অনুকরণেই বল বীর্য্য স্বাধীনতা, এবং জ্ঞান ধর্ম্ম পবিত্রতা প্রভৃতি ঐহিক পারত্রিক মঙ্গলের প্রত্যাশা করেন; তাহা হইলে তিনি অদ্বিতীয় ঈশ্বরের নিরতিশয়-ভাবের খণ্ডন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের অক্ষয় সত্যের মূলেই আঘাত করেন। ঈশ্বর যেমন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের এক মাত্র অধিপতি, তেমনি তিনিই কেবল ধর্ম্ম-রাজ্যের এক মাত্র নিয়ন্তা। তিনিই জ্যোতি, আর সকলই অন্ধকার। তিনিই

ভুমা, আর সকলই ক্ষুদ্র। তিনিই পূর্ণ, আর সকলই পরিমিত। ব্রাহ্মধর্ম্মের মত এই যে ঈশ্বরই কেবল এক মাত্র সত্য সুন্দর মঙ্গল, শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পূর্ণ-পুরুষ; আর তাঁহার সৃষ্ট দেব মনুষ্য সমুদায় জীবই অপূর্ণ ও অবিশুদ্ধ। ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশ্বাস এই যে মনুষ্য মহত্ত্ব ও দেবত্ব লাভ করিলেও তাহাতে পাপ মলিনতা দোষ ও কলঙ্ক থাকিতেই পারে, কেবল নিষ্পাপ নির্ম্মল নির্দ্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক এক মাত্র ভুমা পরমেশ্বর। দীপালোক সেই খানেই শোভা পায়, যেখানে সূর্য্যালোক পতিত না হয়। খদ্যোতজ্যোতি সেই সময়েই মনোহর বেশ ধারণ করে, যখন চন্দ্রমার অভাবে জগন্মণ্ডল অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে। মনুষ্য স্বীয় বুদ্ধিশক্তি, জ্ঞান ধর্ম্ম পবিত্রতার প্রভাবে তত দিনই জন-সমাজের মধ্যে ঈশ্বরের হস্তকে লুক্কায়িত রাখিয়া আপনারই মহিমা প্রকাশ করিতে পারে, আপনাকে আর্দশ বা অবতার-রূপে প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হয়; যতদিন জন-সাধারণ অজ্ঞান-অন্ধকারে ও দৃঢ়-বদ্ধ কুসংস্কারে অন্ধীভূত হইয়া পূর্ণ ঈশ্বরকে দেখিতে না পায়। সূর্য্য সমুদিত হইলে যেমন দীপালোক ম্লান হইয়া যায়, চন্দ্রমা উদিত হইলে যেমন খদ্যোত-জ্যোতি অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়ে; তেমনি অন্তরে "অতুল জ্যোতির জ্যোতি" ঈশ্বর প্রকাশিত হইলে মনুষ্যের সকলই ক্ষীণ হীন মলিন ও ক্ষুদ্রভাব ধারণ করে। যে ধর্ম্ম-শাস্ত্রের মধ্যে পূর্ণ ঈশ্বরের আবির্ভাব না হইয়াছে, সেখানে মনুষ্যেরই একাধিপত্য। এই আর্য্য-ভূমি ভারতবর্ষে বহু কালের বহুবিধ ধর্ম্ম-যুদ্ধের পর, সহস্র প্রকার মত-ভেদ ও জাতিভেদের পর, ঈশ্বর-প্রসাদে ব্রাহ্মধর্ম্ম অভ্যুদিত হইয়া নিঃসংশয়রূপে ঈশ্বরের স্বরূপ নিরূপণ করিয়াছেন—বহু যুগ-যুগান্তরের অনুসন্ধানের পর এখানে ধর্ম্মাচলের উন্নত চূড়া আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঈশ্বরই এই সমুন্নত ধর্ম্মাবলম্বীদিগের এক মাত্র উপাস্য দেবতা। তিনিই তাহারদিগের স্নেহ-দাতা পিতা মাতা, সুহৃৎ সখা; তিনিই তাহারদের জ্ঞান-দাতা, পাপ-ত্রাতা, মুক্তি-দাতা, বিধাতা। এ ধর্ম্মে উপাস্য উপাসকদিগের মধ্যে কিছুরই ব্যবধান নাই, কোন প্রকার আবরণও নাই। এ ধর্ম্মের আশ্রয় লইয়া জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন করিলে ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টি-পথে পতিত হয় না; তাঁহার মহিমা ভিন্ন ত্রিভুবনে আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। "প্রাণোহ্যেষযঃ সর্ব্বভূতৈর্ব্বিভাতি" ইনি প্রাণ-স্বরূপ, যিনি এই সর্ব্ব ভুতে প্রকাশ পাইতেছেন। "হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং। তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদোবিদুঃ"। ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিরা আত্ম-রূপ উজ্জ্বল ও শ্রেষ্ঠ কোষ মধ্যে সেই নির্ম্মল, নিরবয়ব, জ্যোতির জ্যোতি, শুভ্র পরমাত্মাকে উপলব্ধি করেন *"।

পৃথিবীর যাবতীয় পর্ব্বত-মালার মধ্যে যেমন ভারতবর্ষের হিমগিরিই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ, তেমনি ভারতের ব্রাহ্মধর্ম্ম-রূপ উন্নত শিখর আর সকল ধর্ম্মকে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে। জগদ্‌গুরু ব্রাহ্মধর্ম্ম সকল প্রকার সৃষ্ট বস্তুর অপূর্ণতা, ও মনুষ্যের ক্ষুদ্রতার পরিচয় দিয়া আমারদিগকে ভুমা ঈশ্বরেরই শরণাগত ও পদানত করিয়াছেন। এই পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মই কেবল মানব কুলকে "একমেবাদ্বিতীয়ং" এই বিশ্ব-বিজয়ী জয়-পতাকার অনুসরণ করিতে আহ্বান করিতেছেন। সহস্র সহস্র বৎসরের যাগ যজ্ঞ তপস্যার পর; বংশ-পরম্পরা-প্রচলিত স্থাবর

* ব্রাহ্মধর্ম্ম ১ খণ্ড ৩ অধ্যায়।

জঙ্গম, পশু-পক্ষী, নর-নারী, তেত্রিশ কোটি দেবতার আরাধনা ও অর্চ্চনার পর; লোভাসক্ত বিবিধ ধর্ম্ম সম্প্রদায় কর্ত্তৃক নানা প্রকার প্রপীড়নে অনির্ব্বচনীয় ক্লেশ-ভোগের পর; আমরা সত্য সুন্দর মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বরকে পাইয়া আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি। "একমেবাদ্বিতীয়ং" এই সমুন্নত সমুজ্জ্বল জয়-পতাকার অনুবর্ত্তী হইয়া আমরা প্রকৃত ধর্ম্ম-পথে আসিয়া উপনীত হইয়াছি। এই জন্য "একমেবাদ্বিতীয়ং" এই পবিত্র মধুর নাম আমারদিগের এত প্রিয়—এই জীবন্ত মহা-বাক্য অন্তরে বাহিরে চিরমুদ্রিত করিয়া রাখিবার জন্য আমারদিগের এত যত্ন। এই জন্যই আমরা ঈশ্বর-উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার স্তব স্তুতি সমাপ্তির পর লোমাঞ্চিতশরীরে "একমেবাদ্বিতীয়ং" এই পবিত্র শব্দ উচ্চারণ করিয়া আমারদিগের সহিত পরিমিত দেবতার উপাসকদিগের প্রভেদ নির্দ্দেশ করি। এই জন্যই আমরা তাঁহাকে প্রণিপাত করিয়া "একমেবাদ্বিতীয়ং" এই মৃত-সঞ্জীবন সত্য-গর্ভ মধুর নিনাদে উপাসনা-গৃহ নিনাদিত করিয়া হৃদয়ের অনুরাগ ও উৎসাহ দ্বিগুণিত চতুর্গুণিত করিয়া তুলি। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য ঈশ্বরের করুণা! যেমন শীতের পর বসন্ত, গ্রীষ্মের পর বর্ষা, নিশার পর দিবা, বাল্যের পর যৌবন, দুঃখের পর সুখের উদয় হয়; তেমনি এই বঙ্গ দেশে পৌত্তলিকতার পর ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছে। চিররোগী আরোগ্য লাভ করিলে যেমন শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন-বিষয়ে তাঁহার একটি স্বাভাবিক ইচ্ছার উদ্রেক হয়, তেমনি বঙ্গবাসিগণ বহু কষ্টে পৌত্তলিকতার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন বলিয়া স্বভাবতই ব্রাহ্মধর্ম্ম ও পৌত্তলিকতার মধ্যে একটী প্রশস্ত ব্যবধান রাখিবার জন্য তাঁহারদিগের এত প্রাণ-গত যত্ন উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহারা যে সত্য সুন্দর মঙ্গল পরমেশ্বরকে অধ্যাত্ম-যোগে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, সকলকে তাঁহারই সেবক ও উপাসক করিয়া পৃথিবীর উন্নতি সাধন করিবার জন্যই তাঁহারদিগের এই সমস্ত আয়োজন। তাঁহারা যে অমৃত পান করিয়া হৃদয় মনকে শীতল করিয়াছেন, তাহারই স্বাদগ্রহে সকলকে সমর্থ করিবার জন্য তাঁহারদিগের এত প্রয়াস। তাঁহারা ধর্ম্ম-পথের যে সমস্ত বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয়-গ্রহণ করিয়াছেন; সদ্‌ভাবে সাধুভাবে ভ্রাতৃভাবে উত্তেজিত হইয়া সেই সমস্ত উৎপাত হইতে জন-সাধারণকে সতর্ক করাই তাঁহারদিগের ঐকান্তিক ইচ্ছা ও আকিঞ্চন।

হে ব্রহ্ম-পরায়ণ সাধু সজ্জন সকল! তোমরা যে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছ, সেই অমৃত-তরুকে এই বঙ্গ ভুমিতে বদ্ধমূল করিবার জন্য যত্নযুক্ত হও। ব্রাহ্মধর্ম্মের অক্ষয় সত্য চারি দিকে মুক্ত হস্তে বিতরণ করিয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল কর। বঙ্গ ভুমির পতিত সন্তানসকলকে পতিত-পাবনের শরণাগত করিয়া জগতে প্রকৃত ভ্রাতৃ-ভাব বিস্তার কর। জন-সাধারণকে শুদ্ধ একমেবাদ্বিতীয়ং পরব্রহ্মের আদর্শ গ্রহণ করিতে শিক্ষা দিবার জন্য ধন প্রাণ যথা-সর্ব্বস্ব পণ করিয়া জীবনের সার্থক্য সম্পাদন কর। স্বাধীন-ভাবে অনুদ্ধত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কর; তোমারদের পিতৃ-পুরুষগণের সদ্‌ভাব ধর্ম্মভাবকে অবজ্ঞা করিও না। তাঁহারা প্রকৃত ব্রহ্ম-জ্ঞানের অভাবে অকিঞ্চিৎকর পৌত্তলিকতার আশ্রয়ে থাকিয়াও—অকৃত অমৃত ঈশ্বরকে পরিমিত-ভাবে পূজা করিয়াও যে সমস্ত উদারতা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন,

তোমরা সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াও কি তাহা হইতে আরো মহত্ত্ব প্রকাশ করিবে না। তাঁহারা ধর্ম্মের জন্য নিঃস্বার্থভাবে যে সমস্ত ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, অম্লান বদনে অভিমান-শূন্য হইয়া যে সকল ইন্দ্রিয়-সুখ, বিষয়-সুখ, বিসর্জ্জন দিয়াছেন, তাহা স্মরণ হইলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, মন উদার-ভাব ধারণ করে। তাঁহারদিগের প্রাণ-গত ধর্ম্ম-নিষ্ঠা, আন্তরিক ঈশ্বর-প্রীতি, অচলা ভগবদ্ভক্তির কত অযুত নিদর্শন অদ্যাপি এই ভারত ভূমিতে গগন ভেদ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এ দেশের আতিথ্য পরম ধর্ম্ম,ধর্ম্ম-ঘটিত ক্রিয়া-কলাপে অকাতরে অর্থ ব্যয় করাই এখানকার মহত্ত্বের চিহ্ন। নগর গ্রামে,বন উপবনে, পর্ব্বত কন্দরে, নদ নদী সমুদ্রকূলে,যেখানে যাইবে; সেইখানেই আর্য্য-বংশের সহস্র সহস্র ধর্ম্ম কীর্ত্তি লক্ষিত হইবে। নদীর স্রোত শুষ্ক ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, নগর গ্রাম বন উপবনে পরিণত হইয়াছে, রাজ্য ও রাজা বিনষ্ট হইয়াছে; তথাচ তাহার অভ্যন্তরে আর্য্য-জাতির প্রস্তর-নির্ম্মিত মহা-মূল্য ধর্ম্ম-কীর্ত্তি-সকল এখনো অটল-ভাবে বিরাজ করিতেছে। হিমালয় অঞ্চল হইতে সাগর তীর পর্য্যন্ত, সকল স্থানই আর্য্য-কীর্ত্তিতে পরিপূর্ণ। ব্রহ্মাবর্ত্তের পবিত্র সরস্বতী নদী কূলে, যেখানে তাঁহারা ঈশ্বর-উদ্দেশে যাগ যজ্ঞ তপস্যা করিতেন; আর এখানকার এই গঙ্গাতীরে, যেখানে ব্রাহ্মধর্ম্মানুযায়ী ব্রহ্ম-যজ্ঞ আরব্ধ হইয়াছে; ইহার মধ্য-গত সকল স্থানেই আর্য্য-বংশের সমাগমের চিহ্ন-স্বরূপ শোভনতম ধর্ম্ম-মন্দির সকল দেদীপ্যমান রহিয়াছে। তাঁহারদিগের ধর্ম্মকীর্ত্তি-সকল যেমন পৃথিবীর সকল কীর্ত্তিকে অতিক্রম করিয়াছে, সেই রূপ তাঁহারদিগের বহুযত্নলব্ধ সত্য-রত্নের মালা-স্বরূপ ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থও ভূমণ্ডলের সকল ধর্ম্ম-শাস্ত্রেরই সারভূত ও পরাকাষ্ঠা হইয়াছে।

আশ্চর্য্য! যেমন সাগর-গর্ভ বিদীর্ণ করিয়া বাড়বানল প্রজ্বলিত হইয়া থাকে; তেমনি সপ্তত্রিংশ বৎসর হইল, এই বল-হীন নিরীহ বঙ্গ-দেশে ব্রহ্ম-জ্ঞান-রূপ স্বর্গীয় অনল সকলের হৃদয়ে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে; এবং ইহার আলোকে ঈশ্বরের স্বরূপ-ভাব প্রকাশিত হইয়া পৌত্তলিকতার দুর্ভেদ্য দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে সকলে মুক্তি পাইয়াছে।

হে জগদীশ! এ কেবল তোমারই করুণা, তোমারই করুণা! তুমি আমারদিগকে নিরাশ্রয় দেখিয়া, স্বয়ংই আশ্রয় প্রদান করিয়াছ—পথ-হারা দেখিয়া স্বয়ংই আমারদের পথ প্রদর্শক হইয়াছ। তুমি আমারদিগকে নির্জ্জীব ও মৃত-কল্প দেখিয়া স্বয়ংই আমারদের আত্মাতে অমৃত বারি সিঞ্চন করিয়া পুনর্জ্জীবিত করিতেছ। তুমি আমাদের দেশে ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রেরণ করিয়া জ্ঞান বীর্য্য সুখ সৌভাগ্য লাভের সহস্র দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছ। বঙ্গভুমির যে এত দুর্দ্দশা, তাহা কেবল তোমাকে ভুলিয়াই; বঙ্গবাসীগণের যে এত দুর্ব্বলতা, সে কেবল প্রবল পৌত্তলিকতারই দোষে।

হে দীন দয়ালু অভাজন-গতি পরমেশ্বর! তুমি কৃপা করিয়া স্বয়ংই এখন আমারদিগের নিকটে সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত হইয়াছ। কেবল তোমারই প্রকাশে আমরা আমারদের ক্ষুদ্রতা ও মলিনতা বুঝিতে পারিয়া তোমার চির-শরণাগত ও পদানত হইয়াছি। আমরা আমারদিগের বল বীর্য্য, সুখ সৌভাগ্য, প্রীতি পবিত্রতা তোমারই প্রসন্নতা হইতে প্রত্যাশা করিতেছি। শুদ্ধ কেবল তোমারই উপাসনাতে আমারদিগের ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল হইবে, এই দৃঢ়

বিশ্বাস তোমার প্রতিই স্থাপন করিয়া তোমার ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি—তুমিও আমারদিগের অন্তরে থাকিয়া অভয় দান করিতেছ—তুমি স্বয়ংই স্নেহময় সুধাময় উপদেশ দিয়া আমারদের মুক্তির পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিতেছ।

হে জগদীশ! তুমি তোমার যে প্রসন্ন মুখ এক বার আমারদিগের নিকটে প্রকাশ করিয়াছ, তাহা আমারদের সম্মুখে চির কাল প্রকাশিত রাখ। হে পতিত-পাবন অকূল-কাণ্ডারী পরমেশ্বর! তুমি গতিহীন অসহায় বঙ্গদেশে যে উন্নত ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রেরণ করিয়াছ, তুমি স্বয়ংই সেই পবিত্র ধর্ম্মকে রক্ষা কর। পৃথিবী হইতে অধর্ম্ম-জনিত বিবাদ কলহ, বিদ্বেষ-মলিনতা, সংকোচ ক্ষুদ্রতা বিদূরিত করিয়া সমুদায় মানব জাতিকে কেবল তোমারি সেবক ও তোমারি উপাসক করিয়া জগতে "একমেবাদ্বিতীয়ং" এই বিশ্ব-বিজয়ী ব্রহ্ম নামের জয়-পতাকাকে রক্ষা কর। তোমার সুমধুর স্তুতি গানে ধরা ধাম পূর্ণ করিয়া এই মর্ত্ত্য লোকেই স্বর্গের আভাস প্রদর্শন কর—কায়-মনো-বাক্যে এই মাত্র প্রার্থনা করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং"

অনন্তর শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয় ঈশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা করিলেন—

"হে জগদীশ্বর! তুমি যখন কৃপা করিয়া এই বঙ্গ ভূমিতে তোমার ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রেরণ করিয়াছ, তুমি তাহাকে সংরক্ষণ কর। সপ্ত ত্রিংশ বৎসরাবধি তোমার এই অব্যাহত ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম-স্রোত ক্রমাগত এই বঙ্গ ভূমিতে প্রবাহিত হইয়া সকলের জ্ঞানকে পরিষ্কার করিতেছে, সকলের হৃদয়কে পবিত্র করিতেছে, সকলের কর্ম্মকে পরিশুদ্ধ করিতেছে। জ্ঞান ধর্ম্ম প্রীতি তোমার ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসাদে উন্নত ভাব ধারণ করিতেছে। এই বঙ্গ ভূমির দুর্ব্বলতার মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের বলে তাহার উন্নতির প্রত্যাশা। যখন তুমি সেই ব্রাহ্মধর্ম্মকে নির্ব্বীর্য্য বঙ্গ ভূমিতে প্রেরণ করিয়াছ, সেই ব্রাহ্মধর্ম্মকে তুমি স্বয়ংই রক্ষা করিবে। সূর্য্যের ন্যায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রাতঃকালে উদিত হইয়া কুজ্ঝটিকা ও বাষ্পে সময়ে সময়ে আচ্ছাদিত হইতেছে—তাহা দেখিয়া আমরা নানা ভয়ে ভীত হইতেছি! হে পরমেশ্বর! হে ভয়-হরণ! সেই ভয় হইতে পরিত্রাণ কর—সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ব্রাহ্মধর্ম্ম ভিন্ন আমারদের আর গতি নাই। আমারদের বঙ্গ ভূমি কেবল তোমারি ব্রাহ্মধর্ম্মের বলে পাপ-তাপ হইতে মুক্ত হইবে, অজ্ঞান-মোহ হইতে মুক্ত হইবে, ক্ষুদ্রতা সংকীর্ণতা হইতে মুক্ত হইবে, মদ মাৎসর্য্য হইতে মুক্ত হইবে—সেই তোমার ব্রাহ্মধর্ম্মের বলে আমারদের সকলি উন্নত হইবে, এই প্রত্যাশা করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি। হে পরমাত্মন্! তুমি ব্রাহ্মধর্ম্মকে রক্ষা কর। সকল দিক্ শূন্য দেখি, যদি তুমি হৃদয়ে পূর্ণ না থাক। তুমি এই হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া থাকিলে কেহই ভয় দিতে পারে না। হে পরমাত্মন্! তুমি ব্রাহ্মধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া তোমার উৎসাহ-কর কল্যাণ-রূপ আমারদের নিকটে সর্ব্বদা প্রকাশিত রাখ।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং"

অবশেষে ব্রহ্মসঙ্গীত হইয়া সমাজ ভঙ্গ হইল।

তত্ত্ববিদ্যা।

চতুর্থ অধ্যায়।

প্রজ্ঞা-ঘটিত মূল তত্ত্ব।

এক্ষণে প্রজ্ঞা-ঘটিত মূল তত্ত্ব কি কি, তাহাই অন্বেষণ করা যাইতেছে। ইতিপূর্ব্বে যে কয়েকটি মূল তত্ত্ব নির্ণীত হইল, প্রজ্ঞা-

নিহিত সত্য-ভাবই তাহারদিগের অবশ্যম্ভাবিতার নিদান-স্বরূপ। দেশ অবশ্যই দীর্ঘে প্রস্থে এবং বেধে অপরিসীম বিস্তৃত হইবে; কাল অবশ্যই ভূত হইতে বর্ত্তমানে ও বর্ত্তমান হইতে ভবিষ্যতে অবিরাম বহমান হইবে; বিষয়ী অবশ্যই এক, ভাবাত্মক ও স্বাধীন হইবে; বিষয় অবশ্যই অনেক, অভাবাত্মক ও পরাধীন হইবে—ইত্যাদি অবশ্যম্ভাবিতা কোথা হইতে আসিতেছে? আমি বলিতেছি—অথবা অন্য কেহ বলিতেছে—বলিয়া নহে; পরন্তু মূল সত্যেরই বলে উক্ত তত্ত্ব-সকল অবশ্যম্ভাবী হইয়াছে। যিনি সকল সত্যের মূল, তিনিই মূল সত্য এবং বিশেষতঃ আমারদের অন্তরে এই যে একটি মূল সত্যের ভাব বর্ত্তমান আছে, ইহার যিনি মূল, তিনিই সেই মূল সত্য। এই মূল সত্যে অবিশ্বাস করিলে বিশ্বাস করিবার আর কিছুই থাকে না; যে ব্যক্তি বলে যে "মূল সত্য নাই" তাহার প্রতি বক্তব্য এই যে "তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্য কি মিথ্যা? তোমার কথা যদি সত্য হয়, তবে উহার মূলে সত্য থাকাতেই উহা সত্য হইয়াছে, নতুবা আর কিসের গুণে উহা সত্য হইল? সুতরাং মূল সত্য যে অবশ্যম্ভাবী, উহা তোমার আপন কথা অনুসারেই সিদ্ধান্ত হইতেছে।" এই মূল সত্যই সৎ শব্দের অভিধেয়। বন শব্দের সহিত বন্য শব্দের যে রূপ সম্বন্ধ সৎ শব্দের সহিত সত্য শব্দেরও সেই রূপ সম্বন্ধ। বনের গুণেই যেমন পশু-বিশেষ বন্য শব্দে অভিহিত হয়, সেই রূপ সত্তের গুণেই বস্তু-সকল সত্য শব্দের বাচ্য হইয়াছে; অতএব সৎ এবং মূল সত্য উভয়ের একই অর্থ। মূল সত্য যখন আছেন, তখন তিনি চিরকালই আছেন; কেন না তিনি যদি কোন এক সময়ে না থাকিতেন, তাহা হইলে পরক্ষণে তিনি কোথা হইতে আসিবেন? শূন্য—অভাব—অসত্য হইতে সত্য কি রূপে বিনির্গত হইবে? "কথমসতঃ সজ্জায়েত"। পূর্ব্বে যদি অভাব মাত্র ছিল, তবে পরেও অভাব মাত্র না থাকিবার সম্ভাবনা কি? অতএব মূল সত্য সর্ব্বক্ষণই বিদ্যমান আছেন—যখন কোন জীবাত্মাই ছিল না, তখনও সেই মূল সত্য বর্ত্তমান ছিলেন, এখনো তিনিই বর্ত্তমান আছেন। সেই যে পুরাতন এবং সনাতন সত্য, তিনি যেমন আমারদের মুখের কথার উপর নির্ভর করেন না, যেমন তিনি আমারদের শারীরিক মানসিক অথবা আধ্যাত্মিক বলে স্থিতি করেন না; সেই রূপ তিনি অন্য কাহারো উপর নির্ভর করেন না, অন্য কাহারো বলে স্থিতি করেন না; তিনি আপনারই উপর নির্ভর করেন, আপনারই বলে স্থিতি করেন—তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন। তিনি আমারদের এই আধুনিক জ্ঞানের গুণে সত্য হয়েন নাই, প্রত্যুত সেই সত্যেরই গুণে আমারদের এই জ্ঞান সত্য হইয়াছে; আমরা আপনার বলে তাঁহাকে জানিতেছি না, প্রত্যুত তিনি আমাদিগকে জ্ঞান প্রেরণ করাতেই আমরা তাঁহাকে জানিতেছি; তিনি অবিতথ সত্য-রূপে আমারদের সমক্ষে স্বয়ং বিরাজ করিতেছেন বলিয়া আমরা তাঁহাকে কাযে কাযেই জানিতেছি। এমন কখনই হইতে পারে না যে তিনি বাস্তবিক এক রূপ হইয়া আর এক রূপে আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন। প্রত্যুত ইহাই বিশ্বাস যোগ্য যে মূল সত্য আপনার ভাব, যাহা আমাদের আত্মাতে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন, তদ্দ্বারা তিনি যথার্থ রূপেই আপনার পরিচয় প্রদান করিতেছেন। আমারদের আত্ম-জ্ঞান যেমন আমারদের আত্মার স্বরূপের যথার্থই পরিচয় দিতেছে; সেই রূপ মূল সত্য

BLEED THROUGH.

এবং মূল সত্যের প্রজ্ঞা-গত ভাব, এ দুয়ের মধ্যে কোন প্রকারেই বিরোধ স্থান পাইতে পারে না; উদাহরণ যথা—যদি মূল সত্যের ভাব একমেবাদ্বিতীয়ং ও পূর্ণ লক্ষণাক্রান্ত হয়, তাহা হইলে সাক্ষাৎ যিনি মূল সত্য তাঁহারই যে ঐ সকল লক্ষণ, ইহাতে আর সংশয় হইতে পারে না। এক্ষণে মূল সত্যের স্বতঃ-সিদ্ধ লক্ষণ কি তাহাই নির্ণয় করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ—অবশ্যম্ভাবী মূল সত্যের ভাব যাহা আমারদের অন্তরে বিরাজিত আছে, তাহা সকল সত্যের সম্বন্ধেই এক মাত্র অদ্বিতীয়; কারণ এই মূল সত্য-ভাব অনুসারেই আমরা আপনাকে সত্য বলিতেছি, ইহারই অনুসারে আমরা অন্য ব্যক্তিকে সত্য বলিতেছি এবং এই একই সত্য ভাব অনুসারে কি জ্ঞান, কি জড়, সকলকেই আমরা সত্য বলিতেছি; অতএব সাক্ষাৎ মূল সত্য—যিনি উক্ত সত্য-ভাবের প্রবর্ত্তয়িতা—তিনি যে যথার্থই একমেবাদ্বিতীয়ং, ইহার কদাপি অন্যথা হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ—এই অন্তর্নিহিত মূল সত্য-ভাব অনুসারেই আমরা বস্তু-সকলের সদাত্মক বা ভাবাত্মক লক্ষণ-সকল অবগত হই—অর্থাৎ যাহা যে পরিমাণে এই মূল সত্য ভাবের অনুযায়ী, তাহাকে সেই পরিমাণেই ভাবাত্মক বলিয়া অবধারণ করি। যথা—জ্ঞান উক্ত সত্য-ভাবের অনুযায়ী হওয়াতে উহাকে আমরা ভাবাত্মক বলিয়া নিশ্চয় করি, মূঢ়তা সে রূপ না হওয়াতে ইহাকে আমরা অভাবাত্মক বলিয়া স্থির করি; সুতরাং মূল সত্যে সকল প্রকার ভাবাত্মক লক্ষণই বিদ্যমান আছে, এবং কোন অভাবাত্মক লক্ষণই তাঁহার রূপকে কলঙ্কিত করিতে পারে না। উদাহরণ—জড় বস্তুর জ্ঞেয়ত্ব লক্ষণ আছে কিন্তু জ্ঞাতৃত্ব লক্ষণ নাই; সুতরাং জ্ঞেয়ত্ব উহার ভাবাত্মক লক্ষণ এবং অজ্ঞাতৃত্ব বা অজ্ঞতা উহার অভাবাত্মক লক্ষণ। আমারদের আত্মা আপনাকে আপনি জানে; সুতরাং ইহাতে জ্ঞেয়ত্ব লক্ষণও আছে এবং জ্ঞাতৃত্ব লক্ষণও আছে। এই রূপ জড় বস্তুর জ্ঞেয়ত্ব-রূপ ভাবাত্মক লক্ষণ যেটি, তাহা আমারদের আত্মাতে আছে; কিন্তু তাঁহার অজ্ঞতা রূপ অভাবাত্মক লক্ষণ যেটি, তাহা আমাদের আত্মাতে নাই। কিন্তু আমাদের এই আত্মাতে এক দিকে যেমন জ্ঞাতৃত্ব-জ্ঞেয়ত্ব-রূপ ভাবাত্মক লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়, অন্য দিকে আবার উহাতে অল্পজ্ঞতা-রূপ অভাবাত্মক লক্ষণও দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে বক্তব্য এই যে পরমাত্মাতে সকল ভাবাত্মক লক্ষণই বিদ্যমান আছে—সুতরাং জ্ঞাতৃত্ব এবং জ্ঞেয়ত্ব রূপ যে দুই জ্ঞান-সম্বন্ধীয় ভাবাত্মক লক্ষণ জীবাত্মাতে অবস্থান করে, সে দুই লক্ষণও তাঁহাতে অবশ্যই বিদ্যমান আছে—কিন্তু পূর্ব্বোক্তে অল্পজ্ঞতা রূপ অভাবাত্মক লক্ষণ, যাহা দেখা গেল, তাহা পরমাত্মাতে কদাপি স্থান পাইতে পারে না। আর আর লক্ষণ সম্বন্ধেও এই রূপ—অর্থাৎ পরমাত্মাতে মঙ্গল-ভাবের এক টুকুও অভাব নাই, সুতরাং তাঁহাতে অমঙ্গল ভাবের সম্পূর্ণই অভাব আছে; তাঁহাতে জ্ঞানের এক টুকুও অভাব নাই, অজ্ঞানের সম্পূর্ণই অভাব আছে; স্বাধীনতার এক টুকুও অভাব নাই, পরাধীনতার সম্পূর্ণই অভাব আছে। এই রূপ পরমাত্মাতে ভাবের অভাব নাই, প্রত্যুত অভাবেরই অভাব আছে—অর্থাৎ তাঁহাতে কোন কিছুরই অভাব নাই; অতএব পরমাত্মা সর্ব্বতোভাবে ভাবাত্মক, তিনি পূর্ণ।

তৃতীয়তঃ—পরমাত্মা যে সম্পূর্ণ-রূপে স্বাধীন, তাহা ইতি পূর্ব্বে যথোচিত রূপে স্থাপিত

হইয়াছে। যখন বলা হইয়াছে যে সমুদায় জগতের সম্বন্ধে পরমাত্মা অদ্বৈত, পূর্ণ এবং স্বাধীন; তখন তাঁহার সম্বন্ধে জগৎ যে দ্বৈত-সাপেক্ষ, অপূর্ণ এবং আশ্রিত, ইহা আর বলিবার অবশিষ্ট নাই। পরমাত্মার দ্বিতীয় একেবারে অসম্ভব, জগতের প্রত্যেক বস্তুর দ্বিতীয় সর্ব্ব প্রকারে আবশ্যক; পরমাত্মার কিছুরই অভাব নাই, জগৎ অভাব দ্বারা নিয়তই ভ্রাম্যমান হইতেছে; পরমাত্মা আপনারই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া আছেন, জগৎ অন্যের আশ্রয় ব্যতীত থাকিতে পারে না।

পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন যে, জগতের এক বস্তু অপর যে কোন বস্তুকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহাও আবার অন্য আর এক বস্তুকে আশ্রয় করিয়া থাকে; এবং যে সকল বস্তু পরস্পরাশ্রিত, তাহারাও আর একটি কোন সাধারণ আশ্রয়ের অবলম্বন ব্যতীত থাকিতে পারে না। উদাহরণ—পৃথিবীর পরমাণু-সকল পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া আছে; এক পরমাণু নিকটস্থ আর এক পরমাণুকে এক দিকে আকর্ষণ করিতেছে এবং শেষোক্ত পূর্ব্বোক্তকে তাহার বিপরীত দিকে আকর্ষণ করিতেছে; এই রূপ আশ্রয়-সম্বন্ধে একের যাহা অভাব, অন্যে তাহা মোচন করত পৃথিবীর তাবৎ পরমাণু এক শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। এই পরমাণু-সকলের পরস্পর সংযোগ-সাধক একটা কোন আশ্রয় যে অবশ্যই মূলে আছে, ইহা প্রথমতঃ সহজেই প্রতীয়মান হয়; পশ্চাতে অনুসন্ধান দ্বারা জানা যাইতে পারে যে পৃথিবীর মধ্যস্থিত কেন্দ্রই সেই আশ্রয়-স্থান—কেন না ইহারই এক মাত্র আকর্ষণ বশতঃ পৃথিবীস্থ তাবৎ পরমাণু পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে ক্ষমবান্ হইয়াছে। যেমন আকর্ষণাদি জড়-শক্তির আশ্রয়ে জড় বস্তু-সকল অবস্থিতি করে, সেই রূপ আবার জ্ঞান প্রেমাদি চেতন-শক্তির আশ্রয়ে চেতন পদার্থ-সকলকে নির্ভর করিতে দেখা যায়। আত্মাদিগের মধ্যে পরস্পর সদ্ভাবের সঞ্চার হইলে এক আত্মা অন্য আত্মাকে কেমন আশ্চর্য্য রূপে ধারণ করিয়া থাকে। প্রিয় ব্যক্তি নিকটে থাকিলে রোগ শোকের কেমন উপশম হয়; পিতা পুত্রের আত্মার মধ্যে কেমন এক নিগূঢ় বন্ধন অবস্থিতি করে; ঈশ্বর-পরায়ণ সাধু ব্যক্তি নিকটে থাকিলে মৃত্যু কালেও কেমন অভয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এরূপ কেন হয়? না ঈশ্বরের পূর্ণ ভাব, সমুদায় আত্মাকে গূঢ় রূপে আকর্ষণ করাতে উহারা পরস্পর পরস্পরের সহিত এক না এক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতেছে এবং সকলেই স্ব স্ব জীবন ধারণে অনুরাগী ও উদ্যোগী হইতেছে। জীবনের প্রতি অনুরাগই জীবনের মূল; এই অনুরাগ শিথিল হইলে জীবনের মূলও শিথিল হইয়া যায়। ঈশ্বরের পূর্ণ জীবন্ত ভাব যাঁহারদের অন্তর্দৃষ্টি-পথে যত স্পষ্ট-রূপে আবির্ভূত হয়, তাঁহারা আপনারদিগের জীবনের উন্নতি পক্ষে তত অধিক অনুরাগী হন, এবং এই অনুরাগ-আহুতি প্রাপ্ত হইলে তাঁহারদের জীবন-শিখা আরও তেজস্বী ও ঊর্দ্ধগামী হইতে থাকে। কিন্তু যাঁহারদের মনে ঈশ্বরের ভাব এখনো যথোচিত পরিস্ফুট না হইয়াছে, তাঁহারদের চক্ষে জীবন কখন কখন শূন্য রূপ ধারণ করে; এ অবস্থায় সাধু-সঙ্গই তাঁহারদের পক্ষে মহৌষধ—কেননা যথার্থ সাধু ব্যক্তির আত্মোৎসাহে অনেক নির্জ্জীব হৃদয় জীবন পাইয়া কৃতার্থ হয়, তাঁহার জ্ঞানালোকে অনেক পথ-হারা পথিক পথ অন্বেষণ করিয়া প্রাপ্ত হয়। আত্মাদিগের মধ্যে এই যে আশ্রয়-আশ্রিত-ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, এক মাত্র পর-

মাত্মা সকলের মূলে থাকাতেই এ রূপ হইতে পারিতেছে। তিনি মূলে থাকাতেই সকল আত্মা একই পূর্ণ ভাবের দিকে অগ্রসর হইতে উৎসুক হইতেছে এবং যে যত পূর্ণতার মাত্রা সঞ্চয় করিতেছে, সে সেই পরিমাণে অন্যান্য ব্যক্তিদিগের আত্মাতে অনুরাগ ও জীবন সঞ্চার করিয়া তাহারদিগকে উন্নতির পথে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইতেছে। অতএব এক বস্তুর আশ্রয় অন্য বস্তু,তাহার আশ্রয় আর এক বস্তু—জগতের তাবৎ পদার্থই এই প্রকারে চলিতেছে। এখানে জিজ্ঞাস্য এই যে উহারদের চরম আশ্রয়-দাতা কে? এ প্রশ্ন কোন রূপেই নিবারণীয় নহে। চরম আশ্রয় কেবল তিনিই হইতে পারেন, যিনি আপনারই আশ্রয়ে আপনি স্থিতি করিতেছেন, যিনি সম্পূর্ণ রূপে স্বাধীন—পরমাত্মাই সমুদায় জগতের এক মাত্র মূলাধার।

এক্ষণে প্রজ্ঞার স্বতঃ-সিদ্ধ লক্ষণ-সকলের প্রতি মনোনিবেশ করা যাইতেছে। প্রথমতঃ—বুদ্ধি এক এক পদ করিয়া সাধারণ হইতে সাধারণ তত্ত্ব-সকলে আরোহণ করে, প্রজ্ঞা একেবারেই সর্ব্বোপরিস্থ সত্যে মস্তক উন্নত না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে না। সত্যের সত্য, আত্মার আত্মা, পরমাত্মাই উহার চরম পর্য্যাপ্তি-স্থল। সর্ব্বান্তর্যামী পরমাত্মা স্বয়ং প্রজ্ঞার আকর হওয়াতে এক জনের আত্মাতে প্রজ্ঞা যাহা বলে, তাহা সকল আত্মা হইতেই সায় পায়—প্রজ্ঞা সার্ব্বভৌমিক।

দ্বিতীয়তঃ—অপূর্ণ জগতে আমারদের প্রজ্ঞা কখনই তৃপ্তি লাভে সমর্থ হয় না—কেন না জগতের সর্ব্বত্রই সত্যের অভাব দেদীপ্যমান রহিয়াছে, কেবল ঈশ্বরেতে লেশ মাত্রও সত্যের অভাব নাই। যখন অপূর্ণ কিছুতেই প্রজ্ঞার তৃপ্তি হয় না, তখন ইহা বলা বাহুল্য যে পূর্ণ-স্বরূপই উহার এক মাত্র উপজীব্য; তাঁহারই প্রসাদ উপভোগ করিয়া উহা নিত্য নিত্য উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। প্রজ্ঞাকে যখন আমরা দেখি, তখন দেখি যে স্বয়ং ঈশ্বর হইতে উহা অবতীর্ণ হইতেছে; এবং ঈশ্বরের মাহাত্ম্যের প্রতি আমারদের বিশ্বাস এত প্রবল যে তাঁহার নিকট হইতে অল্প কিছু পাইয়া আমারদের আশার কোন মতেই নিবৃত্তি হয় না। যাঁহার ভাণ্ডার অক্ষয়, তাঁহার কি দান অক্ষয় হইবে না? অতএব সাক্ষাৎ তাঁহার নিকট হইতে আমরা যাহা কিছু প্রাপ্ত হই, তাহা হইতে আরো অধিক প্রাপ্তির জন্য আমারদের মন প্রত্যাশাপন্ন না হইয়া কোন রূপেই ক্ষান্ত থাকিতে পারে না। পূর্ব্বে আমারদের কিছুই ছিল না—তিনি যে কারণে আমারদিগকে এই অল্প কিছু প্রদান করিলেন, সেই একই কারণের উপর নির্ভর করিয়া আমরা প্রত্যাশা করিতেছি যে তিনি যখন আমারদের প্রার্থনার পূর্ব্বে আমারদের মহৎ অভাব-সকল পূর্ণ করিয়াছেন, তখন আমারদের স্বভাব-সিদ্ধ অনিবার্য্য প্রার্থনা তিনি কেন না পূর্ণ করিবেন? এবং এ প্রত্যাশার যখন তিনি নিজেই মূল, তখন তিনি যে উহা পূর্ণ করিবেনই, তাহাতে আর সংশয় হইতে পারে না। আমরা যেমন দেখিতেছি যে তিনি স্বয়ং প্রজ্ঞা দ্বারা আমারদের আত্মার অভাব মোচন করিতেছেন, তেমনি ইহাও প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতেছি যে উক্ত মঙ্গল কার্য্যে তিনি কখনই কৃপণতা করিবেন না; অতএব ঈশ্বর-প্রসাদে আমারদের প্রজ্ঞা যে চির উন্নতিশীল, ইহা আমরা জানিয়াছি।

তৃতীয়তঃ—প্রজ্ঞার পরিস্ফুটন দ্বারা আমরা স্বাধীনতা লাভে সমর্থ হইতেছি। ঈশ্বর আমারদের অন্তরে প্রজ্ঞাকে পরিস্ফুট করাতেই আমরা স্বাধীনতার দিকে অহরহ অগ্রসর হইতেছি। যৌবন কাল পর্য্যন্তই আমারদের শারীরিক উন্নতির সীমা; কিন্তু আমারদের আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা লাভের সীমা নাই। বাল্য, যৌবন, জরা—ইহারা এক দিকে যেমন মৃত্যুতে উপনীত হইবার সোপান, অন্য দিকে সেই রূপ মৃত্যুকে পরাজয় করিবার সোপান—স্বাধীনতা-শিখরে বা মুক্তি-ধামে যাত্রা করিবার পান্থশালা। যখন শরীর ক্ষয় হইতে থাকে, বিষয়াকর্ষণ শিথিল হইতে থাকে, ইন্দ্রিয়-সকল নির্ব্বাণ হইতে থাকে ও বিষয়-বুদ্ধি অবসর লইতে থাকে; তখন কাজেই প্রজ্ঞা পরিস্ফুট হয় ও আত্মার স্বাধীনতা পারমার্থিক রাজ্যের দিকে অবিরত উদ্ভূত হয়। ঈশ্বর-প্রসাদে আমারদের প্রজ্ঞা উন্নতি লাভ করিয়াই ক্ষান্ত থাকে না—উহা যত উন্নত হয়, ততই চতুর্দ্দিকে আপন প্রভাব বিকীর্ণ করিতে থাকে। প্রজ্ঞার প্রভাব দেহ মনের উপরে, উৎকৃষ্ট জীব ও নিকৃষ্ট জীবের উপরে, সহৃদয় আত্মীয়দিগের মধ্যে। জগৎ সংসারে প্রজ্ঞা যত উজ্জ্বল-ভাবে স্ফূর্ত্তি পাইবে, ততই জীবাত্মা-সকল একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মের অধীন হইয়া, ব্রহ্মবান্ হইয়া, স্বাধীন-ভাবে কার্য্য করিবে—ইহাতে জন-সমাজে পরম সুশৃঙ্খলা সমানীত হইবে। জ্ঞান যাহা বলে, তদনুসারে চলাই যদি স্বাধীনতা হয়, জ্ঞানের অধীন হওয়াতেই যদি স্বাধীনতা হয়; তবে পূর্ণ-জ্ঞান-স্বরূপের অধীন হইলে আমারদের স্বাধীনতা কত না প্রবর্দ্ধিত হইবে? প্রজ্ঞার প্রভাব পরমাত্মা হইতে জীবাত্মাতে নিঃশ্বসিত হয়, জীবাত্মা হইতে অন্য জীবাত্মাতে সঞ্চারিত হয়; এবং বিষয়-রাশির মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহারদিগকে আত্মার অধীনে আনয়ন করে। প্রজ্ঞার প্রভাবই আমারদের স্বাধীনতার নিদান-স্বরূপ; এবং স্বীয় মহতী প্রজ্ঞার প্রভাব দ্বারাই পরমাত্মা আমারদের মন হরণ করিয়া, সার্ব্ব-ভৌমিক সুশৃঙ্খলার অধীনে—শান্তি, মুক্তি ও মঙ্গলের অধীনে—আপনারই অধীনে—আমারদিগকে দিন দিন আহ্বান করিতেছেন। অতএব প্রজ্ঞা জড়বৎ অকর্ম্মণ্য নহে—উহা ব্রহ্ম-তেজে বলী হইয়া, উৎসাহে পূর্ণ হইয়া, যখন কার্য্যে পরিস্ফুট হয়; তখন প্রভুর কর্ত্তৃত্বে যেমন দাসের কর্ত্তৃত্ব, অথবা সেনাপতির কর্ত্তৃত্বে যেমন সেনার কর্ত্তৃত্ব, সেই রূপ একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্বে আমারদের আপনারদেরই কর্ত্তৃত্ব জাজ্বল্যমান হইয়া উঠে। সকল বস্তুই ঈশ্বরের অধীন; কিন্তু প্রজ্ঞার প্রভাবে আমরা স্বাধীন-রূপে জ্ঞান ইচ্ছা ও প্রীতি-সহকারে ঈশ্বরের অধীন হইতে সমর্থ হইয়াছি।

প্রজ্ঞা-ঘটিত মূল-তত্ত্বগুলিকে নিম্নে লতা-বদ্ধ করা গেল।

পরমাত্মা	জগৎ	সম্বন্ধ-মূলক প্রজ্ঞা
অদ্বৈত	দ্বৈত-সাপেক্ষ	সার্ব্বভৌমিক
পূর্ণ	অপূর্ণ	উন্নতিশীল
মূলাধার	আশ্রিত	প্রভাবময়

সংস্কৃত সাহিত্য।

২৭৫ সংখ্যক পত্রিকার ৬১ পৃষ্ঠার পর।

মহাবীর আলেকজান্দরের ভারতবর্ষ আক্রমণের পর গ্রিশিয়েরা যখন ভারতবর্ষীয়দিগের সহিত সম্যক্ পরিচিত হইয়াছিলেন, তখন ভারতবর্ষীয়দিগের পূর্ব্বোল্লিখিত রূপই অবস্থা ছিল। ইতিবৃত্তবিৎ মহাত্মা মেগাস্থিনিস্ কহেন যে ঐ সময় ভারতবর্ষীয় হিন্দুরা মনুষ্যের জীবন ও মৃত্যুর বিষয়েই সমধিক আন্দোলন করিতেন। তাঁহারা এই জীবনকে গর্ভস্থ ভ্রূণের জীবনের ন্যায় অনুমান করিতেন এবং যাঁহারা মৃত্যু বি-

ময়ে কৃত-নিশ্চয় হইয়া তন্নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া আছেন, মৃত্যুই তাঁহাদিগের পক্ষে জন্ম ও প্রকৃত জীবন বলিয়া বিবেচনা করিতেন*। সাংসারিক শুভ ও অশুভ এই দুইটিতে তাঁহারা নিতান্ত উদাসীন ছিলেন। যদিও তাঁহারা ধর্ম্ম-বুদ্ধিতে শুভ ও অশুভ এই উভয়ের ভেদ স্বীকার করিতেন এবং যদিও তাঁহাদিগের বেদ ও স্মৃতি শাস্ত্র-সকল পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে তাঁহারা ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম নিয়মের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন †; তথাচ তাঁহারা কহিতেন যে এই জীবনে যাহা কিছু উপস্থিত হইতেছে, তন্মধ্যে কোনটিকে শুভ ও কোনটিকে অশুভ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না ‡। তাঁহারা মনুষ্যের সুখ দুঃখের ভাব অপনীত করিবার নিমিত্তই এই মত সবিশেষ পোষণ এবং কষ্ট-সহিষ্ণুতা ও সুখে অনাসক্তিকেই মনুষ্যের বিষয়-বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা বলিয়া উদ্ঘোষণ করিতেন।

ঐ মহাত্মা আরও কহিয়াছেন যে, হিন্দুরা স্ত্রীলোকদিগকে আত্ম-জ্ঞানের বিষয় কদাচই উপদেশ দিতেন না। তাঁহারা এই রূপ বিবেচনা করিতেন, যদি স্ত্রীলোকেরা আত্ম-জ্ঞান শিক্ষা করিয়া সুখ দুঃখে একান্ত ঔদাসীন্য প্রদর্শন পূর্ব্বক জীবন ও মৃত্যুকে একই রূপ পদার্থ বিবেচনা করে, তাহা হইলে তাহারা অন্যের চির-কিঙ্করীর ন্যায় আর অবস্থান করিবে না এবং যদি তাহারা আত্ম-জ্ঞানের যাথার্থ্য অনুধাবনে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে স্বভাব-সুলভ চপলতা বশত অনধিকারীর নিকট সেই অযথার্থ কথা-সকল অনায়াসেই প্রকাশ করিবে। এই ইতিবৃত্তবিৎ যাহা কহিয়াছেন, তাহা হিন্দুজাতির ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রমাণ-সঙ্গত। আমরা সূত্র ও গৃহ্যসূত্র পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই যে স্ত্রীলোকের বেদে কিছুমাত্র অধিকার নাই। গৃহস্থাশ্রম প্রবেশের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরই বেদে অধিকার লাভ করা সম্পূর্ণ আবশ্যক। এমন কি, বেদের উপরই ব্রাহ্মণদিগের সমুদায় শিক্ষা নির্ভর করে; এই নিমিত্ত তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক গুরু-গৃহে গুরুর দুঃসহ শাসনের বশবর্ত্তী হইয়া বহুকাল অতিবাহিত করিতেন। যাহাই হউক, যদিও স্ত্রীলোকের বেদে অধিকার নাই; তথাচ আমরা বেদ পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই, স্বামী আপনার বিবাহিতা স্ত্রীর সহিত মিলিত হইয়া যাগযজ্ঞাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে, এই রূপ বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে*। ব্রাহ্মণ-ভাগে

* ধর্ম্মযাজক বটলার কহেন যে বর্ত্তমান জীবন ও মৃত্যুর বিষয় জ্ঞাত হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে মৃত্যু জন্মের ন্যায় ক্রমশ আমাদিগকে জীবনের উন্নত অবস্থায় উপনীত করিয়া থাকে।

+ ঋগ্বেদে বরুণের স্তুতিবাদে একস্থলে কীর্ত্তিত হইয়াছে 'বিমচ্ছ্বথায় রশনামিবাগ ঋধ্যম তে বরুণ খামৃতস্য। মা তন্তশ্ছেদি বয়তো ধিয়ং মে মা মাত্রা শার্য্যপসঃ পুর ঋতোঃ। ২৪সূ ৫ঋ। হে বরুণ! গলদেশ হইতে রজ্জুর ন্যায় বিধি-বিহিত কার্য্যের অননুষ্ঠান-জনিত পাপ-ভার আমা হইতে অপনীত কর। তুমি আমাকে তোমার সৎপথে গমন করিতে দেও। আমি কর্ম্মক্ষেত্রে যে সমস্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিব, তৎসমুদায় যেন উচ্ছিন্ন না হয় এবং কর্ম্ম সমাপ্তির পূর্ব্বে কর্ম্মের যেন কোন অঙ্গ-বৈকল্য না জন্মে। 'অপো সু ম্যক্ষ বরুণ ভিয়সং মৎসম্রাভূতাবোঽনু মা গুভায়। দামেব বৎসাদ্বি মুমুক্ষ্যংহো ন হি ত্বদারে নিমিষশ্চনেশে'। ৬ ঋ। হে বরুণ! আমার অন্তর হইতে ভয় সমুদায় বিদূরিত করিয়া দেও। হে সম্রাট! গোবৎসের গলদেশ হইতে যেমন রজ্জু উন্মোচন করে, সেই রূপ আমাকে পাপ মুক্ত করিয়া দেও। আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন কর। তোমাহইতে পরিচ্যুত হইলে আমি আপনার নিমেষ-পাতেও সমর্থ হই না। 'ধৃতব্রতা আদিত্যা ইষিরা আরে মৎকর্ত্ত রহস্মরি বাগঃ। সূ ২৯। ১ ঋ। হে বিশ্বেদেবগণ! তোমরা সকলের প্রার্থনীয়। এক্ষণে আমাদিগকে পাপ সমুদায় হইতে উন্মুক্ত কর।

‡ "সাংসারিক সুখ দুঃখ যে ধর্ম্মাধর্ম্ম শুভাশুভের পরিমাপক নহে, ইহা এই ক্ষণে ইউরোপের ধর্ম্ম-নীতিজ্ঞ পণ্ডিতেরা স্বীকার করিতেছেন। কিন্তু আশ্চর্য্য যে এই সিদ্ধান্ত কত পূর্ব্বে ভারতবর্ষেও প্রচলিত ছিল।" সম্পাদক।

* বেদে উক্ত হইয়াছে 'বিত্বা তত জে মিথুনা অবস্যবঃ, হে ইন্দ্র! যজমানগণ সহধর্ম্মিণীর সহিত তোমার উদ্দেশে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ ভাগে উক্ত হইয়াছে 'জায়াপতী অগ্নি মাদধীরীতাং'। সূত্রে উক্ত হইয়াছে বেদং পত্নৈ প্রদাব বাচয়েৎ। স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে 'নাস্তি স্ত্রীনাং পৃথক যজ্ঞং' এই সমস্ত প্রমাণ দ্বারা স্ত্রীলোকের স্বতন্ত্র কোন যজ্ঞানুষ্ঠানেই অধিকার নির্দ্দিষ্ট নাই।

পতি-পত্নীর একত্র যজ্ঞানুষ্ঠানের বিধি বিহিত হইয়াছে। সূত্রেও এই রূপ নির্দ্দিষ্ট আছে যে, যজ্ঞকালে স্বয়ং স্বামী যজ্ঞের উপযোগী মন্ত্র সকল সহধর্ম্মিণীকে পাঠ করাইবেন; অথবা পুরোহিতও যজমানের পত্নীকে বেদোক্ত মন্ত্র পাঠ করাইতে পারেন। যদিও যজ্ঞানুষ্ঠান-কালে স্ত্রীলোকের মন্ত্রোচ্চারণের বিধি আছে; তথাচ তাহারদিগের আত্ম-জ্ঞানে কিছু মাত্র অধিকার নাই। কিন্তু মৈত্রেয়ী প্রভৃতি কয়েকটি ব্রহ্মবাদিনীদিগের পক্ষে এই নিয়মের বিপ্রতিপত্তিও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

মহাত্মা ম্যাগ্যাস্থিনিস্ হিন্দুদিগের বিষয়-বৈরাগ্য ও শান্ত প্রকৃতির বিষয় যেরূপ উল্লেখ করিয়াছেন, আমরা পূর্ব্বতন শাস্ত্র সমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়া অবিকল সেইরূপই দেখিতে পাই। এই সমস্ত শাস্ত্র এই বিজ্ঞান-নিপুণ জাতির পার্থিব চরিত্র কিছু মাত্র অভিব্যক্ত করিতেছে না। সাংসারিক উন্নতি-সম্পাদনে আসক্ত হইলে ইতিবৃত্তে যেমন তাহার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়, হিন্দুদিগের কোন শাস্ত্রে তাহার কিছুই চিহ্ন নাই।

এই রূপ বিষয়-বিরক্ত ব্যক্তিরা যে পার্থিব চরিত্র প্রদর্শন করিবেন, ইহা নিতান্ত অসম্ভব। ইহাঁরদিগের অত্যুৎকৃষ্ট মানসিক ভাব ইহাঁরদিগকে পার্থিব চরিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাতও করিতে দেয় নাই। কিন্তু এই বলিয়া এই জাতি কোন অংশেই আমারদিগের অশ্রদ্ধেয় হইতে পারে না। স্বদেশানুরাগ যাহাদিগকে উন্মত্ত-প্রায় করিয়াছিল, রোম ও গ্রিক ইতিহাস পাঠ করিয়া যদি সেই সকল ব্যক্তিকে প্রসংশা করিতে হয়, তাহা হইলে যাঁহারা বিশুদ্ধ ও উন্নত জীবনের প্রতি সবিশেষ পক্ষপাত স্থাপন করিয়া কখন কখন নিরর্থক ত্যাগ স্বীকার করিয়া ছিলেন, তাঁহারদিগকে ঘৃণা করিতে আমারদিগের কিছুতেই অধিকার নাই। এই হিন্দুজাতীয়েরা এক সময়ে গ্রিশিয়দিগের নিকট যেমন গৌরব লাভ করিয়া ছিলেন, অন্য কোন জাতিই তদ্বিষয়ে সমর্থ হন নাই। মহাবীর আলেকজান্দরের শাসন-কালে হিন্দুদিগের সাংসারিক নীতি ও বুদ্ধি-বৃত্তি-গত অবস্থা আলোচনা করিলে যদিও কতকগুলি উৎকৃষ্ট গুণ দৃষ্ট হয়না, কিন্তু তাহা উহাঁদের স্বাভাবিক অভাব বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। উহাঁরা যাহারদিগের শারীরিক বল বীর্য্যে বশীভূত হইয়াও যাহারদিগকে ম্লেচ্ছজাতি বোধে যথোচিত ঘৃণা করিতেন, সেই সমস্ত ভিন্ন দেশীয় বিজেতৃ জাতিদিগের নিরন্তর পীড়ন বশতই তৎসমুদায় উন্মেশিত হইতে পারে নাই। আমরা কল্যাণ নামক এক ব্রাহ্মণের বৃত্তান্ত পাঠ করিলেই ইহা এক প্রকার সুস্পষ্ট অবগত হইতে পারি। যখন মহাবীর আলেকজান্দর ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া ছিলেন, সেই সময়ে তিনি কল্যাণকে প্রলোভন দেখাইয়া আপনার অনুসরণ করাইবার চেষ্টা পান। কল্যাণও প্রলুব্ধ হইয়া তাঁহার অনুসরণ করিবার নিমিত্ত আপনার বিশুদ্ধ আবাস ভূমি ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করেন। তৎকালে কল্যাণের এই রূপ বিসদৃশ কার্য্য সন্দর্শন করিয়া তাঁহার আত্মীয় স্বজন সকলেই তাঁহাকে নীচাশয় ও দুরাকাঙ্ক্ষ বলিয়া তাঁহার এই ব্যবহারে যথোচিত দোষারোপ করিয়াছিলেন। আলেকজান্দর মন্দনীচ নামক আর এক ব্যক্তিকেও এই বিষয়ে প্রলোভিত করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট এক দূত প্রেরণ করেন। কিন্তু ঐ তেজস্বী পুরুষ তদ্বিষয়ে সম্মত হন নাই;

প্রত্যুত তিনি আলেকজান্দরের দূতের মুখে এই রূপ অধর্ম্ম-সঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া পৌরুষ প্রকাশ পূর্ব্বক যে প্রকার প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা যে তিনি কেবল আপনার জাতি মধ্যে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেন, তাহা নহে; স্বয়ং আলেকজান্দারও তাঁহার ভূয়সী প্রসংশা করিয়াছিলেন। পরিশেষে যখন কল্যাণ বুঝিলেন যে এইরূপ দুরাকাঙ্ক্ষা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত অনুচিত হইয়াছে, তখন তিনি অনুতাপানলে যার পর নাই সন্তপ্ত হইয়াছিলেন এবং এই পাপের শান্তি বিধান করিবার নিমিত্ত পসর্গদ দেশে প্রজ্বলিত হুতাশনে আপনার জীবন আহুতি প্রদান করেন। পূর্ব্বকালে এইরূপ অবিকল আর একটি ঘটনা হইয়াছিল। এই ভারতবর্ষের বারিগজ দেশ হইতে একটি ব্রাহ্মণ ইউরোপে গমন করিয়া আথেন নগরে গ্রিশিয়দিগের সমক্ষে অনলপ্রবেশ করিয়াছিলেন। তদ্দর্শনে গ্রিশিয়রা সকলেই চমৎকৃত হন এবং তাঁহার স্মরণার্থ এক সমাধিস্তম্ভ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে এই রূপ লিখিয়া দেন "এইস্থানে একজন ভারতবর্ষীয় আচার্য্য দেহ বিসর্জ্জন করিয়াছেন; ইনি হিন্দুদিগের প্রাচীন প্রথার অনুবর্ত্তী হইয়া অমরত্ব লাভের চেষ্টা করেন"।

জাতি-সাধারণ-স্বাধীনতা থাকাতেই গ্রিশিয়দিগের প্রতিভা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। সত্য বা মিথ্যা উপাখ্যানে পূর্ণই হউক, মহাকবি হোমরের কবিতা-সকল বীর-মদ-মত্ত গ্রিশিয়দিগের উদ্দেশেই প্রস্তুত হয়। যদি পারসীকেরা গ্রিশিয়দিগের বল পৌরুষ সমুদায় অপহরণ করিয়া লইত, তাহা হইলে আমরা এক্ষণে হিরোডোটস্, ইকিলস্, সোফোক্লেস্, ফিডিয়াস্ ও পেরিক্লেসের নামও শুনিতে পাইতাম না। যেখানে স্বদেশাভিমানের ভাব অতিশয় প্রবল হইয়া উঠে, তথাকার লোকেরা কবিদিগের কাব্য আগ্রহাতিশয়-সহকারে শ্রবণ করে বলিয়াই কবিগণ গর্ব্বিত হইয়া থাকেন এবং তত্রত্য লোকেরা ঐ সমস্ত কাব্যে বর্ণিত হয় বলিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু যখন দেশ-সাধারণ-অবনতির অবস্থা সমুপস্থিত হয়, তখন বিজ্ঞ বিচক্ষণ লোকদিগের প্রতিভা সাংসারিক উন্নতির ইচ্ছা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া বিজ্ঞান ও পদার্থবিদ্যার আলোচনায় শান্তি-লাভের বাসনা করিয়া থাকে। যখন গ্রিশিয়েরা ক্রমশ হীন-বীর্য্য হইতে লাগিলেন, সেই সময়েই সক্রেটিস্, প্লেটো, আরিস্টটল জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথমত মাসিডোনিয়ার শাসন, তৎপরে রোমকদিগের উৎপীড়ন; এই দুই কারণে গ্রিশিয়েরা অতিশয় মশৃণ ভাব ধারণ করে; কিন্তু তৎকালে তাহারদিগের বুদ্ধি-বৃত্তি যে সমস্ত অবিনশ্বর ভাব প্রসব করিয়াছিল, তাহা অদ্যাপি স্বাধীন ও পরাধীন এই উভয় বিধ জাতির মনো মধ্যেই জীবিত রহিয়াছে। ভারতবর্ষীয়েরা স্বদেশাভিমানের ভাব কিছুই পরিজ্ঞাত ছিলেন না এবং জাতি-গত প্রশংসার প্রত্যাশাও তাঁহারদিগের হৃদয়কে স্ফীত করিতে পারিত না। ভারতবর্ষে এমন বীরই ছিলেন না, যিনি কবিগণকে উৎসাহিত করেন এবং এমন ইতিহাসও ছিল না, যাহা এক জন ইতিবৃত্ত-লেখককে উত্তেজিত করিতে পারে*। যে রঙ্গ ভূমিতে ভারতবর্ষীয়দিগের মনোবৃত্তি স্বাধীনতার সহিত কার্য্য করিয়াছিল, তাহার নাম ধর্ম্ম ও পদার্থবিদ্যা। ভারতবর্ষীয়দিগের মনে যেমন ধর্ম্ম ও মনোবিজ্ঞানের ভাব বদ্ধমূল হইয়াছিল, এমন আর কোন জাতিরই দৃষ্টিগোচর হয় না। ভারতবর্ষীয়েরা অতিশয় তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন। তর্কের যুদ্ধই তাঁহাদের যুদ্ধ ছিল। তাঁহারা অতীত কাল চিন্তা করিতে গিয়া কি রূপে সৃষ্টি হইয়াছে, তাহারই বিষয় চিন্তা করিতেন। ভবিষ্যৎকাল চিন্তা করিতে গিয়া সৃষ্টির স্থায়িত্ব কি রূপে হইবে, তাহারই চিন্তা করিতেন। কিন্তু এই অতীত ও ভবিষ্যৎ প্রশ্নের জীবন্ত সিদ্ধান্ত-স্থল বর্ত্তমান কাল তাঁহারদিগের চিন্তাশক্তি, উদ্যোগ ও উৎসাহ আকর্ষণ করিতে পারে নাই। আমরা যখন ইতিবৃত্ত মধ্যে হিন্দুদিগের সমুদায় মনোবৃত্তির গতি পর্য্যালোচনা করি, তখন দেখিতে পাই যে এই জাতির আধ্যাত্মিক জীবন যেমন উদ্যম উৎসাহ প্রভৃতি কার্য্যক্ষম বৃত্তি সমুদায় উন্মূলিত এবং যে সকল গুণ প্রভাবে পৃথিবীর ইতিবৃত্ত-মধ্যে স্থান লাভ করা যাইতে পারে তাহা যেমন বিলুপ্ত করিয়াছে, এমন আর কোন জাতিই নাই।

ইজিপটিয়, গ্রিশিয়, রোমক, পারসীক, ইহুদী, বাবিলোনিয়, আসিরিয় ও টিউটন জাতীয়েরা এক এক সময়ে রাজনীতি বিদ্যার যার পর নাই শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াগিয়াছেন, কিন্তু হিন্দুরা তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। তাঁহারা এই সুমহৎ বিষয়ে এত অল্প সংযোগ রাখিয়াছিলেন যে তাহা লোকের গণনার মধ্যেই আইসে না। বিদেশীয়েরা যে তাঁহাদের রাজ্য আক্রমণ করিবে ইহা এক জন হিন্দু নৃপতির মনে স্বপ্নেও উদয় হইত না এবং তাঁহারদিগের জিগীষা বৃত্তিও কদাচ ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম করিত না।

* হিন্দুজাতি দিগের বীর ও ইতিহাসের অভাব নাই। গ্রন্থকার যেমন হোমরকে নিদর্শন স্থলে আনিলেন হিন্দুদিগের রামায়ণ ও মহাভারত তাহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। রামায়ণ ও মহাভারতে যেরূপ বীরগণের চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে তাহা নিতান্ত বিস্ময় কর সন্দেহ নাই।

নূতন পুস্তক।

সঙ্গীত।

শ্রীযুক্ত আর্থর হুইটেন কলিকাতা নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে পূর্ব্বতন লোকদিগের সংগীত সংক্রান্ত যে একটি প্রস্তাব পাঠ করিয়াছেন, আমরা তাহার আদ্যোপান্ত আলোচনা করিয়া অতিশয় প্রীত হইলাম। এই প্রস্তাবে যদিও কোন কোন দোষ দৃষ্ট হইয়া থাকে; তথাচ এক জন ইউরোপীয় হইয়া এতদ্দেশীয় সংগীত বিদ্যার যে এতদূর অনুসন্ধান রাখিয়াছেন, ইহাই তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসার বিষয়। তিনি এই প্রস্তাব প্রস্তুত করিতে যেরূপ পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তদনুরূপ ফল-লাভে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। তিনি এতদ্দেশীয় সঙ্গীত বিদ্যার এত আলোচনা করিয়াও মধ্যে মধ্যে এ রূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন যে তাহা দেখিলে তাঁহার তাহাতে তাদৃশ ব্যুৎপত্তি জন্মে নাই, এই রূপ বোধ হইয়া থাকে। তিনি একস্থলে হিন্দুদিগের গীতের তাল অনিয়মিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার এ কথা যদি যথার্থ হয়, তবে আমারদের দেশে মৃদঙ্গ প্রভৃতি যে সকল তাল-নিরূপক যন্ত্র এখনও প্রচলিত আছে, তাহারদিগকে নিতান্ত নিরর্থক বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হয়; কেন না যদি তালের কোন নিয়ম না থাকে, তবে তাল-নিরূপক যন্ত্রে আর প্রয়োজন কি? গ্রন্থকার যদি অস্মদ্দেশীয় তালের নিয়ম জানিতে যথার্থই ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে তিনি অতি সহজ উপায়ে তাহা জানিতে পারেন। সে উপায় এই যে তিনি এক জন বাদ্যকরকে আপনার সমীপে আনয়ন করুন, সে বাদ্য করিবে ও আর এক জন তালজ্ঞ ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গে তাল দিবে; ও যদি আবশ্যক বোধ হয়, তবে এক জন গায়ককে আনাইয়া তালের সহিত যে গীতের কতদূর যোগ তাহা তিনি অনায়াসেই অবধারণ করিতে পারেন। এই সহজ উপায় অবলম্বন করিলে বোধ হইতেছে, এই বিষয়ে উঁহার সংশয় এক-কালে তিরোহিত হইবে। আর একস্থলে তিনি ইজিপ্টিয়দিগকে প্রাচীনতা বিষয়ে সর্ব্ব প্রধান বলিয়াছেন। ইহা নিতান্ত

যুক্তি-বিরুদ্ধ। হিন্দু ও পারসীকেরা ইজিপটিয়-দিগের অপেক্ষা প্রাচীনতা বিষয়ে কিছুতেই ন্যূন নহে। তিনি মধ্যে মধ্যে বাইবলের বিষয় যাহা বলিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করা নিতান্ত নিরর্থক ও অপ্রীতিকর বলিয়া উপেক্ষিত হইল। তিনি যে কয়েকটি যন্ত্রের প্রতিরূপ দিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা পূর্ব্ব কালে ও এক্ষণে আরও কতক গুলি যন্ত্র দৃষ্ট হয়। যদিও তৎসমুদায়ের প্রতি-রূপ প্রকাশ করা অনাবশ্যক, কিন্তু গ্রন্থ মধ্যে তাহার উল্লেখ করাও উচিত ছিল। শঙ্খ আমাদিগের সঙ্গীতের উপযোগি যন্ত্র নহে, উহা পূর্ব্বে যুদ্ধ-স্থলে এবং এক্ষণে মাঙ্গলিক কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

উদ্ধৃত।

ব্রহ্মসাধন।

ব্রহ্মসাধনের ষষ্ঠ সোপান।—ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার অভ্যাস।

আত্মা নির্ম্মল হইলে ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভের উপযুক্ত হয়। কিন্তু ঈশ্বর দর্শন একে-বারে সম্পন্ন হয় না। তজ্জন্য অভ্যাস আবশ্যক। সম্মুখস্থ বন্ধুর ন্যায় তাঁহাকে প্রতীতি করা ক্রমে অভ্যাস করিতে হইবে। তিনি সকল স্থানে আছেন ও সকল ঘটনা বিধান করিতেছেন এ প্রকার সর্ব্বদা উপলব্ধি করিবে। হৃদয়ধামে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিবে। তাঁহার সকল কার্য্যে তাঁহার হস্ত দর্শন করিবে। সাধারণ ও অদ্ভুত ঘটনা হইতে ক্রমে বিশেষ বিশেষ সামান্য ঘটনা সকলেতেও ঈশ্বরের হস্ত দেখিবে। এইরূপে সকল সময়ে ও সর্ব্বত্রে তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিবে।

ব্রহ্মসাধনের সপ্তম সোপান—ঈশ্বরের সহিত সম্মিলন।

প্রেমময় মঙ্গলময় পরম পিতা সম্মুখে বর্ত্তমান, সাধক ইহা দেখিলেই তাঁহার অনুপম মাধুর্য্যে বিগলিত হয়েন। তখন তিনি সমুদায় স্বার্থ বিস-র্জ্জন দিয়া আপনাকে ঈশ্বরের হস্তে সমর্পণ করেন এবং তদ্দ্বারা তাঁহার সহিত সম্মিলিত হয়েন।

অনেক ব্যক্তি ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে ভক্তি ও প্রীতি করিয়াই তৃপ্ত হন, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত সাধকেরা তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে চান। তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে না পারিলে তাঁহাদের আর সকলি বৃথা বোধ হয়। তাঁহারা ঈশ্বর প্রাপ্তি বিনা আপনার জীবন পর্য্যন্ত ভার বোধ করেন। তাঁহারা স্বার্থভাবকে একেবারে বিনাশ করিয়া ফেলেন, তাঁহারা আপনার বলিয়া আর কিছুই রাখেন না, সকলই ঈশ্বরের হস্তে সমর্পণ করেন। ঈশ্বরের প্রতি প্রীতির বশে তাঁহারা তাঁহার প্রিয়-কার্য্য সকল প্রাণ পণে সাধন করেন কিন্তু তাহাতে স্বার্থ ভাব আসিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহারা অতি-শয় কষ্ট অনুভব করেন। তাঁহারা নিঃস্বার্থ হইয়া আপনার সমুদায় আত্মাকে কেবল ঈশ্বরের কার্য্যে নিয়োজিত করেন। এই রূপে স্বার্থভাব শূন্য হইয়া তাঁহারা ঈশ্বরের একান্ত সহচর ও অনুচর হয়েন। তাঁহারা আপনাদের ইচ্ছাকে ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া আপনার আত্মাকে ঈশ্বরের সত্তাতে সর্ব্বতোভাবে বিলীন করেন।

ইহাই সাধনের শেষ কার্য্য। যখন সাধক ব্যাকুল অন্তরে ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করেন এবং স্বার্থভাবের সহিত সমুদায় পাপ পরিত্যাগ করিয়া আপনার নির্ম্মল সংযত আত্মা ঈশ্বরে সমর্পণ করেন, তখন তিনি তাঁহার পথের পথিক হয়েন, অর্থাৎ তাঁহার একান্ত সহচর ও অনুচর হয়েন। তিনি যাহা করেন, সেই পর-ব্রহ্মের উদ্দেশে করেন। তিনি স্বার্থ ভাব পরি-ত্যাগ করিয়া যে যে কর্ম্ম করেন, তাহা ব্রহ্মেতে অর্পণ করেন। "ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞান-পরায়ণঃ যদযৎ কর্ম্ম প্রকুর্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সম-র্পয়েৎ।" এ অবস্থাতে সাধক ঈশ্বরের নিকট এই বলিয়া অঙ্গীকার করেন যে "হে হৃদয়-নাথ! অদ্যাবধি আমি তোমার একান্ত দাস হইলাম। হে হৃদয়স্থিত পুণ্যপাপেক্ষিতা পুরুষ! তুমি যে দিকে আমাকে যাইতে বলিবে সেই দিকে যাইব, তুমি যাহা বলিবে তাহাই করিব। তোমাকে ছাড়িয়া আমি কোন কর্ম্ম করিব না।" এবং

সেই অঙ্গীকার পালন করেন। এ অবস্থাতে ঈশ্বরের সহিত আত্মার নিগূঢ় সম্বন্ধ আত্মা অনুভব করিতে পারে এবং বিলক্ষণ করিয়া তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়। তখন আত্মা বুঝিতে পারে যে ঈশ্বর তাহার ঈশ্বর—তাহার হৃদয়েশ্বর। আত্মার সঙ্গে ঈশ্বরের যেমন সম্বন্ধ, এমন কোন বস্তুর সঙ্গে নহে। আত্মাকে যেমন তিনি গাঢ়-রূপে আলিঙ্গন করিয়া আছেন; শোভন বাহ্য জগৎকে তিনি তেমন গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া নাই। এ অবস্থাতে তিনি বিলক্ষণ অনুভব করেন যে পরমাত্মা প্রাণের প্রাণ। এ অবস্থাতে তাঁহার পক্ষে ইহা বলা স্পর্দ্ধার বিষয় নহে যে ঈশ্বর আ-মার সখা—ঈশ্বর আমারই। এ অবস্থাতে অন্তরের আনন্দ ঈশ্বরের মহিমা গাঢ়রূপে পরিস্ফুটিত হয়; সকল বস্তু সুশোভন দেখায়, কষ্ট সহজ বোধ হয়, দুঃখ ক্লেশ সকল উপানৎ লিপ্ত ধূলির ন্যায় প্রতীয়মান হয়, শ্রেয়কে প্রেয় বোধ হয়, লোকের অবজ্ঞাতে দুঃখ বোধ হয় না, শাকান্ন আহার করিতে পাইলেও তাহার প্রত্যেক গ্রাস সুমিষ্ট জ্ঞান হয়। কি সুখ কি দুঃখ, কি সুস্থতা কি সুস্থতা, কি পীড়া, সকল বস্তু ঈশ্বরের; অতএব তিনি দুঃখেতেও অনুদ্বিগ্নমনা থাকেন, ও সুখে-তেও বিগতস্পৃহ হয়েন। তাঁহার আত্মার সম্বন্ধে যুগান্তর উপস্থিত হয়। সকল বস্তু তাঁহার সম্বন্ধে নূতন হয়। তখন তিনি বিস্ময়ার্ণবে মগ্ন হইয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেন এবং বসন্তকালে পুষ্প কাননে যেমন শিশু ক্রীড়া করে, তিনি সেইরূপ এই জগতে আনন্দ করেন। বাস্তবিক তিনি আপনাকে সদ্যোজাত শিশুর ন্যায় জ্ঞান করেন। তাঁহার পুনর্জ্জন্ম হইয়াছে, এমন তিনি বিলক্ষণ রূপে অনুভ করেন। তাহা ভৌতিক জন্ম নহে, তাহা আধ্যাত্মিক জন্ম। যিনি এইরূপে আ-ধ্যাত্মিক জন্ম লাভ করেন, তিনিই প্রকৃত দ্বিজ শব্দের বাচ্য।

শ্লোকঃ।

আপূর্য্যমানমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামাযং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
সশান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥

MISSION OF THE APOSTLES.

"The Cross was the banner under which mad men assemble to glut the earth with blood."

Dissatisfied with his expedition to Nazareth, Jesus went to Upper Galilee, which had already been the theatre of his wonders. He found the inhabitants of that country in a disposition better adapted to his purpose. He perceived, however, that the necessity they were under of suspending their labour in order to come and hear him, kept a great number at home. This consideration obliged him to disperse his apostles by two and two in the province. It is probable, he resolved on this dispersion, because he found his own sermons and prodigies did not gain proselytes enough. The continual enterprises of his enemies made him feel the necessity of increasing his party.

It appears that Jesus had already sent several of his disciples on mission, retaining near himself his twelve apostles only; it may, however, be presumed that these preachers were as yet mere novices; their labours were unsuccessful; for they found the devils so obstinate as to resist their exorcisms. Yet this want of success was owing solely to the weakness of their faith, and would seem to throw a shade on the foresight and penetration of their divine master. Why did he send missionaries whose dispositions were not sufficiently known to him? Besides, it belonged to him alone to bestow on them before hand a necessary stock of faith for their Journey.

Whatever opinion may be formed of this, there is reason for believing that the apostles, who never quitted their master, saw him continually operating, enjoyed his confidence, and had faith from the first hand—were better qualified to labour to the satisfaction of the public. Thus Jesus, fully resolved to make a desperate effort, renewed all their powers, and gave them his instructions, of which the following is the substance: "I have no money to give you, but strive to pick up for yourselves what you can. Providence will provide for you; If he takes care of the sparrows, he will take care of you. Moreover expect to be ill received, reviled, and persecuted; but be of good courage; all is for the best. Silence is no longer requisite; preach openly and on the house tops what I have spoken to you in secret. Inform the world that I am the Messiah, the son of David and

the Son of God. We have no longer to observe discretion; we must either conquer or die; away then with pusillanimity.

"Though I send you forth as sheep in the midst of wolves, explain to the good people that you are under the safeguard of the Most High, who will take a terrible revenge for the outrages offered you, and liberally reward those who welcome you.—You do not require to concert measures for supplying your expenses; it belongs to those whose souls you are going to save to provide for the wants of your bodies; carry not therefore either gold, or silver, or provision, or two suits of raiment; take a good cudgel, and depart in the name of the Lord.

"Take care in your way always to preach that *the kingdom of heaven is at hand*. Speak of the end of the world. On entering cities and villages, inform yourself underhand of such credulous people, as are very charitable and prepossessed in our favour. You will salute them civilly; saying *Peace be to this house*. But the peace you bring must be only *allegorical*; for my doctrine is calculated to create trouble, discord, and division, every where. Whoever would follow me must abandon father, mother, kinsmen, and family; we want only fanatic and enthusiasts; who, attaching themselves wholly to us, trample every human consideration under foot. *I came not to send peace but a sword*. As a like conduct might embroil you with your hosts, you will change your abode from time to time. Do not rely on the power I have of raising the dead: the safest way for you is not to risk your being killed; shun therefore places where you shall find yourselves menaced with persecution. Leave disobedient cities and houses, *shaking the dust from off your feet*. Tell them, that they have incurred the punishment of Sodom and Gomorrah. Declare, in my name, that the divine vengeance is ready to make them sensible of their guilt, and that the inhabitants of these cities will be less rigorously punished than those who shall have the audacity to resist your lessons. The great and last day is at hand: I assure you, that you shall not have finished your tour through all the cities of Israel, before the Son of man shall arrive*."

Such is the sense and spirit of the instructions which Jesus gave to his apostles. These trifles, however, scarcely merit notice:—We are more surprised to find the Son of God proclaiming peace and charity, and at the same time asserting that he brings war and hatred. It is besides unquestionable, that the apostles, and especially their successors in the sacred ministry, have in preaching their gospel brought on the world troubles and divisions unknown in all other preceding religions. The incredulous, who by the way refer to the history of the church, find, that the *glad tidings* which they came on purpose to announce, have plunged the human race into tears and blood*.

It is obvious from his language, that Jesus charged people of property with the maintenance of his apostles. Their successors have taken sufficient advantage of this and through it assumed an authority to exercise for many ages the most cruel extortions on impoverished nations.

Critics maintain also that it was false to say near eighteen hundred years ago *the end of the world was near*, and more false still to affirm that the great Judge would arrive before the apostles could have time to make the tour of the cities of Israel. It is true, theologists understand that the end of the world shall happen when all the Jewish cities, that is, when all the Jews shall be converted. Time will demonstrate whether it be in that sense we ought to understand the words of

* St. Matt. x. St. Mark vi. St. Luke ix.

* If the Christian religion be as is pretended, a restraint to the crimes of men;—if it produces salutary effects on some individuals—can these advantages, so rare, so inefficient and doubtful, be compared with the evident and immense evils which this religion has produced on the earth? Can the prevention of a few trifling crimes, some conversions useless to society, some sterile and tardy repentances, enter into the balance against the perpetual dissensions, bloody wars, horrid massacres, persecutions, and cruelties, of which the christian religion has been a continual cause and pretext? For one secret sinful thought suppressed by it, there are even whole nations armed for reciprocal destruction; the hearts of millions of fanatics are inflamed; families and states are plunged into confusion; and the earth is bedewed with tears and blood. After this, let common sense decide the magnitude of the advantages which mankind derive from the glad tidings which christians pretend to have received from their God.—*Christianity Unveiled.*

Jesus: meanwhile the world still remains, and does not appear to threaten speedy ruin.

It is likewise very probable, that, besides these public instructions, Jesus gave more particular ones to his apostles. They departed in the hope of charities which they were to receive from Jews, of whom the greatest number were already in a state of reprobation, or damned *in petto* by Providence. Jesus altered his orders in part; he reserved for himself the cities, and left the villages only to his apostles. Accordingly they went here and there, calling out, *Hearken to the glad tidings; the world is near its end. Repent therefore, pray, fast, and give us money and provisions, for having acquainted you with this interesting secret.* We are also assured, that they cured several diseases by the application of a certain *oil*. They had doubtless done more excellent things, but the *paraclete* (the comforter) was not yet come: maugre the instructions of the Son of God, the understandings of the apostles were not yet sufficiently brightened*; for we do not find that the missionaries, with their balsam and fine speeches, made many converts.

Jesus, now left alone, went about preaching through many cities of Galilee; but deprived of the assistance of his dear confidents, he did not in these places work any wonders.

ECCE HOMO

* St. Luke ix. 6. St. Matt. xi. St. Mark vi. 12.

বিজ্ঞাপন

দুর্ভিক্ষ-গ্রস্ত উড়িষ্যা দেশের সাহায্য নিমিত্তে গত ৩১ বৈশাখ রবিবার কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ গৃহে ব্রহ্মোপাসনা হইয়া যে দান সংগ্রহ হইয়াছিল এবং তদবধি আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত যাঁহারা দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিদিগকে যাহা দান করিয়াছেন, তাঁহারদিগের নাম ও দান নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। ইহার মধ্যে কটক ও মেদিনীপুরে যাহা পাঠান হইয়াছে, তাহাতে তত্তৎ স্থানে অন্ন দান হইতেছে, এবং কতক লোকের কষ্ট নিবারণের উপায়ও হইয়াছে।

৩১ বৈশাখ অবধি ৩২ আষাঢ় পর্য্যন্ত দুর্ভিক্ষের আয় ব্যয় বিবরণ।

দান

৩১ বৈশাখ প্রাতে সমাজ কালীন		২৬৯ ।০
শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায়	.. ..	২
" যদুনাথ দে	.. ..	২
" চন্দ্রকুমার গুঁই	.. ....	৫
" শ্রীরাম পালিত	.. ....	৫
" উমেশচন্দ্র দত্ত	.. ....	১
" বনমালি ঘোষ	.. ..	।০
" গুরুচরণ মহালানবিষ	....	১
" বিজয় নাথ মুখোপাধ্যায়	....	১
" কাশীনাথ দে	.. ....	২
" বল্লবীকান্ত ভট্টাচার্য্য	....	৫
" মদনমোহন দে	.. ....	৪
" প্রসন্ননাথ সাহা	.. ....	৫
" শীলের ফ্রী কালেজ	.. ....	৩০
শ্রীমতী পঞ্চাননী দাসী	.. ..	২০
শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বসু	.. ....	১
শ্রীমতী স্বর্ণময়ী দাসী	.. ....	১
একজন ব্রাহ্ম	.. ....	১৷৷০
শ্রীযুক্ত রাজকিশোর চট্টোপাধ্যায়	....	১
" শ্রীনাথ যোগী	.. ....	৷৷০
" গোকুল কৃষ্ণ সিংহ	....	১
" শশিভূষণ বসু	.. ....	১৫
শ্রীমতী অঙ্গদেবী দাসী	.. ....	১৸৶
শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দেব	.. ..	২৫
তাঁহার পত্নী	.. ..	১৫
শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র	.....	১০
" বিহারীলাল মজুমদার	....	৩৯
কোন্ নগরস্থ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্র এবং শিক্ষকগণ	.. ..	২১
শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র দেব	.. .. ..	১০
শ্রীমতী কামিনীসুন্দরী দাসী	.. ..	২
		৪৯৭৷৶
কটকে পাঠান যায়	২৫০	
মেদিনীপুরে পাঠান যায় ..	২০০	
	৪৫০	
স্থিত		৪৭৷৶

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের

১৭৮৮ শকের আষাঢ় মাসের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	২৩৪।৶০
পুস্তকালয়	৪৪৲১০
যন্ত্রালয়	১৪৫৸৫
ডাক মাসুল	২৮৷৶০
দুর্ভিক্ষে দান প্রাপ্ত	১২৩৸৶০
দানপ্রাপ্ত	৷৷৵০
পুরাতন ছিন্ন কাগজ বিক্রয় ..	১৷৷৶০
গচ্ছিত	৩৮৵১৫
	৬১৭৶১০

ব্যয়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	৭৭৸১৫
মাসিক বেতন	১১০৶১০
যন্ত্রালয়	১৪২৷৷৶০
ডাক মাসুল	৩২৸৵০
পুস্তকালয়	৩৯৶০
অনিরূপিত	৯৸৫
আলোকের ব্যয়	২৪৸৶১০
দুর্ভিক্ষের উপশমার্থ মেদিনীপুরে প্রেরিত	২০০
গচ্ছিত	৩৯৷৷০
	৬৭৬৸০

আয়	৬১৭৶১০
পূর্ব্বকার স্থিত	২৩১৵১০
	৮৪৮৵০
ব্যয়	৬৭৬৸০
স্থিত	১৭১৷৷৵০

শ্রী সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

১৭৮৮ শকের আষাঢ় মাসের দানের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বসু	১
" পার্ব্বতীচরণ বন্দোপাধ্যায়	১
" দয়ালচন্দ্র শিরোমণি	১
	৩

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	২
	৫

আয়	৫
পূর্ব্বকার স্থিত	৯৪৸০
	৯৯৸০

ব্যয়

ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার জন্য মেদিনীপুর সমাজে দান	১০
	৮৯৸০

শ্রী সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৪ ভাদ্র রবিবার প্রাতঃকালে ৭৷৷০ সাড়ে সাত ঘন্টার সময়ে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাসুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২৩। কলিগতাব্দ ৪৯৩৭। ১২ শ্রাবণ শুক্রবার।

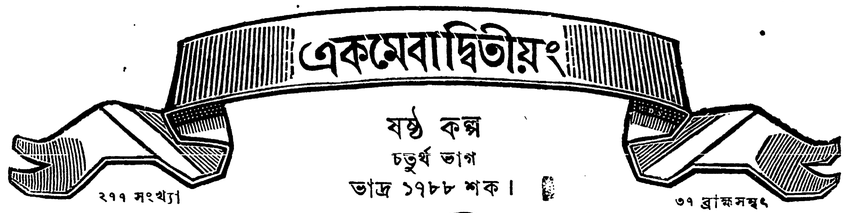

ষষ্ঠ কল্প
চতুর্থ ভাগ
ভাদ্র ১৭৮৮ শক।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদসংহিতা।

প্রথমমণ্ডলস্য ত্রয়োদশানুবাকে দশমং সূক্তং।

গোতমঋষিঃ জগতীচ্ছন্দঃ ইন্দ্রোদেবতা।

৮৭৯

১। অশ্বাবতি প্রথমো গোষু গচ্ছতি সুপ্রাবীরিন্দ্র মর্ত্য স্তবোতিভিঃ। তমিৎপৃণক্ষি বসুনা ভবীয়সা সিন্ধুমাপো যথাভিতো বিচেতসঃ।

১। হে 'ইন্দ্র' যঃ 'মর্ত্যঃ' মনুষ্যঃ 'তব উতিভিঃ' ত্বদীয়ৈঃ রক্ষণৈঃ 'সুপ্রাবীঃ' সুষ্ঠু প্ররক্ষিতো ভবতি স মর্ত্যঃ 'অশ্বাবতি' বহুভিঃ অশ্বৈঃ যুক্তে গৃহে বর্ত্তমানঃ 'গোষু' প্রাপ্তব্যেষু 'প্রথমঃ' 'গচ্ছতি' সর্ব্বেভ্যো যজমানেভ্যঃ পূর্ব্বমেব গোমান্ ভবতীত্যর্থঃ। ত্বং 'তমিৎ' তমেব পুরুষং 'ভবীয়সা' বহুতরেণ ভবিতৃতমেন বা শতসহস্রাদিসংখ্যাযুক্তেন 'বসুনা' ধনেন 'পৃণক্ষি' সংপৃক্তং সংপূর্ণং করোষি। তত্র দৃষ্টান্তঃ 'বিচেতসঃ' বিশিষ্টজ্ঞানহেতুভূতা আপঃ। 'যথাভিতঃ' সর্ব্বাসু দিক্ষু 'সিন্ধুং' সমুদ্রং পূরয়ন্তি তদ্বৎ।

১। হে ইন্দ্র! যে মনুষ্য তোমার প্রযত্নে রক্ষিত হয়, সে প্রভূত-অশ্ব-সম্পন্ন গৃহে অবস্থান করিয়া সর্ব্বাগ্রে গো লাভ করিয়া থাকে। যেমন চেতন লাভের হেতু সলিল সমুদায় চতুর্দ্দিকে সমুদ্রকে পূর্ণ করে, সেই রূপ তুমিই তাহাকে প্রচুর অর্থে পরিপূর্ণ করিয়া দেও।

৮৮০

২। আপো ন দেবীরুপযন্তি হোত্রিযমবঃ পশ্যন্তি বিততং যথা রজঃ। প্রাচৈর্দেবাসঃ প্রণযন্তি দেবযুং ব্রহ্ম প্রিয়ং জোষযন্তে বরাইব।

২। 'হোত্রিযং' হোতুঃ স্বভূতং চমসং 'দেবীঃ' দেব্যঃ দ্যোতমানাঃ 'আপঃ' 'ন' যথাপঃ 'উপযন্তি' উপগচ্ছন্তি তদুপরি বর্ত্তমানা দেবা এতমেব চমসং 'অব' অবস্তাৎ 'পশ্যন্তি' হোতুচমসে অস্মাকং সোমাভিষবায় আপঃ পূরিতা ইতি তেষাং দৃষ্টিরপ্যস্মিন্ সংলগ্না অভূৎ। তত্র দৃষ্টান্তঃ 'বিততং' বিস্তীর্ণং 'রজঃ' জ্যোতিঃ সূর্য্যসম্বন্ধি 'যথা' নিরন্তরমবস্তাৎ পততি তদ্বৎ। 'দেবযুং' দেবান্ কাময়মানং এতং চমসং 'প্রাচৈঃ' প্রাচীনং যদ্বা প্রাঞ্চনৈঃ প্রগমনৈঃ উত্তরবেদ্যভিমুখং হোমকালে 'প্রণযন্তি' হোমার্থে প্রণীতং 'ব্রহ্মপ্রিয়ং' ব্রহ্মণা সোমলক্ষণেন অন্নেন প্রীতং সন্তৃপ্তং পূরিতমিত্যর্থঃ 'জোষযন্তে' 'দেবাসঃ' সর্ব্বে দেবাঃ তং চমসং সেবন্তে 'বরাঃ ইব' কন্যকাং যথা বরাঃ মমেযং ভবিষ্যতি মমেযং ভবিষ্যতীতি কন্যকাং সেবন্তে এবং দেবা অপি মমাযং সোমঃ মমাযং সোম ইতি অস্য পার্শ্বে বর্ত্তন্তে ইত্যর্থঃ। এবমপোনপ্ত্রীযবিনিযোগানুসারেণ যোজিতং সত্রস্যানুষ্ঠেযার্থপ্রকাশকত্বাৎ। যদাতু রাত্রি

পর্য্যাধেয়স্য বিনিযোগস্তদা ত্বেবং ব্যাখ্যেয়ং। হে ইন্দ্র দেব্যঃ 'আপঃ যথা নিম্নদেশং উপগচ্ছন্তি এবং দেবাঃ ত্বদীয়ং স্তোত্রং শুশ্রূষমাণাঃ হোত্রিয়ং হোতৃসম্বন্ধি ধিষ্ণ্য-স্থানমুপগচ্ছন্তি উপগত্যচ অবস্তাৎ পশ্যন্তি বিততং জ্যোতিরিব দেবযুং দেবান্ আত্মনঃ ইচ্ছন্তং এতং শংসিতারং আগতাঃ সর্ব্বে দেবাঃ প্রাচীনং প্রণযন্তি অগ্রতঃ ধারয়ন্তি ব্রহ্মপ্রিয়ং স্তোত্রপ্রিয়ং ত্বাং শং সন্তং বরাঃ কন্যাকাং ইব সেবন্তে।

২। দেবগণ দীপ্তিশীল সলিলের ন্যায় হোতার চমসের নিকট গমন ও বিস্তীর্ণ সূর্য্য জ্যোতির ন্যায় তাহাতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন এবং হোম কালে সেই চমসের নিকট গমন পূর্ব্বক তাহাকে সংশোধন ও বরেরা যেমন কন্যার সেবা করে সেই রূপ সেই সোমরস পূর্ণ চমসের সেবা করিয়া থাকেন।

৮৮১

৩। অধি দ্বয়োরদধা উক্থ্যং বচো যতস্রুচা মিথুনা যা সপর্য্যতঃ। অসংযতো বৃতে তে ক্ষেতি পুষ্যতি ভদ্রা শক্তির্যজমানায সুন্বতে।

৩। হে ইন্দ্র 'দ্বয়োঃ' হবির্ধানয়োঃ 'উক্থ্যং' উক্থং শস্ত্রং তদ্যোগ্যং 'বচঃ' যুজে বাং ইত্যাদি মন্ত্ররূপবচনং 'অধি' 'অদধাঃ' নিহিতবানসি। ননু হবির্ধানযোর্দ্বয়োঃ কথং একমেব বচঃ অধিনিধীয়তে ইত্যাশঙ্ক্য ব্রাহ্মণেনৈব ব্যাখ্যাতং অধিদ্বয়োরদধা উক্থ্যং বচ ইতি দ্বয়োরেতত্তৃতীয়ং ছদিরধিনিধীয়তে উক্থ্যং বচ ইতি যজ্ঞিয়ং বৈ কর্ম্মোক্থ্যং বচো যজ্ঞমেবৈতেন সমর্দ্ধয়তীতি। তত্র যথা হবির্ধান দ্বয়োরেকমেব তৃতীয়ং ছদিরধিনিধীয়তে এবং স্তোত্রমপ্যেকং যুক্তং। উক্তং নাম যজ্ঞসম্বন্ধি শস্ত্রং তদ্যোগ্যং বচনমপি যজ্ঞিয়ং কর্ম্ম তস্য যজ্ঞরূপযোঃ হবির্ধানযোর্যজ্ঞত্বসম্পাদনায়াধিনিধানাদ্যজ্ঞোপি সমৃদ্ধো ভবতি। কীদৃশযে! হবির্ধানযোঃ 'যতস্রুচা' যতাঃ সম্বন্ধাঃ স্রুচঃ গ্রহচমসাদিলক্ষণানি পাত্রাণি যযোঃ তে 'মিথুনা' যুগলরূপেণ বর্ত্তমানে 'যা' যে হবির্ধানে ত্বাং 'সপর্য্যতঃ' পূজযতঃ তযোরিত্যর্থঃ। কিঞ্চ ঈদৃগুপোহবির্ধানযুক্তঃ যজমানঃ 'অসংযতঃ' শত্রুভিঃ সহ যুদ্ধার্থমনভিগতঃ সন্ 'তে' 'ব্রতে' ত্বদীযে কর্ম্মণি 'ক্ষেতি' নিবসতি 'পুষ্যতি' চ প্রজযা পশুভিঃ পুষ্টৌকল্যাণী 'শক্তিঃ' উৎকৃষ্টং বলং ভবতি এতৎ সর্ব্বং হবির্ধানযোরুক্থ্যস্য বচসঃ অভিধানেন ত্বযা কৃতমিত্যর্থঃ।

৩। স্রুক চমসাদিযুক্ত যুগল রূপে বর্ত্তমান তোমার পূজার নিমিত্ত অনুষ্ঠেয় হবির্ধান নামক যজ্ঞপাত্র দ্বয়ের সামগান তুমিই বিধান করিয়াছ। এই প্রকার হবির্ধান পাত্রযুক্ত যজমান যুদ্ধার্থ সমাগত না হইয়া ত্বদীয় ব্রতে অবস্থান করে, প্রজা ও পশুগণ দ্বারা পরিপুষ্ট হয় এবং সোম সংস্কার পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট বল লাভ করে।

৮৮২

৪। আদঙ্গিরাঃ প্রথমং দধিরে বয ইদ্ধাগ্নয়ঃ শম্যা যে সুকৃত্যযা। সর্ব্বং পণেঃ সমবিন্দন্ত ভোজনম শ্বাবন্তং গোমন্তমাপশুং নরঃ।

৪। যদা পণিভির্গাবোপহৃতাঃ তদানীং 'অঙ্গিরাঃ' অঙ্গিরসঃ প্রথমং পূর্ব্বং অগ্রতঃ 'বয়ঃ' হবির্লক্ষণমন্নং 'দধিরে' ইন্দ্রার্থং সম্পাদিতবন্তঃ। 'আৎ' অনন্তরং তাদৃশাঃ 'যে' অঙ্গিরসঃ 'ইদ্ধাগ্নয়ঃ' প্রজ্বলিতাগ্নিযুক্তাঃ সন্তঃ 'সুকৃত্যযা' শোভনকরণোপেতযা 'শম্যা' কর্ম্মণা শোভনেন যাগেন ইন্দ্রং অযজন্নিতি শেষঃ। তে 'নরঃ' যজ্ঞস্য নেতারঃ অঙ্গিরসঃ 'পণেঃ' এতন্নাম্নোসুরস্য সম্বন্ধি 'সর্ব্বং' 'ভোজনং' ধনং 'সং' 'অবিন্দন্ত' সমলভন্ত। কীদৃশং 'অশ্বাবন্তং' অশ্বৈর্যুক্তং 'গোমন্তং' গোভির্যুক্তং 'আ' সমুচ্চয়ে 'পশুং, গবাশ্বব্যতিরিক্তং অন্যৎ পশুজাতঞ্চ সমবিন্দন্ত।

৪। যখন পণিনামক অসুরগণ অঙ্গিরাদিগের গো সমূহ অপহরণ করিয়াছিল, তখন অঙ্গিরাগণ প্রথমে ইন্দ্রের নিমিত্ত হবিরূপ অন্ন প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তৎপরে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া উৎকৃষ্ট উপকরণ সম্পন্ন যাগ দ্বারা ইন্দ্রের অর্চ্চনা করেন, সেই যজ্ঞ সম্পন্ন হইলে তাঁহারা সেই অসুরগণের গো অশ্ব ও অন্যান্য পশু প্রভৃতি সমস্ত ধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

৮৮৩

৫। যজ্ঞৈরথর্ব্বা প্রথমঃ পথস্তে ততঃ সূর্য্যো ব্রতপা বেন আজনি। আ গা আজদুশনা কাব্যঃ সচাযমস্য জাতমমৃতং যজামহে।

৫। পণিভিরপহৃতাসু গোষু 'অথর্ব্বা' এতৎসজ্ঞকঋষিঃ 'যজ্ঞৈঃ' ইন্দ্রদেবতৈ্যরনুষ্ঠিতৈর্যাগৈঃ 'পথঃ' গোসম্বন্ধিনোমার্গান্ 'প্রথমঃ' 'ততে' তনুতে সর্ব্বেভ্যঃঋষিভ্যঃ পূর্ব্বমেব কৃতবানিত্যর্থঃ। 'ততঃ' তদনন্তরং 'ব্রতপাঃ' ব্রতানাং কর্ম্মণাং পালযিতা 'বেনঃ' কান্তঃ 'সূর্য্যঃ' সূর্য্যরূপঃ ইন্দ্রঃ 'আজনি' গবাং প্রদর্শনাযাবিরভূৎ। ততোথর্ব্বা তাঃ 'গাঃ' 'আ' 'আজৎ' আভিমুখ্যেন প্রাখোৎ। তাদৃশস্যেন্দ্রস্য 'কাব্যঃ' কবেঃ পুত্রঃ 'উশনাঃ' তৃষ্ণঃ 'সচা' অসুরনিরসনায সহাযঃ অভূৎ। 'যমস্য' অসুরাণাং নিযমনার্থং 'জাতং' প্রাদুর্ভূতং 'অমৃতং' মরণ রহিতং তমিন্দ্রং 'যজামহে' হবির্ভিঃ পূজযামঃ।

৫। মহর্ষি অথর্ব্বা প্রথমে যজ্ঞ দ্বারা গো সমূহের পথ প্রস্তুত করেন, তৎপরে ব্রতপালক সূর্য্যের রূপ ইন্দ্র গো-সমূহ প্রদর্শনের নিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। অনন্তর অথর্ব্বা গো সমুদায় প্রাপ্ত হইলেন। কবি-পুত্র উসনা অসুর-বিনাশার্থ ইন্দ্রের সহায় হইয়াছিলেন। আমরা অসুর দমনের নিমিত্ত আবির্ভূত, মৃত্যু-বর্জ্জিত সেই ইন্দ্রকে পূজা করি।

৮৮৪

৬। বর্হির্বা যৎ স্বপত্যায় বৃজ্যতে কোবা শ্লোকমাযোষতে দিবি। গ্রাবা যত্র বদতি কারুরুক্থ্য সস্যেদিন্দ্রো অভিপিত্বেষু রণ্যতি। ১। ৬। ৪।

৬। 'স্বপত্যায' শোভনপতনহেতুভূতায কর্ম্মণে 'বর্হিঃ বা' 'যদ্' যদা 'বৃজ্যতে' ছিদ্যতে অধ্বর্য্যুণা যাগার্থমাস্তীর্য্যতে 'অর্কঃ বা' স্তোত্রনিষ্পাদকোহোতাবা শ্লোকং স্তুতিরূপাং বাচং 'দিবি' দ্যোতমানে যজ্ঞে যদা 'আ ঘোষতে' উচ্চারযতি। 'যত্র' যস্মিন্ কালে 'গ্রাবা' অভিষবার্থং প্রবৃত্তঃ উপলঃ 'বদতি' শব্দং করোতি। তত্র দৃষ্টান্তঃ 'কারুঃ' উক্থ্যঃ' লুপ্তোপমমেতৎ। উক্থ্যস্য শস্ত্রস্য শংসিতা কারুঃ স্তোতা যথা অভিমতশব্দং করোতি তদ্বৎ। 'তস্য' পূর্ব্বোক্তস্য সর্ব্বস্য 'অভিপিত্বেষু' অভিপ্রাপ্তিষু 'ইন্দ্রঃ' 'রণ্যতি' রমতে। যদ্বা পূর্ব্বোক্তানাং বর্হিরাদীনামভিপ্রাপ্তিষু সতীষু ইন্দ্রঃ রণ্যতি অস্মদীযোযাগো ভবিষ্যতীতি হর্ষশব্দং করোতি। ১। ৬। ৪।

৬। পাতিত্য-নাশক কর্ম্মের অনুষ্ঠানের নিমিত্ত যখন কুশ সকল আহৃত হয় যখন স্তোত্র-নিষ্পাদক হোতা শ্লোক পাঠ করেন এবং যে কালে যজ্ঞ-প্রস্তর সকল সাম গায়কের ন্যায় শব্দ করিতে থাকে, তখন ইন্দ্র কুশাদি আহৃত দেখিয়া আনন্দ ধ্বনি করিয়া থাকেন। ১। ৬। ৪।

কলিকাতা মাসিক ব্রাহ্মসমাজ।

৭ শ্রাবণ রবি বার ১৭৮৮ শক।

প্রধান আচার্য্যের উপদেশ।

প্রার্থনা না করিতে করিতে সেই পিতা-মাতা আমারদের সম্মুখে বর্ত্তমান। তাঁহার সেই মঙ্গল-ভাব এখানেই দীপ্যমান। তাঁর অমৃত প্রভা এখান হইতে উত্থিত হইয়া দ্যুলোককে অতিক্রম করত সর্ব্বত্র প্রসারিত রহিয়াছে। সেই জ্ঞান-জ্যোতি অমৃত-সরোবরে সমুদায় জগৎ নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে। সমুদ্র মধ্যে যেমন প্রবাল দ্বীপ-সকল, জ্ঞান-স্বরূপ ঈশ্বরের মধ্যে তেমনি এই জগৎ সংসার প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। সেই জ্ঞান-মঙ্গল-জ্যোতিঃ-পূর্ণ পরমেশ্বরের ক্রোড়ে এই অগণ্য নক্ষত্র-খচিত অসীম আকাশ অবস্থিতি করিতেছে। এক বার জ্ঞান-চক্ষুকে উন্নত করিয়া দেখ, দেখিবে যে সেই জ্ঞান-সমুদ্রে, প্রেম-সমুদ্রে, এই জগৎ সংসার নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে—সমুদয় জগৎ সেই প্রেমময় মাতার ক্রোড়ে অবস্থিতি করিতেছে। এক জন নয়, এক প্রাণী নয়, এক কটি আত্মা নয়, অগণ্য লোক-নিবাসী অগণ্য জীব তাহারদের সমুদয় কামনার সহিত সেই অনন্ত প্রেম-সাগরে অবস্থিতি করিতেছে—সেখান হইতে সকলেই আপন আপন কামনার বিষয় লাভ করিতেছে, অন্নপানে পুষ্ট হইতেছে, জ্ঞান ধর্ম্মে উন্নত হইতেছে। কামনার সমুদয় বিষয় সেই এক পরমেশ্বরের নিকট হইতে সকলেই প্রাপ্ত হইতেছে। সেই পরমেশ্বরের নাম কি? তাঁহার নাম নাই। সেই পরমেশ্বরের

রূপ কি? তাঁহার রূপ নাই। তিনি নাম-রূপের অতীত। তিনি অসীম বলিয়া যদি বলি তাঁর নাম আকাশ "আকাশোবৈ নাম" তথাপি আকাশ তাঁহার নাম নয়—তিনি নাম-রূপের অতীত, তিনি নাম-রূপের স্রষ্টা। তবে তিনি কে? তিনি সেই সত্য—তিনি ব্রহ্ম, তিনি ভুমা, তিনি বৃহৎ, তিনি মহৎ; তাঁহা অপেক্ষা বড় আর কেহই না, তাঁহার উপর শ্রেষ্ঠ আর কোথাও নাই। আমরা কখনো তাঁহাকে ওঁ বলি, কখনো তাঁহাকে হূ বলি—কিন্তু তাঁহার নাম নাই। ঋষিরা ওঁ বলিয়া তাঁহাকে নির্দ্দেশ করেন, আরবেরা হূ বলিয়া তাঁহাকে আহ্বান করে; কিন্তু তাঁর নাম ওঁও নয়, তাঁর নাম হূও নয়। তাঁর নাম নাই, তাঁর রূপ নাই—তিনি নাম-রূপের অতীত, তিনি নাম-রূপের নির্ব্বহিতা। ঈশ্বর আকাশের অতীত, সকল নাম-রূপের অতীত; অথচ আকাশের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তিনি নাম-রূপ-জগৎকে রক্ষা করিতেছেন। আকাশ হইতেও শ্রেষ্ঠ এই শরীরস্থিত আত্মা; ঈশ্বর অনন্ত গুণে এই পরিমিত আত্মার অতীত হইয়াও ইহার সযুজা ও সখা হইয়া ইহাকে নিয়ত পালন করিতেছেন। তিনি সংসার কালের অতীত হইয়াও সংসারের পিতা-মাতা হইয়া ইহাকে পোষণ করিতেছেন। তিনি পিতা-মাতা হইতে অধিক, তিনি পিতা-মাতার মনে স্নেহ প্রেরণ করিতেছেন। সেই পরমেশ্বরের নাম নাই রূপ নাই, তাঁর পূর্ণতার খর্ব্বতা নাই; তিনি আপনার স্বরূপ বিনাশ করেন না, তিনি এক হইয়া আপনাকে আর এক রূপে দেখান না; তিনি নিত্য স্ব-স্বরূপে অবস্থিতি করেন। তিনি নির্ব্বিকার, তিনি সদাই সমান-রূপে আপনাকে প্রকাশ করেন—তিনি এই জগতের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া রহিয়াছেন, তিনি সমুদয় জগৎকে আলো করিয়া রহিয়াছেন। যাহা ক্ষুদ্র, তাহা তিনি নহেন; তিনি ভুমা। সেই ভুমাকেই জানিতে ইচ্ছা কর, সেই ভুমাকে অনুসন্ধান কর, সেই ভুমারই শরণাপন্ন হও। আমারদের আত্মা ক্ষুদ্র হইয়া যদি ভুমা ঈশ্বরের আশ্রয় না পাইত, দুর্ব্বলের বল যদি তিনি না হইতেন; তবে আমারদের এখানে আর দুর্দ্দশার শেষ থাকিত না—আমরা দীন-ভাবে মুহ্যমান হইয়া সদাই শোক করিতাম, আমারদের হৃদয়ের বেদনা আর কিছুতেই যাইত না। আমরা পরমেশ্বরকে আশ্রয় করিয়া নির্ভয় হইয়াছি, আরাম পাইয়াছি—যার পর বল নাই, যার পর প্রেম নাই, যার পর মঙ্গল-ভাব নাই; তাঁহাকে আমরা সহায় পাইয়াছি। তিনি প্রতি জনের আত্মাতে সাধু ইচ্ছা প্রেরণ করিতেছেন, আমারদের কুটিল অভিসন্ধি-সকলকে দমন করিতেছেন, আমারদের ধর্ম্মের পুরস্কার গোপনে বিধান করিতেছেন। লোকেরা যদি নির্দ্দোষের উপর দোষারোপ করে, ঈশ্বর তাঁহাকে সেই অপবাদ হইতে রক্ষা করেন; লোকে যদি তাঁহাকে ত্যাগ করে, তিনি তাঁহাকে আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করেন—তাঁর হৃদয়ে শান্তি-সুখ প্রেরণ করেন। আমারদের আদর্শ ঈশ্বর—আমরা সেই দেব-ভাব দেখিয়া মনুষ্য-লোকে তাহা আনিবার জন্য চেষ্টা করি; তাহাতে যদি সকল ইচ্ছা সম্পূর্ণ না হয়, ঈশ্বর সেই সাধু ইচ্ছার পুরস্কার দেন। যদি ঈশ্বর আত্মার আশ্রয় না হইতেন, তাহা হইলে কে এত দুঃখ বহন করিয়া সংসার-ধর্ম্ম পালন করিতে পারিত। আমারদের আত্মার আশ্রয় পরমাত্মা না থাকিলে এই সংসারের কুটিলতা হইতে কি রূপে আমরা রক্ষা পাইতাম। আমরা ধর্ম্ম ভাবিয়া ধর্ম্ম-প্রচারের

জন্য লোকের সঙ্গে যোগ দিতে যাই, তাহারা আমারদিগকে সেই ধর্ম্ম হইতে, সদ্ভাব হইতে, ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত করিতে চেষ্টা করে। আমরা ঈশ্বরকে অবলম্বন করিয়া বিবাদ বিসম্বাদ পরিত্যাগ করিতে যাই, লোকেরা আসিয়া সেই শান্তি হরণ করিতে চেষ্টা করে—আমারদিগকে অভয়-পদ হইতে পরিচ্যুত করিবার জন্য মোহ-কোলাহল উত্থিত করিয়া কর্ণকে বধির করিয়া দেয়। পরমেশ্বর আমারদের সহায়—এই ভয়াবহ সংসারে আমরা মুমুক্ষু হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইতেছি, তিনি আমারদিগকে রক্ষা করুন।

হে পরমাত্মন্! আমরা উন্নত হইয়া তোমার নিকট আগমন করি নাই, নত হইয়াই তোমার নিকটে আসিয়াছি যে তুমি উন্নত করিবে। আমরা পুণ্যবান্ হইয়া তোমার নিকট আগমন করি নাই, পাপী হইয়াই আসিয়াছি যে তুমি পাপ হইতে পরিত্রাণ করিবে—অজ্ঞান ও দুর্ব্বলতা হইতে রক্ষা করিবে। দুঃখী হইয়াই তোমার আশ্রয় লইয়াছি যে দুঃখ-দুর্দ্দিনের অবসান হইবে—আমরা সম্পদে স্ফীত হইয়া তোমার নিকট আগমন করি নাই। আমরা কুৎসিত ও মলিন হইয়াই তোমার নিকট আসিয়াছি যে তুমি সেই মলিনতা পরিহার করিয়া হৃদয়কে সৌন্দর্য্য ও সাধু-ভাবে পূর্ণ করিবে। অসৎ হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইতেছি যে তুমি সৎ পদবীতে লইয়া যাইবে; অন্ধকারে ভীত হইয়া তোমাকে অনুসন্ধান করিতেছি যে তুমি স্বপ্রকাশ আলোকে লইয়া যাইবে; মৃত্যুর পাশে বদ্ধ হইয়া তোমাকে ডাকিতেছি যে তুমি অমৃত-স্বরূপে লইয়া যাইবে। আমারদের সকলি দুর্গতি, সকলি দুর্দ্দশা—কেবল তুমি একমাত্র আমারদের সম্পদ্। তোমার প্রতি নির্ভর করিয়া সৎকে—জ্যোতিকে—অমৃতকে প্রতীক্ষা করিতেছি। তুমি হৃদয়ে যে বিশ্বাস দিয়াছ, তাহা কখনই ব্যর্থ যাইবে না; আমরা নিশ্চয় জানিতেছি। হে পরমাত্মন্! অসৎ হইতে আমাকে সৎ-স্বরূপে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিঃ-স্বরূপে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃত-স্বরূপে লইয়া যাও। হে স্বপ্রকাশ! আমার নিকট প্রকাশিত হও। রুদ্র! তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তাহার দ্বারা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

ব্রহ্ম-বিদ্যালয়।

নবম উপদেশ।

ঈশ্বরের সত্য ভাব ও আমাদের উপর তাঁহার অধিকার।

"তিনিই সত্য, তিনিই আমাদের প্রভু।"

যিনি সৃষ্টির পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, জগতের অস্তিত্ব যাঁহার অস্তিত্বের উপর একান্ত নির্ভর করে, যদি সমুদায় সৃষ্টি ধ্বংস হয়, পরেও যিনি বর্ত্তমান থাকিবেন; তিনি ব্যতীত আর কে সত্য শব্দের প্রতিপাদ্য হইতে পারে? অস্তিত্বই সত্যের প্রকৃতি; অতএব ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান তিন কালেই যাঁহার অস্তিত্ব সমান, সমুদায় দেশ যাঁহার সত্তায় পরিপূর্ণ, জ্ঞান শক্তি মঙ্গল ভাবের অস্তিত্ব যাঁহাতে পূর্ণ-রূপে বর্ত্তমান; তিনিই প্রকৃত সত্য পদার্থ। এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমুদায় জগৎ যাঁহার ইচ্ছায় অসদবস্থা হইতে সদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, তিনিই সকল সত্যের এক মাত্র মূল। তাঁহার সত্য-ভাবই আর সকলের সত্য-ভাবকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। যে জগৎ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, যে আত্মা ইহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছে, এ উভয়ই এক সময়ে অসৎ অবস্থায় ছিল; সেই সত্য-স্বরূ-

পই ইহারদিগকে সদ্ভাবে আনয়ন করিলেন। অতএব যিনি এ অসৎ জগৎকে সত্য করিয়াছেন এবং ইচ্ছা হইলে এই সমস্ত সত্যকে পুনরায় একে বারে অসৎ করিতে পারেন; তিনিই সত্যের সত্য পরম সত্য।

যিনি সেই সত্যকে জানিতে পারেন, তিনিই আর সকল সত্যের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন। সেই অপ্রতিম সত্যের ভাব যাঁহার জ্ঞান-ক্ষেত্রে পরিস্ফুরিত হয় নাই, তাঁহার জ্ঞান ও বিশ্বাস সর্ব্বদাই চঞ্চল ভাবে সঞ্চরণ করে। ইহা অযথার্থ নহে যে, অধিকাংশ মনুষ্য এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎকে যে পরিমাণে সত্য বলিয়া অনুভব করে; ঈশ্বরের সত্য ভাব সেরূপ করিয়া উপলব্ধি করিতে পারে না। তাহার কারণ এই যে চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা মনুষ্যের আত্মা প্রায় সর্ব্বদা বহির্ব্বিষয়েই পর্য্যটন করে, অন্তর্দৃষ্টির উত্তেজনা এ জগতে অতি অল্পই হইয়া থাকে। এখানে আত্মার বাল্য কাল, আত্মার প্রভাব এখানে তত দূর পরিস্ফুটিত হয় না; সুতরাং আত্মা প্রতিনিয়তই রূপ রস প্রভৃতি বহির্ব্বিষয়ের আকর্ষণেই অভিভূত হইতেছে; বহির্ব্বিষয়ের সংসর্গেই আত্মা অধিক কাল অতিবাহিত করে; শরীরের অনুরোধে ও প্রবৃত্তির অনুরোধে এখানে আত্মাকে বাধ্য হইয়া বাহ্য বস্তু ও বহির্ব্বিষয়েরই সেবা করিতে হয়; এই রূপ আত্মার ধ্যান ধারণা, আশা কল্পনা, ও প্রীতি কামনা সমুদায়ই বহির্ব্বিষয়ে বদ্ধ হইয়া পড়ে। সুতরাং বাহ্য বস্তুই তাহার সর্ব্বস্ব হয় এবং তাহাকেই সার সত্য বলিয়া জ্ঞান করে। তথাচ কোন কোন মহাত্মার অন্তরে ঈশ্বরের নিগূঢ় সত্য ভাব সময়ে সময়ে যে আবির্ভূত হয়, ইহাই পৃথিবীর পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু যখন কোন কোন মহাত্মা ঈশ্বরের সত্য-ভাব ধারণ করিয়া মুক্তকণ্ঠে তাঁহাকে "সত্যস্য সত্যং" "সত্যস্য পরমং নিধানং" বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, তখন প্রতি আত্মাতেই যে তাঁহার সত্য-ভাব গ্রহণ করিবার সামর্থ্য বিদ্যমান আছে, তাহার সন্দেহ নাই। যিনি ব্রহ্মদর্শনের প্রকৃত উপায় অবলম্বন করিবেন, তিনি অবশ্যই কৃতকার্য্য হইবেন।

ঈশ্বর সত্য, এই জ্ঞানটি আপনাতে নিরন্তর জাগরূক রাখাই সিদ্ধি লাভের এক মাত্র উপায়। এই জ্ঞানটি যত ক্ষণ অভিভূত না হয়, তত ক্ষণ কেহই কল্যাণের পথ হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে না। এই জ্ঞান যত প্রস্ফুটিত হইবে, ঈশ্বরের স্বরূপ ততই জানিতে পারা যাইবে; কেন না তাঁহার স্বরূপ তাঁহার সত্য-ভাবের অভ্যন্তরেই অভিনিবিষ্ট আছে। এই জগৎ প্রতিক্ষণেই তাঁহার সত্য-ভাব প্রচার করিতেছে—আপনার সত্তার মূলাধার সেই পূর্ণ সত্যকে প্রকাশ করিতেছে—ভূলোক ও দ্যুলোক, স্থাবর ও জঙ্গম, জড় ও আত্মা, সকলে মিলিয়া সেই সত্য-স্বরূপকে প্রদর্শন করিতেছে। দূরে নিকটে, অন্তরে বাহিরে, সর্ব্বত্রই সেই সত্য-স্বরূপ দীপ্যমান হইয়া আছেন। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান তিন কালই তাঁহাকে বর্ত্তমান বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছে। জ্ঞানগর্ভ কৌশল-সকল সেই সত্য-স্বরূপের পরিচয় প্রদান করিতেছে। সকল শক্তিই সেই সত্য-পুরুষের সংবাদ আনয়ন করিতেছে। শুভাবহ নিয়ম সমস্ত সেই সত্য-স্বরূপের আদেশকেই বহন করিতেছে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম উপদেশ দিতেছেন যে "তিনিই সত্য" তাঁহার তুল্য সত্য আর কিছুই নাই; সত্যের যে সকল লক্ষণ, তাহা কেবল তাঁহাতেই পূর্ণরূপে বিদ্যমান আছে। তথাপি জগৎকে একে বারে অসত্য বলা

যায় না। ঈশ্বর পূর্ণ সত্য; জগৎ তাঁহা হইতে নিঃসৃত অপূর্ণ সত্য। রজ্জুতে সর্পভ্রমবৎ ঈশ্বরকে জগৎ বলিয়া ভ্রম হইতেছে না; ঈশ্বর ইহাকে সৃষ্টি করিয়া আমাদের সহিত ইহার যে রূপ সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, আমরা তদনুসারেই ইহাকে প্রত্যক্ষ করিতেছি। পরমাত্মা জড় ও জীবাত্মা এই উভয়বিধ জগৎ হইতেই সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তিনি আপন ইচ্ছাতে জগৎকে উৎপন্ন করিয়াছেন; স্বয়ং জগৎরূপে আবির্ভূত হন নাই। এ জগৎ বাস্তবিকই জগৎ; মায়াও নহে, স্বপ্নও নহে। যাঁহারা ঈশ্বরকে বিস্মৃত হইয়া সমুদায় জড়কেই সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহারা যেমন এক দিকে ভ্রমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছেন; আর যাঁহারা প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগতের সত্তা বিলুপ্ত করিয়া সমুদয়কেই পরমাত্ম-স্বরূপ বোধ করেন, তাঁহারাও সেই রূপ আর এক দিকে ভ্রমান্ধকারে নিপতিত হইয়াছেন। যাঁহারা ঈশ্বরকে পূর্ণ সত্য ও জগৎকে অপূর্ণ সত্য বলিয়া দেখিতে পান, তাঁহারাই যথার্থদর্শী।

সেই সত্য-স্বরূপ ঈশ্বরই আমাদের প্রভু। তিনিই আমাদিগের সত্তা ও জীবনের প্রেরয়িতা। তিনি আমাদের শরীর মন আত্মা সকলেরই বিধাতা। আমাদের যাহা কিছু আছে, তৎসমুদায় তিনিই প্রদান করিয়াছেন। তিনি বিনা বাধ্যতায় আমারদিগকে মনুষ্য করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি ইচ্ছা করিলে আমারদিগকে উৎপন্ন না করিতেও পারিতেন। তিনি আমারদিগকে এ অবস্থা না দিয়া কোন অপকৃষ্ট অবস্থাও প্রদান করিতে পারিতেন। তিনি যদি সেই রূপ করিতেন, কে তাঁহাকে নিবারণ করিতে পারিত? আমরা যে স্বাধীনতা প্রভাবে মহাগৌরবের আস্পদ হইয়াছি, তাহাও তিনি প্রদান করিয়াছেন। অতএব যখন এ সকল বিষয়ে আমাদের কিছুমাত্র কর্ত্তৃত্ব নাই, তখন আমরা সম্পূর্ণরূপে তাঁহারই বস্তু। তিনি আমাদের সর্ব্বপ্রকারে প্রভু। আমাদের উপর তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। আমারদিগকে সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত তাঁহার কোন প্রকার বাধ্যতা ছিল না; তিনি স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া আমারদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আমারদিগকে এই এই প্রদান করিতে হইবে বলিয়া তাঁহার উপরে আমাদের কিছুই দাবি ছিল না; তিনি স্বকীয় উদারতাতে আমারদের যাহা কিছু প্রয়োজন সকলই প্রদান করিয়াছেন। আমরা তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রভুতার অধীন হইয়াই জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। তিনি আমারদিগকে সুখ-সম্পদে সংস্থাপিত করুন, অথবা দুঃখ-বিপদে নিপাতিত করুন, তদ্বিষয়ে তাঁহার অক্ষুণ্ণ অধিকার আছে; তন্নিমিত্ত তাঁহার উপর অভিযোগ করিতে আমাদের কিছুমাত্র অধিকার নাই। তাঁহার ইচ্ছাকে আমাদের ইচ্ছার আয়ত্ত করিতে সংকল্প করা কখনই বিধেয় নহে। প্রত্যুত আমাদের ইচ্ছাকে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তাঁহার ইচ্ছার বশীভূত করাই একান্ত উচিত; তাহা না করিলে তাঁহার প্রভুত্বের প্রতি অবজ্ঞা করা হয়। তিনি যে আদেশ করিবেন—আমাদের ধর্ম্ম-বুদ্ধি ও বিচার-শক্তি দ্বারা যাহা তাঁহার আদেশ বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, অক্ষুব্ধ হৃদয়ে তাহা প্রতিপালন করাই আমাদের কর্ত্তব্য। যদি তজ্জন্য আমারদিগকে ম্রিয়মাণ হইতে হয়, তথাপি আমাদের মনে মনেও যেন তাঁহার উপর অভিযোগ উত্থাপিত না হয়।

আমরা যখন সম্পূর্ণ-রূপে তাঁহারই, তখন আমাদের প্রতি তাঁহার সর্ব্ব-প্রকার ব্যবহারই শোভা পায়। কিন্তু যখন দেখি

যে, আমাদের প্রতি কেবল প্রভুত্ব প্রদর্শন করিবার নিমিত্তই তিনি প্রভু হন নাই; প্রত্যুত আমারদের আত্মাকে উন্নত করিবার নিমিত্তই আমাদের প্রভু হইয়াছেন—যখন দেখি যে, তাঁহার প্রভুত্ব সুকঠোর প্রভু-শক্তির সমষ্টি নহে; প্রত্যুত বিমল নীতি ও কোমল করুণায় সেই প্রভুত্বের অভ্যন্তর পরিপূরিত আছে—যখন দেখি যে, আমরা যে সকল দুঃখ-ক্লেশ প্রাপ্ত হই, তাহা আমাদের বিনা দোষে নহে; প্রত্যুত আমরা মোহান্ধ হইয়া আত্ম-বিনাশের নিমিত্ত যে অশুভ পথে পদার্পণ করিয়াছিলাম, আমাদিগকে তাহা হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহারই নিষেধ দণ্ডরূপে আমাদিগের প্রতি প্রেরিত হইতেছে এবং যখন দেখি যে, প্রথমে তিনি অতি কোমল স্বরে আমাদের শুভ বুদ্ধিতে অসৎ পথে যাইতে নিষেধ করেন, তাহা কোন প্রকারে না শুনিলেই দুঃখ-ক্লেশ-রূপ কঠোর দণ্ড বিধান করিয়া সুপথে লইয়া যান; তখন তাঁহার প্রতি অভিযোগ করা দূরে থাকুক, হৃদয়ের সমুদায় কৃতজ্ঞতা ও সমুদায় প্রীতি প্রবল বেগে তাঁহার প্রতি প্রবাহিত হয়। তিনি আমাদের এই প্রকার প্রভু। তাঁহার প্রভুত্ব আমাদের অসহনীয় নহে, প্রত্যুত আমাদের অমোঘ কল্যাণের হেতু। প্রভু হইয়া দাসদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করেন, এমন প্রভু আর কে আছেন? যদি এমন প্রভুর সেবা করিতে না পারি, তবে আমাদের নিতান্ত দুর্ভাগ্য। তিনি প্রভু হইয়াও আমাদিগকে অধীন করিতে চান না; এই জন্যই আমাদের হৃদয় তাঁহার অধীন হইতে চায়। আমরা দাস হইয়া শত শত বার তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছি, তথাপি তিনি প্রভু-শক্তি সত্ত্বেও ক্ষমা দানে মুক্তহস্ত হইয়া আছেন! যেন এমন প্রভুর বিরোধাচারী না হই। যেন বিশ্বস্ত দাসের ন্যায় তাঁহার আজ্ঞাবহ হইয়া থাকি।

তত্ত্ববিদ্যা।

উপসংহার।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে মূলতত্ত্ব-সকলকে শাখা প্রশাখা সমেত এত অধিক বিস্তার পূর্ব্বক শ্রেণীবদ্ধ করিবার তাৎপর্য্য কি? এ জিজ্ঞাসার যাহাতে সমূলে নিবৃত্তি হয় এই অভিপ্রায়ে অধুনা সুস্পষ্ট-রূপে দেখান যাইতেছে যে উক্ত শ্রেণী বন্ধন হইতে বহুতর ফল লাভ হইতে পারে; এতদন্যথায় "সত্য অথচ তাহাতে কোন ফল নাই" ইহা বলিতে গেলে, সত্যের কিছুই পরিচয় দেওয়া হয় না, প্রত্যুত আমাদের আপনারদেরই অযত্ন ও শৈথিল্যের পরিচয় দেওয়া হয়। উক্ত শ্রেণী-বন্ধনের সর্ব্বাবয়ব একত্র করিয়া এই রূপ পাওয়া যাইতেছে।

পরমাত্মা	জগৎ	সম্বন্ধমূলক প্রজ্ঞা
অদ্বৈত	দ্বৈত-সাপেক্ষ	সার্ব্ব-ভৌমিক
পুর্ণ	অপূর্ণ	উন্নতিশীল
মূলাধার	আশ্রিত	প্রভাবময়
	জগৎ	
বিষয়ী	বিষয়	সম্বন্ধমূলক বুদ্ধি
এক	অনেক	সমষ্টি বদ্ধ
ভাবাত্মক	অভাবাত্মক	সীমাত্মক
স্বাধীন	পরাধীন	পরস্পরাধীন
	বিষয়	
কালিক	দৈশিক	সম্বন্ধমূলক
আবির্ভাব	আবির্ভাব	ইন্দ্রিয়-বোধ
ভূত	দীর্ঘ	গতি-সাপেক্ষ
বর্ত্তমান	প্রস্থ	বিস্তৃতি-সাপেক্ষ
ভবিষ্যৎ	বেধ	ঘনত্ব-সাপেক্ষ

উক্ত শ্রেণী-বন্ধন সম্বন্ধে প্রথম প্রস্তাব। কেহ কেহ বলেন যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও লক্ষণ বিষয়ক জ্ঞান মনুষ্যের স্বতঃ-সিদ্ধ নহে। ইঁহারা বলেন যে এক আর একে দুই হয়, এই প্রকার তুচ্ছ জ্ঞান-সকলকেই যাহা কিছু সর্ব্ববাদি-সম্মত দেখা যায়; কিন্তু ঈশ্বর আছেন, তিনি পূর্ণ-জ্ঞান মঙ্গল-স্বরূপ এবং সমুদায়ের এক মাত্র স্রষ্টা, এবম্বিধ গুরুতর জ্ঞান-সকল ঈশ্বরানুগৃহীত বিশেষ বিশেষ মহাত্মার উপদেশ ব্যতীত কাহারো মনে স্বতঃ-উদয় হইতে পারে না। ইহার প্রত্যুত্তর এই যে উপদেশের কথা যখন হইল, তখন একে একে দুই হয়, ইহাও শিক্ষক-বিশেষের উপদেশানুসারে আমরা শিখিয়াছি; কিন্তু উক্ত শিক্ষক কাহার নিকট হইতে শিখিয়াছেন? আর এক শিক্ষকের নিকট হইতে। এ শিক্ষকও আবার আর এক শিক্ষকের নিকট হইতে উক্ত জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। কিন্তু এ রূপ শিক্ষক-পরম্পরার সংখ্যা কি অনন্ত? কেহই কি আপনা হইতে উক্ত জ্ঞানের সূত্র আবিষ্কার করেন নাই? অবশ্যই এক জন কেহ আপনার আন্তরিক স্বভাব হইতে উহার আভাস পাইয়া শিষ্যানুশিষ্য পরম্পরায় তাহাই বহমান করত উহাকে উন্নতি-মুখে নিক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু ইহা বলিয়া কি উহার স্বতঃ-সিদ্ধতা বিষয়ে আমাদের লেশ মাত্রও সংশয় হয়? আমরা কি এরূপ মনে করি যে শিক্ষক বলিয়াছেন বলিয়াই উহা আমারদের শিরোধার্য্য? প্রত্যুত আমরা কি এরূপ মনে করি না যে শিক্ষক বলুন বা না বলুন, উহা স্বতঃ-সিদ্ধ হওয়াতে উহার কোন প্রকারেই অন্যথা হইতে পারে না? এই রূপ যিনি মূল সত্য, তিনি এক মাত্র অদ্বিতীয় ও জ্ঞান-স্বরূপ, ইহা আমরা যদিও শিক্ষক-বিশেষের নিকট হইতে প্রকাশ্য-রূপে প্রাপ্ত হইয়াছি, তথাপি উহা গূঢ়-রূপে আমাদের অন্তরে আপনা আপনি ছিল, সুতরাং উহা স্বতঃ-সিদ্ধ—এবিষয়ে কিছু মাত্র সংশয় হইতে পারে না। এস্থলে এই আর এক প্রশ্ন আসিতে পারে যে "একে একে দুই হয়"—এই যৎসামান্য জ্ঞানও আমরা যেখান হইতে পাইতেছি, "জ্ঞান-স্বরূপ ঈশ্বর আছেন"—এই অত্যাবশ্যক জ্ঞানও কি সেই খান হইতে আসিতেছে? ইহার উত্তর এই যে আত্মা এক না হইলে একের ভাব কোথা হইতে আসিত? বিষয় অনেক না হইলে অনেকের ভাব কোথা হইতে আসিত? জ্ঞান সমষ্টি-বদ্ধ না হইলে সমষ্টির ভাব কোথা হইতে আসিত? অতএব ইহাতে আর সংশয় কি যে উক্ত তিনটি মূল-তত্ত্বের প্রসাদেই এক এবং এক, এ দুয়ের সমষ্টি দুই রূপে পরিগণিত হইতে পারিতেছে। অতত্রব সংখ্যা-সম্বন্ধীয় স্বতঃ-সিদ্ধতা এবং আত্মা বা পরমাত্মা সম্বন্ধীয় স্বতঃ-সিদ্ধতা, উভয়ই যে একই আকর হইতে অবতীর্ণ হইতেছে, ইহা একটুকুও অযথার্থ নহে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। বিষয়ী আপন জ্ঞানেতেই আপনি প্রকাশ পায়—বিষয়ী স্বপ্রকাশ; কিন্তু বিষয় সেরূপ নহে, কেননা উহা কেবল অন্যের জ্ঞানেতেই প্রকাশ পায়। অন্যের জ্ঞানে প্রকাশিত হইতে গেলে সেই পরকীয় জ্ঞানের নিয়মাধীন হইয়াই প্রকাশিত হইতে হয়, স্বাধীন-রূপে প্রকাশিত হওয়া যায় না। এই হেতু বিষয় আপনি যে রূপ সেরূপে আবির্ভূত না হইয়া বিষয়ীর অনুরূপ ছদ্ম-বেশ ধারণ করিয়াই আবির্ভূত হয়; সুতরাং বিষয়-সকলের প্রকৃত ভাব এক রূপ এবং উহারদের আবির্ভাব আর এক রূপ। ইন্দ্রিয়-বোধ-সহকারে বিষয়ের আবির্ভাব

অগ্রে দেশ কালে প্রতিভাত হইলে পশ্চাতে উহার স্বরূপ-লক্ষণ-সকল বুদ্ধি-সংক্রান্ত প্রজ্ঞার যোগে অভিব্যক্ত হয়। বিষয়-সকল বাস্তবিক অনেক, অভাবাত্মক ও পরাধীন, অথচ উহারা এক ভাবাত্মক এবং স্বাধীন-রূপ ছদ্ম বেশ ধরিয়া দেশ কালে প্রবেশ করত ইন্দ্রিয়-প্রহরি-সকলকে প্রবঞ্চিত করে, কিন্তু বুদ্ধি সেই ছদ্ম-বেশ ভেদ করিয়া বিষয়ের বাস্তবিক লক্ষণ-সকল অবগত হইতে চেষ্টা করে; এবং প্রজ্ঞাতে উক্ত লক্ষণ-সকল অবিতথ-রূপে প্রকাশমান হয়।

অতএব বিষয়-সকল ইন্দ্রিয় সমক্ষে যে রূপ দেখায়; তাহা সত্য নহে, তাহা ভান মাত্র—তাহা জ্ঞান নহে, তাহা বোধ মাত্র। যথা ইন্দ্রিয়-সমক্ষে সূর্য্য অতিশয় অল্পায়তন বলিয়া বোধই হইতে পারে, জানা হইতে পারে না; কেবল বুদ্ধি দ্বারাই জানা হইতে পারে যে উহার আয়তন বাস্তবিক অতীব সুবিশাল। এই জন্য ইন্দ্রিয়-ক্রিয়াকে ইন্দ্রিয়-বোধ বলা যেমন সঙ্গত, ইন্দ্রিয়-জ্ঞান বলা কখনই সে প্রকার সঙ্গত নহে। একটা মৃৎ-পিণ্ডকে হস্তে ধারণ করিলে ইন্দ্রিয়-সমক্ষে আপাততঃ বোধ হয় যে ইহা এক সংখ্যক, কিন্তু বাস্তবিক এই যে, অনেক পরমাণু দেশে সন্নিহিত থাকাতেই উহারা এক রূপে প্রকাশ পাইতেছে। দ্বিতীয়তঃ দেশেতে উহার আবির্ভাব দৃষ্টে বোধ হয় যেন উহাতে একটা ভাব আছে; কিন্তু বাস্তবিক উহা অচেতন বস্তু—উহার ভিতরে কোন ভাব নাই। তৃতীয়তঃ বোধ হয় যেন উহা আপন শক্তিতে স্থিতি করিতেছে; কিন্তু বাস্তবিক উহা সচেতনবৎ স্বাধীন বস্তু নহে—সুতরাং উহা অন্যের অধীনেই অবস্থান করিতেছে। বিষয়ের ইন্দ্রিয়-গোচর আবির্ভাব সকল যে প্রকারে দেশে এবং কালে এক-সংখ্যক ভাবাত্মক ও স্বতন্ত্র-রূপে প্রতিভাত হয়; তাহার পদ্ধতি এই রূপ, যথা—দেশ কালকে বিভাগ করিয়া এত দূর সংক্ষিপ্ত করা যাইতে পারে যে তাহাতে এমন একটু অবকাশ থাকে না যেখানে ইন্দ্রিয়-বোধ-বিশেষ দাঁড়াইতে স্থান পায়; এমন একটি নিয়ম আছে যে অন্যূন এত পরিমাণ দেশ কালে ব্যাপ্ত না হইলে ইন্দ্রিয়-গোচর প্রতিমা-বিশেষ প্রকাশ পাইতে পারে না; সুতরাং যে কোন ইন্দ্রিয়-বোধকে আমরা ঐটুকু মাত্র দেশে অবস্থিত দেখি, তাহাকে তাহা-হইতে আর অধিক বিভাগ করিতে পারা যায় না; কেননা বিভাগ করিলেই তাহা অপ্রকাশ হইয়া যাইবে। এই রূপ অত্যল্প দেশ-ব্যাপী ইন্দ্রিয়-বোধকে যদি এক বলা যায়, তবে তাহার দ্বিগুণকে দুই বলিতে হয় এবং তাহার ত্রিগুণকে তিন বলিতে হয়; অথবা যদি তাহার দ্বিগুণকে এক বলা যায়, তবে তাহার চতুর্গুণকে দুই বলিতে হয় এবং তাহার ষড়্গুণকে তিন বলিতে হয়; এই রূপ করিয়া ইন্দ্রিয়-বোধ-সকল দেশে এক দুই বলিয়া পরিগণিত হয়। কালাত্যয় গণনারও ঐ একই রূপ প্রথা, যথা—ক অক্ষর উচ্চারণ করিতে কতক সময় লাগে এবং আমরা তাহার দ্বিগুণ সময়ে "কা" উচ্চারণ করিয়া থাকি। দীর্ঘ অপেক্ষা হ্রস্বকে আমরা দ্রুত উচ্চারণ করি, কিন্তু তাহা অপেক্ষাও দ্রুত উচ্চারণ হইতে পারে, এত দ্রুত হইতে পারে যে তাহা শ্রবণেন্দ্রিয়ে ধরা পড়ে না। অতএব কোন শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয়ে গ্রাহ্য হইতে হইলে কিয়ৎ পরিমাণ কালাত্যয় উহার পক্ষে একান্তই আবশ্যক; এই একান্ত প্রয়োজনীয় কালাত্যয় টুকু যখন প্রথম বারে আবশ্যক হয়; তখন উহা যে শেষ পর্য্যন্ত ক্রমাগতই আবশ্যক হয়, ইহা বলা বাহুল্য। উদাহরণ—প্রথমে "ক" উচ্চারণ করিবা-মাত্র

যৎকিঞ্চিৎ কাল সহকারে একটি পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়; পরে যদি ক-য়ের পর খ, খ-য়ের পর গ, গ-য়ের পর ঘ উচ্চারণ করত প্রতি পদেই উক্ত পরিবর্ত্তন নবীভূত করা যায়, তাহা হইলে সময়ের বিভাগ সুস্পষ্ট রূপে আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। কিন্তু যদি ক-খ-গ-ঘ র পরিবর্ত্তে উক্ত একই সময় ধরিয়া কেবল "কা" উচ্চারণ করা যায়, তাহা হইলেও সময়ের বিভাগ পূর্ব্বেরই ন্যায় বলবৎ থাকে, কেবল তত স্পষ্ট-রূপে অবধারিত হয় না; কেননা কোন ইন্দ্রিয়-বোধকে প্রথম বারে গ্রহণ করিতে গেলে যেমন কতক পরিমাণ কালাত্যয় আবশ্যক হয়, পরে আমরা যতক্ষণ তাহার প্রতি মনকে নিবিষ্ট রাখি, তত ক্ষণই সেই কালাত্যয় টুকু বহমান থাকা সেই রূপই আবশ্যক এবং উক্ত অত্যল্প মুহূর্ত্ত টুকুর দ্বিগুণ ত্রিগুণ চতুর্গুণ অনুসারে কালের ন্যূনাধিক্য আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ ইন্দ্রিয়-বোধ-সকলের ভাবাভাব-মূলক মাত্রা নির্ণয় সম্বন্ধেও ঐরূপ দেশ কালের নিয়ম বলবৎ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা অতীব স্পষ্ট যে অনেক উজ্জ্বল বস্তু দেশে যত ঘনিষ্ট রূপে সন্নিহিত থাকে, তদীয় উজ্জ্বল ভাবের ততই মাত্রাধিক্য হয় এবং উহারা যত দূরে দূরে থাকে, ততই উক্ত উজ্জ্বল ভাবের মালিন্য হয়; ইহাও সুস্পষ্ট যে যত অল্প কালের মধ্যে যত অধিক ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া প্রবর্ত্তিত হয়, ততই ইন্দ্রিয়-বোধের প্রাখর্য্য হয় এবং যত অধিক কাল লইয়া যত অল্প ইন্দ্রিয় ক্রিয়া সাধিত হয়, ততই ইন্দ্রিয়-বোধের মান্দ্য হয়। উদাহরণ—বায়ুর স্পন্দন পরম্পরা কর্ণকুহরে আহত হওয়াতেই শব্দ-বোধ উদ্ভূত হয়; এতদবস্থায় ইহা সহজেই বোধ-গম্য হইতেছে যে এক স্পন্দনের পর অন্য স্পন্দন, তাহার পর আর এক স্পন্দন, এই রূপ ক্রিয়া কালেতে যত ঘনীভূত হয়—অর্থাৎ যত দ্রুত রূপে প্রবর্ত্তিত হয়—ততই শব্দের প্রাখর্য্য হয় এবং উক্ত ক্রিয়া কালেতে যত বিরল হয়, ততই শব্দের মন্দতা হয়।

তৃতীয়তঃ ইন্দ্রিয়-বোধের স্বাতন্ত্র্য, পরতন্ত্রতাও ঐরূপ দেশ কালের নিয়মাধীন। কার্য্য এবং কারণের মধ্যে দেশ-কাল-মূলক ছেদ যত অল্প হয়, ততই ইন্দ্রিয়-বোধ-সকলের স্বতন্ত্রতা প্রকাশ পায়; এবং উক্ত ছেদ যত অধিক হয়, ততই কার্য্য-ভাগের পরতন্ত্রতা প্রকাশ পায়। উদাহরণ—যদি এক পরমাণুর আকর্ষণ বশতঃ আর এক পরমাণু তাহার এতদূর সন্নিকৃষ্ট হয় যে উহারদের মধ্যে দেশের অবকাশ কিছুই উপলব্ধি না হইয়া উক্ত দুই পরমাণু এক পরমাণু-সদৃশ প্রতীয়মান হয়—তাহা হইলে "এই পরমাণুটি আকর্ষণ-ক্রিয়ার কারণ ও ঐ পরমাণুটিতে উহার কার্য্য ফলিত হইতেছে" এবংপ্রকারে কার্য্য এবং কারণকে পৃথক্ রূপে নির্ণয় করা সাধ্য হয় না; প্রত্যুত এই রূপ বোধ হয় যেন কার্য্যত্ব এবং কারণত্ব একই পরমাণুতে অবস্থান করিতেছে, একই পরমাণু যেন আপনারই উপর কার্য্য করত আপনাকে আপনার নিয়মাধীন করিতেছে; এই প্রকার পদ্ধতি-অনুসারেই ইন্দ্রিয়-বোধ-সকল স্বতন্ত্র-রূপে প্রতিভাত হয়। কিন্তু যদি একটি আকর্ষণকারী পরমাণু ও আকৃষ্ট পরমাণুর মধ্যে অন্য কোন সামগ্রী বা কতক পরিমাণ শূন্য আকাশ ব্যবধান থাকে, তাহা হইলে কার্য্য এবং কারণ বিভিন্ন দেশে লক্ষিত হইয়া একটি পরমাণু যে অন্যটির পরতন্ত্র, ইহা সহজেই প্রকাশ পাইতে থাকে। দ্বিতীয়তঃ কোন এক ধ্বনির প্রবাহ আমাদের কর্ণ গোচর হইলে আমরা তাহাকে একটি ধ্বনি বলিয়া গ্রহণ করি; কিন্তু

সে ধ্বনি যে এক বস্তুর শক্তিতে অনেক ক্ষণ চলিতেছে, তাহা নহে; বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন শক্তিতেই উহা বহমান হইতেছে। বায়ুর অনেক হিল্লোল এ উহা-কর্ত্তৃক কর্ণ-কুহরে তাড়িত হইয়া তদীয় অনেক শক্তির ঘন ঘন অনুবর্ত্তন বশতই উহা প্রসূত হইতেছে; পরন্ত উক্ত বিভিন্ন ক্রিয়া-সকলের মধ্যে কালচ্ছেদ এত অল্প যে বোধ হয় যেন একই স্বতন্ত্র বস্তুর শক্তিতে উল্লিখিত ধ্বনি উৎপন্ন হইতেছে।

এই রূপ দেখা যাইতেছে যে বিষয়-সকল ইন্দ্রিয়-সকাশে যে রূপ আবির্ভূত হয়, তাহা উহারদের স্বরূপের অবিকল প্রতি-রূপ নহে। যেমন এক ব্যক্তি বাস্তবিক সাধু নহে—আপনাকে আপনি সাধু বলিয়া জানে না, অথচ সাধু সমাজে যথাসাধ্য সাধু-ভাব প্রকাশ করিতে বাধ্য হয়; সেই রূপ বিষয় আপনাকে আপনি সত্য বলিয়া জানে না, অথচ বিষয়ীর সমক্ষে যথা সাধ্য সত্য-ভাব প্রকাশ করিতে বাধ্য হয়। বিষয়ের মায়া-জাল, বিষয়ের কৃত্রিমতা—এই প্রকার বচন-সকল পুরাতন কালা-বধি যাবতীয় তত্ত্ববিৎগণের গ্রন্থে বিশিষ্ট-রূপে সম্মানিত হইয়া আসিতেছে; কিন্তু আত্মারও যে ঐরূপ কৃত্রিমতা হইতে পারে, এবং ততোধিক আশ্চর্য্যের বিষয়—পরমাত্মারও যে ঐরূপ কৃত্রিমতা হইতে পারে; ইহা কেবল আধুনিক ইউরোপীয় তত্ত্ববিৎগণের গ্রন্থ মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। পরন্তু শেষোক্ত আশঙ্কা যে নিতান্ত অমূলক তাহার আর সন্দেহ নাই; কারণ পরমাত্মা যখন সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন, তখন তিনি যে আপনাকে অসত্য-রূপে প্রকাশ করিবেন, ইহা ত একেবারেই অসম্ভব। এতদ্ব্যতীত—কোন মনুষ্যই জ্ঞান-সত্ত্বে আপনার নিকটে আপনি অসত্য-রূপে প্রকাশ পাইতে ইচ্ছা করে না, কেবল অজ্ঞতা বশতই মনুষ্য ওরূপ করিতে বাধ্য হয়। মনুষ্য আপনি এক রূপ হইয়া অন্যের নিকটে আর এক রূপ দেখাইলে তাহা কিছুই আশ্চর্য্য বোধ হয় না বটে, কিন্তু আপনার নিকট হইতে আপনার স্বভাব ঐ রূপ গোপন রাখা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? ইহা অস্বীকার করা যাইতেছে না যে, ব্যক্তি-বিশেষ বিষয়-মায়াজালে এ রূপ আচ্ছন্ন হইতে পারে যে সে অভিমান বশতঃ আপনি বাস্তবিক ক্ষুদ্র হইয়াও আপনাকে মহৎ মনে না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে না। এখানকার কেবল এই মাত্র তাৎপর্য্য যে আত্মা যে পরিমাণে স্বধর্ম্মানুযায়ী—অর্থাৎ উহা যে পরিমাণে জ্ঞানবান্ ও স্বাধীন—সেই পরিমাণে উহা আপনার নিকটে যথার্থ রূপেই প্রকাশিত হইয়া থাকে; কারণ আত্মা স্বাধীন-রূপে ও সজ্ঞান-রূপে কেন যে আপনাকে আপনি প্রতারিত করিবে, ইহার এক টুকুও অর্থ হইতে পারে না। আরো এই দেখা যায়, যে সাধু মহাত্মারা অন্যের নিকটেও আপনাদিগকে অসত্য রূপে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন না, প্রত্যুত ইহাঁরা আপনার-দের পবিত্র অন্তঃকরণকে সাধারণ-সমক্ষে যথার্থ-রূপে প্রকাশ করিতেই সর্ব্বদা যত্ন পাইয়া থাকেন। ঈশ্বরের ভক্তেরাই যখন এই রূপ, তখন স্বয়ং ঈশ্বর আমারদের ক্ষুধিত আত্মা-সমক্ষে আপনাকে যে রূপ প্রকাশ করিতেছেন, তাহা ঠিক সত্য কেন না হইবে? অতএব ইন্দ্রিয়গণই মায়ার রাজ্য বা আবির্ভাবের রাজ্য, বুদ্ধি আপেক্ষিক সত্যের রাজ্য বা ভাব রাজ্য, প্রজ্ঞা পরম সত্যের রাজ্য বা প্রভাবের রাজ্য। ইন্দ্রিয়গণকে অবিশ্বাস করাই জ্ঞান-উপার্জ্জনের প্রথম সোপান; কেন না মায়াবী ইন্দ্রিয়গণের প্রতিকূলে

সংগ্রাম করিয়াই বুদ্ধি সত্য-রাজ্যে আপন অধিকার বিস্তার করিতে সমর্থ হয়। উদাহরণ—সূর্য্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে না কিন্তু পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে; দূরস্থিত নক্ষত্র-বিশেষ চক্ষুতে এক-সংখ্যক দেখা যায়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা দ্বিসংখ্যক; সূর্য্যের আলোক একই প্রকার দেখা যায়, কিন্তু বাস্তবিক উহা সপ্ত প্রকার বর্ণের সংমিশ্র; মোহ বশত মনে হয় যে বিষয় স্বাধীন, আত্মা পরাধীন কিন্তু বাস্তবিক আত্মা স্বাধীন, বিষয় পরাধীন; এই রূপ আরো ভুরি ভুরি উদাহরণ উল্লেখ করা যাইতে পারে। এত ক্ষণ যাহা বলা হইল, ইহাতে এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে ইন্দ্রিয়গণ নিতান্তই অবিশ্বাসের পাত্র, বুদ্ধি কতক বিশ্বাসের যোগ্য ও প্রজ্ঞা সম্পূর্ণ বিশ্বাস-যোগ্য।

তৃতীয় প্রস্তাব। দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্পষ্ট-রূপে স্থাপিত হইয়াছে যে বুদ্ধি-চালনাতে আমারদের আপনারদেরই কর্ত্তৃত্ব পরিস্ফুট হয়; এ ক্ষণে প্রজ্ঞাতে উক্ত কর্ত্তৃত্বের যে রূপ অভাব বর্ত্তে তাহাই প্রদর্শন করা যাইতেছে। আমারদের আপনারদের বলে সত্য জানাতে বুদ্ধির প্রভাব প্রকাশ পায়, পরন্তু সত্যের বলে সত্য জানাতেই প্রজ্ঞার প্রসাদ অভিব্যক্ত হয়। সত্যের বলে জানা, মঙ্গলের বলে কার্য্য করা, এবং সৌন্দর্য্যের বলে প্রীতি করা; এ তিনটি একই প্রকার উন্নত অবস্থার কার্য্য। সত্যে বিশ্বাস, সৌন্দর্য্যে অনুরাগ, এবং মঙ্গলে উৎসাহ; ইহাতেই প্রজ্ঞার প্রাধান্য, ইহাতেই মনুষ্যত্ব। নিষ্কলঙ্ক সৌন্দর্য্য যখন আমারদের সম্মুখে, তখন কি আমরা যুক্তি ও কর্ত্তৃত্ব পুরঃসর তাহাতে প্রীতি সমর্পণ করি? না আমাদের প্রীতি আপনা হইতেই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে? এই রূপ, অবিতথ সত্য যখন আমারদের জ্ঞান-নেত্রের সম্মুখে বিরাজ করে, তখন আমারদের বিশ্বাস আপনা হইতেই আবির্ভূত হয় এবং যখন অমায়িক মঙ্গল আমারদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখন আপনা হইতেই আমাদের উৎসাহ প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। ইহাতে এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে পরমাত্মা আমারদের ব্যাকুলতা ও একান্ত আগ্রহ দেখিয়া এবং প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া যখন কৃপা-পূর্ব্বক আপনাকে আমারদের নিকট পরিষ্কার-রূপে ব্যক্ত করেন, তখন আমারদের জ্ঞান প্রীতি কর্ত্তৃত্ব ও সমুদায় মনের বৃত্তি যথোচিত চরিতার্থতা-পথে সহজেই ধাবমান হয় এবং তাহাতে আমরা যৎপরোনাস্তি কৃতার্থ হই। আমারদের আপন কর্ত্তৃত্ব যে রূপ বুদ্ধির প্রাণ, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা সেই রূপ প্রজ্ঞার প্রাণ; ঈশ্বরের বাক্য-স্বরূপ প্রজ্ঞা-নিহিত সত্য-সকলে যদি আমারদের শ্রদ্ধার হানি হয়, তাহা হইলে কেবল তর্ক-মাত্রের বলে আমরা কখনই উহারদিগকে আয়ত্ত করিতে পারি না। যে ব্যক্তি বলে যে ঈশ্বর নাই, অথবা আমি নাই, অথবা বাহ্য বস্তু নাই; তাহার সহিত উক্ত সকল বিষয় লইয়া তর্ক বিতর্ক করিতে গেলে অনর্থক বাক্য ব্যয় ভিন্ন আর কোন ফলই দর্শিতে পারে না। ঈশ্বর স্বয়ং আমারদিগকে বলিতেছেন যে "তুমি বাস্তবিক পদার্থ, মৃত্যুর হস্তেও তোমার বিনাশ নাই"—তাঁহার এ কথায় অবিশ্বাস করিয়া ফল কি? তিনি বলিতেছেন যে "সকলের উপরে আমি বিরাজমান আছি, সকলেতেই মঙ্গল হইবে, ভয় নাই"—ইহাতেই বা অবিশ্বাস করিয়া ফল কি? উক্ত সকল বাক্যের প্রতি বিশ্বাসের অধিকার যাহা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা কি বহুমূল্য নহে? তাহাতে কি আমারদের আত্মার তৃপ্তি হয় না? সত্যে বিশ্বাস না করিয়া অসত্যে বিশ্বাস করাই কি শ্রেয়? অতএব উক্ত প্রকার বিশ্বাস

কোন মতেই পরিত্যজনীয় নহে, প্রত্যুত সর্ব্বতোভাবে অবলম্বনীয়;—"মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ অনিরাকরণমস্ত্ব"। স্বতঃ-সিদ্ধ সত্য-সকল যে নিতান্ত বিশ্বাস-যোগ্য ও সে বিশ্বাস যে ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা-সাপেক্ষ; তাহার একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। ইংলণ্ডীয় বিখ্যাত পণ্ডিত সর্ উইলিয়ম হামিল্টন এই রূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে "কতক গুলি সত্য, যাহাকে আমরা স্বতঃ-সিদ্ধ বলিয়া বিশ্বাস করি, তাহা যখন আমরা বুদ্ধিতে আয়ত্ত করিতে পারি না; তখন তদ্বিষয়ে আমরা হাঁ কি না কোন কথা কহিবারই অধিকারী নহি"। এতদুপলক্ষে আমারদের বক্তব্য এই যে আমারদের বুদ্ধি উক্ত প্রকার সত্য-বিশেষকে সম্যক্ রূপে আয়ত্ত করিতে পরাভব মানিলেও অমরা তাহাতে বিশ্বাস না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না এবং তাহাতে বিশ্বাস করিবার অধিকার আমারদের সম্পূর্ণই আছে ও তাহাতে অবিশ্বাস করিবার লেশ মাত্রও অধিকার নাই। এতদ্বিরুদ্ধে কথিত মহাত্মার যুক্তি-প্রণালী এই রূপ; যথা—আকাশ অসীম, ইহাও আমরা জানিতে পারি না; আকাশ যে অসীম নহে, ইহাও আমরা জানিতে পারি না। ইহার প্রমাণ—আকাশকে আমরা যত পরিমাণ আয়ত বলিয়া জানিতে পারি, উহাকে তাহা হইতেও অধিক আয়ত বলিয়া না জানিলে উহাকে অসীম বলিয়া জানা হয় না; এই রূপ আকাশের আয়তন আমারদের জ্ঞানের অতীত হওয়াতেই উহা অসীম রূপে প্রকাশ পাইতেছে, সুতরাং উহার অসীমতা জ্ঞান কর্ত্তৃক অবধারিত হওয়া অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ ইহাও বলিতে পারা যায় না যে আকাশের সীমা আছে; কেন না যদি বলা যায় যে আকাশ এই টুকু, তাহা হইলে উহা যে তাহা হইতেও আর একটুকু অধিক, ইহা বলিবার বাধা কি? অতএব ইহা যেমন জানিতে পারা যায় না যে আকাশ অসীম, ইহাও সেই রূপ জানিতে পারা যায় না যে আকাশের সীমা আছে। সর্ উইলিয়ম হামিল্টনের এই রূপ দ্বৈধ-জনক তর্ক বিতর্ক সত্য-জ্যোতিকে নির্ব্বাণ করিতে উদ্যত হইলেও সত্যজ্যোতি তাহাতে আন্দোলন পাইয়া যে আরও প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে, ইহা কিছু মাত্র বিচিত্র নহে। সকল মনুষ্যই নিঃসংশয়-রূপে জানিতেছে যে আকাশ অসীম, কিন্তু আকাশ সসীম ইহা বিশ্বাস করিতে কেহই সমর্থ নহে; এতদবস্থায় কোন্ বিচারে সিদ্ধ হইতে পারে যে আকাশের অসীমতা ও সসীমতা উভয়ই জ্ঞানের চক্ষে সম-দৃষ্টি-ভাজন? অতএব এ বিষয়ে আর অধিক বাক্য ব্যয়ের কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই। কিন্তু যদি এ রূপ প্রশ্ন করা যায় যে আকাশের অসীমতা আমরা কি রূপে অবগত হই? তবে ইহার যথোচিত প্রত্যুত্তর দেওয়া আবশ্যক সত্ত্বে এ ক্ষণে তাহাই দেওয়া যাইতেছে। আমারদের জ্ঞান শরীর-পিঞ্জরে কিয়ৎ পরিমাণে আবদ্ধ হওয়াতে উহা সমুদায় আকাশকে সমান দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে না; আপনার শরীরগত আকাশকে সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী মনে করে এবং তাহা হইতে যে আকাশ-খণ্ড যত বিচ্ছিন্ন, তাহাকে ততই দূরবর্ত্তী মনে করে; কিন্তু যদি আমারদের জ্ঞান কিছু মাত্র শরীর পরতন্ত্র না হইয়া ঐশ্বরিক জ্ঞানের ন্যায় সর্ব্বতো ভাবে বিশুদ্ধ হইত, তাহা হইলে অসীম আকাশকে আমরা একই নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে এক কালেই অবলোকন করিতাম, তাহাতে আর সংশয় নাই। অতএব ঈশ্বরের নিরপেক্ষ ও অমায়িক জ্ঞানের প্রতি আমারদের বিশ্বাস অটল থাকাতেই তাঁহার সম-দৃষ্টি-ভাজন অসীম আকাশের অস্তিত্বে বিশ্বাস না করিয়া আমরা ক্ষান্ত থাকিতে পারি না—"জলে স্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে" "সর্ব্বত্র আছে গমন অথচ নাহি চরণ, কর বিনা করে গ্রহণ নয়ন বিনা সকল হেরে"। আমরা আপনারা যাহা জানি, তাহারই কেবল অস্তিত্ব আছে ও অন্য ব্যক্তি যাহা জানে তাহার অস্তিত্ব আছে কি না সন্দেহ-স্থল—এ রূপ বলা যেমন স্পর্দ্ধা মাত্র; আমরা আপনারা অসীম আকাশকে জ্ঞানে ধারণ করিতে পারি না বলিয়া, উহা আছে কি না সন্দেহ স্থল—এ উক্তিও সেই রূপ। কেন না উহাকে জ্ঞানে ধারণ করিতে আমরাই অশক্ত, ঈশ্বর কদাপি অশক্ত নহেন; অতএব যদি ইহা স্বীকৃত হয় যে আমরা যাহা নাও জানি, তাহার অস্তিত্ব থাকিবার বাধা নাই এবং ঈশ্বর যাহা জানেন, তাহার অবশ্যই অস্তিত্ব আছে—তাহা হইলেই অসীম আকাশের অস্তিত্ব অটল রূপে প্রতিপন্ন হয়। ইহাতে এই দেখা যাইতেছে, যে অসীম আকাশের অস্তিত্বে যথোচিত বিশ্বাস করিতে গেলে ঈশ্বরের পূর্ণ জ্ঞানে বিশ্বাস করা অগ্রে আবশ্যক; পূর্ণ-স্বরূপ পরমাত্মার প্রসাদেই আমরা অসীমের ভাব প্রাপ্ত হইয়াছি, নতুবা কেবল যুক্তি মাত্র দ্বারা আমরা কোন কালেই উক্ত ভাব উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইতাম না। এই রূপ আমারদের আত্মা এবং বহির্ব্বস্তু-সকল অনন্ত কাল বর্ত্তিয়া থাকিবে—এ বিশ্বাসটিও অনন্ত-স্বরূপ ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস-সাপেক্ষ এবং আর আর স্বতঃ-সিদ্ধ সত্য-সম্বন্ধেও দেখান যাইতে পারে, যে পরমাত্মার প্রতি বিশ্বাস ব্যতিরেকে উহাদের বিশ্বসনীয়তা নিতান্তই অমূলক হইয়া পড়ে। পুনর্ব্বার এই জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে ঈশ্বরের পূর্ণতা আমরা কি প্রকারে অবগত হই? ইহার প্রত্যুত্তর দেওয়া যাইতেছে। আমরা যদি আপনার প্রতি পক্ষপাত-শূন্য হইয়া সত্যের প্রতি মন সমাধান করি, তাহা হইলে আমরা আপনারা যে কত অপূর্ণ তাহা একে বারেই আমারদের জ্ঞান-গোচর হইবে; কেন? না—পূর্ণতার ভাব আদর্শ রূপে আমারদের আত্মার অভ্যন্তরে স্বতই বিরাজমান রহিয়াছে; এই মহান্ আদর্শের প্রতি যখন আমারদের দৃষ্টি যায়, তখন কাজেই আমারদের আপনারদিগকে তাহার তুলনায় অতীব অকিঞ্চন বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হয়। কেহ বলিলেও বলিতে পারেন যে পৃথিবীতে এ রূপ ভূরি ভূরি উৎকৃষ্ট সামগ্রী বিদ্যমান আছে, যাহার তুলনায় আপনাকে ঐ রূপ অকিঞ্চন মনে হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। ইহার উত্তর এই যে যখন আমরা নির্জ্জনে উপবেশন পূর্ব্বক বহির্ব্বিষয়-সকল হইতে মনকে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া আপন আত্মার প্রতি প্রণিধান করি, তখনই আরো বিশিষ্ট-রূপে আপন প্রগাঢ় অকিঞ্চনতা আমারদের অন্তরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত আক্রমণ করে; এবং যত কেন উৎকৃষ্ট বহু-মূল্য সামগ্রী সে অবস্থাগত উদাস অন্তঃকরণের সমীপবর্ত্তী হউক না, অমনি তাহার মূল্য একে বারে মৃত্তিকাসাৎ হইয়া পড়ে। অতএব অন্য কোন কারণে নহে, কেবল এক পূর্ণতার ভাব আমারদের আত্মার অভ্যন্তরে জাগরূক হওয়াতেই আমরা তাহার সমক্ষে হেঁট-মস্তক না হইয়া কোন রূপেই নিস্তার পাইতে পারি না। এই পূর্ণতার ভাবকে আমরা আপনারা ভাবিয়া চিন্তিয়া আনয়ন করি নাই, প্রত্যুত উহা আপনা হইতেই স্বীয় গুরু ভার ও স্বর্গীয় মহিমা সহকারে

অতীব শুভ ক্ষণে আমারদের আত্মাতে আসিয়া উদয় হয়। অতএব আমারদের এই অপূর্ণ আত্মা হইতে নহে—পূর্ণ-স্বরূপ পরমাত্মা হইতেই পূর্ণতার ভাব অবতীর্ণ হইতেছে।

এই রূপ দেখা যাইতেছে যে পূর্ণতার ভাব আমারদের বুদ্ধি দ্বারা কোন রূপেই প্রাপ্য নহে, অথচ প্রজ্ঞা উহার প্রতি নিঃসংশয় রূপে বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া কিছুতেই ক্ষান্ত হইতে পারে না। এখানে পুনর্ব্বার এই একটি জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে প্রজ্ঞা কেমন করিয়া বুদ্ধির অগম্য সত্য-সকলকে উপলব্ধি করে? ইহারও উত্তর দেওয়া যাইতেছে।—বুদ্ধি-চালনার একটি প্রকরণ-পদ্ধতি আছে, কিন্তু প্রজ্ঞার সে রূপ কোন প্রকরণ নাই। বাস্তবিক সত্য-সকলের দিকে বুদ্ধি ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হয় বটে কিন্তু কোন কালেই উহা প্রকৃত গম্য স্থানে উত্তীর্ণ হইতে পারে না, উহা কোন সত্যেরই শেষ পর্য্যন্ত পারদর্শী হইতে পারে না। পরন্তু প্রজ্ঞা বাস্তবিক সত্যে গিয়া একে বারেই পর্য্যন্ত হয়; বুদ্ধি এবং বুদ্ধির সিদ্ধান্ত এ দুয়ের মধ্যে যুক্তি-প্রকরণ-রূপ ব্যবধান অবস্থিতি করে কিন্তু প্রজ্ঞা এবং প্রজ্ঞার সত্য এ দুয়ের মধ্যে কিছুই ব্যবধান নাই; সুতরাং বুদ্ধি-সম্বন্ধেই জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে উহা কি প্রকরণ দ্বারা সত্য উপলব্ধি করে, কিন্তু প্রজ্ঞা-সম্বন্ধে সে রূপ জিজ্ঞাসা নিতান্তই অর্থ-হীন। উদাহরণ—বুদ্ধি দ্বারা আত্মাকে জানিতে গেলে সে জানার কখনই শেষ হয় না, সুতরাং আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করা সুকঠিন হয়; "নেতি নেতি" ইহা নহে, ইহা নহে,—এই রূপ অশেষ প্রকরণ দ্বারা বুদ্ধি আত্মাকে ধরিতে যায়, কিন্তু কোন কালেই ধরিতে পারে না। অসীম আকাশকে বুদ্ধি যখন—ইহা নহে, ইহা হইতেও অধিক—তাহা নহে, তাহা হইতেও অধিক—এই রূপ নেতি নেতি প্রকরণ দ্বারা আয়ত্ত করিতে যায়, তখনও উহা ঐরূপই পরাভব মানে। কিন্তু প্রজ্ঞা তর্ক বিতর্ক ও যুক্তি-রূপ প্রকরণ ব্যতিরেকেও একে বারেই জানিতেছে যে আমাদের জীবাত্মা আছে, অসীম আকাশ আছে, পূর্ণ-স্বরূপ পরমাত্মা আছেন ইত্যাদি। অতএব যাঁহারা প্রজ্ঞার প্রকৃতি বিষয়ে অনভিজ্ঞ, তাঁহারদেরই মুখে এ প্রশ্ন শোভা পায় যে কি প্রকরণ দ্বারা প্রজ্ঞা পূর্ণ-স্বরূপকে উপলব্ধি করে? অন্যথা এ প্রশ্ন মূলেই উত্থাপনের সম্ভাবনা নাই। বুদ্ধি-প্রকরণ দ্বারা সত্য উপার্জ্জন করাতে আমারদের আপনাদেরই কর্তৃত্ব প্রকাশ পায়; কিন্তু কোন প্রকরণকে অপেক্ষা না করিয়া সত্যের বলে সত্যে প্রত্যয় করাতে সত্য-স্বরূপেরই কর্তৃত্ব প্রকাশ পায়। আমারদের আপন কর্তৃত্ব যেমন বুদ্ধির প্রাণ, সত্য-স্বরূপ পরব্রহ্মে বিশ্বাস সেই রূপ প্রজ্ঞার প্রাণ। এই স্বাভাবিক বিশ্বাস, যাহা কোন প্রকরণ-পরতন্ত্র নহে, তাহাকে আত্ম-প্রত্যয় কহে, এবং বিনা প্রকরণে যে জ্ঞান আমারদের আত্মাতে আপনা আপনি আবির্ভূত হয়, তাহাই সহজ জ্ঞান শব্দে উক্ত হইয়াছে। সহজ শব্দের অর্থ সঙ্গে সঙ্গে জাত; আত্মা থাকিলেই যে জ্ঞান তাহার সঙ্গে সঙ্গে আবির্ভূত হয়, তাহাই সেই প্রজ্ঞা-মূলক সহজ জ্ঞান। এই আত্ম-প্রত্যয় এবং সহজ জ্ঞান সহকারেই প্রজ্ঞা, বুদ্ধির অপ্রাপ্য বাস্তবিক সত্য-সকলকে ঈশ্বর-প্রসাদে উপলব্ধি করিয়া থাকে; এবং প্রজ্ঞা যাহা বলে, তাহাতে বিশ্বাস ব্যতিরেকে উপায়ান্তর নাই।

ধর্ম্মের আদর্শ।

সাধারণের সম্পূর্ণ আদর্শ কেবল এক মাত্র ঈশ্বর। যাহার অনুকরণ করিয়া চলিলে রাজা প্রজা-পালনে, অমাত্য মন্ত্রণা-দানে, আচার্য্য ধর্ম্মোপদেশে, পিতা মাতা পুত্র কন্যার প্রতিপালনে, দম্পতী পরস্পরের প্রেম বন্ধনে, পুত্র কন্যা পিতা মাতার শুশ্রূষায় সমর্থ হন, যাহার অনুকরণ করিয়া চলিলে সমুদায় লোক যথাযোগ্য রূপে স্ব স্ব কর্ত্তব্য সকল সম্পন্ন করিতে পারে, তাহাই সম্পূর্ণ আদর্শ—সেই সম্পূর্ণ আদর্শ পরমেশ্বর। ঈশ্বর এই সংসাররূপ বিচিত্র কর্ম্মক্ষেত্রে মনুষ্যগণকে প্রেরণ করিয়াছেন। তারাগণের ন্যায় অসংখ্য কার্য্যে কর্ম্ম-ক্ষেত্র পরিপূরিত আছে। রাজ্য শাসন অবধি ক্ষেত্র কর্ষণ পর্য্যন্ত সমুদায়ই তাঁহার কাজ। এক্ষণে মনুষ্যগণ যে প্রকার ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া আছে, চির কালই সেই রূপ বিচিত্র কার্য্যের প্রয়োজন। যে ব্যক্তি যে কার্য্যের ভার গ্রহণ করিবে, তাহাকে তদুপযোগী গুণ ও সামর্থ্য সঞ্চয় করিতে হইবে। কি অর্থ শাস্ত্র, কি বীর-কার্য্য, কি পরমার্থ তত্ত্ব, পৃথিবীতে সকল গুলিই আবশ্যক। সকলকেই ঈশ্বর-পরায়ণ হইয়া সাধ্যানুসারে ঐ সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে হইবে।

এক মাত্র পূর্ণ-স্বরূপ ঈশ্বর ব্যতীত আর কেহই এ রূপ সম্পূর্ণ আদর্শ হইতে পারে না। ঈশ্বর জগতের রাজা—তিনি যে প্রকার ন্যায়ের সহিত অগণ্য প্রজাপুঞ্জের যথা-যোগ্য বিচার করিতেছেন, রাজা তাহার অনুকরণ করিলে পৃথিবীই স্বর্গ-ধাম হয়। ঈশ্বর জগতের পিতা মাতা—তিনি যে প্রকার অটল স্নেহে সন্তানগণকে প্রতিপালন করিতেছেন, পিতা মাতা তাহার অনুকরণ করুন, সন্তানগণের অব্যাহত কল্যাণ উৎপন্ন হইবে। ঈশ্বর সকলের পরম গুরু—মানবগণকে শিক্ষা-দিবার নিমিত্ত তাঁহার যে প্রকার শিক্ষা-প্রণালী, আচার্য্যগণ সেই আদর্শ গ্রহণ করিলে পৃথিবীতে-শিক্ষা বিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত হয়। ক্ষমা ও দয়া সেই আদর্শ হইতে গ্রহণ করিলে মনুষ্যই দেব-পদে প্রতিষ্ঠিত হন। অধিক কি, এমন একটি কর্ত্তব্যও নাই, যাহা সেই আদর্শ অনুসারে সুসম্পন্ন না হয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম সেই আদর্শ দর্শন করিয়াই সংকলিত হইয়াছে। মনুষ্য ব্রাহ্মধর্ম্ম অনুসারে আপনার চরিত্রকে নির্ম্মিত করিবেন; মনুষ্যের চরিত্রকে আদর্শ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রস্তুত হইতে পারে না। যদি কোন ব্যক্তির জীবন ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুযায়ী না হয়, তবে সেই মনুষ্যকেই দোষযুক্ত বোধ করিতে হইবে; কিন্তু কোন মনুষ্যের জীবন-চরিতের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের মিল হইতেছে না বলিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম অযুক্ত হইতে পারে না। যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে আদর্শ করিয়া, ব্রাহ্মধর্ম্মকে আদর্শ করিয়া, আপনার জীবনকে শোধন করিতে পারিবেন, তিনি ইহ লোকেও মনুষ্যত্বের পরা কাষ্ঠা উপার্জ্জন করিবেন।

থিওডোর পার্কর।

২৭৫ সংখ্যক পত্রিকার ৬৫ পৃষ্ঠার পর।

ধর্ম্মের উপাদান মানব প্রকৃতিতে অবিনশ্বর অক্ষরে মুদ্রিত রহিয়াছে। কি আন্তরিক নিরঙ্কুশ ইচ্ছা, কি বাহ্য অবস্থা, কি যুদ্ধ বিগ্রহ, কি শান্তি, কি স্বাধীনতা, কি দাসত্ব, কি অনভিজ্ঞতা, কি বিজ্ঞতা, কেহই ইহা উন্মূলিত ও বিধ্বস্ত করিতে পারে না। ইহার উন্নতির পথ প্রতিরুদ্ধ বা

উন্মুক্ত হইতে পারে ; ইহার শক্তি বিপথে প্রবর্ত্তিত বা উপযুক্ত স্রোতে প্রবাহিত হইতে পারে ; কিন্তু আন্তরিক ও বাহ্য কোন প্রকার বলই ইহার উপাদানকে এককালে বিনষ্ট করিতে পারে না। সুস্থ শরীর হইতে ক্ষুৎপিপাসা অপনীত করা যেমন সুকঠিন, আত্মা হইতে ধর্ম্ম-ভাব আচ্ছিন্ন করা সেই রূপ দুষ্কর। মনুষ্যের এই ভাবটি নিদ্রিত হইয়া থাকিতে পারে কিন্তু ইহার বিনাশ একান্ত অসম্ভব। অদ্য কোন বাহ্য কারণে ইহা প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে কিন্তু কল্য ইহা প্রজ্বলিত শিখাজাল বিস্তার পূর্ব্বক স্বর্গকে স্পর্শ করিবে। যখন এই ভাবটিকে ইহার প্রাকৃতিক গতি হইতে স্বতন্ত্র করা হয়, তখন ইহা অনিষ্টরাশি উৎপন্ন করিয়া বিনাশের পথ প্রস্তুত করিয়া দেয় ; তখনই আমরা ইহার ভয়-বিস্ময়কর নিগূঢ় শক্তির সম্যক্ পরিচয় লাভ করিয়া থাকি। যাহারা ধর্ম্মের বন্ধনকে ঘৃণা করে, যাহারা ইহার বীর্য্য কিছুই জানে না, সেই সমস্ত ঘোর বিষয়ীরা মনুষ্য-রূপ উদ্যানের মধ্যস্থলে ঈশ্বরের স্বহস্ত রোপিত এই ধর্ম্মরূপ বৃক্ষকে সমূলে উন্মূলিত করিবার চেষ্টা করে ; কিন্তু তদ্বিষয়ে কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারে না, প্রত্যুত এই জ্ঞানের ও জীবনের বৃক্ষ অক্ষুণ্ণ ভাবেই অবস্থান করিয়া থাকে। যাহারা নাস্তিক নাম পরিগ্রহ করিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করে, তাহারাও অবিজ্ঞাত রূপে এই বৃক্ষের সুপ্রশস্ত ছায়ায় বিশ্রাম ও ইহার সুস্বাদু ফলে তৃপ্তিসুখ অনুভব করিয়া থাকে। ধর্ম্ম অনুগত ব্যক্তিকেই সুখিত করে। যে ব্যক্তি ঐশিক নিয়মের বিরুদ্ধ অনুষ্ঠান করিয়া হৃদয় হইতে ধর্ম্ম ভাব উন্মূলিত করিবার চেষ্টা করে, তাহাকে যার পর নাই মর্ম্মভেদী যাতনা অনুভব করিতে হয় সন্দেহ নাই।

ধর্ম্ম-ভাব মানব প্রকৃতিতে একটি সুদৃঢ় ও গভীর উপাদান স্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহা কোন সমাজিক নিয়ম ও কল্পনার উপর নির্ভর করিতেছে না। ইহা প্রত্যেক মনুষ্যে তুল্য-রূপে বিদ্যমান আছে। যদিও ইহার পরিমাণ-গত বৈলক্ষণ্য যায়, কিন্তু প্রত্যেক আত্মাতেই ইহার প্রকৃতি একই প্রকার লক্ষিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক মনুষ্যের অতি গভীর অন্তর হইতেই পূজা প্রার্থনা ও স্তুতিগীত নিঃসৃত হয়। ধর্ম্ম যে কত দূর স্থান অধিকার করিয়া আছে, পৃথিবীর ইতিবৃত্তই তাহা এক প্রকার সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। ধর্ম্ম শিল্প ও পদার্থ বিদ্যার প্রসূতি ; অতিভীষণ সংগ্রামের উপরও ধর্ম্মের শাসন নিরীক্ষিত হয়। ধর্ম্মই অদৃশ্য হস্তে সমস্ত লোককে ধারণ করিয়া আছে। ব্যবস্থাপকদিগের নিষ্ঠুর ব্যবস্থা প্রণালী অপেক্ষাও ইহা অপ্রতিহত বলে মনুষ্যদিগের আন্তরিক দুর্দ্দান্ত রিপুগণকে দমন করিয়া রাখিয়াছে। ইহা মনুষ্যের সৎ প্রবৃত্তি সমুদায়কে উত্তেজিত করিয়া দিতেছে। সন্তাপহর সন্তোষ প্রেরণ করিয়া দুঃখ সমুদায় প্রশমিত করিতেছে, এবং দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্য হইতেও একটি বিশ্বাস প্রেরণ করিয়া ভবিষ্যৎ আশা উজ্জ্বল করিতেছে।

ধর্ম্মই সমাজ প্রতিষ্ঠিত এবং ব্যবস্থাপক ও শিল্পিদিগকে স্ব স্ব কার্য্যে উত্তেজিত করিতেছে। ইহাই পূর্ব্বতন বীরগণকে সমরক্ষেত্রে আহ্বান করিয়াছিল। সাহস ও সহিষ্ণুতা ধর্ম্মেরই পবিত্র আদেশে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ধর্ম্ম ব্যতিরেকে পণ্ডিতেরাও একটি নগর প্রস্তুত করিতে পারেন না কিন্তু ধর্ম্মের সাহায্য লাভ করিয়া এক জন নির্ব্বোধ বাতুলও বহুসংখ্য লোককে শাসন করিতে পারে।

অত্যুৎকৃষ্ট শিল্প কার্য্য সমুদায় ধর্ম্মের উৎসাহজনক বাক্যে সংসাধিত হইয়া থাকে। সুদৃঢ় দুর্ভেদ্য প্রস্তরও ধর্ম্মের মুগ্ধকর করস্পর্শে সমুন্নত হয় এবং উহা যেন যথার্থই পবিত্র জীবন বহন করিতেছে ইহা বোধ হইয়া থাকে। দেবতার একটি প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তিকে দেখিলে ইহা নিশ্চয়ই প্রতীয়মান হয় যেন সে নিস্তব্ধ ও জীবন্তভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া উপাসক দিগের প্রার্থনা ও স্তুতিগান শ্রবণ করিতেছে ; শিল্পবিদ্যা ধর্ম্মকেই মন্দির ভজনালয় যজ্ঞবেদি যূপ ও দেব প্রতিমা প্রভৃতি উপহার প্রদান করিয়া থাকে। যাহারা জড় বস্তুকে পবিত্র আকারে পরিণত করে, যাহারা সারবৎ কঠিন দ্রব্যকে আপনার আয়ত্ত করিয়া মঠ প্রভৃতি নানা প্রকার বস্তু প্রস্তুত করিয়া থাকে, যাহারা প্রস্তর দ্বারা আপনাদিগের ইচ্ছাকে জীবন্ত করিতে সমর্থ হয়, সেই সমস্ত ব্যক্তি কাহার নিকট হইতে এই রূপ উদ্ভাবনী শক্তি প্রাপ্ত হইল ? আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, ধর্ম্মই উহাদিগকে এই রূপ অদ্ভুত শক্তি প্রদান করিয়াছে। উহারা ধর্ম্মের উৎসাহেই এই সমস্ত বিস্ময়কর পদার্থ প্রস্তুত করিতেছে। মনুষ্যের আদিমাবস্থায় অজ্ঞানান্ধকারের মধ্য হইতেও ধর্ম্মের আদেশে মনুষ্যের প্রতিভা প্রকাশিত হইয়াছিল, দেবতাদিগের উদ্দেশে নানা প্রকার উপাখ্যান ও গান প্রস্তুত হইত এবং কৃতজ্ঞতা অনুতাপ ও প্রার্থনা-পূর্ণ গাথা সকল লোকের স্মৃতি-পথে জাগরূক থাকিত। ধর্ম্ম-বিরহে মনুষ্য গ্রাম, নগর ও গৃহ সমুদায় প্রস্তুত করিতে পারিত না, অন্ধকারের নিমিত্ত আলোক ও শীত নিবারণের নিমিত্ত বস্ত্রও প্রাপ্ত হইত না। ধর্ম্ম-বিরহে কোন জাতিই অবস্থান করিতে পারে না। সহস্র সহস্র মনুষ্য ধর্ম্মের নিমিত্তই দার পরিগ্রহ না করিয়া সন্ন্যাসীর বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া থাকে। তাহাদিগকে দেখিয়া কি কেহ এই রূপ কহিতে পারেন যে তাহারা সম্পদ সুখ ও যশোলাভার্থে এই রূপ অনুষ্ঠান করিতেছে ?

মনুষ্য ধর্ম্মের অনুরোধেই ত্যাগ স্বীকার করিয়া থাকে। মনুষ্য সুখ শান্তি, জনসমাজ, বন্ধু বান্ধব ও স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি যা কিছু প্রীতিকর বলিয়া বিবেচনা করে, ধর্ম্মের নিমিত্ত তৎসমুদায়ই পরিত্যাগ করিতে পারে। যদি ধর্ম্মের স্বর শ্রুতিগোচর হয়, তাহা হইলে কোন বিপদকেই বিপদ ও কোন ক্লেশকেই ক্লেশ বলিয়া বোধ হয় না। সাইমিয়ন বহু কালই স্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান থাকিবে এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা ঈশ্বরের প্রীতি উদ্দেশে আপনাদিগের দেহের মাংস চ্ছেদন করিবে। ধর্ম্মার্থই পেগান পৌত্তলিকেরা প্রস্তর নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তির সন্নিধানে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া আপনার অধিকৃত বস্তু সমুদায় প্রদান, অতি জঘন্য ব্রতাদি সংসাধন ও আপনার অঙ্গ বিশেষ ছেদন করিয়া থাকে। আত্মার পাপ শান্তির নিমিত্ত আপনার প্রথম সন্তানকে প্রদান করে এবং আপনার শরীরকে মৃত্যুর মুখে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। এই রূপ ত্যাগ স্বীকার করিলে দেবগণ প্রীত ও প্রসন্ন হইবেন, এই প্রকার বিশ্বাস করিয়াই তাহারা এই সমস্ত দুষ্কর কার্য্য অনুষ্ঠান করে। খ্রিষ্টীয় পৌত্তলিকেরা ভ্রান্তি সংকুল মতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সামান্য জ্ঞান ও ধর্ম্ম বুদ্ধিকে ঐ রূপ কল্পিত শাসনের হস্তে সমর্পণ করে, অলীক অমূলক বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপনে প্রস্তুত হয়, অসঙ্গত বাক্য আদরের সহিত প্রতিগ্রহ করে এবং যাহা ধর্ম্ম বুদ্ধির সম্পূর্ণ বিপরীত তাহার অনু-

ষ্ঠানে তৎপর হয়। যাহা মনুষ্যের জীবনকে ঘন বিষাদে আচ্ছন্ন করিয়া দিতেছে; অনন্ত কালকে ভয়ঙ্কর, মনুষ্যকে ক্ষুদ্র কীটের ন্যায় নিকৃষ্ট ও ঈশ্বরকে নির্দ্দয় নিষ্ঠুর বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছে এবং যাহার প্রভাবে খ্রিষ্টধর্ম্ম বিরোধী অর্দ্ধেক মনুষ্যকে অভিশপ্ত বলিয়া স্থির করিতে হয়, এই পৌত্তলিক সম্প্রদায়েরা সেই মতেই দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া থাকেন। এই অসঙ্গত বিশ্বাসের কারণ অনুসন্ধান করিলে তাঁহারা কহেন যে ধর্ম্মের অনুরোধে এই রূপ বিশ্বাস করা আমাদিগের কর্ত্তব্য। যখন দুষ্ট পুরোহিত অস্পষ্ট বাক্যে লাটিনভাষায় কূটার্থ পূর্ণ মন্ত্র পাঠ ও কর-যুগল উত্তোলন করেন, তখন অসাধারণ প্রতিভা সম্পন্ন টমাস মুরও ধর্ম্মের অনুরোধে এক খণ্ড রুটিকে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের প্রীতিকর বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন। এখনও টমাস মুরের ন্যায় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগকেও ধর্ম্মের আদেশ ও ঈশ্বরের নির্দ্দেশ বলিয়া সম্পূর্ণ অসঙ্গত মতের একান্ত পক্ষপাতী হইতে দেখা যায়। ধর্ম্মের নিমিত্ত অযৌক্তিক উপদেশও মনুষ্যের গ্রাহ্য হইয়া থাকে; ঘৃণিত ও দূষিত মত, নিকৃষ্ট আচার ব্যবহার এবং অনুপেক্ষণীয় দোষ সমুদায় ধর্ম্মের প্রভাবেই সুন্দর, মনোহর, সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও ঈশ্বর পরিগৃহীত বলিয়া বিবেচিত হয়। দুরাচার পামরেরা পাপাত্মা নরাধমকেও আশীর্ব্বাদ ও ধর্ম্মপরায়ণ পবিত্র ব্যক্তিদিগকেও অভিশাপ প্রদান করিতে পারে এবং যোগিগণ আশীর্ব্বাদ ও অভিশাপ উভয়েতেই হস্তোত্তোলন করিতে সমর্থ হয়।

কাহার শাসনে এই সমস্ত কুৎসিত বিষয় এবং ঈশ্বরের অকীর্ত্তিকর দূষিত মত সমুদায় লোকের গ্রহণযোগ্য হইতে পারে? কাহার নিমিত্ত মনুষ্যেরা এই সমস্ত কার্য্যানুষ্ঠান ও এই রূপ দুষ্কর ত্যাগ স্বীকার করিয়া থাকে। ধর্ম্মের জন্যই রাজা, অমাত্য, প্রধান পদস্থ ও উন্নতমনস্ক মনুষ্যেরা আপনাদিগের সুগভীর বিচার শক্তিকে বির্জ্জন ও জ্ঞান চক্ষুকে মুদ্রিত করে এবং যাহারা ভণ্ডতা ও কপটাচার বৈ আর কিছুই জানে না, সেই সমস্ত হতভাগ্য নির্ব্বোধ ব্যক্তিদিগের চরণে প্রণত হয়। আদি ভবিষ্যদ্বক্তার সময় অবধি এখন পর্য্যন্ত ধর্ম্মের জন্য এই রূপ অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। বুদ্ধির গৌরব, জ্ঞানের প্রাধান্য, ধর্ম্ম বুদ্ধির উৎকর্ষ এবং প্রীতি ও বিশ্বাসের সৌন্দর্য্য অপহৃত ও পদতলে নিক্ষিপ্ত করা হইয়াছে। কর চরণ চক্ষু কর্ণ ও জিহ্বা প্রভৃতি বিশুদ্ধ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, বিচারশক্তি, কল্পনা শক্তি প্রভৃতি উৎকৃষ্ট মানসিক বৃত্তি, দয়া ন্যায় পরতা ও প্রীতি প্রভৃতি আধ্যাত্মিক বৃত্তি সমুদায়কে অপবিত্র বস্তুর ন্যায় ঈশ্বরের পবিত্র ক্ষেত্রে বলিপ্রদান করা হইয়াছে। কি পৌত্তলিক কি খ্রিষ্টসন্ন্যাসী কি বিদ্যাবিশারদ মনীষী কি সুসভ্য মনুষ্য সকলকেই এই রূপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে।

এই শোকাবহ ফল-সকল ধর্ম্ম ভাবের ভ্রান্তিও মনুষ্যের বিকৃতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়; কিন্তু ইহা ধর্ম্মের সহিত জড়িত এবং ধর্ম্মের প্রকৃত ফল বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই অনেকের এই রূপ একটি সংস্কার জন্মিয়াছে যে, ধর্ম্ম একটি ভয়ঙ্কর পদার্থ এবং উহা মনুষ্যের মূর্খতা ও বাতুলতা। ফলত এই রূপ বিষদৃশ ফল ধর্ম্মকে অন্য প্রকারে প্রতিপাদন করিতেছে। এই সকল ফল দ্বারাই যাহা মনুষ্যের ক্রোধাদি রিপু, ধর্ম্মবুদ্ধি, জ্ঞান ও প্রীতির উপর আধিপত্য করে, সেই ধর্ম্মভাবের গাম্ভীর্য্য ও ভয়-বিস্ময়-কর বলবীর্য্যের সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে। যদি এক জন মনুষ্যকে এই বলিয়া প্রলোভিত করা যায় যে সে জীবন পরিত্যাগ করিলে তাহার কোন স্বার্থ সাধন হইতে পারে, তখন সংশয় উপস্থিত হইয়া তাহার চিত্তকে আন্দোলিত করে, কিন্তু যদি তাহাকে বলা যায় যে তুমি ধর্ম্মের নিমিত্ত প্রাণ পরিত্যাগ কর, ধর্ম্ম তোমার নিকট এই রূপ আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন, তখন কেবল সেই ব্যক্তি নহে, সহস্র সহস্র লোক আনন্দের সহিত উৎসাহের সহিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবে। ধর্ম্ম একটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদার্থ; এই ধর্ম্মই নিকৃষ্ট ব্যবহারে পরিণত হয় কিন্তু আবার সেই নিকৃষ্ট ব্যবহারই ইহার মর্য্যাদা হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেয়।

নূতন পুস্তক।

১। চিত্তোৎকর্ষ বিধানং। এই পুস্তক খানি সংস্কৃত পদ্যে বিরচিত। শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস অধিকারী ওয়াট্ সাহেবের ইম্প্রুবমেণ্ট অব মাইণ্ড্ নামক পুস্তকের কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া এই গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন। এই গ্রন্থ দুই পরিচ্ছেদে বিভক্ত। গ্রন্থকার প্রথম পরিচ্ছেদে ভূমিকা দ্বারা গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বর্ণন করিয়া গ্রন্থারম্ভে চিত্তোৎকর্ষ বিধানের পঞ্চদশ প্রকার নিয়ম নির্দেশ করিয়াছেন। তৎপরে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দর্শন, অধ্যয়ন, উপদেশ গ্রহণ, আলাপ ও চিন্তা, চিত্তোৎকর্ষ বিধানের এই পাঁচ প্রকার উপায় নির্দ্দেশ করিয়া ইহাদের প্রত্যেকের লক্ষণ ও গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। যে মূল পুস্তক অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহার বিষয় সর্ব্বাংশেই উৎকৃষ্ট সন্দেহ নাই। কিন্তু এই অনুবাদিত গ্রন্থ তাদৃশ প্রাঞ্জল হয় নাই। এই গ্রন্থের বিজ্ঞাপন দৃষ্টে বোধ হইল, গ্রন্থকার এতদ্দেশীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগকে সংস্কৃত ভাষা দ্বারা নূতন জ্ঞান শিক্ষা দিবার নিমিত্ত এই গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন; কিন্তু এ বিষয়ে তিনি কত দূর কৃতার্থতা লাভ করিতে পারিবেন, বলিতে পারি না। গ্রন্থকার এক স্থলে লিখিয়াছেন যে, "মানবপ্রকৃতের্ভূরিদোষদৌর্ব্বল্যবিভ্রমাঃ। আদিস্বধর্ম্মবিভ্রংশরূপপাতিত্যসম্ভবাঃ।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে প্রথমে মনুষ্যের একটি বিশুদ্ধ ধর্ম্ম ছিল, মনুষ্য সেই আদি ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে; সেই পাতিত্য নিবন্ধন মানব প্রকৃতিতে অনেক দোষ, ক্ষীণতা ও ভ্রান্তি উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা খৃষ্টীয় মত এবং সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। গ্রন্থকার যদি এই ভাবটি উঠাইয়া দিতেন, তাহা হইলে গ্রন্থের উদ্দেশ্যও ব্যাহত হইত না এবং ইহার গৌরবও সমধিক হইত। তিনি যদি কেবল খৃষ্টান্‌দিগের নিমিত্ত ইহার অনুবাদ করিতেন, তাহা হইলে হানি ছিল না। এতদ্দেশীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা খৃষ্টীয় ভাবগুলি পরিত্যাগ পূর্ব্বক যদি ইহার যথার্থ হিতকারী বিষয় গুলি শিক্ষা করেন, তাহা হইলে অনেক উপকার লাভ করিতে পারিবেন।

২। আঞ্জমনি-পঞ্জাবের বিবরণ। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ২১ জানুয়ারি পঞ্জাবে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সভার উদ্দেশ্য দুই প্রকার। প্রথম সংস্কৃত ও আরবি প্রভৃতি প্রাচীন ভাষার পুনর্জীবন প্রদান, দ্বিতীয় তৎপ্রদেশস্থ সমস্ত লোকের নিকট পারস্য, হিন্দি ও উর্দ্দু ভাষায় বিবিধ জ্ঞানের শিক্ষা দান। এই বিবরণ পুস্তকে ইংরাজী ও উর্দ্দু ভাষায় তাহার উপায় ও নিয়ম সকল নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহা আলোচনা করিলে স্পষ্ট বোধ হয় যে, পঞ্জাব দিন দিন উন্নত হইতেছে।

(FROM THE ENGLISMAN.)

To make up the present of all nations there must be a past. The present, to use the words of the late Prince Consort in his address to the British Association, stands on the shoulders of the past; and if so, upon the shoulders of what Past shall we build the present of India? Upon the past of Egypt, Babylonia, Assyria, Persia, Greece, Rome, Germany,

France, England, or any other modernly civilized nation of the world, or upon the past of India herself? Surely, if ever there was a country, the Past of which is interesting and instructive to the student of history, that country is India. What! exclude from the course of an *Indian* University, the ancient history of that people, who, issuing from our common home, established in a remote land, a civilization, unique in itself, which penetrated as far as Egypt and beyond it; forbid its students to recal that period when, all Europe, but a little spot, being sunk in barbarism, Alexander the Great, if the records of Megasthenes and Strabo are to be believed, found in India schools of philosophers whose whole life was devoted to the study of the sublimest transcendentalism, the profoundest of all knowledge,—the knowledge of the soul? Shall we hide from our native students our own belief in the superiority of the race from which they have sprung,—that race who, having settled amongst savage tribes, reduced rude societies to order, invented letters, and elaborating a wonderously perfect language, laid the very foundations, we may say, of the highest order of philology, who, having similarly invented numbers, unaided, but by the force of their natural genius, advance to arithmetic and astronomy, calculated eclipses, and made other accurate astronomical observations? Are we to hold back from those, we fain would elevate, the knowledge that, when all was chaos in Northern Europe, their forefathers had established systems of law, logic, and mental and moral philosophy, which, if at the present day they are considered eccentric, prove them, nevertheless, to be capable of, and at one time to have attained, the very highest mental culture, and then to have been possessed of an original, and not a purely imitative genius? Are the names of Manu, Yajnavulkya, Parasara, Viswamitra, Sakya Muni, Kapila, Saunaka, Katyayana, Panini, Kalidasa, Vyasa, Valmiki, and whole host of others we might mention, to be proscribed, and their great works to be held up to public scorn, or, so to speak, to be burned by the common hangman? Or to take a nearer retrospect, is that Oriental link to be cut out of the chain which connects the civilization of our own times with that of Ancient Greece? Is it from the pages of Chaucer alone, that the students of an Eastern University are to learn that in *his* day knowledge in England, as in the rest of Europe, was sought from

> ——————olde Esculapius,
> And Discorides, and eeke Rufus;
> Old Ypocras, Haly, and Galien;
> Serapyon, Razis, and Avycen;
> Averrois, Damescen, and Constantyn;
> Bernard, and Gatisden, and Gilbertyn?

Are our students to be permitted to read in Elphinstone, Mill, Elliot and others, or in the proceedings of the Asiatic Society, of the foundation of mighty empires, the building of temples, the endowment of colleges, schools, and charitable institutions, the encouragement of learning and men of letters, by the mighty sovereigns who have ruled over this land; to see around them the ruins of canals, roads, fortresses, mosques, and mausoleums of the most exquisite architecture, and exhibiting a highly, refined state, and to compare them with that monument of empty bottles which it was said, and a very few years back might very justly be said, was all we should leave behind us;—to hear that such men as Sir William Jones, James Prinsep, Sir W. Macnaghten, Colebrooke, H. H. Wilson, Sir Henry Elliot, and the few scholars British India has produced, attained a European celebrity from their profound knowledge of the Past, and yet be expected to believe that that Past is 'unmixed evil.' In short, having eyes shall they see not, ears shall they hear not, and understanding shall they be dead to those impulses which, be they of creed, of nation, or of race, nature has implanted in the hearts of all it has endowed with superior intelligence. Impossible! Yet such would really appear to be the visionary idea of the authorities of our chief Educational Institution. The past of India, her mythology, her religions, her laws, her ancient languages, her literature with its dramas and epics, her logic, her antiquities, have all been carefully excluded from the Calcutta University system; and, whichever way we view it, what a melancholy parody on that system is it, that before the close of the first decade of the Institution's existence, the Vice-Chancellor has thought it necessary to devote a third of his annual address to a vain endeavour to wean the students from dwelling on that period of their country's history which is said to be "unmixed evil." And why is this?

Why, we would ask, whether the past of India be good or evil, should the sons of her soil be warned against a practice which, from time immemorial, the natives of all countries have considered one of their dearest privileges? Why again should it be deleterious? Or, admitting for argument sake, the past of India to be all evil, and the present all good, why should any one, having full confidence in the latter, dread a comparison with the former, however, highly that comparison might be colored? We really can see no reason for it; but on the contrary, every reason why such comparison should be encouraged to the utmost, as the surest means of making the students appreciate those great advantages which they are told they enjoy under British rule.

But a question arises on the threshold of this argument, and of all similar arguments, in which the premises are not demonstrable facts or admitted truths,—is the conclusion true? Is the past of India unmixed evil? With the most convincing of proofs of the high place in the intellectual history of the world which Ancient India has a right to claim, furnished by early Greek Historians, proofs which Europeans Savans have verified and increased manifold, and with the institutes of Akbar before us—to which as the Government of India are now defraying the expenses of a new edition, they would probably not be ashamed to own their obligations,—we think we may spare ourselves the trouble of advancing further evidence to prove the negative of so novel a proposition. The past of India may be singular according to our notions, and, as with the past of all nations which recede into very remote antiquity, it may contain much that is repugnant to modern ideas of civilization, but, most certainly, no one with any but a very superficial knowledge of that past could be so bold or so rash as to pronounce it unmixed evil. Indeed, could Dr. Maine succeed in establishing the affirmative of his proposition, we fear that it would prove too much; for, were it so, it would be impossible to find a circumstance more condemnatory of the present system than that those brought up under it, preferred to look back with longing eyes to those evil times, than to the bright prospect which they are confidently assured, lies before them. Depend upon it, when such is the case, there must be something much more wrong with the present than with the past, and that the fault lies not with the students, or in the practice by them of any modern tricks they may have picked up from their European instructors, but that the evil has deeper roots. Depend upon it the Natives of this or any other country will not withdraw their thoughts from the present to dwell with satisfaction or pride on the past, or to yearn after its imaginary blessings, unless they feel some real want which the present does not supply. The learned doctor, it appears to us, has overlooked—possibly rather looked over—the true cause of discontent which finds expression in regrets for the past, if it really exist. The educated natives of this country if we understand their views rightly have no desire whatever to be astrologers, poets, or chroniclers to mythical Indian Princes of ancient memory, nor do they spend much of their time in comparing the briliancy of the career of learned men in ancient and modern India. Taking them at Dr. Maine's high valuation, they are far too astute and far too sensibly alive to their own interests, to have any such silly notions. What they deplore is, that the real Indian Kings, Viceroys, and Princes of British India, have no astrnomers, poets, or historians, attached to their Courts; and that, consequently, there are *no* learned men in India. In other words, learning is not encouraged— there is no demand for it, and consequently, it is not produced. Under Mahomedan rule there was always a large literary class, scattered throughout India. The last vestiges of this class still exist, but they are reduced in circumstances, and are scattered so far and wide that they may almost be said to have disappeared. The class can obtain no fresh blood, or new life because for a man to devote himself to any kind of learning now, is to make mendicity his profession, or to starve. The class therefore, and, with it, all learning, is dying out. This very probably is what the educated Natives feel; and it is with this very natural feeling, no doubt, which Sir Donald McLeod, and many who coincide with him in his views regarding the present system of exotic education, have very great sympathy.

বিজ্ঞাপন

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে দুর্ভিক্ষ উপশমের নিমিত্ত কটক ব্রাহ্মসমাজে ২৫০ ও মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজে ২০০ টাকা প্রেরিত হইয়াছিল। পূর্ব্ব বারে কটক প্রদেশের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। সংপ্রতি মেদিনীপুরের সংবাদ পাওয়াগিয়াছে। তথায় প্রতি দিন ৮০ জন করিয়া আহার প্রাপ্ত হইতেছে। তথাকার সমাজের অধ্যক্ষেরা বিবেচনা করিয়াছেন যে, এই টাকায় প্রায় ৩ মাস এই রূপ সাহায্য করা যাইতে পারিবে।

দুর্ভিক্ষ উপশমের সাহায্যার্থ দান প্রাপ্ত।

পূর্ব্বে বিজ্ঞাপিত	৪৯৭৷৶০
শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য	৩৬৶০
" গিরীন্দ্রনাথ সিংহ	১
	৩৭৶০
	৫৩৪৷৶০

কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের ১৭৮৮ শকের শ্রাবণ মাসের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা	১২০৸৶০
পুস্তকালয়	৯৬ (১০
যন্ত্রালয়	৩৩০৸০
ডাক মাসুল	২৫৷৶০
দুর্ভিক্ষে দান প্রাপ্ত	৩৭৶০
রামলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পত্তি হইতে দান প্রাপ্ত	২৮
গচ্ছিত	৬৪৸/০
	৭০৩৶১০

ব্যয়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	১৬৪ (৫
যন্ত্রালয়	১২১৶১০
পুস্তকালয়	৯১৷৵১০
মাসিক বেতন	১০৭
ডাক মাসুল	২৪৷১০
অনিরূপিত	৯১/৫
আলোকের ব্যয় (জুন ও জুলাই ২মাসে)	৪১৷৶৫
কাগজ পত্রাদি	৬৸৶০
গচ্ছিত	৮৭৷৶০
	৬৫৩৷৶৫

আয়	৭০৩৶১০
পূর্ব্বকার স্থিত	১৭১৷৵০
	৮৭৪৷৶১০
ব্যয়	৬৫৩৷৶৫
স্থিত	২২১(৫

শ্রী সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

১৭৮৮ শকের শ্রাবণ মাসের দানের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় ..	১৬

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২০
	৩৬

আয়	৩৬
পূর্ব্বকার স্থিত .	৮৯৸০
	১২৫৸০

ব্যয়

ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার জন্য মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজে দান	১০
	১১৫৸০

শ্রী সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১ আশ্বিন রবিবার প্রাতঃকালে ৭৷৷০ সাড়ে সাত ঘণ্টার সময়ে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাসুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২৩। কলিগতাব্দ ৪৯৩৭। ১২ ভাদ্র সোমবার।

একমেবাদ্বিতীয়ং
ষষ্ঠ কল্প
চতুর্থ ভাগ
আশ্বিন ১৭৮৮ শক।
২৭৮ সংখ্যা ৩৭ ব্রাহ্মসম্বৎ

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেবং নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদসংহিতা।

প্রথমমণ্ডলস্য ত্রয়োদশানুবাকে দশমং সূক্তং।

গোতমঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ ইন্দ্রোদেবতা।

৮৮৫

১। অসাবি সোম ইন্দ্র তে শবিষ্ঠ ধৃষ্ণবা গহি। আ ত্বা পৃণক্ত্বিন্দ্রিযং রজঃ সূর্য্যো ন রশ্মিভিঃ।

১। হে 'ইন্দ্র' 'তে' ত্বদর্থং 'সোমঃ' 'অসাবি' অভিষুতোঽভূৎ। হে 'শবিষ্ঠ' অতিশয়েন বলবন্ অতএব 'ধৃষ্ণো' শত্রূণাং ধর্ষয়িতঃ ইন্দ্র 'আগহি' দেবযজনদেশং আগচ্ছ। আগতং 'ত্বাং' 'ইন্দ্রিযং' সোমপানেনোৎপন্নং প্রভূতং সামর্থ্যং 'আপৃণক্তু' আপূরযতু। 'রজঃ' অন্তরীক্ষং 'রশ্মিভিঃ' কিরণৈঃ 'সূর্য্যঃ' 'ন' যথা সূর্য্যঃ পূরযতি তদ্বৎ।

১। হে ইন্দ্র! তোমার নিমিত্ত সোমরস সংস্কৃত হইয়াছে। হে মহাবল! হে শত্রুবিনাশন! তুমি এই দেবযজন প্রদেশে আগমন কর। যেমন দিবাকর কর-নিকর দ্বারা নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ করেন, সেই রূপ সোমরস-পানোৎপন্ন সামর্থ্য তোমাকে পূর্ণ করুক।

৮৮৬

২। ইন্দ্রমিদ্ধরী বহতোঽপ্রতিধৃষ্ট শবসং। ঋষীণাং চ স্তুতীরুপ যজ্ঞং চ মানুষাণাং।

২। 'অপ্রতিধৃষ্টশবসং' কেনাপ্যপ্রধর্ষিতবলং অহিংসিতবলমিত্যর্থঃ। 'ইন্দ্রং' 'ইৎ' ইন্দ্রমেব 'ঋষীণাং' বশিষ্ঠাদীনাং 'মানুষাণাং' চ 'স্তুতিঃ' 'যজ্ঞং' 'চ' 'হরী' অশ্বৌ 'উপবহতঃ' সমীপং প্রাপযতঃ। যত্র যত্র স্তুবন্তি যত্র যত্র যজন্তে তত্র সর্ব্বত্রেন্দ্রমশ্বৌ প্রাপযত ইত্যর্থঃ।

২। যেস্থলে মনুষ্যেরা স্তব ও মহর্ষিগণ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছেন, তথায় অশ্বদ্বয় সেই অধৃষ্য-বল ইন্দ্রকে লইয়া যাউক।

৮৮৭

৩। আ তিষ্ঠ বৃত্রহন্নুথং যুক্তা তে ব্রহ্মণা হরী। অর্ব্বাচীনং সু তে মনো গ্রাবা কৃণোতু বগ্নুনা।

৩। হে 'বৃত্রহন্' শত্রূণাং হন্তরিন্দ্র 'রথং' 'আতিষ্ঠ' আরোহ। যস্মাৎ 'তে' 'হরী' ত্বদীযৌ অশ্বৌ 'ব্রহ্মণা' স্তোত্রলক্ষণেন মন্ত্রেণ 'যুক্তা' রথে অস্মাভির্যোজিতৌ। তস্মাৎ ত্বং রথং আতিষ্ঠ। 'তে' 'মনঃ' তদীযং মনশ্চ 'গ্রাবা' অভিষবার্থং প্রবৃত্তঃ পাষাণঃ 'বগ্নুনা' বচনীযেনাভিষবশব্দেন 'অর্ব্বাচীনং' অস্মদভিমুখং 'সু' 'কৃণোতু' সুষ্ঠু করোতু।

৩। হে শত্রু-সংহারক ইন্দ্র! তোমার অশ্বদ্বয় ব্রহ্মমন্ত্র দ্বারা রথে সংযোজিত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে তুমি রথে আরোহণ কর। কণ্ডনী শিল্প অভিষব শব্দ দ্বারা তোমার মনকে আমাদিগের অভিমুখীন করিয়া দিক।

৮৮৮

৪। ইমমিন্দ্র সুতং পিব জ্যেষ্ঠমমর্ত্ত্যং মদং। শুক্রস্য ত্বাভ্যক্ষরন্ধারা ঋতস্য সাদনে।

৪। হে 'ইন্দ্র' 'সুতং' অভিষুতং 'ইমং' সোমং 'পিব' কীদৃশং 'জ্যেষ্ঠং' অতিশয়েন প্রশস্যং 'মদং' মদকরং 'অমর্ত্ত্যং' অমারকং সোমপানজন্যোমদোমদান্তরবন্মারকো ন ভবতীত্যর্থঃ। তথা 'ঋতস্য' যজ্ঞস্য সম্বন্ধিনি 'সদনে' গৃহে বর্ত্তমানাঃ 'শুক্রস্য' দীপ্তস্য অস্য সোমস্য 'ধারাঃ' ত্বাং 'অভ্যক্ষরন্' অভিমুখ্যেন সংচলন্তি। ত্বাং প্রাপ্নুবন্তি। স্বয়মেবাগচ্ছন্তীত্যর্থঃ।

৪। হে ইন্দ্র! তুমি এই সংস্কৃত অতিশয় প্রশংসনীয় ও মাদক অথচ অমারক সোম রস পান কর। এই যজ্ঞগৃহে বর্ত্তমান অতি উজ্জ্বল সোমরসের প্রবাহ তোমার নিকট গমন করিতেছে।

৮৮৯

৫। ইন্দ্রায নূনমর্চতোক্থানি চ ব্রবীতন। সুতা অমৎসুরিন্দবো জ্যেষ্ঠং নমস্যতা সহঃ।১।৬।৫।

৫। হে ঋত্বিজঃ 'ইন্দ্রায' 'নূনং' ক্ষিপ্রং 'অর্চত' পূজনং কুরুত। এতদেব স্পষ্টীক্রিয়তে। 'উক্থানি' অপ্রগীতমন্ত্রসাধ্যানি স্তোত্রাণি 'চ' 'ব্রবীতন' ব্রূত। 'সুতা' অভিষুতা 'ইন্দবঃ' সোমাঃ 'অমৎসু' আগতমেব তমিন্দ্রং মত্তং কুর্ব্বন্তু। অনন্তরং 'জ্যেষ্ঠং' প্রশস্যতমং 'সহঃ' সহস্বিনং বলবন্তং তং ইন্দ্রং 'নমস্যত' নমস্কুর্ব্বত। ১। ৬। ৫।

৫। হে ঋত্বিকগণ! তোমরা ইন্দ্রকে অবিলম্বে অর্চ্চনা ও স্তোত্র দ্বারা আরাধনা কর। সংস্কৃত সোম রস ইহাঁকে আনন্দিত করুক। তৎপরে তোমরা এই প্রশংসনীয় বীরকে নমস্কার কর। ১। ৬। ৫।

কলিকাতা মাসিক ব্রাহ্মসমাজ।

৪ ভাদ্র রবিবার ১৭৮৮ শক।

প্রধান আচার্য্যের উপদেশ।

আমরা একটি ক্ষুদ্র বিন্দু মাত্র—একটি কণা মাত্র। অসীম সংসার মধ্যে আমরা প্রতি জনে একটি ক্ষুদ্র বালুকা-রেণু তুল্য। যখনি আমরা তাঁহার পথের দ্বারে উপস্থিত হই, তখনি আমারদের মহত্ত্ব—তখনি আমারদের আনন্দ। যখন ঊর্দ্ধগামী এক বিন্দু বালু-কণাতে সূর্য্য-কিরণ পতিত হয়, তখন তাহা সম্পূর্ণ সূর্য্যকে প্রতিবিম্বিত করে—আবার তাহা ভূমিসাৎ হইলে ধূলির সহিত মিশ্রিত হইয়া পূর্ব্ববৎ মলিন হইয়া যায়। সেই প্রকার আমারদের আত্মা সংসারের ঘোরে বদ্ধ থাকিলে তাহার মলিনতা বৃদ্ধি পায়—যখন সেই আত্মা পরমাত্মার কিরণ প্রতিবিম্বিত করে; তখন সে উচ্চ হয়, তখন তাহার সুন্দর ভাব সকলের নিকটে প্রকাশ পায়। আমারদের আত্মা ক্ষুদ্র হইয়াও যখন তাঁহার পথের দ্বারে যায়, তখনি তার মহত্ত্ব। তাহা হইতে ছাড়া হইলে আমারদের সকলি দুর্গতি। যে সময়ে তাঁহাকে স্মরণ করি, সেই সময়ই জীবন; যে সময় তাঁহার আনন্দ উপভোগ করি, সেই সময়ই জীবন—যখন তাঁহা হইতে বিচ্যুত হই, তখনি মৃত্যুর গ্রাস মধ্যে পতিত হই। তাঁহাকে যে সময় স্মরণ করি, সেই ব্রহ্ম-মুহূর্ত্ত—যে স্থানে স্মরণ করি, সেই ব্রহ্ম-লোক। আমরা যে সময়ে, যে দেশে, ঈশ্বরকে স্মরণ করি; সেই সময়, সেই দেশ, পবিত্র হয়। সেই পবিত্র-স্বরূপকে কে লাভ করিতে পারে? যে শ্রদ্ধাবান্ হয়, সেই তাঁহাকে লাভ করিতে পারে। শ্রদ্ধা ভক্তি না থাকিলে সেই পবিত্র নিকেতনে কে যাইতে সমর্থ হইবে? শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ। যাহার চিত্তের একাগ্রতা হয়—তাঁহাকে না পাইলেই নয়, তাঁহার প্রতি যাহার এই প্রকার চিত্তের তৎপরতা হয়; সেই শ্রদ্ধাবান্ তৎপরায়ণ পুরুষ তাঁহাকে লাভ করে। ইন্দ্রিয়গণ যখন বিষয়-কামনায় ব্যাকুল না হয়, কিন্তু প্রভুকে দেখিয়া দাসদিগের ন্যায় তাহারা যখন সংযত থাকে; তখন চিত্ত সাম্যভাবে ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করে। ব্রহ্ম-লাভের ফল আরাম, ব্রহ্ম-লাভের ফল শান্তি। যতক্ষণ মনের শান্তি হয় নাই, আরাম হয় নাই; যতক্ষণ অন্তরে ক্রোধ রহিয়াছে, দ্বেষ রহিয়াছে; ততক্ষণ ব্রহ্মকে কখনই লাভ হয় নাই। ব্রহ্মকে লাভ করিবার ফল আরাম ও শান্তি। "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ। জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিং অচিরেণাধিগচ্ছতি।" প্রথমে শ্রদ্ধা চাই, তৎপরে জ্ঞানের অন্বেষণ হইবে, ব্রহ্ম-জ্ঞান হইলে নিশ্চয় শান্তি। ঈশ্বর সুনির্ম্মলা শান্তির উদ্দেশে স্বয়ং ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। ঈশ্বরের উপাসনার ফল শান্তি, ঈশ্বরের উপাসনার ফল মুক্তি। "যায় শোক যায় তাপ যায় হৃদয়-ভার। সর্ব্ব সম্পৎ তাহে মেলে যখন থাকি তাঁর সাথ।" হে পরমাত্মন্! তুমি আমারদের সকলের হৃদয়ে শ্রদ্ধা ভক্তি অনুরাগ প্রেরণ কর এবং আমারদের নিকটে প্রকাশিত হও।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

ব্রহ্ম-বিদ্যালয়।

দশম উপদেশ।

ঈশ্বরের শক্তি ও ইচ্ছা।

"সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর সত্য কাম ও সত্য সংকল্প; তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই হয়।"

যাঁহার অলৌকিক শক্তি দ্বারা চেতন অচেতন সমুদায় পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে ও বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে; তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর। তাঁহার শক্তির সীমা নাই, তাঁহার শক্তির পরিমাণ হয় না, তাঁহার শক্তির গুরুভার বুদ্ধিতে ধারণ করা কাহার সাধ্যায়ত্ত নহে। যে পদার্থে যত শক্তি বিদ্যমান আছে, সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের অদ্ভুত শক্তিই তৎসমুদায়ের মূল। আমরা ক্ষুদ্রতম প্রদেশের অধিবাসী হইয়াও যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই সেই দিব্য শক্তির দীপ্যমান নিদর্শন-সকল দর্শন করিয়া আশ্চর্য্য-ভাবে অভিভূত হইতে থাকি। আমাদের এই দেহ-রূপ ক্ষুদ্রতর গেহে যে সমস্ত অদ্ভুত কার্য্য বিদ্যমান আছে, তাহাই সম্যক্ রূপে দর্শন করিয়া শেষ করা যায় না; তবে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর বাহিরে সেই বিশ্বকর্ম্মার কার্য্য কলাপ কে গণনা করিয়া উঠিবে? সূক্ষ্মতম কীটাণু অবধি স্থূলাঙ্গ মাতঙ্গ পর্য্যন্ত—বিন্দুমিত সর্ষপ অবধি গগনভেদী পর্ব্বত পর্য্যন্ত—ক্ষুদ্রতর শৈবাল অবধি অত্যুন্নত বটবৃক্ষ পর্য্যন্ত—সংকীর্ণ পল্লল অবধি অতি বিস্তীর্ণ মহাসাগর পর্য্যন্ত, এই পৃথিবীর সমস্ত পদার্থই তাঁহার আশ্চর্য্য শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। পৃথিবী যেমন অত্যাশ্চর্য্য পদার্থ পুঞ্জে পরিপূর্ণ হইয়া সেই পূর্ণ-স্বরূপের কর-চিহ্ন প্রদর্শন করিতেছে; সেই রূপ এক একটি সৌর জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তাহার তুলনায় এমন পৃথিবীই অতি সামান্য বোধ হইবে। কত গ্রহ, কত উপগ্রহ, কত ধূমকেতু, কত উল্কাপিণ্ড এই বৃহৎকায় দিবাকরের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। তাহাদের প্রকাণ্ড আকৃতি, প্রচণ্ড বেগ, চিন্তা করিলে স্তব্ধ হইতে হয়। এই রূপ অগণ্য সৌর জগৎ-সকল ঈশ্বরের অসীম গগন-প্রাঙ্গনে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। এমন কি, এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত আকাশের যে কত দূর স্থান

অধিকার করিয়া আছে, তাহার আদি অন্ত অবধারণ করা যায় না। ভূতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, রসায়ণ, জ্যোতিষ প্রভৃতি সমস্ত বিদ্যা তাঁহার অলৌকিক শক্তির যাহা কিছু পরিচয় করিতে পারিয়াছে, মনুষ্য যাবজ্জীবন শ্রবণ করিয়াও তাহারই শেষ করিতে পারে না। দিন দিন ঐ সমস্ত বিদ্যার যতই উন্নতি হইতেছে, ততই ঐশীশক্তির নব নব তত্ত্ব সকল অভিব্যক্ত হইয়া অনুসন্ধায়ীদিগের পরিশ্রমকে অতিক্রম করিতেছে।

আবার অধ্যাত্ম জগতের অদ্ভুত কাণ্ড-সকল ইহা অপেক্ষাও সহস্র-গুণ বিস্ময় উৎপন্ন করে। জড় শরীরে আত্মার জন্ম-গ্রহণ, তমঃ-প্রকাশবৎ পরস্পর-বিরুদ্ধ-স্বভাব শরীর ও শরীরীর একত্র মেলন, জড় জগতের সহিত আত্মার সম্বন্ধ বন্ধন; জ্ঞান, ভাব, ইচ্ছার আশ্চর্য্য পরিবেশন, পরতন্ত্র আত্মাতে স্বাধীনতার সমাবেশ; ইত্যাদি এক একটি বিষয়ে ঈশ্বর যে আশ্চর্য্য শক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন; কোন্ মন তাহা অনুধ্যান করিয়া আয়ত্ত করিতে পারে? এক-বিধ উপাদানে বিনির্ম্মিত আত্মা-সকল ভিন্ন ভিন্ন দেহে অবস্থান করিয়া কি বিস্ময়কর বিচিত্রতা প্রদর্শন করিতেছে! তাহারা অন্তরে অভিনিবিষ্ট থাকিয়া রূপ রস গন্ধ স্পর্শ প্রভৃতি বহিস্থিত বিষয় সকলের সহিত কি আশ্চর্য্য-রূপে ক্রীড়া করিতেছে। কি অদ্ভুত শক্তি প্রভাবে কেবল ইচ্ছা দ্বারা কর চরণ চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি বিজাতীয় পদার্থ-সকলকে আপনার অভিপ্রেত কার্য্যে বিনিযোজিত করিতেছে। স্বয়ং প্রচ্ছন্ন থাকিয়া একটি ক্ষুদ্র শরীর মাত্র সহায় পাইয়া কি মহৎ মহৎ কর্ম্ম-সকল সম্পন্ন করিতেছে। ভূলোকে থাকিয়াও দ্যুলোকের সংবাদ অবগত হইতেছে, মৃত্যুর মধ্যে থাকিয়াও অমৃত-ভাবে স্ফীত হইতেছে, ইহলোকে থাকিয়াই পরলোকের জন্য প্রস্তুত হইতেছে, এবং সংসারে থাকিয়া সংসারের অতীত পদার্থে সমাগত হইতেছে! এই সকল যে আশ্চর্য্য শক্তি লক্ষিত হইয়া থাকে, কে তাহার পরিমাণ করিতে পারে? কিন্তু ইহাও সৃষ্টির সমুদায় অংশ নহে। কি প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান অধিভূত জগৎ, কি অন্তরে অনুভূয়মান অধ্যাত্ম রাজ্য; উভয়ত্রই তাঁহার যে সকল কার্য্য প্রকটিত হইয়া আছে; আমরা তাহার অত্যল্প ভাগ মাত্র অবগত হইতে পারিতেছি। তাঁহার সৃষ্টি আমাদের নিকট অপরিমেয় বোধ হইতেছে, কিন্তু তিনি এক কটাক্ষে সমুদায় জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং অবলীলা ক্রমে ইহাকে ধারণ করিয়া আছেন। তথাপি কেবল তাঁহাকে এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কর্ত্তা বলিলে তাঁহার শক্তির সকল ভাব প্রকাশ পায় না; তিনি এমন কোটি কোটি জগৎ নিমেষের মধ্যে সৃষ্টি ও সংহার করিতে পারেন, তথাপি তাঁহার শক্তি পরিক্লান্ত হয় না।—তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর।

শক্তি কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধ হয় না; কিন্তু পরিবর্ত্তন মাত্রই নিয়ত শক্তি-সাপেক্ষ—এই স্বাভাবিক সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা কোন পরিবর্ত্তন দর্শন করিলেই কোন প্রকার শক্তিকে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী মনে করিয়া থাকি। তৃণ-সকল দগ্ধ হইতেছে ও নদী-কূল ভগ্ন হইতেছে দর্শন করিয়া আমরা অগ্নির দাহিকা শক্তি ও জলের দ্রবকরী শক্তি অবধারণ করি; সেই রূপ যখন জানিতে পারি যে এই জগৎ এক সময়ে ছিল না, অসৎ অবস্থা হইতে সদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন এই মহা পরিবর্ত্তের পূর্ব্বে একটি মহা শক্তির অস্তিত্ব আপনা হইতেই মনে হইয়া থাকে। আবার যখন

দেখিতে পাই, অগ্নি বায়ু জল প্রভৃতির শক্তি দ্বারা যে সকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহাতে সৃষ্টির ভাব কিছুই নাই—তদ্দ্বারা হয় বিশ্লিষ্ট পদার্থ জাত একত্র সংহত হওয়াতে এক নূতন আকার নির্ম্মিত হইতেছে, নয় সংহত পদার্থ সমুদায় বিশ্লিষ্ট হওয়াতে পূর্ব্ব আকার ভগ্ন হইয়া যাইতেছে। আকারের পরিবর্ত্তন ব্যতীত কোন নূতন বস্তু উৎপন্ন বা কোন পুরাতন বস্তু উৎসন্ন হইতেছে না, নির্ম্মাণ বা ভঙ্গ করিবার শক্তি ব্যতীত সৃষ্ট পদার্থে অন্যবিধ শক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। তখন যে শক্তি দ্বারা জগৎ অসৎ অবস্থা হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে, তাহা আর এক প্রকার পরতন্ত্র শক্তি বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না। তাহা প্রাকৃতিক শক্তি নহে এবং প্রাকৃতিক শক্তির ন্যায় উপকরণ সাপেক্ষও নহে; তাহা অদ্ভুত শক্তি—তাহা অলৌকিক শক্তি; সমুদায় সৃষ্টিই সেই শক্তির কার্য্য, কিন্তু কোন সৃষ্টিই সে শক্তির অধিকারী নহে। তাহা অসাধারণ শক্তি; তাহা কেবল সেই একেই বিদ্যমান আছে, আর কাহাকেও তাহা প্রদত্ত হয় নাই।

যেমন পরিবর্ত্তন দর্শন করিলেই তাহার কারণ-স্বরূপ শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস হয়; সেই রূপ কার্য্য-গত বৈলক্ষণ্য দ্বারা, শক্তি-গত বৈলক্ষণ্য অনুভূত হইয়া থাকে। অগ্নি বায়ু জল প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য-সকল দৃষ্টিগোচর হইতেছে, সুতরাং ঐ সমস্ত পদার্থে বিভিন্ন প্রকার শক্তি-সকল বিদ্যমান আছে, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু যাবতীয় ভৌতিক শক্তির এই একটি সাধারণ ভাব দেখিতে পাওয়া যায় যে, তৎসমুদায় চির কালই অন্ধের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। সহস্র-রশ্মি দিবাকর প্রখর করজাল বিস্তার করিয়া সমুদায় পৃথিবীকে সন্তপ্ত করিতেছে; ঘোরতর ঘনঘটা গগন-মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া গম্ভীর গর্জ্জন সহকারে মুষল-ধারে বারি বর্ষণ করিতেছে, জলদ-জাল-বিলাসিনী বিদ্যুল্লতা মুহুর্ম্মুহু স্ফুরিত হইয়া জীব-জন্তুগণকে চমকিত ও চকিত করিয়া তুলিতেছে, প্রচণ্ড সমীরণ সমুত্থিত হইয়া গ্রাম নগর অরণ্য সমস্ত ছিন্ন-ভিন্ন করিতেছে, প্রবল মারুত-ক্ষোভিত মহা সাগর উত্তাল-তরঙ্গ-ভঙ্গী বিস্তার করিয়া দ্বীপোপদ্বীপ সকল গ্রাস করিতেছে; এই সমস্ত ভৌতিক ব্যাপারে একটি ক্রিয়াও জ্ঞান-কৃত বলিয়া প্রতীয়মান হয় না;—কেবল এক অনিবার্য্য অন্ধ শক্তিরই নিদর্শন দৃষ্ট হইয়া থাকে; ইহা দ্বারা সেই সর্ব্বস্রষ্টা পরমেশ্বরের অসীম জ্ঞান ব্যতীত আর কোন জ্ঞানেরই পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু যখন জন-সমাজে নেত্রপাত করি, তখন সেই প্রকার সৃষ্ট শক্তিরই আর এক মূর্ত্তি নিরীক্ষিত হইতে থাকে। সাগর-গর্ভ-সমুত্থিত অপূর্ব্ব দ্বীপ-শ্রেণী ও প্রান্তর-পরিশোভিত মনোজ্ঞ অট্টালিকা, সায়ন্তন মেঘমালার নানা বিধ আকৃতি ও সুচিক্কণ চিত্র-পটে সুচিত্রিত পশু পক্ষী, তরু-নিকর-সমাকীর্ণ দুর্গম মহারণ্য ও ফল-পুষ্প-সুশোভিত সুখ-সেব্য উপবন; এই সমস্ত পদার্থে আমরা স্পষ্ট-রূপেই বিভিন্ন প্রকার শক্তি অনুভব করিয়া থাকি। দ্বীপ শ্রেণী, মেঘমালা ও মহারণ্যে আমরা কেবল ঈশ্বরেরই জ্ঞানের পরিচয় প্রাপ্ত হই; যে সকল ভৌতিক পদার্থ স্ব স্ব শক্তি সহকারে ঐ সমস্ত বস্তুকে সংগঠিত করিয়াছে, তাহাদের জ্ঞান-চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু অট্টালিকা, চিত্রপট ও উপবন-সকল কেবল স্রষ্টার নয়, নির্ম্মাতারও জ্ঞানবত্তা স্পষ্ট রূপে প্রদর্শন করিতেছে। অতএব ভৌতিক পদার্থের

জ্ঞান-বিরহিত অন্ধ-শক্তি হইতে মনুষ্যের জ্ঞান-সহকৃত শক্তি যে বিভিন্ন; ইহা বলা বাহুল্য। এই জ্ঞান-সহকৃত শক্তির নাম ইচ্ছা।

অতএব যে শক্তির দ্বারা এই জ্ঞান-প্রাণ-সমন্বিত কৌশল-কলাপ-পরিপূর্ণ আশ্চর্য্য জগৎ সমুৎপন্ন হইয়াছে; কি অন্ধীভূত ভৌতিক শক্তি, কি জ্ঞান-সহকৃত মানবীয় শক্তি, উভয়ই যে অদ্ভুত শক্তি হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে; যে শক্তি নভো-মণ্ডলস্থ দিবাকরের সহিত পৃথিবীস্থ মনুষ্যের সম্বন্ধ বন্ধন করিয়াছে; যে শক্তি ভাবী সন্তানের পোষণার্থ জননীর স্তনে দুগ্ধ দান করিয়াছে; যে শক্তি পৃথিবীকে মনুষ্যের যোগ্য ও মনুষ্যকে পৃথিবীর যোগ্য করিয়া সৃষ্টি করিয়াছে; যে শক্তি পাপ পুণ্যের সহিত দণ্ড-পুরস্কারের সংযোগ করিয়া মনুষ্যগণকে শাসন করিতেছে; কোন্ বুদ্ধি তাহা এক বারও অন্ধ শক্তি বলিয়া মনে করিতে পারে! তাহা জ্ঞান-সহকৃত শক্তি—তাহা দীপ্যমান ইচ্ছা। সেই সর্ব্বস্রষ্টা পরমেশ্বরের ইচ্ছা দ্বারা সমুদায় উৎপন্ন হইয়াছে। সেই ইচ্ছাই তাঁহার শক্তি এবং সেই শক্তিই তাঁহার ইচ্ছা। ঈশ্বরের ইচ্ছার বল অবগত হইবার নিমিত্ত একবার মানবীয় ইচ্ছার পরাক্রম আলোচনা কর। আপনাকে ও অন্যকে জ্ঞান পূর্ব্বক নিয়োগ করা ইচ্ছার কার্য্য। মানুষ যে কার্য্য করুক, ইচ্ছা তাহার নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিনী থাকে। ভৌতিক শক্তি অপেক্ষা ইহার পরাক্রম অনেক অধিক। আত্মা ইহারই প্রভাবে জড় প্রকৃতি শরীরকে দাসত্ব শৃঙ্খলে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে, সময়ে সময়ে ভৌতিক শক্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহাকে পরাজয় করিতেছে। ইহাই যন্ত্রী হইয়া মস্তিষ্ক রূপ যন্ত্রকে পরিচালিত করিতেছে; ইহারই আদেশে ইন্দ্রিয়গণ বহির্জ্জগতের সংবাদ-সকল আত্মার নিকট বহন করিতেছে; ইহারই নিয়োগে কর চরণ প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ কর্ম্ম ক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করিতেছে। ইহারই পরাক্রমে আত্মা দুর্নিবার প্রবৃত্তি-স্রোতের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া পুরুষত্ব প্রদর্শন করিতেছে; এবং ইহারই সহায়তায় ধর্ম্ম-রূপ সরোবরে অবগাহন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছে। অধিক কি, এই মানবীয় ইচ্ছা তরুলতা কানন গিরি নদী সাগর প্রভৃতি ঈশ্বর সৃষ্ট প্রাকৃতিক জগতের ন্যায় ভূরি ভূরি গ্রাম নগর, উদ্যান আপণ সরোবর শস্য-ক্ষেত্র প্রভৃতি আশ্চর্য্য পদার্থ-পুঞ্জে পরিপূর্ণ এক মনোহর কৃত্রিম জগৎ নির্ম্মাণ করিয়া তুলিয়াছে এবং দিন দিন উহার বিস্তার ও শোভা পরিবর্দ্ধিত করিতেছে। এখানে মানবীয় ইচ্ছা নানাবিধ বন্ধনে বদ্ধ ও বিবিধ প্রতিবন্ধকে পরিবৃত হইয়াও যখন এই সমস্ত আশ্চর্য্য ব্যাপার সম্পন্ন করিতেছে, তখন ভবিষ্যতে—যখন বিমুক্ত হইয়া সম্যক স্ফূর্ত্তি লাভ করিবে—তখন ইহার পরাক্রম যে কি প্রকার হইবে, এখন তাহার পরিমাণ অবধারণ করা যায় না। এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে মনুষ্য অতি ক্ষুদ্র জীব; প্রায় ইহাকে বহির্ব্বিষয় ও পশু-প্রকৃতির অধীন হইয়া থাকিতে হয়, এ শরীরের ভারে নিয়তই আক্রান্ত হইয়া আছে, ইহার জ্ঞান উপার্জ্জনের পাঁচটিমাত্র পথ, কর্ম্মের সময় কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহায়তা আবশ্যক; শরীরের সহিত ইহার এমন বন্ধন যে, শরীর ক্লান্ত হইলেই আপনিও কাতর হইয়া পড়ে; এমন দারিদ্র্য অবস্থায় থাকিয়াও আত্মার ইচ্ছার বল কেমন প্রচুর পরিমাণে প্রদর্শন করিতেছে। অতএব যিনি নিরতিশয় মহান্, যাঁহার উপরে কোন শক্তি

কার্য্য করিতে পারে না, যিনি স্বভাবত মুক্ত, জ্ঞানে পূর্ণ, যিনি অসদবস্থা হইতে কেবল ইচ্ছা দ্বারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন; তাঁহার ইচ্ছার বল কি আমরা কল্পনাতেও ধারণ করিতে পারি! তিনি সত্য-কাম ও সত্য-সংকল্প—তাঁহার কল্পনা ও কামনা ব্যর্থ হইবার নহে—তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই হয়—তাঁহার ইচ্ছাকে কেহই প্রতিরোধ করিতে পারে না। তাঁহার যে ইচ্ছা, সেই কাজ।

তত্ত্ববিদ্যা।

চতুর্থ প্রস্তাব। পূর্ব্বে কেবল এই পর্য্যন্ত স্থাপন করা হইয়াছে যে বিষয়ী স্বাধীন ও বিষয় পরাধীন; কিন্তু কার্য্য-কারণ-বিষয়ে বিশেষ কিছুই বলা হয় নাই। পরন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে শেষোক্ত বিষয় লইয়া এখনও যে রূপ তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে, তাহাতে বর্ত্তমান গ্রন্থে উক্ত বিষয়ে একেবারে ঔদাসীন্য অবলম্বন করা কোন মতেই বিধেয় নহে; অতএব কার্য্য-কারণের ভাব কি রূপ, তাহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। এটি জ্ঞান-কাণ্ড, এই হেতু তৃতীয় অধ্যায়ে কেবল জ্ঞান সম্বন্ধেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে বিষয়ী স্বাধীন ও বিষয় পরাধীন; কিন্তু আনুষঙ্গিক-রূপে ইহাও দর্শাইতে ত্রুটি করা হয় নাই যে শক্তির সহিত ইচ্ছারই বিশিষ্ট-রূপ সম্বন্ধ; অতএব এই ইচ্ছা সম্বন্ধে যে রূপ বিষয়ীর স্বাধীনতা ও বিষয়ের পরাধীনতা, তাহার প্রতি কিঞ্চিৎ প্রণিধান করিলেই বর্ত্তমান প্রস্তাবের যথেষ্ট মীমাংসা হইতে পারিবে। ইহা যেমন স্বতঃ-সিদ্ধ যে জ্ঞান দ্বারা অন্যকে জানিতে হইলে আপনাকেও সঙ্গে সঙ্গে জানিতে হয়, ইহাও সেই রূপ যে, ইচ্ছা দ্বারা অন্যকে নিয়মিত করিতে হইলে আপনাকেও সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত করিতে হয়; উদাহরণ, যথা—পদ-দ্বয়কে পরিব্রজন কার্য্যে নিয়মিত করিতে হইলে আপনাকে পরিব্রাজক রূপে নিয়মিত করা কাযে কাযেই আবশ্যক হয়। এই রূপ আমরা মস্তিষ্ক চালনা করি, বা জ্ঞানেন্দ্রিয় চালনা করি, অথবা কর্ম্মেন্দ্রিয় চালনা করি; যে কোন কার্য্য করি, তাহার সঙ্গে আপনার দিগকে সেই সেই কার্য্যের কর্ত্তা রূপে নিয়মিত না করিয়া কোন রূপেই ক্ষান্ত থাকা যায় না। ইহাতে এই দেখা যাইতেছে যে বিষয়ী আপনার উপরে এবং অন্যের উপরে উভয়ত্রই কার্য্য প্রকটন করিয়া থাকে। পরন্তু বিষয়-সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এই রূপ দেখা যায় যে যদিও আকর্ষণাদি শক্তি দ্বারা এক বিষয় অন্য বিষয়কে নিয়মিত করে বটে; কিন্তু কোন বিষয়েরই এরূপ সামর্থ্য নাই যে উহা আপনি আপনাকে নিয়মিত করে। যথা—বিষয়-সকল আকর্ষণ শক্তি দ্বারা আপনি আপনাকে আকর্ষণ করে না কিন্তু অন্য বিষয়-সকলকেই আকর্ষণ করে—বাধা-শক্তি দ্বারা আপনাকে বাধা প্রদান করে না, অন্যকেই বাধা প্রদান করে; প্রকাশ-শক্তির দ্বারা আপনার নিকটে প্রকাশিত হয় না, বিষয়ীর নিকটেই প্রকাশিত হয়। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে বিষয়-সকল আপনারদের শক্তি দ্বারা আপনারদিগকে নিয়মিত করিতে কোন রূপেই সমর্থ নহে; সুতরাং উহারা যে অন্যের শক্তি দ্বারা নিয়মিত হইতেছে, ইহাতে আর সংশয় নাই। অতএব আমরা আপন আত্মাকেই দেখি, আর অন্য কোন বস্তুকেই দেখি, সর্ব্বত্রই কার্য্য-কারণের ভাব দেদীপ্যমান রহিয়াছে; এবং এ ভাবটিকে ছাড়িয়া চলা জ্ঞানের পক্ষে নিতান্তই অসাধ্য। আমরা যখন ইন্দ্রিয় দ্বারা একটা তরুকে প্রত্যক্ষ করি,

তখন আলস্য, জড়তা বা অজ্ঞান আসিয়া আমারদের কর্ণে এই রূপ কুমন্ত্রণা দিতে পারে যে উহার আবার কারণ কোথায়, দেশ কালে যাহা প্রতিভাত হইতেছে তাহাই যথেষ্ট; কিন্তু বুদ্ধি সেই আলস্যকে পরাজয় করিয়া উক্ত ইন্দ্রিয়-গোচর বৃক্ষের প্রতিমাকে মনো-রূপ দর্পণে আবির্ভাব মাত্র মনে করে এবং ভাব-রাজ্যে উহার কারণান্বেষণে প্রবৃত্ত হয়; বুদ্ধি উক্ত বৃক্ষের বাহ্য আবির্ভাব ভেদ করিয়া তাহার অভ্যন্তরে একটি জীবনী শক্তিকে (ইন্দ্রিয়ে নহে) ভাবে উপলব্ধি করে। ইতিপূর্ব্বে পুনরুল্লেখ করা হইয়াছে যে বিষয়ী স্বাধীন; কিন্তু ইহা জানা আবশ্যক যে বিষয়ী আপন ইচ্ছানুসারে স্বাধীন হয় নাই; ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারেই উহা স্বাধীন হইয়াছে এবং নিয়ত কাল স্বাধীন-রূপে বর্ত্তিতেছে; সুতরাং ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ পরাধীন। ঈশ্বর চাহেন যে আমরা স্বাধীন হই, এই জন্যই আমরা স্বাধীন হইয়াছি; আমরা সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন পুরুষের অধীন বলিয়াই এমন যে অমূল্য রত্ন স্বাধীনতা, তাহা অবলীলা-ক্রমে প্রাপ্ত হইয়াছি। যেমন শরীরের অভ্যন্তরে একই আত্মা স্বাধীন-রূপে কার্য্য করিতেছে; সেই রূপ কি জড়, কি আত্মা, প্রত্যেক বস্তুর অভ্যন্তরে একমেবাদ্বিতীয়ং পরমাত্মা সম্যক্ স্বাধীনতা-সহকারে কার্য্য করিতেছেন। ঈশ্বর যিনি তিনি সকল কারণের কারণ, সকল অধিপতির অধিপতি। ইউরোপীয় কোন কোন পণ্ডিত-সম্প্রদায় এই রূপ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন যে "কার্য্য মাত্রেরই কারণ আছে"—ইহা একটি কথার কথা মাত্র। ইহাঁদের মতে, যাহা কিছু আমাদের জ্ঞানে প্রকাশ পায়, তাহা কার্য্য ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না; কারণ-সত্তা আমাদের জ্ঞানে একবিন্দুও স্থান পাইতে পারে না; সুতরাং কার্য্য-বিশেষের কারণ আছে, ইহা কেবল আমাদের মনের কল্পনা মাত্র। ইহাঁদের প্রতি বক্তব্য এই যে আমরা যখন আপনারদিগকে কোন কার্য্যের কর্ত্তা-রূপে নিয়মিত করি, তখন সহস্র চেষ্টা করিয়াও মনকে এরূপ প্রবোধ দিতে পারিনা যে উক্ত কার্য্যের আমরা আপনারা কারণ নহি। অতএব স্বাধীন কারণ যে আছে—ইহা আমাদের আত্মার অভ্যন্তরে জাজ্বল্য-রূপে প্রকাশ পাইতেছে। আত্মা অপনি আপনাকে নিয়মিত করে, এই হেতু আত্মাতে কার্য্য এবং কারণ উভয়ই একত্রে পাওয়া যায়। কিন্তু বিষয়-সকলেতে এই রূপ দেখা যায় যে বীজ মৃত্তিকার অভ্যন্তরে, বৃক্ষ তাহার ঊর্দ্ধে;—কারণ এক স্থানে কার্য্য অন্যত্র; বিষয়-সকলেতে কার্য্য এবং কারণ এই রূপ বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকে বলিয়া, কার্য্য যেখানে—কারণকে সেখানে পাওয়া যায় না, ইহাকে আর কোথাও অন্বেষণ করিতে হয়। এই জন্য বিষয়-ক্ষেত্রে কেহ কেহ যে আলস্য পরবশ হইয়া কেবল কার্য্য টুকু মাত্রেই স্থগিত থাকিবেন, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। কিন্তু যথার্থ সত্যের প্রতি একটুকু প্রণিধান করিলেই প্রকাশ পাইবে যে বিষয়েতেও কারণ-ভাব উপলব্ধি করিতে আমাদের স্বল্প মাত্রও বিলম্ব হয় না; কেন না রূপ রস প্রভৃতির কারণ-রূপেই আমরা বিষয়-সকলকে উপলব্ধি করিয়া থাকি। রূপ রস প্রভৃতির আবির্ভাব সকল আকস্মিক ব্যাপার নহে; প্রত্যুত বহির্ব্বিষয়ের শক্তি-যোগেই উহারা প্রকটিত হয়—ইহা অপেক্ষা সহজ সত্য আর কি হইতে পারে? তথাপি এবিষয়ে এই রূপ এক আপত্তি হইতে পারে যে স্বপ্ন-কালে আমরা রূপ রসাদি নানাবিধ আবির্ভাব

প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, অথচ তাহার মূলে বাস্তবিক পদার্থ একটিও নাই; যাহা কিছু সকলই কাল্পনিক। ইহার এ ক্ষণে মীমাংসা করা যাইতেছে। স্বপ্ন-কালে আমরা যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করি, তাহা আমারদের আপন ইচ্ছাধীন নহে; সুতরাং তাহাও যে বহির্ব্বস্তু-মূলক তাহাতে আর সংশয় নাই। রূপ রস প্রভৃতির বাহন-স্বরূপ আলোকাদি ভৌতিক বস্তু-সকল এত সূক্ষ্ম যে তাহা ইন্দ্রিয় দ্বার দিয়া আমারদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করত তথায় বিধৃত হইয়া অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে। এই সকল সূক্ষ্ম পদার্থ-নিচয়ের মধ্যে জাগ্রৎ-কালে আমরা কল্পনা-দ্বারা যে সকল যোগাযোগ সংস্থাপন করি, বুদ্ধি তখন অন্যান্য গুরুতর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকাতে, তাহারা সে সময়ে স্পষ্ট-রূপে প্রকাশ পায় না; কিন্তু নিদ্রা-কালে যখন আমারদের বুদ্ধি-বৃত্তি শিথিল হইয়া পড়ে, তখন তাহারা শ্রেণী-পরম্পরায় অল্পে অল্পে উদ্বোধিত হইয়া নিজ মূর্ত্তি প্রকাশ করিতে থাকে। পরন্তু স্বপ্ন-গত বিষয়-সমূহে দেশ-কাল-ঘটিত কৃত্রিমতার প্রাদুর্ভাব বলিয়া উহারদিগের বিষয়ত্ব অস্বীকার করা কোন রূপেই যুক্তি সিদ্ধ নহে; কেন না পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে বিষয় মাত্রেতেই ঐ রূপ কৃত্রিমতা অবস্থান করে—অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থাতে মস্তিষ্ক-বিলীন বিষয়-সকলকে আমরা যে দূর দূর দেশে প্রত্যক্ষ করি, তাহা সেই রূপ কোন নিয়মানুসারে হইবে; যেমন দূরবর্ত্তিতা হেতু বৃহৎ সূর্য্যকে আমরা অল্পায়তন মনে করি ও দুঃখ-আগমন হেতু অল্প-পরিমাণ সময়কে সুদীর্ঘ মনে করি। অতএব ইহা সর্ব্ব-প্রকারেই স্থিরতর হইল যে ইন্দ্রিয়-বোধের কারণ-রূপেই আমরা বিষয়-সকলকে উপলব্ধি করি। ইহাও নিশ্চয় যে বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়বোধের কারণ—বিশেষ বিশেষ বিষয়; যথা রূপ বোধের কারণ আলোক, গন্ধ বোধের কারণ অন্য কোন বিষয়; তরুর কারণ এক বিষয়, বিশেষ বিশেষ শাখার কারণ আর আর বিশেষ বিশেষ বিষয়, বিশেষ বিশেষ পল্লবের কারণ অপরাপর বিষয়, ইত্যাদি। অবশেষে বক্তব্য এই যে কার্য্য-কারণ-বিষয়ে কোন সংশয় উপস্থিত হইলে এই মূল তত্ত্বটিকে মাত্র স্মরণ করা যে পরিবর্ত্তন মাত্রেরই উপযুক্ত কারণ আছে, তাহা হইলেই সকল সংশয় তিরোহিত হইবে।

পঞ্চম প্রস্তাব।—কেবল বুদ্ধির পরিচালনা করা তত্ত্ববিদ্যার উদ্দেশ্য নহে; মুক্তি সাধনই তত্ত্ববিদ্যার এক মাত্র লক্ষ্য। এই হেতু যে সকল জ্ঞান এই মুক্তি সাধনের সহায়তা করিতে পারে, বর্ত্তমান জ্ঞান-কাণ্ডে কেবল তাহারদিগকেই স্থান দেওয়া হইয়াছে। "কি হবে সে জ্ঞানে যাতে তোমারে না পাই।" যাঁহারা বলেন যে তর্ক বিতর্ক অভ্যাস ও বাগ্‌জাল উপার্জ্জন করাই তত্ত্ববিদ্যার এক মাত্র ফল, তাঁহারা বিশেষ পরীক্ষা না করিয়াই ওরূপ কথা উচ্চারণ করিয়া থাকেন; সুতরাং তাঁহাদের কথা ধর্ত্তব্য নহে। প্রথমে যখন গণিত-শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তখন তাহা কি পর্য্যন্ত না অকিঞ্চিৎকর বোধ হয়? "সংকলন ব্যবকলন" "গুণন হরণ" এ সকল কার্য্যে কি পর্য্যন্ত না পণ্ড-শ্রম মনে হয়? কিন্তু সেই গণিত-বিদ্যা অবলম্বন করিয়া যখন গৃহ-নির্ম্মাণ, ভূমি-পরিমাপন প্রভৃতি নানাবিধ আবশ্যক কার্য্য সুচারু-রূপে সম্পন্ন করা যায়, এবং ভৌতিক বিদ্যা সম্বন্ধীয় নানাবিধ আশ্চর্য্য তথ্য-সকলকে পরীক্ষার অধীনে আনয়ন করা

যায় ; তখন আর তাহার মহিমা কাহারো নিকটে গোপন থাকিতে পারে না। কিন্তু গণিত বিদ্যার এই যে মাহাত্ম্য, ইহা দুই বা তিন শত বৎসর পূর্ব্বে লোক-সমাজে এতাধিক পরিমাণে কি বিদিত ছিল ? না। কেন বিদিত ছিল না ? যেহেতু তখন গণিত বিদ্যাকে কার্য্যে এত দূর প্রয়োগ করা হয় নাই। দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বে গণিত বিদ্যার যে রূপ অবস্থা ছিল, তত্ত্ববিদ্যার এখনো সে অবস্থা যায় নাই। তত্ত্ববিদ্যা-ঘটিত অনেক সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহারদিগকে রীতি মত কার্য্যে প্রয়োগ করিবার পদ্ধতি এখনো উত্তমরূপে প্রদর্শিত হয় নাই। এতাবৎ কাল তত্ত্ব-গ্রন্থ-সকলের প্রায়ই এই রূপ পদ্ধতি চলিয়া আসিতেছে যে জ্ঞান-কাণ্ড কেবল অতিরিক্ত তর্ক বিতর্কেই ক্ষেপিত হয়; এবং কর্ম্ম-কাণ্ডকে জ্ঞান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আর এক স্বতন্ত্র পত্তন-ভূমিতে সংস্থাপিত করা হয়। আধুনিক জন-সমাজে তত্ত্ববিদ্যার নামে যে একটি অপবাদ আছে যে উহাতে তর্ক বিতর্ক অভ্যাস ব্যতিরেকে আর কোন ফলই দর্শে না—ইহার কারণ এ ক্ষণে স্পষ্ট-রূপে বুঝা যাইতেছে। সে কারণ এই;—এত দিন পর্য্যন্ত তত্ত্ববিদ্যা কেবল এই রূপে আলোচিত হইয়া আসিতেছে যে কার্য্যের সহিত তাহার যে কোন সম্পর্ক আছে ইহা সুস্পষ্ট বোধ হয় না। উদাহরণ ;—কুজান, হামিল্টন প্রভৃতি যে সকল তত্ত্ববিৎ ইউরোপ দেশে অধুনা সর্ব্বাগ্রগণ্য-রূপে বিখ্যাত, সকলেই জর্ম্মন্-দেশীয় মহাত্মা কাণ্টকে ভক্তি-ভাজন গুরু-রূপে মান্য করিয়াছেন। এই বিখ্যাত মহাত্মা তত্ত্ববিদ্যা-সম্বন্ধে যে এক প্রকৃষ্ট প্রণালী সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, ও যে সকল নিগূঢ় সত্যের আভাস প্রদর্শন করিয়াছেন ; তাহা উল্লঙ্ঘন করিয়া তত্ত্ব-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে কেহই সমর্থ নহেন। তাঁহার সময়ে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাব ক্রমশঃ লোপ পাইয়া জড়-নিষ্ঠতার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিয়াছিল এবং এই রূপ আসুরিক ভাবের প্রতিবিধান-মানসে তিনি তাহার বিপরীত ভাবের এক খানি মূল গ্রন্থ প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হন। ইনি প্রথমে যে এক খানি অনুপম গ্রন্থ রচনা করেন, তাহার তিনি নাম দিয়াছিলেন "বিশুদ্ধ জ্ঞানের দোষ-গুণ-বিচার।" ইহাতে তিনি এই সত্যটি বিশেষ-রূপে স্থাপন করেন যে বহির্ব্বস্তু হইতে আমরা জ্ঞানের উপকরণ বা সামগ্রী-সকল প্রাপ্ত হই; কিন্তু যে প্রণালী অনুসারে উক্ত উপকরণ-সকলকে জ্ঞান আপনার আয়ত্তাধীন করিয়া গড়িয়া লয়, জ্ঞানের সেই যে গঠন-প্রণালী, তাহা অমরা বহির্ব্বস্তু হইতে পাই না। প্রত্যুত আপনারদের অন্তর হইতেই যোগাইয়া থাকি। যথা—রূপ রস প্রভৃতি উপকরণ-সকলকে আমরা বাহির হইতে প্রাপ্ত হই; কিন্তু দেশ, কাল, একত্ব, অনেকত্ব, বস্তু, গুণ, কার্য্য-কারণ, এই যে-সকল প্রণালী অনুসারে আমরা উহারদিগকে জ্ঞানে আয়ত্ত করি, এই প্রণালীগুলি আমরা আপন অন্তর হইতে প্রাপ্ত হইয়া রূপ-রসাদি উক্ত উপকরণ-সকলের উপর তাহারদিগকে আরোপিত করি। এই রূপ মহাত্মা কাণ্ট—একাকী ও অসহায়—কেবল আপনার মাত্র অনুসন্ধান দ্বারা ইহা যৎপরোনাস্তি অবিতথ-রূপে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন যে সকল সত্যই আমরা কেবল বাহির হইতে প্রাপ্ত হই না,—একপ্রকার সত্য আমরা বাহির হইতে প্রাপ্ত হই, আর একপ্রকার সত্য আমরা অন্তর হইতে প্রাপ্ত হই; এবং এই দুই প্রকার সত্যের মধ্যে তিনি যথোচিত প্রভেদ নির্দ্দেশ করিতে ত্রুটি করেন নাই। সে প্রভেদ এই যে, জ্ঞানের প্রণালী-সকল যাহা আমরা অন্তর হইতে প্রাপ্ত হই, তাহা অবশ্যম্ভাবী ও সার্ব্ব-ভৌমিক ; এবং জ্ঞানের উপকরণ-সকল যাহা আমরা বাহির হইতে প্রাপ্ত হই, তাহা আনুসঙ্গিক ও বিশেষ বিশেষ। ইহার তাৎপর্য্য এই যে জ্ঞানের প্রণালী-সকল জ্ঞান হইতে তিলার্দ্ধও অন্তর থাকিতে পারে না; সুতরাং আমরা যে কোন বিষয়কে জানি, ঐ সকল প্রণালী অনুসারেই তাহাকে জানিতে হয়। এই প্রণালী-সকল জ্ঞানের সহিত অবশ্যই বিদ্যমান থাকে বলিয়া ইহারা অবশ্যম্ভাবী; এবং যাবতীয় জ্ঞানের সঙ্গে—জ্ঞান মাত্রেরই সঙ্গে—বিদ্যমান থাকে বলিয়া ইহারা সার্ব্ব-ভৌমিক-রূপে আখ্যাত হইয়াছে। অতঃপর কাণ্ট বিশুদ্ধ জ্ঞানের উক্তরূপ প্রণালী-সকলের দোষ গুণ বিচার করিতে গিয়া অতল-স্পর্শ সংশয়-সাগরে নিপতিত হইলেন। তাঁহার সংশয় এই,—আমারদের জ্ঞান-প্রণালী অনুসারেই যখন সত্য-বিশেষ প্রকাশ পায়, তখন সে সত্য যে উক্ত প্রণালী দ্বারা বিকৃত ও রূপান্তরিত না হইবে, তাহার প্রমাণ কি ? অতএব আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে আমার জ্ঞানের প্রণালী অনুসারে এটি সত্য ; কিন্তু তাহা যে বাস্তবিক সত্য কি না, এ বিষয়ে আমরা কিছুই বলিতে পারি না। এই রূপ মহাত্মা কাণ্ট বাস্তবিক সত্যে সংশয়াপন্ন হইয়া আপন প্রকৃত উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইলেন, ও কতকগুলি নিষ্প্রয়োজনীয় তর্ক বিতর্কে জড়িত হইয়া পথিমধ্যে পড়িয়া রহিলেন ; এবং তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যেরা ঐ সকল বিষয়েরই বাহুল্য-রূপ আন্দোলনে তাঁহারদের বিদ্যা বুদ্ধি সমুদায় সমর্পণ করিলেন। এই রূপ করাতেই শাক্তদিগের কর্ত্তৃক তত্ত্ব-বিদ্যার নামে যে এক মিথ্যা অপবাদ ইউরোপ প্রদেশে রটিত হইয়াছিল, তাহা হ্রাস না হইয়া ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কিন্তু বাস্তবিক সত্য সম্বন্ধে কাণ্টের এতাধিক সংশয়-জনক তর্ক বিতর্ক কেন ? যদি মূলে বাস্তবিক সত্য কিছুই না থাকে, তবে জ্ঞানের গঠন-প্রণালীই বা কি ? জ্ঞানের উপকরণ সামগ্রীই বা কি ? "বাস্তবিক সত্য অবশ্যই আছে" ইহা যদি তিনি প্রথমে স্বীকার না করেন, তবে তিনি জ্ঞানকেই বা কি রূপে সত্য বলিবেন ? জ্ঞানের প্রণালী-সকলকেই বা কি রূপে সত্য বলিবেন ? জ্ঞানের উপকরণ-সকলকেই বা কি রূপে সত্য বলিবেন ? এবং এক মাত্র অগাধ সংশয়ের স্বপক্ষে এবং আর তাবতেরই বিপক্ষে তিনি স্বয়ং যে সকল সিদ্ধান্ত করিতেছেন, তাহাই বা তিনি কি রূপে সত্য বলিয়া স্বীকার করিবেন ? এই রূপ দেখা যাইতেছে যে কোন প্রণালী ব্যতিরেকেও ইহা তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে বাস্তবিক সত্য অবশ্যই আছে। অতএব তিনি যে বলেন যে আমরা কেবল আমারদের নিজের জ্ঞান-প্রণালী অনুসারেই সত্য জানিয়া থাকি, একথা সর্ব্বাংশে সত্য নহে। দেশ, কাল, একত্ব, অনেকত্ব, বস্তু, গুণ, কার্য্যকারণ—সত্য জানিবার এই যে সকল প্রণালী—ইহারা কি আমারদের নিজের মনঃ-কল্পিত প্রণালী ? কখনই না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে ইহা যথোচিত-রূপে স্থাপিত হইয়াছে যে সকল হইতে বাস্তবিক সত্য যিনি পরমাত্মা—উক্ত প্রণালী-সকল তাঁহারি প্রতিষ্ঠিত। উহারা যদি আমারদের মনঃ-কল্পিত হইত, তাহা হইলে আমার জ্ঞান-প্রণালী এক রূপ হইত, অন্যের জ্ঞান-প্রণালী আর এক রূপ হইত; কিন্তু সকল আত্মা-সম্বন্ধে যখন উহারা অব-

শ্যই একই প্রকার হইতে চায়; তখন উহারা যে আমারদের নিজের নিজের প্রণালী নহে, প্রত্যুত পরাৎপর সত্য-স্বরূপের প্রতিষ্ঠিত অনতিক্রমণীয় প্রণালী; ইহা বলা বাহুল্য। অতএব "সত্যের সত্য পরমাত্মাই মূল-প্রণালী-সকলের প্রবর্ত্তক ও সমুদায় জগৎ তাঁহার নিয়মের অধীন" ইহাতে অগ্রে বিশ্বাস না করিলে জ্ঞানের উক্ত প্রণালী-সকলের বাস্তবিকতা ও বলবত্তা কোন মতেই আমারদের বিশ্বাস-গম্য হইতে পারে না। আমরা আপনারা নহি পরন্ত সেই পরমাত্মাই উক্ত বিশ্বাসের মূল ও সর্ব্বস্ব; এবং এই পরমাত্ম-জ্যোতির নিকটে কোন সংশয়ই স্থান পাইতে পারে না। "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।" এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাবে অবতীর্ণ হইয়া দেখান যাইতেছে যে তত্ত্ববিদ্যা এ রূপ কোন অলীক সামগ্রী নহে যে তর্ক-বিতর্কেরই সময় তাহার রসনাতে স্ফূর্ত্তি হয়, পরন্ত কার্য্যের সময় উহা হইতে কোন উপকারই পাওয়া যায় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বর্ত্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য মুক্তি-সাধন; অনর্থক তর্ক বিতর্কের আবর্ত্তে নিয়ত কাল পরিভ্রমণ করা উদ্দেশ্য নহে। এই জন্য দেশ-কাল, বিষয়-বিষয়ী, ঈশ্বর-জগৎ, এই সকল সত্য আমারদের সহজ জ্ঞানে যে রূপ উপলব্ধি হয় তাহা বিনা সংশয়ে সর্ব্বাগ্রে স্থাপন করা হইয়াছে। গণিত-বিদ্যার গ্রন্থ-কর্ত্তারা গণিতের বীজ-সত্য-সকল লইয়া যে কারণে বৃথা তর্ক বিতর্ক উত্থাপন করিতে পরাঙ্মুখ, সেই কারণেই আমরা তত্ত্ববিদ্যার বীজ-সত্য-সকল লইয়া বৃথা বাক্য ব্যয় করিতে সর্ব্বদাই সাবধান হইয়াছি। কাণ্ট কেবল জ্ঞানের স্বতঃ-সিদ্ধ প্রণালীগুলি আবিষ্কার করিতে সবিশেষ যত্ন পাইয়াছিলেন; কিন্তু বাস্তবিক সত্তার সহিত যে তাহাদের পদে পদে যোগ আছে—তাহারা যে কেবল শূন্য প্রণালী মাত্র নহে—ইহার মীমাংসা-স্থলে তিনি বিষম সংশয়-চক্রে পড়িয়া কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। বর্ত্তমান গ্রন্থে ঐ অভাবটির পূরণ উদ্দেশে ইহা স্পষ্ট-রূপে দেখান হইয়াছে যে ইয়ত্তা লক্ষণ ও শক্তি-ঘটিত-প্রণালী-সকল পূর্ণ-রূপে পরমাত্মা ও জগতের সহিত সংলগ্ন রহিয়াছে; সুতরাং বাস্তবিক সত্তাই উহারদের মূল। আমরা সাধ্য মতে ইহাই প্রদর্শন করিতে নিয়ত যত্ন পাইয়াছি যে প্রথমতঃ পরমাত্মা জীবাত্মা ও বহির্ব্বিষয়, তিনেরই বাস্তবিক সত্তা আমারদের আত্ম-প্রত্যয়ে স্বতঃ-সিদ্ধ-রূপে প্রকাশিত আছে। দ্বিতীয়তঃ বিষয়ীর সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ কি রূপ ও পরমাত্মার সহিত জগতের সম্বন্ধ কি রূপ, ইহা তত্ত্ববিদ্যা আলোচনা দ্বারা যথোচিত-রূপে জানা যাইতে পারে। বাস্তবিক-সত্তা-বিষয়ক এই যে প্রত্যয় এবং উহারদের সম্বন্ধ-বিষয়ক এই যে জ্ঞান; ইহা যে মুক্তি-সাধনের পক্ষে কি রূপ উপযোগী, তাহাই এক্ষণে দেখান যাইতেছে।

লোকেরা যখন সুখাশ্বাসে আমোদ-কোলাহলের মধ্যে প্রবেশ করে, তখন তাহাতে তাহারদের মস্তক ভ্রাম্যমাণ হইলেও তাহারা মনে করে যে এ ক্ষণকার এই অবস্থাই স্থায়ী অবস্থা; কিন্তু তাহা হইতে দূরে থাকিয়া যাঁহারা দিব্য-ধামের শান্তি উপভোগ করিতেছেন, তাঁহারাই দেখিতে পান যে সে অবস্থা বিভ্রান্তি ও কোলাহলের সমুদ্র-বিশেষ। কল্য এক রূপ, অদ্য এক রূপ, পর দিন আর এক রূপ সুখ দুঃখ, হর্ষ শোক, কতই পরিবর্ত্তন; ইহার মধ্যে লোকেরা প্রাণ-পণে অর্থ সঞ্চয় করিতেছে, গৃহ নির্ম্মাণ করিতেছে, খ্যাতি বিস্তার করিতেছে; কেন? না তাহাতে স্থায়ী সুখ

লাভ হইবে। 'বিষয়-সকল পরাধীন, আমরা স্বাধীন—বিষয় সকল যে আমারদের উপর প্রভুত্ব করিবে, ইহা আমারদের কখনই সহ্য হইতে পারে না; প্রত্যুত বিষয়ের উপর আমরা প্রভুত্ব করিব, ইহাই আমারদের মনোগত অভিপ্রায়;—যাঁহারা স্থায়ী সুখ উপার্জ্জনে ব্রতী হইয়াছেন, এই অভিপ্রায়টি চরিতার্থ করা তাঁহাদের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। তথাপি আমরা পথি মধ্যে মোহাচ্ছন্ন হইয়া বিলাপ করি যে "আমি নানা বিষয়ে বিক্ষিপ্ত, নানা বিষয়াভাবে পরিবৃত, নানা বিষয়ের অধীন; কাল-স্রোতে চলিতেছে, আমিও তাহার সঙ্গে চলিয়া যাইতেছি, ইহা ব্যতীত আমা কর্ত্তৃক আর কি হইতে পারে?" এই সময়ে তত্ত্ববিদ্যা আসিয়া ভর্ৎসনা করিয়া কহেন যে "বিষয়ের সম্বন্ধে তুমি এক, তোমার কোন অভাব নাই, তুমি স্বাধীন" যাঁহারা বলেন যে বাহিরে এই যে সকল পদার্থ আছে, ইহাই আমরা জানি, আত্মাকে আমরা জানিনা; পঞ্চদশী নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে তাঁহারদের ভ্রম দূরীকরণ জন্য একটি অতি সুনিপুণ উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে। যথা—"কোন স্থানে দশ জন পুরুষ একত্র হইয়া এক নদীর পর-পারে গমন পূর্ব্বক আপনারদিগের সংখ্যা নির্ণয় করিতে লাগিলেন; কিন্তু কি আশ্চর্য্য যিনিই গণনা করেন, তিনিই আপনাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইতর নয় জনকে দেখেন, এবং নয় জনকে দেখিলেও নয় সংখ্যাতে বিভ্রান্ত-চিত্ত হইয়া স্বয়ং যে দশম, ইহা জানিতে পারেন না। তখন তাঁহারা ভ্রান্তি বশতঃ বলিলেন যে দশম পুরুষ দেখিতেছি না, অতএব তিনি নাই। পশ্চাৎ নদী-জলে দশম পুরুষের মৃত্যু হইয়াছে মনে করিয়া শোক ও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সেই কালে কোন অভ্রান্ত পুরুষ আসিয়া বলিলেন যে তোমারদিগের দশম পুরুষ মরে নাই—আছে। পরে গণনা করিয়া তুমিই দশম পুরুষ, এই রূপ উপদিষ্ট হইয়া প্রত্যক্ষ-রূপে দশম পুরুষকে দেখিয়া রোদন পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহারা হর্ষযুক্ত হইলেন।" এই রূপ, আমরা আপন আত্মাকে প্রতিক্ষণেই জানিতেছি, যে কোন বিষয় জানিতেছি, তাহারই সঙ্গে আত্মাকে সেই বিষয়ের জ্ঞাতা রূপে জানিতেছি; অথচ গণনা কালে শরীরাদি বিষয় পর্য্যন্ত গণনা করিয়াই ক্ষান্ত থাকি, আত্মাকে আর গণনা করি না। পরে তত্ত্ববিদ্যা আসিয়া আমারদিগকে বলেন যে তুমি এ-বিষয় জানিতেছ ও-বিষয় জানিতেছ; কিন্তু তুমিই যে উক্ত বিষয় সকলের জ্ঞাতা—ইহা কি তুমি জানিতেছ না? তুমি কি কেবল পরকেই জানিতেছ; কিন্তু আপনাকে কি তুমি কিছু মাত্র জান না? তুমি যদি আপনাকেই না জান, তবে তুমি পরকে কি রূপে জানিবে? তত্ত্ববিদ্যার মুখে এই রূপ কথা-সকল শুনিয়া তবে যখন আমারদের চেতন হয়, পরে দেখি যে হারা-সামগ্রী আমারদের এই আত্মাকে পাইয়াও আমারদের সম্পূর্ণ তৃপ্তি হইতেছে না। পুনর্ব্বার আমরা মোহে মুগ্ধ হইয়া বিলাপ করি যে আমারদের আত্মা সে-দিনকার বই নয়—ইহা কত দিনই বা থাকিবে। কোথা হইতে আসিয়াছে, কোথায় বা গমন করিবে! ইহার মধ্যে এমন কি আছে যে ইহা এত বহুমূল্য? এই পৃথিবীতে কিছু দিন যেন বিষয়ের উপর ইহার প্রভুত্ব সংস্থাপিত হইল, কিন্তু পরে সে প্রভুত্ব কোথায় যাইবে? তত্ত্ববিদ্যা পুনর্ব্বার স্বর্গ হইতে আগমন করেন এবং এই রূপ উপদেশ দেন;—"তুমি এক্ষণে ভবনদীর মধ্য-স্থানে আসিয়া সংশয় তর-

ঙ্গের আন্দোলনে অতিশয় অধীর হইয়াছ; যদি তুমি ফিরিয়া যাও, তবে তোমার সকল পরিশ্রম ব্যর্থ হইবে—ইহা তুমি জানিতেছ; তথাপি অগ্রসর হইতে তুমি ভীত হইতেছ; যে হেতু কোথায় যে কূল, তাহা তোমার নয়নগোচর হইতেছে না; এই ভয়ানক মধ্য গঙ্গাতে থাকিয়া তুমি কি বিনাশ পাইবে? অতএব প্রাণ-পণে অগ্রসর হও, শান্তির কূল অবশ্যই তোমার নয়নে দেখা দিবে। তুমি তোমার অপূর্ণ আত্মাকে জানিয়াছ, এক্ষণে পূর্ণ-স্বরূপ পরমাত্মা যিনি তোমার সেই আত্মার পরাকাষ্ঠা—যিনি সংসার-সাগরের পর-পার—তাঁহাকে জানিতে চেষ্টা কর, তাহা হইলেই পরম শান্তির অন্বেষণ পাইবে। তুমি কেবল আপনাকেই "আমি" বলিতেছ, কিন্তু ইহা দেখিতেছ না যে প্রত্যেক ব্যক্তিতেই ঐরূপ এক একটি "আমি" বিদ্যমান রহিয়াছে—এমন কি তোমার মত কোটি কোটি আত্মা হইবার কিছু মাত্র বাধা নাই। তোমার সম্বন্ধেই তুমি বলিতে পার যে "আমি এক" কিন্তু সত্যের সম্বন্ধে তোমার সদৃশ অনেক "আমি" সংসারে বিচরণ করিতেছে; পরন্তু সকল আত্মার যিনি অন্তরাত্মা, আত্মা হইতেও যিনি আত্মা, "আমি" হইতেও যিনি "আমি" যিনি তাবতের অভ্যন্তর-স্থিত মূল সত্য; তিনিই কেবল সকলেরই সম্বন্ধে সর্ব্বতোভাবে একমাত্র, তাঁহার সদৃশ একেবারেই অসম্ভব। তুমি এক, পরমাত্মা একমেবাদ্বিতীয়ং; তুমি ভাবাত্মক, পরমাত্মা পূর্ণ; তুমি স্বাধীন, পরমাত্মা সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন—কিনা মুক্ত; তোমাতে যে কোন সদাত্মক লক্ষণ পাওয়া যায়, পরমাত্মাতে তাহাই পরাকাষ্ঠা রূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। তোমার মনের সদ্ভাব তুমি যদি আর এক জনেতে দেখিতে পাও, তবে তুমি তাহার সহিত বন্ধুতা করিতে ব্যগ্র হও; কিন্তু পরমাত্মাতে তোমার মনের সকল সদ্ভাব পরাকাষ্ঠা-রূপে অবস্থিতি করিতেছে—কি জন্য তুমি তাঁহার বিরোধী হও? তিনি সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন, তাঁহার শরণাপন্ন হও, তবে পাপ-তাপ দুঃখ-শোক হইতে মুক্তি পাইয়া পরম আনন্দে অভিষিক্ত হইবে—ইহার আর অন্যথা নাই।" তত্ত্ববিদ্যার এই উপদেশানুসারে আমরা যখন অনাদি অনন্ত, সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন, শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত, মঙ্গলময়, একমাত্র অদ্বিতীয় পূর্ণ পুরুষের শরণাপন্ন হই; তখন আমরা নিশ্চয় জানিতে পাই যে, ঈশ্বর যিনি তিনি আমারদের অনন্ত কালের ঈশ্বর—যখন আমরা তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছি, তখন তিনি আমাদিগকে কোন কালেই পরিত্যাগ করিবেন না। যদি এরূপ কুমন্ত্রণা বাক্য কখনো আমারদের কর্ণগোচর হয় যে, তোমার যিনি হৃদয়-বন্ধু, তিনি তোমাকে গোপনে বিনাশ করিতে সংকল্প করিয়াছেন; তবে সেই প্রাণ-স্বরূপের অকৃত্রিম প্রেম-মুখের প্রতি একবার নিরীক্ষণ করিয়া আমরা হাস্য-মুখে ব্যক্ত করিতে পারি যে "ইঁহার হস্তে যদি আমারদের মৃত্যু হয়, তবে মৃত্যুই আমারদের জীবন।"

বর্ত্তমান খণ্ডের নানা অধ্যায়ে নানা প্রকার সত্য বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। কিন্তু সে সমুদায়ের সার মর্ম্ম এক্ষণে অতি সংক্ষেপে ব্যক্ত হইতে পারে। সার মর্ম্ম এই—আমরা বিষয়ের সম্বন্ধে এক ভাবাত্মক ও স্বাধীন এবং ঈশ্বরের সম্বন্ধে দ্বৈত-সাপেক্ষ অপূর্ণ ও পরাধীন। পুনশ্চ "আমরা বিষয়ের অধীন" এই মিথ্যা-জ্ঞান হইতে আমরা যে পরিমাণে নিষ্কৃতি লাভ করি, সেই পরিমাণে আমরা এই অবিতথ সত্য-জ্ঞানটি উপার্জ্জন করি যে, আমরা ঈশ্বরেরই সম্পূর্ণ অধীন;—বিষয়-শৃঙ্খল হইতে যত আমরা মুক্ত হই, ঈশ্বরের সহিত তত আমরা যুক্ত হই। পুনশ্চ জ্ঞানময় প্রেমময় ঈশ্বরের অধীন-রূপে যত আমরা আপনারদিগকে উপলব্ধি করি, ততই আমরা অচেতন অসাড় বিষয়-সকলের সম্বন্ধে আপনারদিগের স্বাধীনতা হৃদয়ঙ্গম করি;—আমরা যত ঈশ্বরের অধীন হই, বিষয়-সকল ততই আমারদের অধীন হয়।

বিষয় হইতে আত্মার পৃথক্ সত্তা সুস্পষ্ট রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে তাহার প্রকৃষ্ট উপায় এই যে, শরীর মন যাহা কতক অংশে আমারদের আপনার-কর্ত্তৃক নিয়মিত, তাহারদিগকে ঈশ্বরের নিয়মিত প্রাকৃতিক কার্য্য-কারণে সমর্পণ করা হয়; এবং অল্প পরিমাণে নিয়ন্তা যে আমারদের আত্মা, তাহাকে সর্ব্ব-নিয়ন্তা ঈশ্বরেতে সমর্পণ করা হয়—তাহা হইলেই নিয়মিত-স্বভাব বিষয়-সকল হইতে নিয়ন্তৃ-স্বভাব আত্মার পৃথক্ত্ব স্পষ্ট-রূপে অনুভূত হইতে পারিবে। এখানে বিশেষ-রূপে জানা আবশ্যক যে দেশ-কাল-ঘটিত আবির্ভাব-সকলকে আমরা যে রূপ মনেতে কল্পনা করিতে পারি, আপন আত্মাকে আমরা কখনই সে রূপ কল্পনা করিতে পারি না। আত্মাকে আমরা জ্যোতি-ই বলি, মস্তিষ্ক-ই বলি, এবং শূন্য-ই বলি;—আত্মা তাহার কিছুই নহে। আত্মাকে ঘন-পিণ্ড-রূপে দেশেতে কল্পনা করা যায় না, অবস্থা-বিশেষ রূপে কালেতেও কল্পনা করা যায় না,—আত্মা কদাপি কাল্পনিক সামগ্রী নহে; প্রত্যুত আত্মা এ রূপ বাস্তবিক পদার্থ যে কল্পনার অগম্য হইলেও এক ভাবাত্মক ও স্বাধীন রূপে উহা আমারদের জ্ঞানে নিয়তই প্রকাশ পাইতেছে। কাহার বলে আমারদের আত্মা ও-রূপ সদ্‌গুণ-ত্রয়ে সুসম্পন্ন হইয়াছে? যাঁহার বলে সমুদায় জগৎ স্ব স্ব স্বভাব পরিগ্রহ করিয়াছে—তাঁহারি বলে। অমরা অনেকে বিক্ষিপ্ত না হইয়া এক-নিষ্ঠ হই, অভাবে ক্লিষ্ট না হইয়া স্পৃহা-শূন্য হই, পরাধীনতায় ম্রিয়মান না হইয়া স্বাধীন হই—ঈশ্বরের এই পরমাশ্চর্য্য মঙ্গল ইচ্ছা সকল মনুষ্যেরই আত্মাতে অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত আছে। "এক-নিষ্ঠ হইয়া, স্পৃহা-শূন্য হইয়া, স্বাধীন হইয়া, ঈশ্বরের রাজ্যে বিচরণ কর; যথেচ্ছা-মঙ্গল-কার্য্য অনুষ্ঠান কর, এবং ঈশ্বরকে মনের সহিত ধন্যবাদ কর—এ কথাতে যেমন আমরা সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত সায় দিতে পারি, এত আর কিছুতেই নহে। এই রূপ আত্মার অভ্যন্তরে পরমাত্মাকে হৃদয়ঙ্গম করিয়া যাহাতে আমরা মুক্তির জন্য প্রস্তুত হইতে পারি, তাহাই এই জ্ঞান-কাণ্ডের উদ্দেশ্য;—যে যে পথের মধ্য দিয়া মুক্তি-ধামে যাত্রা করিতে হইবে, তাহা দ্বিতীয় খণ্ড-নিহিত কর্ম্ম-কাণ্ডে সাবধানে অন্বেষণ করা যাইবে।

ইতি জ্ঞান-কাণ্ড সমাপ্ত।

সাধারণ আদর্শ।

ইতিহাস পাঠে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, রাজা ও রাজ-পুরুষেরা যে প্রকার আচার ব্যবহার ও যে প্রকার ধর্ম্মের অনুগত হন, তাঁহাদের আয়ত্তীকৃত প্রজামণ্ডলীতেও সেই প্রকার আচার ব্যবহার ও সেই প্রকার ধর্ম্ম অনেক পরিমাণে সংক্রামিত হইয়া থাকে। তৎ সমুদায় কত দূর উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট, তদ্বিষয়ে তাদৃশ বিবেচনা উপস্থিত হয় না; কিন্তু রাজ-শক্তির এমনি একটি প্রভাব যে, সেই শক্তি যখন যে জাতির হস্তগত হয়, তখন তাহারদিগের

অবলম্বিত অতি কুৎসিত বিষয়গুলিও সাধারণ লোকের নয়ন ও মনকে অল্পে অল্পে বশীভূত করিয়া লয়। ইহার উদাহরণ-সংগ্রহের নিমিত্ত অধিক দূরে গমন করিবার আবশ্যকতা নাই, এক ভারতবর্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই কৃতার্থ হওয়া যাইবে। যখন এ দেশের শাসন-ভার বৌদ্ধদিগের হস্তে বিন্যস্ত হয়, সেই সময়েই বৌদ্ধধর্ম্মের সমধিক প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। যত দিন উজ্জয়িনী প্রদেশে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী আর একটি রাজ-বংশের অভ্যুদয় না হইয়াছিল, তত দিন পর্য্যন্ত বৌদ্ধ-ধর্ম্ম এ দেশে অসাধারণ আধিপত্য বিস্তার করে; তৎপরে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী রাজাদিগের বল-ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মও শ্রীভ্রষ্ট হইয়া যায়। কাল-ক্রমে যখন মুসলমানদিগের শাসন-শৃঙ্খলে ভারত বর্ষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সকল দৃঢ়বদ্ধ হইল, তখন মুসলমান রীতি নীতি, মুসলমান আচার ব্যবহার ও মুসলমান ধর্ম্মপদ্ধতি অল্পে অল্পে হিন্দুসমাজে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। অদ্যাপি হিন্দুদিগের মধ্যেও তাহার নিদর্শন-স্বরূপ সত্য পীর, পীর মামুদ, ও গাজী সাহেব প্রভৃতি মুসলমান গুরুদিগের আদর-পূর্ব্বক অর্চ্চনা দৃষ্টি-গোচর হইয়া থাকে। এক্ষণে খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বীরা ভারত বর্ষের রাজ-সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছেন; ইহাঁরদিগের প্রচুর ক্ষমতা, উন্নত বিদ্যা ও উৎকৃষ্ট রাজনীতি বহুল পরিমাণে হিন্দুদিগের মনোহর হইয়াছে। অতএব ঈদৃশ জাতির অবলম্বিত খৃষ্টীয় ধর্ম্ম অসার হইয়াও অনেকের যে প্রীতিকর হইবে এবং ইহাঁরদিগের পূজনীয় যীশু খৃষ্ট মহান্ পুরুষ বলিয়া অনেকের যে আদরণীয় হইবে, ইহাতে কিছুই আশ্চর্য্য নাই। যদি ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দু-সমাজের পৌত্তলিকতা-রূপ বিষম দোষের সংশোধনে অগ্রসর না হন, তাহা হইলে ইহাও অসম্ভব নয় যে, মুসলমান পীরদিগের ন্যায় যীশুখৃষ্টও কালক্রমে ভারত বর্ষের তেত্রিশ কোটি দেবতার দল-ভুক্ত হইয়া যাইবেন। এ ক্ষণে এত দূর পর্য্যন্ত কথা উত্থিত হইয়াছে যে, বাইবলের যীশু খৃষ্ট সাধারণ আদর্শ। কিন্তু আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নত ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতেছি যে খৃষ্টের চরিত্র কোন রূপেই সাধারণের অনুকরণীয় নহে। যাহারা খৃষ্টকে পৃথিবীর পাপ-মোচনার্থে অবতীর্ণ ঈশ্বর বলিয়া মনের সহিত বিশ্বাস করিয়া থাকে, তাহাদের অন্ধ ভক্তি দ্বারা খৃষ্টের চরিত্র যে রূপ চিত্রিত হইয়াছে,তাহাই যখন উন্নত-চেতা পণ্ডিতগণের নিকটে জঘন্য ও অশ্রদ্ধেয় বলিয়া অনাদৃত হইতেছে; তখন, যাঁহারা খৃষ্টকে মনুষ্য বলিয়া অঙ্গীকার করেন, তাঁহারা তাঁহাকে কত দূর উন্নত করিয়া তুলিতে পারিবেন? যাঁহারা তাঁহাকে মনুষ্য বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াও তাঁহাতে মনুষ্য অপেক্ষা উচ্চ প্রকৃতি ও মানব প্রকৃতির অতিরিক্ত গুণ আরোপিত করেন; তাঁহারদের বাক্যের কোন অর্থই নাই; তথাপি বাইবল খৃষ্টের যত দূর উৎকর্ষ প্রদর্শন করিতেছে, বোধ হয় তাহা অপেক্ষা অধিক বলিতে কেহই সাহসী হইবেন না। কিন্তু বাইবলে লিখিত খৃষ্ট-চরিত লক্ষ্য করিয়াই আমরা বারংবার বলিতেছি যে, খৃষ্ট জন-সমাজের সমগ্র আদর্শ কখনই হইতে পারেন না। যদিও বাইবলের খৃষ্ট-চরিত পুরাণের প্রহ্লাদ-চরিত ও ধ্রুব-রচিত অপেক্ষা বড় অধিক বিশ্বাস-যোগ্য বলিয়া বোধ হয় না, তথাচ বাইবল অনুসারেও খৃষ্টকে সাধারণ সমগ্র আদর্শ কোন প্রকারেই বলা যাইতে পারে না। সমগ্র আদর্শ কি রূপ হওয়া উচিত, তাহা গত বারের পত্রিকাতে প্রদর্শিত হইয়াছে। তদনুসারে "পূর্ণ আদর্শ" এই উন্নত সংজ্ঞা পূর্ণ-স্বরূপ ঈশ্বর ব্যতীত আর কাহাকেও প্রদান করা যায় না। এক জন মনুষ্যকে—যীশু খৃষ্টকে সেই ঈশ্বরোচিত উন্নত সংজ্ঞা প্রদান করা আর মৃণ্ময় প্রতিমূর্ত্তিতে ঈশ্বর বোধ করা, এই উভয়ে কি প্রভেদ থাকে? ট্রিনেটেরিয়ান খৃষ্টানেরা বাইবলের যে প্রকার অর্থ করে, যদি তাহাই প্রকৃত অর্থ বলিয়া গ্রহণ করা যায়; তাহা হইলে এই বোধ হয় যে পুরাতন বাইবলে যে 'মেসায়া' অবতারের কথা উল্লিখিত আছে, যীশু খৃষ্ট আপনাকে সেই মেসায়া বলিয়া পরিচয় দিতেন। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে খৃষ্টকে আদর্শ বলিয়া শ্রদ্ধা পূর্ব্বক গ্রহণ করা দূরে থাকুক; ঈশ্বরাভিমানী ঈশ্বরের সিংহাসন-লোলুপ দুরাচার বলিয়া তাঁহার প্রতি ঘৃণারই উদয় হইতে পারে। আর যদি ট্রিনেটেরিয়ান্দিগকে বাইবলের অর্থ গ্রহণে ভ্রান্ত অথবা বাইবলের ঐ সকল অংশ বাইবল-লেখকদিগের কপোল-কল্পিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যায়; তাহা হইলে এই বোধ হয় যে, যীশু খৃষ্ট এক জন ধর্ম্মপ্রচারক ছিলেন—তিনি আপনার বিশ্বাসানুযায়ী কতকগুলি মত লোকের নিকট প্রচার করিতেন,তদনুরোধে আর আর সমুদায় কর্ত্তব্য তাঁহার নিকট উপেক্ষিত হইয়াছিল। খৃষ্টের প্রতি একান্ত শ্রদ্ধার জন্য অথবা কোন অনির্ব্বচনীয় কারণে যদি তাঁহাকে এই উন্নত সময়ের উপযুক্ত সজ্জায় সজ্জিত করিয়া প্রচারক-রূপেই লোকের নিকট বাহির করা হয়; তাহা হইলেও প্রচারক ব্যতীত সংসারের আর কোন সম্প্রদায়ই খৃষ্টের অনুকরণ করিতে পারে না। অতএব খৃষ্টকে সাধারণ আদর্শ করিবার আশা কিছুতেই পরিপূর্ণ হয় না।

যে আদর্শের অনুকরণ করিতে হইবে, তাহা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর না হইলে সে অনুকরণ-জনিত ফল কখনই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হয় না। কিন্তু মনুষ্যের চরিত্র কখনই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইতে পারে না। বিশেষতঃ ত্যাগ স্বীকার, ক্ষমা, দয়া প্রভৃতি যে সকল গুণ ধর্ম্মের জন্য নিতান্ত আবশ্যক, খৃষ্টের চরিত্রে তাহা অল্পই লক্ষিত হইয়া থাকে—খৃষ্টের এমন কি ছিল যে, তিনি তাহা ত্যাগ করিয়া ত্যাগ-স্বীকারের দৃষ্টান্ত হইতে পারেন? খৃষ্টের এমন কি অবস্থা ঘটিয়াছিল যে, সামর্থ্য সত্ত্বেও অন্যকৃত অপকার সহ্য করিয়া ক্ষমা-গুণ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন—অসামর্থ্য-নিবন্ধন সহিষ্ণুতা ক্ষমা শব্দের বাচ্য হইতে পারে না। প্রত্যুত যাহারা তাঁহার মতের দোষোদ্ঘোষণ করিত, তাহাদের সহিত আলাপ ও ব্যবহার কালে তাঁহার দয়া, সৌজন্য ও ভ্রাতৃভাবের বিকট বিপরীত পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহারা মেষের ন্যায় নিঃশব্দে তাঁহার অনুগমন করিয়াছিল, তিনি তাহারদিগকে মেষ ও আপনাকে মেষ-পালক বলিতেন; আর যাহারা তাঁহার অনুগমন করিতে অস্বীকার করিত, তাহারদিগকে শয়তানের সন্তান বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিতেন। দয়া ও ভ্রাতৃভাবের কি এই আদর্শ গ্রহণ করিতে হইবে? তাঁহার কতকগুলি উপদেশ অবশ্যই সাধু হৃদয়ের আনন্দ-জনক হইবে; কিন্তু তাঁহার চরিত্র কখনই সাধুদর্শীদিগকে প্রীত করিতে পারে না। অন্যত্র যেমন উপদেষ্টা অপেক্ষা উপদেশের মূল্য অধিক হইয়া থাকে, তাঁহার বিষয়েও অবিকল সেই রূপ। সুতরাং তাঁহার কতকগুলি উপদেশকে যে পরিমাণে আদর করা যায়, তাঁহার চরিত্রকে সে পরিমাণে আদর্শ করা যাইতে পারে না। যাঁহারা ঈশ্বরের জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছার সহিত আপনার জ্ঞান ভাব ও ইচ্ছার সামঞ্জস্য বিধানকেই মুক্তি, উন্নতি, ও পরম পুরু-

যার্থ বলিয়া বিশ্বাস করেন; এক মাত্র ঈশ্বরই তাঁহারদিগের আদর্শ হইবেন।

যাহারা ধর্ম্ম বিষয়ে খৃষ্ট অপেক্ষা নিকৃষ্ট এবং সূক্ষ্মতম অতীন্দ্রিয় পরমাত্মাকে আদর্শ করিয়া আপনাকে নিয়মিত করিতে অসমর্থ; যদি কেবল তাহারদিগের জন্য খৃষ্টকে আদর্শ করা হয়, তাহাও আমাদের অনুমোদিত হইতে পারে না। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসাদে আমারদের এই সত্যটির উপরে দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে এক-নিষ্ঠ হইয়া ঈশ্বরের বিশুদ্ধ-মূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া না চলিলে ধর্ম্ম-পথে, কল্যাণ-পথে, অগ্রসর হওয়া যায় না। ঈশ্বরের সহিত যোগ-নিবদ্ধ করাই ব্রাহ্মধর্ম্মের লক্ষ্য; অতএব তাঁহা হইতে বিমুখ হইয়া কোন পরিমিত বস্তুর প্রেমে আবদ্ধ হইয়া থাকিলে তাঁহাকে আমরা কি প্রকারে লাভ করিব? যত ক্ষণ সাধক সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঈশ্বরের সহিত সংযুক্ত না হইবে, তত ক্ষণ ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহাকে উপদেশ দিতে ক্ষান্ত হইবেন না। ঈশ্বর ও মনুষ্যের মধ্য স্থানে একটি ব্যবধান সংস্থাপন করা ব্রাহ্মধর্ম্মের বিপরীত কার্য্য। বিশেষতঃ ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতগণ জ্ঞানময় অশরীরী পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ উপাসনায় অসমর্থ ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত তাঁহার রূপ কল্পনা করিয়া হিন্দু-সমাজের যে অনিষ্ট করিয়া গিয়াছেন, তাহা দেখিয়াও সতর্ক ও সাবধান হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

মহাত্মা হরদেব চট্টোপাধ্যায়ের পরলোক-প্রাপ্তি।

ব্রহ্মনিষ্ঠ মহাত্মা হরদেব চট্টোপাধ্যায় দুশ্চিকিৎস পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া গত শ্রাবণ মাসের চতুর্থ রাত্রিতে মানব লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তাঁহার বয়ঃক্রম ৬৫ বৎসর হইবে। তিনি এই সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া অধিকাংশ কাল কেবল ধর্ম্মের আলোচনাতেই, ঈশ্বরের উপাসনাতেই, পরোপকার সাধনাতেই, অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার তুল্য অকপট ব্রাহ্ম অতি বিরল। তাঁহার জীবন একটি জীবন্ত দৃষ্টান্ত-স্থল। তিনি এমনি উৎসাহী ব্রাহ্ম ছিলেন যে যখন পীড়িত হইয়া শয্যাগত হইয়া আছেন, তখনও ১১ মাঘের উৎসবে ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হন। তিনি গত ১১ মাঘে ব্রাহ্ম সমাজে আসিয়া যে একটি বক্তৃতা করেন, তাহাতে এই পাঁড়াই যে সাংঘাতিক হইবে, তাহার আভাস দিয়াছেন। তিনি বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন যে এই তাঁহার শেষ সভারোহণ, সাধারণের নিকট এই বক্তৃতাই তাঁহার শেষ বক্তৃতা, ও এই দর্শনই তাঁহার শেষ দর্শন। আমরা আর তাঁহার সেই পবিত্র-ভাব-পরিপূর্ণ মুখ-শ্রী প্রত্যক্ষ করিতে এবং তাঁহার রসনা-বিনির্গত সুমধুর বক্তৃতা শ্রবণ করিতে পাইলাম না। তিনি সেই অবধিই জন্মের মত সাধারণের নিকট বিদায় লইয়া গিয়াছেন।*

ঐ মহাত্মা মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে আপনার পুত্রদিগকে কহিয়াছিলেন যে আমার মৃত্যু হইলে ব্রাহ্ম-সমাজের প্রধান আচার্য্য মহাশয়কে সংবাদ দিবে—পরে তিনি আসিয়া যে রূপ ব্যবস্থা প্রদান করিবেন, তদনুসারে আমার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া তোমরা সমাহিত করিবে। পিতৃ-ভক্তি-পরায়ণ পুত্রেরা পিতা হরদেব চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইলে প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের নিকট সেই রাত্রিতেই সমাচার প্রেরণ করেন। তিনি সেই রাত্রি অবসান হইলে পর দিন প্রাতঃকালে ব্রাহ্ম-বন্ধুবান্ধবদিগকে সঙ্গে লইয়া চট্টোপাধ্যায়ের বাটীতে উপস্থিত হন।

উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, হরদেবের মৃত দেহ পাটল-বর্ণ-বসনে প্রাবৃত হইয়া দ্বার দেশে খট্টার উপর শয়ান রহিয়াছে। আত্মীয় স্বজন সকলেই বিষণ্ণ বদনে স্তব্ধ-ভাবে উপবেশন পূর্ব্বক অতি যত্ন সহকারে শব রক্ষা করিতেছেন। শবের নিকট ধূপের সুস্নিগ্ধ সুগন্ধ নির্গত হইতেছে। চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যম পুত্র দীন-নয়নে দণ্ডায়মান হইয়া মৃত পিতার দেহে শনৈঃ শনৈঃ তালবৃন্ত সঞ্চালন করিতেছেন। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, রৌদ্রের সম্পর্ক নাই। তত্রোপবিষ্ট ব্যক্তিদিগের ন্যায় প্রকৃতিও যেন তৎকালে নিস্তব্ধ ভাব অবলম্বন করিয়া আছে।

অনন্তর প্রধান আচার্য্য মহাশয় হরদেবের মুখ-শ্রীর অবিকৃত ভাব ও পবিত্র ভাবের সুস্পষ্ট চিহ্ন তখনো পর্য্যন্ত জাজ্বল্যমান দেখিয়া কিয়ৎ ক্ষণ বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে স্থির-ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। পরে তাঁহার আদেশানুসারে মৃত দেহ সলিল-ক্ষালিত ও পরিষ্কৃত করা হইল। মৃত দেহের উপর কষায় বস্ত্রের পরিবর্ত্তে শ্বেতবর্ণ বস্ত্র নিহিত হইল; ও সেই আচ্ছাদন-বস্ত্রের উপর অভ্র মিশ্রিত আবীর নিক্ষিপ্ত হইল এবং মাল্য চন্দন ও পুষ্প দ্বারা তাহা সুসজ্জিত করা হইল। অনন্তর প্রধান আচার্য্য মহাশয় স্বহস্তে পুষ্প-রাশি তাহার উপরে বিকীর্ণ করিলেন। চট্টোপাধ্যায়ের দুই পুত্র ও জামাতারা এবং অন্যান্য ব্রাহ্মগণ মৃত দেহের উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলে প্রধান আচার্য্য মহাশয় স্বয়ং শবের শিরোভাগে দণ্ডায়মান হইয়া বাষ্প-গদ্‌গদ-বাক্যে এই বক্তৃতা করিলেন।

"যখন এই মহাত্মা ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, তখন কেহই আমরা ইহাঁকে আহ্বান করি নাই—সে সময় কেহই আমরা পৃথিবীতে ছিলাম না। এখন, যখন ইনি স্বর্গস্থ হইলেন—এখন ইঁহাকে সম্মান করিতে আমরা সকলে এখানে একত্রিত হইয়াছি। যদিও আমারদের মুখ ম্লান, কিন্তু ইঁহার সদ্গতি অনুভব করিয়া আমারদের আত্মা নির্ম্মলানন্দে প্লাবিত হইতেছে। দেখ, ধর্ম্মের কি পুরস্কার। ইনি একাকী ৬৫ বৎসর পর্য্যন্ত এক ধর্ম্মের উদ্দেশে নানা প্রকার ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করিয়া আত্মাকে নির্ম্মল করিয়াছেন। যত দিন পর্য্যন্ত এই শরীরে ইঁহার আত্মা ছিল, তত দিন এমন দিন যায় নাই, যে দিন ইনি কোন না কোন উপকারের চিন্তা না করিয়াছিলেন। ইনি ক্রমিক ৬৫ বৎসর পর্য্যন্ত একাকী নিঃস্বার্থ ধর্ম্মের পথে গমন করিয়া এখন দিব্য-লোকে আনন্দ অনুভব করিতেছেন। ধর্ম্মের পুরস্কার আমরা এখান হইতে কি অনুভব করিব? ইঁহার আত্মা এই ক্ষণে তাহা সম্যক্-রূপে অনুভব করিতেছে। আমরা পৃথিবীতে থাকিয়া এইক্ষণে কিসে এই শরীর পবিত্র পঞ্চভূতে মিশ্রিত হইয়া পবিত্র হয়, ইহাতেই চেষ্টিত আছি। এখানে বন্ধুবর্গ আর কি করিবে? কিন্তু এই ক্ষণে দেবতারা দিব্য-ধামে ইঁহার আত্মাকে আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিতেছেন। মনুষ্য-লোকের আর এক জন সচ্চরিত্র সরল সাধু আত্মাকে লাভ করিয়া দেবতারা প্রহৃষ্ট হইয়াছেন। এই সাধু মহাত্মা কত ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু শ্যামাপ্রসন্ন! দুর্গাপ্রসন্ন! স্মরণ কর, তোমারদিগকে এক দিনের জন্যও ইনি বিস্মৃত হন নাই। তোমরা হয়তো ইহাঁর উপরে কত অত্যাচার করিয়াছ, ইনি সহিষ্ণুতা অবলম্বন পূর্ব্বক সকলি ক্ষমা করিয়াছেন। ধর্ম্মের জন্য ইনি সকল ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি তোমারদের মঙ্গল-চিন্তা ইনি এক দিনের নিমিত্তেও বিস্মৃত

হন নাই। তোমারদের যাহাতে শরীর রক্ষা হয়, ধর্ম্ম রক্ষা হয়, আত্মা উন্নত হয়; ইনি এক ঘণ্টাকাল তাহার চিন্তা হইতে আপনাকে বিরত করেন নাই। তেমনি স্বয়ং ঈশ্বর ইঁহার সকল কার্য্য সমাধা করিয়াছেন। যেমন ইনি ইঁহার আত্মাকে ঈশ্বরে অর্পণ করিয়াছিলেন, তেমনি ঈশ্বর ইঁহার শরীর ও ইঁহার সকল পরিবারকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছেন। কত দুঃখ বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছিল, এক দিনের জন্যও ইনি বিমর্ষ হন নাই; প্রহৃষ্ট চিত্তে সংসার-ধর্ম্ম চিরকাল পালন করিয়াছেন। কেবল কি তোমারদিগের কল্যাণ-সাধনে ইঁহার সমুদায় যত্নের অবসান হইয়াছিল? কিসে সমুদায় বঙ্গ ভূমি—এই মাতৃ-ভূমি, শ্রী সৌভাগ্যে উন্নত হয়; দিবা রাত্রি এই তাঁর চিন্তা ছিল। এই মহাত্মার সঙ্গে আমার যখন প্রথম আলাপ হয়, তখন তিনি আমার সঙ্গে কি বিষয়ে প্রথমই সম্ভাষণ করেন? এই যে—দামোদরের বন্যাতে জল-প্লাবন হইয়া প্রজা-সকল উচ্ছিন্ন যাইতেছে—কিসে তাহারদের রক্ষা হয়? সেই জল-প্লাবনের দুঃখ দূরের নিমিত্তে প্রথম আমার সঙ্গে ইহাঁর আলাপ। আমার সহিত প্রথম দিনের আলাপে প্রথমেই এই মুখ হইতে বিনির্গত হয়—"জল-প্লাবনে দেশ ভেসে গেল, কিসে প্রজাদের দুঃখ নিবারণ হইবে।" পরের দুঃখ নিবারণ করা ইঁহার আন্তরিক চেষ্টা ছিল। কিসে লোকের দুঃখ দূর হয়, কিসে লোকেরা বিদ্যাতে ধর্ম্মেতে উন্নত হয়; ইহাতে ইঁহার অপ্রতিহত উৎসাহ ও যত্ন ছিল। কি সহ-মরণ নিবারণে—কি বিধবা-বিবাহে—কি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনে—কি ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠাতে, দেশের সকল প্রকার মঙ্গল কার্য্যে ইনি সকলের অগ্রসর ছিলেন। ইনি লোক-ভয়ে ভীত হইতেন না, ইনি লোকের অত্যাচারে অবসন্ন হইতেন না, ইনি ধর্ম্ম-যুদ্ধে কখনো পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। দেখ, অদ্য এখানকার কি বিষণ্ণ ভাব—এখন সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে না। এই মেঘাবৃত মলিন নভোমণ্ডল আমারদের অন্তঃকরণের বিষাদ-ভাবের অনুরূপ রূপ ধারণ করিয়াছে—সম্ভ্রমের সহিত এই মৃত-দেহকে ছায়া দান করিয়া রক্ষা করিতেছে। যেমন ইনি এখানে ছিলেন, তেমনি শান্ত ভাবে এখনো ইনি এই শয্যার উপরে শয়ান আছেন। মুখের কিছুই বিকৃতি হয় নাই। ইহাঁর আত্মা হয় তো এখানে এখন সঞ্চরণ করিয়া অমার বাক্য শ্রবণ করিতেছে। ইনি ব্রাহ্মধর্ম্মের জীবন্ত দৃষ্টান্ত ছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থে যে উপদেশ আছে, আমি তাহা পাঠ করি; দেখ দেখি, ইহার সঙ্গে এই সাধুর জীবন মেলে কি না? "ব্রহ্মনিষ্ঠোগৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞান-পরায়ণঃ। যদ্যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।" "গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞান-পরায়ণ হইবেন; যে কোন্ কর্ম্ম করুন, তাহা পরব্রহ্মেতে সমর্পণ করিবেন।" দেখ, এই কথা ইহাঁর জীবনের সঙ্গে কেমন মিলে। আবার দেখ, "মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতাং। মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্ব্বপ্রযত্নতঃ।" "গৃহী ব্যক্তি পিতা মাতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা-স্বরূপ জানিয়া সর্ব্ব-প্রযত্নে সর্ব্বদা তাঁহারদের সেবা করিবেন।" ইঁহার পিতামাতার প্রতি ভক্তি ইঁহার মুখ হইতে কত বার শুনিয়াছি, আমার বিলক্ষণ বিশ্বাস, ইঁহার মত পিতৃ-ভক্ত সৎপুত্র পৃথিবীতে অতি দুর্ল্লভ। "গুরূণাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং মাতা পরমকো গুরুঃ।" "সকল গুরুর মধ্যে মাতা পরম গুরু।" ইনি প্রতিদিন মাতার পদ পূজা করিতেন। মাতার মৃত্যুর সময় হইতেই ইহাঁর তত্ত্ব-জ্ঞানের আলোচনা আরম্ভ হইল।

ইনি ভাবিলেন, মা কোথা? এই শরীর কি মা? শরীর তো ভস্মান্ত হইল, তাহা তো এই জলেতে, বায়ুতে, মিলিয়া গেল। তবে মা কোথা? এই প্রশ্নে ইহাঁর আত্ম জ্ঞান জন্মিল। মাতা শরীর না, কিন্তু মাতার শরীরের মধ্যে যে জীবাত্মা, তিনিই আমার মাতা। এই প্রকারে প্রথম ইহাঁর আত্ম-জ্ঞান জন্মিল। অন্য লোকে কত তর্ক-শাস্ত্র দর্শন-শাস্ত্র পড়িয়া যাহা বুঝিতে পারে না, ইনি স্বীয় সরল-হৃদয়ের এক-ভক্তি-বলে মৃত মাতার নিকট হইতে আত্ম-জ্ঞান লাভ করিলেন। ইঁহার পৈতৃক ধর্ম্ম শাক্ত ধর্ম্ম ছিল, ইনিও প্রথম বয়সে শক্তি-মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে ইনি আলোচনা করিয়া দেখিলেন যে কালী-মূর্ত্তি দুর্গা-মূর্ত্তি কিছুই নহে, আত্মাই সত্য এবং লোকের উপকারই ঈশ্বর-পূজার নৈবেদ্য—অতএব ইনি প্রাণ-পণে পরোপকারে আপনার শরীর ও মনকে নিযুক্ত করিলেন। ইনি যখন যে সত্য জানিতেন, তদনুরূপ আচরণে প্রবৃত্ত হইতেন। ইনি একটী সত্য-পালনের জন্য ইহাঁর পৈতৃক নিবাস-বাটী পরিত্যাগ করিতে বাধিত হইলেন। ইহাঁর নিকটে বিষয় এমনি তুচ্ছ ছিল, যে পিতৃ-ভূমি ছোট ভ্রাতাকে দিয়া সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া আইলেন। ইনি ত্যাগ করিতে যান, ঈশ্বর ইহাঁর সকল অভাব দূর করেন। ইনি পিত্রালয় পরিত্যাগ করিলেন, ঈশ্বর ইহাঁকে এই গৃহে স্থাপন করিলেন। এই গৃহ পুত্র-পৌত্রে, দুহিতা-দৌহিত্রে, ধন-ধান্যে, পূর্ণ হইল। ইহাঁর পুত্র-সকল কর্ম্মক্ষম, কন্যারা সুশীলা। যথার্থ ধর্ম্মের পুরস্কার ইহাঁর আত্মা বুঝিতেছে। মৃত মাতার আত্মাকে অন্বেষণ করিতে গিয়া ইঁহার আত্ম-তত্ত্বের জ্ঞান হইল, ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশে ইঁহার ব্রহ্ম-তত্ত্বের লাভ হইল। ইনি সাধারণ অদ্বৈত-বাদীদিগের মতের অনুসরণ করিয়া অনেক দিন এই শরীর-স্থিত আত্মাকেই ব্রহ্ম বলিয়া বোধ করিতেন। পরে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের এই শ্রুতিটি শ্রবণ করিয়া ইহাঁর সে ভ্রম দূরীকৃত হইল এবং স্বীয় আত্মা অপেক্ষা সত্য-স্বরূপ ব্রহ্মকে অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ বলিয়া উপলব্ধি করিলেন। "হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং। তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্যদাত্মবিদোবিদুঃ।" "ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিরা আত্ম-রূপ উজ্জ্বল ও শ্রেষ্ঠ কোষ মধ্যে সেই নির্ম্মল, নিরবয়ব, জ্যোতির জ্যোতি, শুভ্র পরমাত্মাকে উপলব্ধি করেন।" ইনি এই শ্রুতিটি আলোচনা করিয়া নিশ্চয়-রূপে প্রতীতি করিলেন যে এই শরীর-স্থিত আত্মা ব্রহ্ম নহে, যেহেতু ইহা জ্ঞান-ধর্ম্মে পরিমিত; কিন্তু এই আত্মার আশ্রয় হইয়া যিনি এই আত্মার অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, তিনিই অনন্ত—তিনিই ব্রহ্ম। ইনি স্বরচিত ব্রহ্ম-সঙ্গীতে এই সার সত্যটি কি সহজেই প্রকাশ করিয়াছেন—"যেমন দেহ অন্তরে, এ আত্মা সদা বিহরে, সে রূপ তার অন্তরে, ব্যাপ্ত পরাৎপর।" এই শরীর-স্থিত পরিমিত আত্মার মধ্যে সর্ব্বব্যাপী অখণ্ড অনন্ত ব্রহ্মকে লাভ করিয়া ইনি জ্ঞান-তৃপ্ত ও কৃত-কৃতার্থ হইলেন—ইহাঁর মুখ সমুজ্জ্বলিত হইল। দেখ ইহাঁর এই মুখ-শ্রী—ইহাঁর প্রশান্ত ভাব এখন কাহাকে না আকর্ষণ করিতেছে? হে পরমাত্মন্! আমারদের ধর্ম্মের গতি যেন এই মহাত্মার ন্যায় হয়!

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং"

অনন্তর শব-বাহকেরা শ্মশানে শব লইয়া চলিল। তাঁহার মধ্যম ও কনিষ্ঠ পুত্র এবং অন্যান্য সকলেই দুঃখ-শোকে অভিভূত হইয়া শবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। মৃত দেহ শ্মশানে উপনীত

হইল। পরে হরদেবের উক্ত পুত্র-দ্বয় ব্রাহ্ম-বিধানানুসারে অগ্নি স্থাপনা করিলেন। দাহক ও বাহকেরা ঘৃত চন্দনে সুবাসিত করিয়া চিতা প্রজ্বলিত করিয়া দিল। অগ্নি উগ্রভাবে শিখা-জাল বিস্তার করিয়া অবিলম্বে মৃত দেহ বিলুপ্ত করিল। দেহ পবিত্র পঞ্চভূতে বিলীন হইলে হরদেবের ঐ পুত্র-দ্বয় শ্রদ্ধান্বিত হইয়া পরলোকে পিতার আত্মার উন্নতির নিমিত্তে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন। এই রূপে ব্রাহ্ম-বিধানানুসারে অন্ত্যেষ্টি সমাহিত হইলে সকলেই স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন এবং হরদেবের পুত্রদ্বয়ও আপনারদের কুলাচারের অনুরূপ শোক-চিহ্ন ধারণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

হরদেব চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা পিত্রালয়ে এবং মধ্যমা ও কনিষ্ঠা ভর্ত্তৃ-গৃহে অবস্থান করিতেছেন। ইহাঁরা চতুর্থ দিবসে ব্রাহ্ম-বিধানানুসারে চতুর্থী করিয়াছেন। যাঁহারা ভর্ত্তৃ-গৃহে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহারা সেই দিবস বহু-সংখ্য নিরন্ন ও বস্ত্রহীন ব্যক্তিদিগকে অন্ন ও বস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন।

পরে একাদশ দিবসে ব্রাহ্ম-বিধানানুসারে হরদেব চট্টোপাধ্যায়ের শ্রাদ্ধ সমাহিত হইয়াছে। শ্রাদ্ধ কালে হরদেবের আত্মীয় স্বজন ও অন্যান্য ব্রাহ্ম অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী আচার্য্য-আসন গ্রহণ করিয়া এই পারত্রিক-সাধন শ্রাদ্ধ-কর্ম্ম অতি পবিত্র-ভাবে সুসম্পন্ন করেন। প্রথমে ব্রহ্মোপাসনা হয়। তৎপরে হরদেব চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যম ও কনিষ্ঠ পুত্র দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার পিতার সদ্গতির নিমিত্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন। শেষে ব্রহ্ম-সঙ্গীত হয়। এই রূপে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের ব্যবস্থানুসারে বিশুদ্ধ প্রণালীতে শ্রাদ্ধ-কর্ম্ম নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হইল।

(FROM THE NATIONAL PAPER.)

Our worthy writer on Christianity (II.) in common with the orthodox writers on the subject has deduced the necessity of a Revelation from the fact or rather the supposed fact of our fallen and corrupt nature. Indeed, there has scarcely been any system of religion in the world which, did not claim Divine revelation on the ground of such or similar presumption. The Koran, the Veds, the Zenda Vesta and Adi Grantha, the Institute of Menu and Laws of Lycurgus have one and all professed to be the works of God himself. The Bible, therefore is not unique in its pretensions as to its divine origin. The universality of the fact, in truth cannot be gainsaid. Man feels that he wants religious enlightenment, and has in all ages looked heavenward for guidance and support. There is a universal craving in humanity on the one hand, and a general belief of its satisfaction on the other; and this is the more confirmed by our observation of the arrangements made by Providence for the supply and gratification of our inferior wants and appetites. But though mankind have always stood in its need, and its influence upon and connection with the spiritual wellbeing of our race has been generally appreciated and discussed in polemical theology, few subjects have been more differently understood and frequently mis-understood than the nature, mode and scope of Revelation. We therefore make no apology in offering our remarks at some length upon this important subject.

The question which we have to solve in the threshold of our enquiry is what do we mean by Revelation. Revelation in its general sense, implies communication of knowledge, in its special sense, of religious knowledge by God to man. It evidently presupposes a mode or a process of intelligence as its condition. Now thereare only two modes of intelligence possible to man in the present state of things, the intuitional and the logical. Revelation, undoubtedly belongs to the former category; for the characteristics of Intuition are the same as those universally ascribed to Revelation. To the

possibility of Intuition it is necessary that truths be immediately presented to our consciousness, which are unattainable either by experience or reasoning, and which therefore must be referred to the Source of all things. Now this is exactly predicable of Revelation. Direct presentation of truths to our minds by the agency of God holds true as well of Intuition as of Revelation. Again the knowledge we derive from Intuitional consciousness is *material* and that which we obtain from the reflective, is formal. The province of the former is to furnish us with facts and materials, that of the latter is to define, classify and annalize them. The object of the former is to enlarge the horizon of our mental vision, to widen the circle of our knowledge, that of the latter is to ascertain that the relation between our ideas, to give clearness and distinctness to our conception. The former forms the basis upon which the vast superstructure of science is raised; the latter gives form to the whole and symetry to the parts. The former leads to unity; the latter to division. In short Logic never enables us to apprehend original truths as Intuition does. Logic, being then incompatible with any discovery of truth, clashes with our notion of Revelation whose primary object is as has been already said, the presentation to our consciousness of such facts or truths as cannot be obtained by our own ingenuity. Revelation and Intuition, therefore are one and the same thing. They are only two names signifying one identical thing.

If the reasonings employed above, be correct a book, in as much as it is an external thing and not a mode of our intuitive conciousness, and addressing itself as it does to our intellectual and critical faculties cannot with any propriety be called revelation, But though not itself a revelation we do not deny it may contain such truths as may have been revealed to the writer thereof and are calculated to awaken and elevate our religious consciousness. But if it is possible for a book to contain truths of this sort, there is no reason for crediting the Bible alone with being their sole repository. Indeed, the Koran of the Mahomedan, the Veds of the Hindoos, the Zenda Vesta of the Parsees all contain innumerable truths which chime in with the intuitive cognitions of our mind and must on that account be reckoned as having been revealed to the respective writers thereof. So that, look to the question in what light you may, consciousness must in the nature of the thing be acknowledged to be the ultimate standard by which the claims of Revelation should be tested. It must be held competent to judge of a professed revelation, to accept that portion of it which tallies with its dictates and reject that which jars with its voice. Any *authoritative* external revelation which presumes to transcend its verdict is, therefore, impossible nay inconceivable. To say that our mental faculties are mendacious and untrustworthy, that our nature is corrupt and debased is suicidal to the doctrine of Revelation. For in that case the proof, the arguments and the appeals in support of the doctrine must needs be rejected as proposed to a mind that is false, and a nature that is corrupt. In connection with the subject of the infallibility of the Bible, of which so much has been said by Christian writers, it may be here, briefly mentioned that, suppossing the truth of the alleged fact were proved to our satisfaction, which, however, is far from being the case, it is of no avail so far as the attainment of religious certitude is concerned. Of what earthly use, we ask in the name of common sense, would then an infallible book be, when the mind by which it is to be interpreted and understood is after all fallible. Man as man must always be subject to error and mistake, whatever book he may chose for his religious guidance. History abundantly testifies to the truth of this statement. The numberless sects into which the whole of Christiandom has been pulverized are an abiding proof of the truth of our assertion.

We have not space enough to enlarge upon the topic of the authenticity and credibility of the writings of the Bible. We will dismiss the subject for the present with a few remarks of the impractibility of converting History into Religion. Religion, there is no doubt, is in history, and in what science it is not, but history is not religion. As the records of the past History no doubt relates the most important and public events with tolerable certainty, but as to the minute details a large margin should be left aside for mere probabilities. It is said of the celebrated Sir. Walter Releigh (when he was writing the History of the World) that he "heard the

noise of a violent contention under his window, whence he could neither see nor hear distinctly. Of one person after another as each entered his appartment he made enquiries concerning the disturbance but so inconsistent were the several accounts, that he was unable to trace the truth. What said he can I not make myself master of an incident that happened an hour ago under my own window and shall I imagine I can truely understand the history of Hannibal and Cæsar." Moreover the faculties concerned in the pursuit of historical knowledge are the intellectual and the critical. To study, to collate and sift texts and passages, these are the business of an historian. Were History therefore religion, the intellect would be the all and end all of our existence and the soul left uncultivated and uncared for. The scholar and the Logician would then enjoy all the fruits of religion and not the lowly and the faithful in heart. But such a monstrous conclusion no one in his wits would, we think, be prepared to admit. Our idea of religion is, that common as the air, it blesses as well the learned as the ignorant—it blesses as well the hut of the poor as the palace of the rich. But the above conclusion, however absurd, one would naturally come to if History were converted into Religion.

Again does the assumption that History is religion simplify any of the problems of riligion ; does it enable us to found religion on a sure and certain bassis ; does it remove difficulties from the path of our Religious enquiry —far from it. In the historical sense of religion (if there is any logic at all in the words historical religion) one could hardly be said to possess a grain of religion in his composition unless he had previously solved the army of difficulties—difficulties as to the authenticity and credibility, the age and authorship of the Books—difficulties as to the miracles and prophecies—difficulties as to the scientific accuracy of the narratives—difficulties as to the theology deducible from them and many others which one in a thousand can hardly be expected to master.

From these reasons it is clear that History can never be the source of religious knowledge. Let us therefore get quite of the false position at once for ever, and trust in the still small voice within, the perennial Revelation of God in the deep recesses of our hearts. Such a revelation is Common and Catholic as human nature itself. It is limited neither to time, nor place nor cread nor color. Wherever the sprit of man holds communion with hte spirit of God and gets hold of some truths it knows not how, there it is. It comes to our mind not supernaturally but in accordance to the laws of Spirit.

বিজ্ঞাপন

আগামী ৫ কার্ত্তিক রবিবার প্রাতঃকালে ৭৷৷০ সাড়ে সাত ঘণ্টার সময়ে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের প্রণীত ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকার প্রথম খণ্ড—ধর্ম্মতত্ত্ববিবেক সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা পূর্ব্বে স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া তাঁহারদিগের স্বাক্ষরিত ১৷৷০ ডেড় টাকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিবেন, এবং সেই সঙ্গে তাঁহাদের বর্ত্তমান ঠিকানাও লিখিয়া দিবেন। তাহা হইলে তাঁহাদিগের নিকটে আপাততঃ এই প্রথম খণ্ড এবং আর কিছু দিন পরে ইহার দ্বিতীয় খণ্ড প্রেরিত হইবে। যাঁহারা স্বাক্ষর করেন নাই, তাঁহারা ১ এক টাকা পাঠাইলে ঐ প্রথম খণ্ড প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীঈশানচন্দ্র বসু।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাসুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২৩। কলিগতাব্দ ৪৯৩৭। ২১ আশ্বিন শনি বার।

একমেবাদ্বিতীয়ং

ষষ্ঠ কল্প
চতুর্থ ভাগ
কার্ত্তিক ১৭৮৮ শক

২৭৯ সংখ্যা ৩৭ ব্রাহ্মসম্বৎ

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদসংহিতা।

প্রথমমণ্ডলস্য ত্রয়োদশানুবাকে একাদশং সূক্তং।

গোতমঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ ইন্দ্রোদেবতা।

৮৯০

৬। নকিষ্ট্বদ্রথীতরো হরী যদিন্দ্র যচ্ছসে। নকিষ্ট্বানু মজ্মনা নকিঃ স্বশ্ব আনশে।

৬। হে 'ইন্দ্র' 'যৎ' যস্মাৎ ত্বং 'হরী' এতৎ সংজ্ঞৌ অশ্বৌ 'যচ্ছসে' রথে যোজয়সি তস্মাৎ তত্তোঽন্যঃ কশ্চিৎ 'রথীতরঃ' অতিশয়েন রথবান্ 'নকিঃ' নাস্তি। অন্যেষাং ঈদৃক্ অশ্বযুক্তরথাভাবাৎ। 'ত্বা' ত্বাং অনুলক্ষ্য 'মজ্মনা' বলনামতৎ। বলেন সদৃশোঽপি 'নকিঃ' নহি অস্তি। 'স্বশ্বঃ' শোভনাশ্বোঽন্যশ্চ ত্বাং 'নকিঃ আনশে' ন প্রাপ। ইন্দ্রস্য বলাশ্বযোঃ অসাধারণত্বাৎ ইন্দ্রসদৃশোবলবান্ অশ্ববান্ লোকে কশ্চিদপি নাস্তীত্যর্থঃ।

৬। হে ইন্দ্র! তুমি হরি নামক দুই অশ্বকে রথে যোজিত করিয়া থাক, এই হেতু তোমা অপেক্ষা আর কেহ রথী নাই এবং তোমা অপেক্ষা কেহ বলবানও নাই। যাহাদিগের উৎকৃষ্ট অশ্ব আছে, তাহারদের অশ্ব তোমার অশ্বের তুল্য নহে।

৮৯১

উষ্ণিক্ছন্দঃ

৭। যএক ইদ্বিদয়তে বসু মর্ত্তায় দাশুষে। ঈশানো অপ্রতিষ্কুত ইন্দ্রো অঙ্গ।

৭। 'যঃ' ইন্দ্রঃ 'এক ইৎ' একএব 'দাশুষে' হবির্দ্দত্তবতে 'মর্ত্তায়' মনুষ্যায় যজমানায় 'বসু' ধনং 'বিদয়তে' বিশেষেণ দদাতি। অঙ্গেতি ক্ষিপ্রনাম। 'অপ্রতিষ্কুতঃ' পটৈরঃ অপ্রতিশব্দিতঃ প্রতিকূলশব্দরহিতইত্যর্থঃ। এবম্ভূতঃ সঃ 'ইন্দ্রঃ' ক্ষিপ্রং 'ঈশানঃ' সর্ব্বস্য জগতঃ স্বামী ভবতি।

৭। যিনি একাকীই যজ্ঞশীল ব্যক্তিকে অবিলম্বে ধন দান করিয়াথাকেন,সেই অদ্বিতীয় ইন্দ্র সমস্ত জগতেরই অধিপতি।

৮৯২

৮। কদা মর্তমরাধসং পদা ক্ষুম্পমিব স্ফুরৎ। কদা নঃ শুশ্রবদ্গির ইন্দ্রো অঙ্গ।

৮। 'অরাধসং' হবির্লক্ষণেন রাধসা ধনেন রহিতং অযষ্টারং ইত্যর্থঃ। এবম্বিধং 'মর্তং' মনুষ্যং ইন্দ্রঃ 'পদা' পাদেন 'ক্ষুম্পংইব' অহিচ্ছত্রকমিব 'কদা' 'স্ফুরৎ' স্ফুরিষ্যতি বাধিষ্যতি। যথাহি ছিদ্রত্রং মণ্ডলাকারেণ শয়ানং কশ্চিৎ অনায়াসেন হন্তি এবং ইন্দ্রোঽপি কদাস্মৎশত্রূন হনিষ্যতীত্যর্থঃ। স্ফুরৎ। স্ফুর্তির্গত্যর্থকর্ম্মা স্ফুরতি স্ফুলতীতি বধকর্ম্মসু পঠিতত্বাৎ। 'নঃ' অস্মাৎ যষ্টৃণাং

'গিরঃ' স্তুতিলক্ষণা বাচঃ 'ইন্দ্রঃ' 'কদা' কস্মিন কালে 'অঙ্গ' ক্ষিপ্রং 'শ্রুধ্যৎ' শ্রোষ্যতি ইতি বিতর্কতে। কদা মর্ত্ত অনারাধয়ন্ত পাদেন ক্ষুপ্প মিব অবস্ফুরিষ্যতি কদা নঃ শ্রোষ্যতি গিরঃ ইন্দ্রোঽঙ্গ।

৮। যাহারা যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে না এই রূপ ব্যক্তিকে অহিচ্ছত্রের ন্যায় ইন্দ্র পদাঘাতে কবে বিনাশ করিবেন এবং কবেই বা আমারদিগের স্তুতি বাক্য শ্রবণ করিবেন।

৮৯৩

৯। যশ্চিচ্ছক্ষি ত্বা বহুভ্য আ সুতাবাঁ আবিবাসতি। উগ্রং তৎপত্যতে শব ইন্দ্রো অঙ্গ।

৯। 'বহুভ্যঃ' মনুষ্যেভ্যঃ সকাশাৎ 'যঃ' 'চিৎ' 'হি' যএব খলু যজমানঃ 'সুতাবান' অভিষুতসোমযুক্তঃ সন্ ত্বে ইন্দ্র 'ত্বা' ত্বাং 'আবিবাসতি' পরিচরতি। বিবাসতিঃ পরিচরণকর্ম্মা। 'তৎ' তস্মৈ যজমানায যৎ 'উগ্রং' উদ্গূর্ণং 'শবঃ' বলং 'ইন্দ্রঃ' 'অঙ্গ' ক্ষিপ্রং 'পত্যতে' পাতযতি প্রাপযতি।

৯। বহু মনুষ্যের মধ্যে যে ব্যক্তি সোম রস দ্বারা ইন্দ্রের পরিচর্য্যা করে, ইন্দ্র সেই ব্যক্তিকে অবিলম্বে প্রভুত বল প্রদান করিয়াথাকেন।

৮৯৪

পংক্তিচ্ছন্দঃ

১০। স্বাদোরিত্থা বিষূবতো মধ্বঃ পিবন্তি গৌর্য্যঃ। যা ইন্দ্রেণ সযাবরী বৃষ্ণা মদন্তি শোভসে বস্বীরনু স্বরাজ্যং॥ ১। ৬। ৬।

১০। 'স্বাদোঃ' স্বাদুভূতস্য রসযুক্তস্য 'ইত্থা' 'বিষূবতঃ' ইত্থং অনেন প্রকারেণ সর্ব্বযজ্ঞেষু ব্যাপ্তিযুক্তস্য 'মধ্বঃ' মধুররসস্য সোমস্য। এবম্বিধং সোমং 'গৌর্য্যঃ' গৌরবর্ণা গাবঃ 'পিবন্তি'। 'যা' গাবঃ 'শোভসে শোভার্থং 'বৃষ্ণা' কামাভিবর্ষকেণ ইন্দ্রেণ 'সযাবরী' সহ যান্ত্যঃ গচ্ছন্ত্যঃ সত্যঃ 'মদন্তি' হৃষ্টাভবন্তি। তা ইন্দ্রপীতস্য সোমস্য শেষং পিবন্ত্যত্যর্থঃ। 'বস্বীঃ' গবঃপ্রদানেন নিবাসকারিণ্যস্তা গাবঃ 'স্বরাজ্যং' স্বস্য স্বকীয়স্য ইন্দ্রস্য যৎ রাজ্যং রাজত্বং তদনুলক্ষ্যাবস্থিতা ইতি শেষঃ। ২। ৩। ৩।

১০। যাহারা শোভার্থ অভিলষিত ফলপ্রদ ইন্দ্রের অনুসরণ করিয়া আনন্দিত হয়, সেই সমস্ত গৌরবর্ণ ধেনু সুস্বাদু সুমধুর সর্ব্বযজ্ঞোপযোগী সোমরস পান করিয়া থাকে এবং যাহারা দুগ্ধ প্রদান পূর্ব্বক অন্যের আশ্রয়ে বাস করিয়া থাকে, সেই সমস্ত ধেনু ইন্দ্রের রাজত্ব লক্ষ্য করিয়া অবস্থান করে। ১। ৬। ৩।

শরচ্চন্দ্রালোকে ব্রহ্মোপাসনা।

বাহিরে শারদীয় পূর্ণ চন্দ্রের উদয়; ভিতরে সেই প্রেম পূর্ণচন্দ্রের উদয়। সেই প্রেম-পূর্ণ চন্দ্রকে দর্শন করিলে রোগ, শোক, বিষাদ কোথায় পলায়ন করে। সেই ব্যক্তি যথার্থ শূর, যিনি সাংসারিক বিপদকে অতিক্রম করিয়া সেই শুধাংশুর জ্যোতিতে সর্ব্বদা সঞ্চরণ করেন। বাহিরে পূর্ণ চন্দ্র ইতি পূর্ব্বেই রাহু-গ্রস্ত হইয়া মলিন হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার গ্রাস হইতে বিমুক্ত হইয়া নবজ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান হইয়াছে। সেই রূপ আমাদের আত্মা কখন কখন পাপ-রাহু-গ্রস্ত হইয়া মলিন হয়, পুনর্ব্বার ঈশ্বর-প্রসাদে সেই পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া তাঁহার জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান হয়। সাবধান, যেন পাপ-রাহু দ্বারা আমাদের আত্মা আক্রান্ত না হয়। সংসারের সুখ দুঃখ চক্রবৎ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। সুখ দুঃখ আমাদের অধীন নহে; কিন্তু আমাদিগের আত্মা আমাদিগের অধীন। আমাদের আত্মাকে হয় আমরা পবিত্র রাখিতে পারি, কিম্বা পাপ-পঙ্কে কলঙ্কিত করিতে পারি। চন্দ্র যেমন সূর্য্যের জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান থাকে, সেই রূপ আমাদিগের আত্মা সেই পরমাত্মার আলোকে উজ্জ্বল হয়, নতুবা ঘোর অন্ধকারে

আচ্ছন্ন থাকে। যতক্ষণ পাপরূপ রাহু সেই আলোকের বিচ্ছেদ সাধন করে, ততক্ষণ আমাদের আত্মা নিষ্প্রভ থাকে। পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইলেই ঈশ্বরের আলোক পাইয়া আমরা কৃতার্থ হই। আমরা যেন সর্ব্বদা এই চেষ্টা করি যে যেমন মনুষ্য এই শারদীয় পূর্ণচন্দ্রের জ্যোতিতে উপবিষ্ট হইয়া আনন্দ লাভ করে, সেই রূপ আমরা সেই আধ্যাত্মিক প্রেম-শশির কিরণে সর্ব্বদা সঞ্চরণ করিয়া তদপেক্ষা অসংখ্যগুণে শ্রেষ্ঠতর আনন্দ উপভোগ করি।

থিওডোর পার্কর।

২৭৭ সংখ্যক পত্রিকার ১১৭ পৃষ্ঠার পর।

মানব জাতির অন্তরে যে ধর্ম্ম-ভাব নিহিত আছে, তাহার বৈধ কার্য্যই ঈশ্বরানুরাগ উৎপন্ন করিয়া দেয়। এক সময়ে এই অনুরাগ প্রদীপ্ত হইয়া ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, আশা ও প্রীতি উৎপাদন করিতে পারে; এই রূপ কার্য্যই ইহার প্রাকৃতিক। আর এক সময়ে এই অনুরাগ নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া ঈশ্বরের প্রতি সন্দেহ, ভয় ও ঘৃণার উদ্রেক করিয়া দিয়া থাকে; এই রূপ কার্য্য ইহার অপ্রাকৃতিক। এই রূপে যখন ইহা মনুষ্যের জ্ঞান ও পবিত্রতা বা অজ্ঞান ও অপবিত্রতার সহিত অবস্থান করে, তখন ইহার উন্নতি বা অবনতি উপস্থিত হয়। যাহাই হউক, যদি সূক্ষ্ম রূপে বিবেচনা করা যায়, তাহা হইলে ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ বিশ্বাস ও প্রীতি মনুষ্যের অন্তর্নিহিত ধর্ম্মভাবের বৈধ ও প্রাকৃতিক কার্য্য হইতে যে উৎপন্ন হইতেছে, তাহাতে আর কোন সংশয় থাকে না। যেমন দেশ ও কাল একই প্রকার, সেই রূপ ধর্ম্মেরও প্রকারান্তর নাই। প্রীতি বা ঘৃণা, জ্ঞান বা অজ্ঞানতা, ইহার অন্যতর পক্ষের সহিত সংযুক্ত হইলেই উহা সবল বা দুর্ব্বল হইয়া থাকে। যেমন প্রীতি পদার্থ স্বয়ং অবিকৃত; কিন্তু প্রয়োক্তা ও প্রয়োজ্যের স্বভাবানুসারে উহার বাহ্য বিকার লক্ষিত হয়, সেই রূপ মনুষ্যের স্বভাবানুসারে ধর্ম্মও বাহ্যে রূপান্তরিত হইয়া থাকে। সুতরাং ধর্ম্ম যখন একই পদার্থ হইল, তখন প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম্ম ও প্রাকৃতিক ধর্ম্মের শব্দগত বৈ বস্তুগত কোন বৈষম লক্ষিত হইতেছে না। প্রাকৃতিক ধর্ম্মকে অবশ্যই প্রত্যাদেশ-লব্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, নতুবা সে ধর্ম্ম কদাচ অনুভব করা যাইতে পারা যায় না এবং প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম্ম অবশ্যই প্রাকৃতিক, নতুবা তাহা কোন ব্যবহারেই আসিতে পারে না। যা কিছু মনুষ্যের ব্যবহারে আইসে, তাহা তাহার জ্ঞানের অণুমাত্র বহির্ভূত নয়। আমরা এই একমাত্র ধর্ম্মকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিতে দর্শন ও আমাদিগের একতর পক্ষপাতী সংক্ষিপ্ত অনুভবকেই অনুরূপ এক একটি নাম দ্বারা নির্দ্দেশ করি এবং এই জন্যই এই প্রাকৃতিক প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম্মকে অদ্বৈতবাদ-নিষ্ঠ, দ্বৈতবাদাত্মক, পৌত্তলিক, ইহুদীয়, খৃষ্টীয় ও মুসলমান ধর্ম্ম বলিয়া থাকি; কিন্তু নাম দ্বারা যে স্বতন্ত্রতা নির্দ্দেশ করা হইতেছে, তাহা চিন্তার বিষয়ীভূত ধর্ম্মের নয়, যিনি চিন্তা করিতেছেন উহা তাঁহার মনেরই। ইতিহাসে ধর্ম্মের বাহ্য আকার নানা প্রকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে কিন্তু তন্মধ্যে কোন কোন ধর্ম্ম বিশুদ্ধ ও সুন্দর এবং কতগুলি বিজাতীয় ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া ভক্তি ভাবকে এক কালে কলুষিত করিয়া দিতেছে।

সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন প্রকৃত ধর্ম্ম কাহাকে বলে? এই প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করিতে হইলে ইতিহাসে ধর্ম্মের যে বিবিধ আকার দৃষ্ট

হয়, তৎসমুদায়ের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রশ্মি-জাল একটি বিন্দু মধ্যে সংগ্রহ করিয়া তাহার নাম সর্ব্বাঙ্গপুষ্ট প্রকৃত ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি না; কারণ আমরা বহু সংখ্য অসম্পূর্ণ অঙ্গহীন দৃশ্য হইতে একটি পূর্ণাবয়ব সঙ্কলন করিতে কিছুতেই সমর্থ নহি। কিন্তু দেখিতেছি যখন আমরা এই রূপ অনুসন্ধান দ্বারা বিবিধ প্রকার ধর্ম্ম হইতে প্রকৃত সত্য পূর্ণ ধর্ম্ম সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হই, তখন আমরা অগ্রেই আমারদিগের অন্তরে এই সমস্ত ধর্ম্ম বিচার করিয়া লইবার যে একটি প্রকৃত সত্য-ভাব আছে, যাহা নিকষোপলের ন্যায় সমস্ত পরীক্ষা করিয়া লয়, তাহারই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকি। নিকষোপলের ন্যায় এই প্রকৃত সত্য-ভাব না থাকিলে আমরা কিছুতেই ঐরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিতাম না। সুতরাং প্রকৃত পূর্ণ ধর্ম্ম আমাদের অভ্যন্তরেই রহিয়াছে। বাহ্যে তাহা সঙ্কলন করিবার প্রয়াস বিড়ম্বনা মাত্র। আমরা সেই অন্তর্নিহিত সত্য-ভাব হইতেই অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়া তাহাতেই শেষ করিয়া থাকি। পূর্ণ ধর্ম্ম যে আমাদের অন্তরেই রহিয়াছে, ইহা সপ্রমাণ করিতে হইলে আমাদিগের ধর্ম্মজ্ঞানের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলেই পর্য্যাপ্ত হইতে পারে। আমরা দেখিতে পাই যে ঐশিক নিয়মের অধীনতাই ধর্ম্ম। ঈশ্বর আমাদিগের প্রকৃতিতে যে সমস্ত নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন, সহজ জ্ঞান, জ্ঞান, বিবেক ও ধর্ম্মভাবে যাহা প্রত্যাদেশ করিয়াছেন, কায়মনে তৎসমুদায়ের অধীনতা স্বীকারই ধর্ম্ম। আমরা এই অধীনতা প্রভাবেই ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ অনুরাগ, বিশ্বাস ও প্রীতির পাত্র বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকি। যে অল্পবয়স্ক বালক কর্ত্তব্য ও ইচ্ছাকে একই পদার্থ বলিয়া বিবেচনা করে এবং এই উভয়ের বিরুদ্ধভাব অনুধাবন করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ, এই অধীনতা তাহার অপরিজ্ঞাত থাকে। কিন্তু যিনি ইচ্ছা মাত্রকেই কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করেন না এবং ঈশ্বরের প্রকৃত নিয়ম অনুসন্ধানে যত্ন করিয়া থাকেন, তাঁহার নিকট এই অধীনতা সম্পূর্ণ অনুভূত হয় সন্দেহ নাই।

মনুষ্যের ধর্ম্মসংক্রান্ত দুই প্রকার ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একটি চিন্তার ভাব; ইহার প্রভাবেই মনুষ্য ধর্ম্ম, ঈশ্বর, ধর্ম্মপ্রকৃতি এবং ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ এই কএকটি বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। এই ভাবের ফল ধর্ম্মশাস্ত্র; এই ধর্ম্মশাস্ত্রকে ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে না, ইহাতে কেবল ধর্ম্ম বিষয়ে মনুষ্যের ভাব আছে, ইহাকে স্বর্গীয় পদার্থের বিজ্ঞান বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। মনুষ্যের মনই ইহার ক্ষেত্র। জ্যোতিষ ও গ্রহ নক্ষত্রাদি যেমন পরস্পর স্বতন্ত্র, সেই রূপ ধর্ম্ম ও ধর্ম্মশাস্ত্র উভয়ই পৃথক পদার্থ। ধর্ম্ম নিত্যকাল একই প্রকার থাকিবে কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্র সময়ে সময়ে পরিবর্ত্ত হইয়াথাকে। ধর্ম্মের সহিত অনেক গুলি মতের বিলক্ষণ সংশ্রব আছে বটে কিন্তু ধর্ম্ম কদাচই তৎ সমুদায়ের উপর নির্ভর করে না।

দ্বিতীয়টি কার্য্যের ভাব; মনুষ্য ইহার প্রভাবে ধর্ম্মের বশম্বদ হইয়া বিবিধ কার্য্যানুষ্ঠানে নিযুক্ত হইয়া থাকে। এই ভাবের ফল নীতি। এই নীতি স্বয়ং ধর্ম্ম নহে কিন্তু ইহা ধর্ম্মের জীবন। কেহ কেহ এই রূপ আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন যে নীতির সহিত ধর্ম্মের কোন সংশ্রবই নাই। মনুষ্যের অন্তরে নীতি ও ধর্ম্মের বীজ যে স্বতন্ত্র আছে, ব্যবচ্ছেদ দ্বারা তাহা

সুস্পষ্টই প্রতিপাদন করা হইয়াছে। নীতি ঐশিক নিয়মের সহিত মানবীয় কার্য্যের একটি সংযোগ বিধান করিয়া দিতেছে। ইহা ধর্ম্মের একটি চিহ্ন। যেমন জ্ঞান প্রীতিকে প্রকাশ করিয়া দেয়, সেই রূপ প্রকৃত নীতি ধর্ম্মকে সুস্পষ্ট অভিব্যক্ত করিয়াথাকে। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও প্রীতি ধর্ম্মের প্রাণ এবং নীতি ও স্বজাতির প্রতি প্রীতি ইহার আকার। সুতরাং নীতি ও ধর্ম্ম পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে। কোন কোন অভিজ্ঞ লোক এরূপও কহিতে পারেন যে বিচার-চতুর মহাত্মারা ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ও ভক্তির ভাব অনুভব না করিয়াই নিঃস্বার্থ ও বিষদ ভাবে কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারেন। মনুষ্য ধর্ম্মশীল না হইয়াই অনেকাংশে নীতি-পরায়ণ হইতে পারেন বটে কিন্তু নীতি-নিরত না হইলে কদাচ ধার্ম্মিক বলিয়াই পরিগণিত হইতে পারেন না। যে মহাত্মার গুণে সকলকে মোহিত হইতে হয়, প্রাণ ও দেহের ন্যায় ধর্ম্ম ও নীতি তাঁহার নিকট কার্য্যকালে কদাচই বিচ্ছিন্ন থাকে না। যিনি কেবল নীতি-পরায়ণ, তিনি আপনার প্রকৃতিতে অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত কর্ত্তব্যের নিয়মকে যথোচিত সমাদর করেন কিন্তু ঐ নিয়মকে আদর করিয়াও নিয়ন্তার প্রতি কিছু মাত্র আস্থা প্রদর্শন করেন না। কিন্তু ধর্ম্মশীল মনুষ্য ঈশ্বরের সাক্ষাৎ ইচ্ছা বলিয়া ঐ নিয়মকে আদরের সহিত প্রতিপালন করিয়া থাকেন। এক জন কেবল নিয়ম লইয়াই আর এক জন কেবল নিয়ন্তাকে লইয়াই যার পর নাই আরাম প্রাপ্ত হন।

একটি ধর্ম্ম সকল মনুষ্যেই বিদ্যমান রহিয়াছে। এক ব্যক্তির যেরূপ ধর্ম্ম অন্য ব্যক্তির তাহারই অনুরূপ আর একটি আছে এপ্রকার নয়, কিন্তু একের যাহা আছে অন্যের তাহাই বিদ্যমান রহিয়াছে। ধর্ম্মের এক বা বহু সংখ্য উপাস্য বস্তুতে নিয়োগ এবং জাতি ও ব্যক্তিগত উহার তারতম্য এই উভয় দ্বারাই উহার ভেদ লক্ষিত হয় বস্তুত উহার স্বরূপ-গত কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই। ধর্ম্মের জাতি ও ব্যক্তি-গত তারতম্য এবং এক বা বহু সংখ্য উপাস্য বস্তুতে নিয়োগ ইহাও আবার বাহ্য অবস্থা প্রভাবেই উদ্ভূত হইয়া থাকে। যখন মনুষ্যের সামাজিক অবস্থা বিভিন্ন, তখন তাহাদিগের ধর্ম্ম যে উপাস্য পদার্থের স্বরূপ ও সংখ্যানুসারে বিভিন্ন আকার, বিভিন্ন মত, ঐ সকল উপাস্য পদার্থের উপাসনা ও তৃপ্তি সম্পাদনার্থ নানা প্রকার অধিকার, প্রণালী ও বিধি সহকৃত হইবে এবং মনুষ্যের জীবন ও চরিত্রের ফলগত বৈষম্য সম্পাদন করিবে, তাহার আর বৈচিত্র্য কি। সকল মনুষ্যের প্রকৃতি এক রূপ হইলেও যেমন দুইটি জাতি ও দুইটি কাল উহাদের চরিত্র, অবস্থা ও উন্নতি সমান রূপ অধিকার করিতে পারে না, সেই রূপ ধর্ম্মের উপাদান যদিও সাধারণের এক রূপ, তথাচ দুই জাতি ও দুই কালে ইহার কার্য্য কদাচ তুল্য রূপ দৃষ্টিগোচর হইবে না। আমরা স্থির চিত্তে অনুধ্যান করিলে দেখিতে পাই যে, দুইটি মনুষ্য চরিত্র, অবস্থা ও উন্নতি বিষয়ে কদাচই সমান নহে, সুতরাং ঐ দুই ব্যক্তি যদি এক দেবতার সন্নিধানে বাষ্পাকুল-লোচনে ভক্তি-ভাবে প্রণত হয় এবং উহারা যদি ধর্ম্মের একই প্রকার মত স্বীকার করে, তথাচ উহারা ধর্ম্মকে এক আকারে কদাচই প্রদর্শন করিতে পারিবে না। এক্ষণে মনুষ্যের মধ্যে পরস্পর এই রূপ বিভিন্নতা দেখিয়া সহজেই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে যাহারা

ঈশ্বরের বিষয়ে চিন্তা করে এবং আপনাদিগের কার্য্যে ভাব ও চিন্তার সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকে, এই রূপ যতগুলি স্ত্রী ও পুরুষ আছে, তাহাদিগের প্রত্যেকেরই বিভিন্ন প্রকার ঈশ্বরের ভাব ও বিভিন্ন প্রকার ধর্ম্মের আকার থাকিবে। যদিও এক ধর্ম্ম প্রত্যেক মনুষ্যে নিরবচ্ছিন্নই আছে, তথাচ ধর্ম্মের মত, ধর্ম্মের আকার, উপাসনা প্রণালী এবং ধর্ম্মের কার্য্য যাহাকে নীতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, তৎসমুদায়, যে দুই ব্যক্তি এক জননীর গর্ভসম্ভূত ও একই প্রকারে সুশিক্ষিত হইয়াছে, সেই দুই ব্যক্তিতেও কদাচই সমান হইবে না। আমরা ঈশ্বরের ভাব যে রূপে গ্রহণ করি এবং ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ ও এই সম্বন্ধ হইতে যে কর্ত্তব্য উপলব্ধি করি এই সমস্ত আমাদিগের চিন্তা, ভাব ও জীবনের অভিব্যঞ্জক। ব্যক্তি জাতি ও কালের যে উন্নতির সমষ্টি, ঐ সমস্তই তাহার পরিমাণ করিয়া দেয়। সুতরাং এক্ষণে ইহাই নির্ণীত হইল যে বিজ্ঞান ও শিল্পের ন্যায় ধর্ম্মের বাহ্য দৃশ্যও প্রত্যেক দেশে ও প্রত্যেক কালে মনুষ্যের অবস্থানুসারে বিভিন্ন প্রকার হয়। নবজিলণ্ডে প্রথম শতাব্দীতে উহা এক রূপ এবং আমেরিকায় ঊনষষ্টি শতাব্দীতে অবশ্যই অন্য রূপ হইবে। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের নিকট উহা এক প্রকার ও অনক্ষর মূর্খের নিকট অন্য প্রকার হইবে। অধিক কি এক ব্যক্তিতেই জ্ঞান, সদ্ভাব ও স্বভাবানুসারে উহা বিভিন্ন প্রকার রূপ ধারণ করিবে। একটি বালকের ধর্ম্ম ও একটি বৃদ্ধের ধর্ম্ম পরস্পর কেমন অনৈক্য বোধ হয়! একটি বালকের প্রার্থনা একটি যুবক বা বৃদ্ধকে কদাচই বিচলিত করিতে পারে না।

আত্মোৎকর্ষ বিধান।

২৭৫ সংখ্যক পত্রিকার ৬৮ পৃষ্ঠার পর।

একটি আবশ্যক প্রস্তাব অবশিষ্ট আছে। আত্ম সমুন্নতির পরম উপায় ব্রাহ্মধর্ম্ম এখনো অস্পৃষ্ট রহিয়াছে। পূর্ব্বোল্লিখিত সমুদায় উপায়ই এই মহান্ উপায়ের আশ্রিত। ইহাকে পরিত্যাগ করিলে সকলই অসার হইয়া পড়ে। এরূপ আখ্যানে অনেকে এই প্রকার আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন, যে "পূর্ব্বে আত্মোৎকর্ষ বিধানের দৃঢ় সংকল্পকে উহার সর্ব্ব প্রধান উপায় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া এক্ষণে ব্রাহ্মধর্ম্মকে সমুদায় উপায়ের আশ্রয় বলা কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে?" তাঁহাদের এ আপত্তি আপাতত স্থান পায় বটে, কিন্তু কিঞ্চিৎ প্রণিধান করিয়া দেখিলেই ইহার মীমাংসা হয়। আত্ম সমুন্নতির ঐকান্তিক অভিলাষই যে উহার মুখ্য উপায় তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মই যে উক্ত রূপ অভিলাষের অন্তরঙ্গ সাধন, তাহাতেও কোন সন্দেহ হইতে পারে না। যিনি আত্মাকে সমুন্নত করিতে একান্ত উৎসুক হইয়াছেন, তিনি অবশ্যই ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রিত হইয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম যাবতীয় সাধু ভাবের নিয়ামক। ব্রাহ্মধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া কোন সাধু সংকল্পই এক পদ মাত্র অগ্রসর হইতে পারে না। যেমন শরীরের উত্তমাঙ্গ না থাকিলে অপর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমস্ত সম্পূর্ণ সৌষ্ঠব ও লাবণ্য সমন্বিত হইলেও কোন কার্য্যকর হয় না, অথবা যেমন মাধ্যাকর্ষণ না থাকিলে অপরাপর প্রাকৃতিক নিয়ম সকলের কোন ফলবত্তা থাকেনা, সেই রূপ ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আস্থা না থাকিলে আত্মোৎকর্ষ বিধানের কোন উপায়ই সমীহিত সিদ্ধি লাভের উপযোগী হইতে পারে না। ব্রাহ্মধর্ম্ম মানব-হৃদয়-

গত সমুন্নত সদ্ভাব-চক্রের নাভি স্বরূপ; নাভির অসদ্ভাবে কিপ্রকারে চক্রের গতি নিষ্পাদিত হইবে?

ধর্ম্মের ভাব যে মনুষ্যের প্রকৃতি সিদ্ধ, তাহা পূর্ব্বে সামান্যাকারে স্বীকার করিয়া লইলেও এস্থলে বিশেষ রূপে তাহার নিরূপণ করা অসঙ্গত হইবেনা।

মনুষ্যের বুদ্ধি দ্বারা এপর্য্যন্ত যে সমস্ত বিষয় নিরূপিত হইয়াছে, তৎসমুদয় যদি প্রগাঢ় ও সংশয়-শূন্য বলিয়া প্রতীত হয়, তবে মানব-প্রকৃতির যে একটি ধর্ম্ম-তত্ত্ব আছে, ইহাতেও আর কোন সংশয় থাকে না। একমাত্র মনুষ্যের প্রকৃতি ভিন্ন তাদৃশ ধর্ম্ম-তত্ত্বের আর কুত্রাপি সংস্রব নাই। তাহা ভূমণ্ডলের পশ্চিম খণ্ডের কি পূর্ব্বভাগের, নবীন কি প্রাচীন জগতের অথবা এই সমগ্র জগতেরও বিশেষ ধর্ম্ম নহে। সমস্ত বিশ্বের সহিতই তাহার সম্বন্ধ আছে। রোম, জেরুসালম, মক্কা প্রভৃতি কোন পার্থিব রাজধানীর অধিকার নিমিত্ত তাদৃশ ধর্ম্ম-তত্ত্বের আবির্ভাব হয় নাই। বেদ, কোরাণ কি বাইবেল কোন প্রকার পুস্তক মধ্যেও তাহা আবদ্ধ নাই। সে ধর্ম্ম কোন শুভ্র বা কৃষ্ণ বর্ণ জাতিরও নিজস্ব নহে, তাহা ইউরোপ কি ভারতবর্ষ—গ্রীস্ কিম্বা পারস্য—পালেস্টিন্ অথবা মিসর রাজ্যের ধর্ম্ম নহে। মুসা যখন মিসরের, লূথর ইউরোপের এবং রামমোহন রায় ভারত বর্ষের ধর্ম্ম-প্রণালী সংশোধিত করিয়াছিলেন, তাহার পূর্ব্বেও ঐ উল্লিখিত ধর্ম্ম-তত্ত্ব বিদ্যমান ছিল। তাহা তীর্থাদি কোন স্থান মাহাত্ম্যেরও অধীন হইতে পারে না এবং মনুষ্যের অবস্থা ভেদেও তাহার আবির্ভাব বা তিরোভাব হয় না। মনুষ্য সভ্যতার পরাকাষ্ঠাতেই অধিরোহণ করুক, অথবা আদিম অসভ্যাবস্থাতেই আবদ্ধ থাকুক, তাহার প্রকৃতি-সিদ্ধ ধর্ম্ম-তত্ত্ব আর কস্মিন কালেও অন্যথা হইবার নহে, তাহা চিরকালই সমভাবে বিরাজ করিতে থাকে। যে কাল পর্য্যন্ত মানব-প্রকৃতির বিধ্বংস না হইবে সে পর্য্যন্ত তাহার ধর্ম্মেরও বিলোপ হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না, উহা নিয়তই তাহার সঙ্গী হইয়া চলিবে। যেখানে মনুষ্য থাকিবে, সেই খানেই তাহার ধর্ম্ম-তত্ত্বের অনুসন্ধান পাওয়া যাইবে। তাহার বুদ্ধি ও বিবেক, চিন্তা ও অনুভব, মন ও অন্তঃকরণ যেমন স্বভাব-সিদ্ধ, তাহার ধর্ম্মও অবিকল সেই রূপ। আদিকালের অতি পুরাতন পুরাবৃত্ত মধ্যেও উহার প্রতিভার যে রূপ নিদর্শন পাওয়া যায়, অনাগত অনন্তকালের অভ্যন্তরেও তাহা তদ্রূপই দেদীপ্যমান থাকিবে, সন্দেহ নাই।

মানব-প্রকৃতির যে রচনা-পরিপাটী তাহাই ধর্ম্ম-তত্ত্বের মূল পত্তন ও অদ্বিতীয় প্রমাণ। নীতি-শাস্ত্র-প্রয়োজক প্রধান প্রধান পণ্ডিতেরা ধর্ম্ম-তত্ত্ব ভিন্ন অন্যান্য বিষয়েও উহাকে ঐরূপ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। বাস্তবিকও আমাদিগের অন্তঃকরণে ধর্ম্ম-নীতি-সংক্রান্ত যে সমস্ত ভাবের আবির্ভাব হয়, আমাদের প্রকৃতির কৌশলই সে সকলের মূল ও বিলক্ষণ প্রমাণ। উল্লিখিত ভাব-সমস্ত অন্তর হইতেই উদিত হয়, বাহ্য হইতে নহে; তৎ সমুদায় আমাদের অন্তরেই অবস্থিতি করে এবং আমাদিগেরই সঙ্গে সংস্রব রাখে, বাহিরে বাহিরে কি কৃত্রিম ভাবে কখন সংযোজিত হয় না। ভূমির স্বভাবোৎপন্ন শস্যাদির ন্যায় আপনা হইতেই সে সকল আমাদিগের হৃদয়-ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়। ফলতঃ মনুষ্যের প্রকৃতিই এই, যাহা স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্তের প্রমাণ করিয়া থাকে, যাহাকে অনুমানের পরিবর্ত্তে আমরা অবিলম্বিত

ঈশ্বরের বিষয়ে চিন্তা করে এবং আপনাদিগের কার্য্যে ভাব ও চিন্তার সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকে, এই রূপ যতগুলি স্ত্রী ও পুরুষ আছে, তাহাদিগের প্রত্যেকেরই বিভিন্ন প্রকার ঈশ্বরের ভাব ও বিভিন্ন প্রকার ধর্ম্মের আকার থাকিবে। যদিও এক ধর্ম্ম প্রত্যেক মনুষ্যে নিরবচ্ছিন্নই আছে, তথাচ ধর্ম্মের মত, ধর্ম্মের আকার, উপাসনা প্রণালী এবং ধর্ম্মের কার্য্য যাহাকে নীতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, তৎসমুদায়, যে দুই ব্যক্তি এক জননীর গর্ভসম্ভূত ও একই প্রকারে সুশিক্ষিত হইয়াছে, সেই দুই ব্যক্তিতেও কদাচই সমান হইবে না। আমরা ঈশ্বরের ভাব যে রূপে গ্রহণ করি এবং ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ ও এই সম্বন্ধ হইতে যে কর্ত্তব্য উপলব্ধি করি এই সমস্ত আমাদিগের চিন্তা, ভাব ও জীবনের অভিব্যঞ্জক। ব্যক্তি জাতি ও কালের যে উন্নতির সমষ্টি, ঐ সমস্তই তাহার পরিমাণ করিয়া দেয়। সুতরাং এক্ষণে ইহাই নির্ণীত হইল যে বিজ্ঞান ও শিল্পের ন্যায় ধর্ম্মের বাহ্য দৃশ্যও প্রত্যেক দেশে ও প্রত্যেক কালে মনুষ্যের অবস্থানুসারে বিভিন্ন প্রকার হয়। নবজিলণ্ডে প্রথম শতাব্দীতে উহা এক রূপ এবং আমেরিকায় ঊনষষ্টি শতাব্দীতে অবশ্যই অন্য রূপ হইবে। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের নিকট উহা এক প্রকার ও অনক্ষর মূর্খের নিকট অন্য প্রকার হইবে। অধিক কি এক ব্যক্তিতেই জ্ঞান, সদ্ভাব ও স্বভাবানুসারে উহা বিভিন্ন প্রকার রূপ ধারণ করিবে। একটি বালকের ধর্ম্ম ও একটি বৃদ্ধের ধর্ম্ম পরস্পর কেমন অনৈক্য বোধ হয়! একটি বালকের প্রার্থনা একটি যুবক বা বৃদ্ধকে কদাচই বিচলিত করিতে পারে না।

আত্মোৎকর্ষ বিধান।

২৭৫ সংখ্যক পত্রিকার ৬৮ পৃষ্ঠার পর।

একটি আবশ্যক প্রস্তাব অবশিষ্ট আছে। আত্ম সমুন্নতির পরম উপায় ব্রাহ্মধর্ম্ম এখনো অস্পৃষ্ট রহিয়াছে। পূর্ব্বোল্লিখিত সমুদায় উপায়ই এই মহান্ উপায়ের আশ্রিত। ইহাকে পরিত্যাগ করিলে সকলই অসার হইয়া পড়ে। এরূপ আখ্যানে অনেকে এই প্রকার আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন, যে "পূর্ব্বে আত্মোৎকর্ষ বিধানের দৃঢ় সংকল্পকে উহার সর্ব্ব প্রধান উপায় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া এক্ষণে ব্রাহ্মধর্ম্মকে সমুদায় উপায়ের আশ্রয় বলা কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে?" তাঁহাদের এ আপত্তি আপাতত স্থান পায় বটে, কিন্তু কিঞ্চিৎ প্রণিধান করিয়া দেখিলেই ইহার মীমাংসা হয়। আত্ম সমুন্নতির ঐকান্তিক অভিলাষই যে উহার মুখ্য উপায় তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মই যে উক্ত রূপ অভিলাষের অন্তরঙ্গ সাধন, তাহাতেও কোন সন্দেহ হইতে পারে না। যিনি আত্মাকে সমুন্নত করিতে একান্ত উৎসুক হইয়াছেন, তিনি অবশ্যই ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রিত হইয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম যাবতীয় সাধু ভাবের নিয়ামক। ব্রাহ্মধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া কোন সাধু সংকল্পই এক পদ মাত্র অগ্রসর হইতে পারে না। যেমন শরীরের উত্তমাঙ্গ না থাকিলে অপর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমস্ত সম্পূর্ণ সৌষ্ঠব ও লাবণ্য সমন্বিত হইলেও কোন কার্য্যকর হয় না, অথবা যেমন মাধ্যাকর্ষণ না থাকিলে অপরাপর প্রাকৃতিক নিয়ম সকলের কোন ফলবত্তা থাকেনা, সেই রূপ ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আস্থা না থাকিলে আত্মোৎকর্ষ বিধানের কোন উপায়ই সমীহিত সিদ্ধি লাভের উপযোগী হইতে পারে না। ব্রাহ্মধর্ম্ম মানব-হৃদয়-

গত সমুন্নত সদ্ভাব-চক্রের নাভি স্বরূপ; নাভির অসদ্ভাবে কিপ্রকারে চক্রের গতি নিষ্পাদিত হইবে?

ধর্ম্মের ভাব যে মনুষ্যের প্রকৃতি সিদ্ধ, তাহা পূর্ব্বে সামান্যাকারে স্বীকার করিয়া লইলেও এস্থলে বিশেষ রূপে তাহার নিরূপণ করা অসঙ্গত হইবেনা।

মনুষ্যের বুদ্ধি দ্বারা এপর্য্যন্ত যে সমস্ত বিষয় নিরূপিত হইয়াছে, তৎসমুদয় যদি প্রগাঢ় ও সংশয়-শূন্য বলিয়া প্রতীত হয়, তবে মানব-প্রকৃতির যে একটি ধর্ম্ম-তত্ত্ব আছে, ইহাতেও আর কোন সংশয় থাকে না। একমাত্র মনুষ্যের প্রকৃতি ভিন্ন তাদৃশ ধর্ম্ম-তত্ত্বের আর কুত্রাপি সংস্রব নাই। তাহা ভূমণ্ডলের পশ্চিম খণ্ডের কি পূর্ব্বভাগের, নবীন কি প্রাচীন জগতের অথবা এই সমগ্র জগতেরও বিশেষ ধর্ম্ম নহে। সমস্ত বিশ্বের সহিতই তাহার সম্বন্ধ আছে। রোম, জেরুসালম, মক্কা প্রভৃতি কোন পার্থিব রাজধানীর অধিকার নিমিত্ত তাদৃশ ধর্ম্ম-তত্ত্বের আবির্ভাব হয় নাই। বেদ, কোরাণ কি বাইবেল কোন প্রকার পুস্তক মধ্যেও তাহা আবদ্ধ নাই। সে ধর্ম্ম কোন শুভ্র বা কৃষ্ণ বর্ণ জাতিরও নিজস্ব নহে, তাহা ইউরোপ কি ভারতবর্ষ—গ্রীস্ কিম্বা পারস্য—পালেস্টিন্ অথবা মিসর রাজ্যের ধর্ম্ম নহে। মুসা যখন মিসরের, লূথর ইউরোপের এবং রামমোহন রায় ভারত বর্ষের ধর্ম্ম-প্রণালী সংশোধিত করিয়াছিলেন, তাহার পূর্ব্বেও ঐ উল্লিখিত ধর্ম্ম-তত্ত্ব বিদ্যমান ছিল। তাহা তীর্থাদি কোন স্থান মাহাত্ম্যেরও অধীন হইতে পারে না এবং মনুষ্যের অবস্থা ভেদেও তাহার আবির্ভাব বা তিরোভাব হয় না। মনুষ্য সভ্যতার পরাকাষ্ঠাতেই অধিরোহণ করুক, অথবা আদিম অসভ্যাবস্থাতেই আবদ্ধ থাকুক, তাহার প্রকৃতি-সিদ্ধ ধর্ম্ম-তত্ত্ব আর কস্মিন কালেও অন্যথা হইবার নহে, তাহা চিরকালই সমভাবে বিরাজ করিতে থাকে। যে কাল পর্য্যন্ত মানব-প্রকৃতির বিধ্বংস না হইবে সে পর্য্যন্ত তাহার ধর্ম্মেরও বিলোপ হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না, উহা নিয়তই তাহার সঙ্গী হইয়া চলিবে। যেখানে মনুষ্য থাকিবে, সেই খানেই তাহার ধর্ম্ম-তত্ত্বের অনুসন্ধান পাওয়া যাইবে। তাহার বুদ্ধি ও বিবেক, চিন্তা ও অনুভব, মন ও অন্তঃকরণ যেমন স্বভাব-সিদ্ধ, তাহার ধর্ম্মও অবিকল সেই রূপ। আদিকালের অতি পুরাতন পুরাবৃত্ত মধ্যেও উহার প্রতিভার যে রূপ নিদর্শন পাওয়া যায়, অনাগত অনন্তকালের অভ্যন্তরেও তাহা তদ্রূপই দেদীপ্যমান থাকিবে, সন্দেহ নাই।

মানব-প্রকৃতির যে রচনা-পরিপাটী তাহাই ধর্ম্ম-তত্ত্বের মূল পত্তন ও অদ্বিতীয় প্রমাণ। নীতি-শাস্ত্র-প্রয়োজক প্রধান প্রধান পণ্ডিতেরা ধর্ম্ম-তত্ত্ব ভিন্ন অন্যান্য বিষয়েও উহাকে ঐরূপ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। বাস্তবিকও আমাদিগের অন্তঃকরণে ধর্ম্ম-নীতি-সংক্রান্ত যে সমস্ত ভাবের আবির্ভাব হয়, আমাদের প্রকৃতির কৌশলই সে সকলের মূল ও বিলক্ষণ প্রমাণ। উল্লিখিত ভাব-সমস্ত অন্তর হইতেই উদিত হয়, বাহ্য হইতে নহে; তৎ সমুদায় আমাদের অন্তরেই অবস্থিতি করে এবং আমাদিগেরই সঙ্গে সংস্রব রাখে, বাহিরে বাহিরে কি কৃত্রিম ভাবে কখন সংযোজিত হয় না। ভূমির স্বভাবোৎপন্ন শস্যাদির ন্যায় আপনা হইতেই সে সকল আমাদিগের হৃদয়-ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়। ফলতঃ মনুষ্যের প্রকৃতিই এই, যাহা স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্তের প্রমাণ করিয়া থাকে, যাহাকে অনুমানের পরিবর্ত্তে আমরা অবিলম্বিত

প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের নিমিত্তই অবলম্বন করি, এবং যাহাতে এরূপ সত্য সকলের অনুসন্ধান করি, যাহাদের প্রমাণ করিবার আর অপেক্ষা থাকে না।

বিশ্বব্যাপী ধর্ম্ম-সুধাকর এই রূপে স্বয়ং সমুদিত হইয়া মানব-প্রকৃতির উদ্ভাসন বিষয়ে সম্যক রূপে উপযোগিতা করেন। তাঁহার সুবিমল কিরণ-রাজি অনভিজ্ঞ লোকদিগের দুর্ব্বোধ-কলুষিত মানস-গগনে উন্মেষ-শূন্য হইয়া থাকিতে পারে বটে, কিন্তু সুবোধ-সম্পন্ন বিজ্ঞগণ-হৃদয়ে সম্পূর্ণ রূপেই প্রতিভাত হয়। ধর্ম্ম উদার-প্রকৃতি মহীয়ান মানসে মহীয়ান এবং প্রীতি-প্রবণ সুকুমার মানসে প্রীতিময় ও নিরতিশয় সুকুমার হইয়া থাকেন। দেশভেদে যে সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম-প্রণালী নির্দ্ধারিত আছে, সবিশেষ চিন্তা ও অনুভব দ্বারা তৎ সমুদায় অতিক্রান্ত হইলেও হইতে পারে, কিন্তু উল্লিখিত প্রাকৃতিক ধর্ম্মকে সহস্র সহস্র চিন্তা ও অনুভবেও কখন অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। মনুষ্য-নিরূপিত কোন প্রকার ধর্ম্মের সেই পর্য্যন্তই অনুসরণ করা যায়, যে পর্য্যন্ত তাহাতে এরূপ কোন সিদ্ধান্ত দৃষ্ট না হয়, যদ্দ্বারা যথার্থ ধর্ম্ম-নীতি বিক্ষোভিতা ও তটস্থা হইতে পারে, অথবা ধর্ম্ম নীতি দ্বারা তিরস্কৃত হইয়া যাহা ঘোরতর বিবাদের আস্পদ হইয়া উঠে। কিন্তু প্রকৃতি-মূলক ধর্ম্ম-তত্ত্ব আমাদিগের অন্তঃকরণে এরূপ প্রগাঢ় ও বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে যে, কোন প্রকার বিবাদ-সূত্রে আকৃষ্ট হইয়া কোন কালেও আর অপনীত হইবার নহে। ফলতঃ প্রতিদ্বন্দ্বিতা কি বিবাদ বিসম্বাদের সহিত উহার সংস্রব মাত্রই নাই, বরং বিবেচনা করিয়া দেখিলে সর্ব্ব প্রকার বিরোধ ভঞ্জন করাই উহার উদ্দেশ্য এবং প্রকৃতিতে, পরমেশ্বরে ও মনুষ্যত্বে, মনুষ্য মাত্রই পরস্পর একীভূত এই রূপ অনুভব করাই উহার একটি প্রধান ফল।

অন্যান্য ধর্ম্মের ন্যায় এধর্ম্মেরও আবির্ভাব আছে। যদি ধর্ম্মের স্বয়ং আবির্ভাব হওয়া সঙ্গত হয়, তবে এই ধর্ম্মের আবির্ভাবকেই যথার্থ আবির্ভাব বলা যাইতে পারে। প্রকৃতি-সিদ্ধ যে সমস্ত মহত্তর পদার্থ-পুঞ্জ ইতস্ততঃ বিস্তৃত রহিয়াছে, মানব প্রকৃতির নিদেশানুসারে তৎ সমুদায় অনুধাবন করিয়া দেখিলে মানব-প্রকৃতি-মাত্র-সম্বদ্ধ ধর্ম্ম-সংক্রান্ত অভিপ্রায় সকল যে স্বতঃপ্রদীপ্ত ও স্বতঃপ্রমিত তাহা স্পষ্টই প্রতীত হয়। পুরাবৃত্ত সম্বন্ধীয় কোন সত্য মূলক বৃত্তান্তের ন্যায় বাহ্য বস্তু হইতে সে সকলের প্রমাণ সঙ্কলন করা আবশ্যক হয় না। ইতিহাস-নিবদ্ধ কোন বিষয়ক বিবরণের সত্যতা নির্ণয় করিতে হইলে অগ্রে সাক্ষ্য সংকলন দ্বারা তাহার প্রমাণের বলাবল পরীক্ষা এবং সমান হস্তে তাহার সম্ভব্যাসম্ভব্যের পরিমাণ করিতে হয়; পশ্চাৎ অসম্বদ্ধ বস্তু রাশি মধ্যে সবিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা যদি যৎসামান্য কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে তাহারও সূক্ষ্মতা নির্দ্ধারণ করিতে হয়। কিন্তু নীতি ও ধর্ম্ম সংক্রান্ত মহীয়ান ভাব সকলের নিশ্চয়তা নিমিত্ত সে রূপ কিছুই করিতে হয় না, শুদ্ধ সত্তা ও স্বভাবই তাহাদের যথেষ্ট প্রমাণ। ভুবনোদ্ভাসী ভাস্কর নিকরের ন্যায় তাহারা স্বয়ং সমুদিত হইয়া সমুজ্জ্বল কিরণাবলী বিস্তার দ্বারা মোহ রূপ অবিরল তিমির-জালের শান্তি বিধান করে। তাহারা বিশ্বের সর্ব্বভাগেই অলৌকিক আলোক-মালা প্রসারণ করতঃ প্রতিফলিত প্রতিভা দ্বারা উহাকে উদ্ভাসিত

করিয়া থাকে। মানব-প্রকৃতির অবস্থান নিমিত্ত তাহারা একটি স্বতন্ত্র জগতের উৎপত্তি করিয়া দেয়। পরিদৃশ্যমান ভৌতিক জগতের ন্যায় বাহ্য নয়ন দ্বারা সে জগতের আকার নিরীক্ষিত হয় না, তাহা আন্তরিক জ্ঞান-নেত্রেই প্রত্যক্ষ হইবার বিষয়। বাহ্য জ্ঞান-প্রভাবে প্রত্যেক মনুষ্যের নিকটেই এই বাহ্য জগতের যেমন নূতন নূতন সৃষ্টি হইয়া থাকে, সেই রূপ ঐ অনির্দ্দেশ্য পারলৌকিক জগৎও অন্তঃপ্রবুদ্ধ জ্ঞান-সন্নিধানে নব নব ভাবে প্রকাশ পায়। ফলতঃ উল্লিখিত নীতি ও ধর্ম্ম সংক্রান্ত ভাব সমস্ত আমাদিগের অন্তরেই বিরাজমান হইয়া আনন্দময় আধিপত্য প্রচার করিতে থাকে এবং পূর্ব্ব নির্দ্দেশানুসারে ঐ সকলই যথার্থ আবির্ভাবনের উপযুক্ত হইতে পারে। যখন কোন ব্যক্তি স্বর্গ হইতে ধর্ম্মের আবির্ভাব সংকলনে ব্যবসিত হন, অর্থাৎ এরূপ অপরিদর্শনীয় অত্যাবশ্যক গুরুতর সত্যের আবিষ্কার ও প্রচারার্থে সংকল্প করেন, যাহা অন্য কোন প্রকারেই আর পরিজ্ঞেয় হইবার বিষয় হইতে পারে না, তখন তিনি অপরিচিত-অক্ষর-মালা-নিবদ্ধ এক খানি অপূর্ব্ব ভাষার গ্রন্থ আনিয়া উপস্থিত করেন। তাহার অর্থগ্রহ করিতে হইলে ভাষান্তরে অনুবাদ ও বিশিষ্ট রূপ ব্যাখ্যান ব্যতীত আমাদিগের আর অন্য উপায়ান্তর থাকে না। কিন্তু সেই সকল প্রক্রিয়াতে যে নানা প্রকার ভ্রম প্রমাদ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা বিলক্ষণ অনুভব সিদ্ধ। সুতরাং ধর্ম্ম প্রকাশের এরূপ চেষ্টা করা কেবল মানব-প্রকৃতির প্রতি এক প্রকার পরিহাস অথবা তদপেক্ষাও কোন অধম ব্যাপারের বিষয় হইয়া উঠে। কেহ কেহ বলেন, পরমেশ্বর মূসাকে প্রাচীন ইহুদী ভাষায় যে সকল উপদেশ করিয়াছিলেন, তৎসমুদায়ই ধর্ম্মের যথার্থ আবির্ভাব। তন্মধ্যে এই একটি উপদেশ আছে, আমি যে তোমার প্রভু পরমেশ্বর, আমি একটি ঈর্ষান্বিত পরমেশ্বর, পুত্রদিগের প্রতি জনকগণের যে অনমদর্শিতা ও অবিচার, সে সকল আমি পর্য্যবেক্ষণ করি। এস্থলে পদে পদে সংশয় উপস্থিত না হয় এমন একটি পদও কি বিদ্যমান আছে? ইহার প্রত্যেক শব্দেরই অর্থ কি কি? সমুদয় প্রস্তাবেই বা কোন্ অর্থ উদ্ভাবিত করে? লেখকের অভিপ্রায়ে ঈর্ষা ও পরমেশ্বরই বা কি পদার্থ এবং আমাদিগের মনেই বা সে সকলের কি রূপ ভাব প্রকাশ পায়? আমরা কি উল্লিখিত শব্দ সকলের যথার্থ অভিপ্রায় ও তাৎপর্য্যার্থ অবধারণ করিতে পারিয়াছি? সে সকল কি কোন জাতি বিশেষ মাত্রে সংকীর্ণ ভাবে অথবা বিশ্বজনীন রূপে প্রয়োগার্হ হইবে বলিয়া অভিপ্রেত হইয়াছে? তাহাদের শক্তি ও সত্যত্ব কি ক্ষণকালবর্ত্তী অথবা অনন্তকালস্থায়ী? এই সকল প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করিতে হইলে ঘোরতর সংশয়-তিমিরে আচ্ছন্ন হইতে হয়। কিন্তু যে সমস্ত চিন্তা-রত্ন আপনা হইতেই আমাদিগের হৃদয়াকরে উৎপন্ন হয়, উক্ত রূপ সন্দেহ-মল দ্বারা সে সকলের উজ্জ্বল জ্যোতিঃ বিলুপ্ত হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। ফলতঃ যে সকল বিষয়ে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ধর্ম্মের পবিত্র মূর্ত্তি বিরাজ করিতে থাকেন, কতগুলি শব্দ, কেবল শব্দ মাত্রই তৎ সমুদায়ের কখন প্রকাশক হইতে পারে না। অনন্ত স্বরূপ পরমেশ্বর-বিষয়ে অথবা মানবীয় একটি অবিনাশী স্বরূপের সত্তা পক্ষে আমাদিগের যে সমস্ত বিশুদ্ধতম অত্যুন্নত মহীয়ান উদার ভাবের উদয় হয়, কেবল শব্দমাত্র সহকারে আমরা কোন ক্রমেই সে সকল সংকলন করিতে পারিনা। এরূপ ভাব আমাদিগের অন্তরাত্মা হই-

তেই স্বতঃ প্রবুদ্ধ হয় এবং আমরাই তাহার অধিকারী। তাহা বিশ্ব-প্রসবিনী প্রকৃতি দেবীর একটি অঙ্গ স্বরূপেই প্রকাশমান হয়। প্রকৃতি-সিদ্ধ পদার্থ সকল যেমন আপনা হইতেই উৎপন্ন ও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, সেই রূপ ঈশ্বরের সত্তা ও আত্মার অবিনাশিত্ব বিষয়ে আমাদের চিত্তবৃত্তিও স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া বৃদ্ধি পায়। যাহারা নিতান্ত অসভ্য, হিতাহিতের প্রভেদ করিতে পারেনা, পশুদিগের ন্যায় কেবল স্বাভাবিক সংস্কারের বশম্বদ হইয়া চলে, তাহাদিগেরও অন্তঃক্ষেত্রে কখন কখন উক্ত রূপ পরিশুদ্ধ চিন্তা-প্রবাহ সকল প্রবাহিত হইতে থাকে। তাহারাও অন্তর্নিহিত নিগূঢ় ভাব সকলের রসাস্বাদ করিতে পারে। যে অনির্ব্বচনীয় ঐশী শক্তি প্রভাবে বিশ্বের সমস্ত কার্য্যজাত নিষ্পন্ন হইতেছে, উল্লিখিত ধর্ম্মভাবও তাহারই অন্তর্গত। যেমন ভূমি হইতে শস্যাদির উৎপত্তি হইতেছে, গগন মণ্ডলে নক্ষত্রমালা বিরাজ করিতেছে, প্রবলতর মাধ্যাকর্ষণ প্রভাবে সূর্য্য গ্রহনিবহ তারকপুঞ্জ ও জগৎ সমূহ পরস্পর সম্বদ্ধ ও সমঞ্জসীভূত হইয়া রহিয়াছে, সেই রূপ মহাপ্রতাপ ধর্ম্মরাজ আপনা হইতেই মনুষ্যের হৃদয়-সিংহাসনে চিরকাল বিরাজ করিতেছেন। যেকাল পর্য্যন্ত প্রকৃতি দেবীর সত্তা থাকিবে সে পর্য্যন্ত তাঁহারও বিপ্রণাশ হইবার প্রশক্তিমাত্র থাকিবেনা।

অতএব মানব প্রকৃতির যে একটি ধর্ম্মতত্ত্ব আছে, তাহা নিঃসংশয়ে প্রতিপাদিত হইল। মানব প্রকৃতি বাক্য মনের অগোচর এক অনাদি পরমেশ্বরের আরাধনা করে এবং উত্তর কালে স্থিরতর নিত্য সুখ লাভের প্রত্যাশা রাখে, কল্পনা সম্ভূত আরোপিত যে পূর্ণতা ও সমুন্নতি তাহাই ইহার যাবতীয় উপদেশের মূলীভূত ও সার মর্ম্ম। সেই মর্ম্মের অনুসারেই আমরা পরমেশ্বরের অনন্ত জ্ঞান ও অসীম শক্তি, সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রভুত্ব ও সততা, অখণ্ডনীয় নিয়ম ও শৃঙ্খলা, করুণা পূর্ণ সংকল্প ও অব্যর্থ নিষ্পাদনের বিষয় হৃদয়ঙ্গম করি এবং আশা ও ভয়ের সহিত তাঁহার প্রতি প্রীতি করিয়া অপার আনন্দ-স্রোতে ভাসমান হই। মহীয়সী ধর্ম্মনীতির সাহায্যে আমরা যে, শোভা ও সামর্থ্যের সত্ত্বাসত্ত্ব বিবেচনা করিয়া ন্যায় ও অন্যায়ের প্রভেদ করি, সামাজিক প্রবৃত্তির বশম্বদ হইয়া প্রকৃতি-সম্ভূত যাবতীয় পদার্থজাত এক পিতা হইতে উৎপন্ন এই রূপ জ্ঞান করত ধর্ম্মতীর্থের যাত্রী মাত্রকেই আনন্দিত ও উৎসাহিত করি; পরম পিতার অভিশ্রেত ও প্রিয় কার্য্য বোধে কৃচ্ছ্র সাধ্য উৎকট ধর্ম্ম সকলেরও যথাবৎ অনুশীলন করি এবং এই রূপে মনুষ্যজীবনের মহান উদ্দেশ্য সম্পাদনে সমর্থ হই, ইহাই যথার্থ ধর্ম্মতত্ত্ব। আহা! ইহাতে কি সারল্য কি নির্ম্মল বিশুদ্ধ ভাবই বিরাজ করিতেছে! ধর্ম্মের কার্য্য ও ফল বলিয়া যাহা কিছু নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে, তাহা ইহা দ্বারাই সম্যক রূপে সম্পাদিত হয়, কোন কাল্পনিক ধর্ম্ম-পদ্ধতি দ্বারা কদাচ সেরূপ সুসিদ্ধ হইতে পারে না।

উল্লিখিত ধর্ম্ম তত্ত্বই ব্রাহ্মধর্ম্মের উপজীব্য। ইহা আমাদিগের হৃদয়-ধামে শ্রদ্ধা ও ভক্তির আবির্ভাব, ধর্ম্ম-নীতির বলাধান এবং সুবিমল সন্তোষ প্রদানের আশ্বাস করিতে থাকে। অতএব হে ভ্রাতৃবর্গ! আত্মার উৎকর্ষ সাধন যদি বিধেয় হয়,—অচিরস্থায়ী অসার বিষয়-রসে চির-নিমগ্ন না থাকিয়া চিরস্থায়ী সারবৎ পরমার্থ রসের আন্দোলন করিবার যদি বাসনা হয়, তবে প্রীতি-প্রবণ চিত্তে সর্ব্বতোভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রিত হও।

সংস্কৃত সাহিত্য।

২৭৫ সংখ্যক পত্রিকার ৬১ পৃষ্ঠার পর।

যদিও ভারতবর্ষীয়দিগের রাজ্যাদি বিস্তার বিষয়ে তাদৃশ যত্ন ও উৎসাহ ছিল না কিন্তু তাঁহারা যে অধ্যাত্ম বিদ্যার যৎপরোনাস্তি শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন, বোধ হয় তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। তাঁহারদিগের বুদ্ধিবৃত্তি রাজ্য বিস্তার ও যুদ্ধযাত্রা প্রভৃতি প্রবৃত্তি বিশেষে অল্প আসক্ত ছিল বলিয়াই অধ্যাত্ম বিদ্যার এই রূপ উন্নতি বিধানে সমর্থ হয়। মানব জাতির ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই প্রতীয়মান হইবে যে উন্নতির মুখে উপনীত হইতে হইলে পূর্ব্বে তদনুরূপ প্রস্তুত হওয়া চাই। প্রকৃত সত্যের আলোক লাভ করিবার পূর্ব্বে ভ্রান্তি-সমুদায় তিরোহিত হওয়া আবশ্যক। এই পৃথিবীতে পূর্ব্বে কত প্রকার ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছিল; কিন্তু বালকেরা দুগ্ধে পরিপুষ্ট হইয়া সবলকায় হইলে পশ্চাৎ অন্নরস যেমন সেই দুগ্ধের স্থানকে অধিকার করে, সেই রূপ এক একটি জীবন্ত ধর্ম্ম প্রকৃত অবসরে ঐ সমস্ত ধর্ম্মকে নষ্ট করিয়া তাহাদিগের স্থানকে অধিকার করিয়াছে। অতি পূর্ব্বকালে আর্য্য জাতির মধ্যে জড়ের উপাসনা প্রচলিত ছিল, তৎপরে ভারতবর্ষীয়েরা তৎকাল-প্রচলিত ধর্ম্মের অসারতা প্রতিপাদন করিয়া আর একটি ধর্ম্ম প্রস্তুত করেন। এই ধর্ম্মের নাম বৌদ্ধ ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম বাহ্য পদার্থের উপাসনার পরিবর্ত্তে কেবল আন্তরিক ধ্যান ধারণারই ব্যবস্থা প্রদান করিয়া থাকে। এক সময়ে এই ধর্ম্মের এই রূপ প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিয়াছিল যে স্মরণ হইলেও বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। অধিক কি এই ধর্ম্ম এখনও আর্য্যদিগের সীমাকে অতিক্রম করিয়া পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে বিস্তীর্ণ হইয়া রহিয়াছে।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম অন্যান্য ধর্ম্ম অপেক্ষা ব্রাহ্মণদিগের চিরন্তন বিশ্বাসের নিতান্ত পরিপন্থী ছিল। পূর্ব্বতন প্রটেষ্টাণ্ট খৃষ্টিয়ানদিগের সহিত রোমন ক্যাথলিকদিগের যে রূপ সম্বন্ধ বৌদ্ধদিগের সহিত ব্রাহ্মণদিগেরও সেই রূপ। ভারতবর্ষই যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের উৎপত্তি স্থান উভয়ের এই প্রকার বিপক্ষ ভাব তাহা বিলক্ষণ সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে! বুদ্ধ দেবের যেরূপ মত, তাহা নিতান্ত নূতন নহে। তাঁহার পূর্ব্বেও যে ঐ প্রকার মত আবিষ্কৃত হইয়াছিল, অন্যান্য দেশে তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন লক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু যে প্রকার হৃদয়গ্রাহী প্রণালী অনুসারে ভারতবর্ষে ঐসমস্ত মত প্রচারিত হইয়াছিল, যে প্রকারে ভারতবর্ষীয়দিগের মনোমধ্যে তৎসমুদায় স্থান লাভ করে, যে প্রকারে সর্ব্বাগ্রে অধস্তন শ্রেণীর লোকেরা আগ্রহের সহিত এই ধর্ম্ম প্রতিগ্রহ করিয়াছিল, যে প্রকারে নৃপতিরা ইহাকে রাজ্য মধ্যে বিস্তার করেন, তাহা অতিশয় বিস্ময়োৎপাদক। তৎসমুদায় ভারতবর্ষীয়দিগেরই পূর্ব্বতন ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে সুস্পষ্ট অবগত হওয়া যায়। বৌদ্ধ ধর্ম্মে এরূপ কতগুলি সত্য আছে, যাহা সকল প্রকার পদার্থ বিদ্যার অনুমোদিত এবং যে ধর্ম্ম ক্ষয়োন্মুখ পৌত্তলিকতা ও নিষ্ঠুর পৌরোহিত্যাধিকার হইতে স্বতন্ত্র ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতেও ঐ রূপ সমস্ত সত্য দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম্মের আবার এমনও কতগুলি সত্য আছে, যাহা পৃথিবীর অন্যান্য ভ্রান্তিমূলক ধর্ম্মেও নিরীক্ষিত হয়। যাহাই হউক, যেস্থলে মনুষ্যেরা ব্রাহ্মণদিগের প্রাচীন ধর্ম্মপ্রণালী দূষিত দর্শন করিয়া বহুকালাবধি সত্যের আলোচনায় প্রস্তুত হয়, সেই ভারত বর্ষেই এই বৌদ্ধ-

ধর্ম্ম অবলম্বিত ও পোষিত হইয়াছিল। ভারত বর্ষেই বৌদ্ধধর্ম্ম-সংক্রান্ত মত ইতিহাস মধ্যে সন্নিবিষ্ট এবং একটি ধর্ম্মরূপে পরিণত হয়; ফলত যদি লোক সংখ্যার উপর ধর্ম্মের সত্যাসত্য নির্ভর করে, তাহা হইলে ভারতবর্ষে তৎকাল-প্রচলিত অন্যান্য ধর্ম্ম অপেক্ষা বৌদ্ধধর্ম্ম যে একটি সত্য-ধর্ম্ম ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

অতি পূর্ব্বকালে পৃথিবীতে বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় আর কোন ধর্ম্মই অপেক্ষাকৃত অধিক স্থান অধিকার করে নাই। যদিও এই ধর্ম্ম এক্ষণে ভারতবর্ষ হইতে অন্তরিত হইয়াছে, যদিও এক্ষণে ভারতবর্ষে প্রকৃত বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না, তথাচ সিলোন, সায়াম, আবা, পেগু উপদ্বীপ এবং ব্রহ্মদেশ, তিব্বত, চীন, তাতার, মঙ্গলিয়া ও সাইবিরিয়া দেশে ইহার সম্যক প্রদুর্ভাব দেখা যায় এবং এক্ষণে ইহা একটি দূষিত ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইলেও বহুসংখ্য লোক ইহা সত্য ধর্ম্ম বলিয়া অবলম্বন করিয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত এই ধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই অবধিই পৃথিবীর বুদ্ধিবৃত্তি-সংক্রান্ত ইতিহাসের সময় গণনা আরম্ভ হইয়াছে এবং সেই সময়ই ভারতবর্ষের মধ্যাহ্ন কাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। যাঁহারা ভারতবর্ষীয়দিগের মনোবৃত্তির উন্নতি সবিশেষ পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এই সময়কেই ভারতবর্ষের অবস্থা নির্ণয় করিবার অনুকূল বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। অধ্যাপক উইলসন আপনার অনুবাদিত বিষ্ণু পুরাণে, অধ্যাপক বর্ণুফ স্বপ্রণীত বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত ইতিহাসের অনুক্রমণিকায় এবং অধ্যাপক লাসেন ভারতবর্ষের পূর্ব্ব কাল নিরূপণে এই কালকেই কাল গণনার অনুকূল বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত কোন বিষয় বর্ণন করা এস্থলে আমাদিগের তাদৃশ উদ্দেশ্য নয়। যেমন খৃষ্টীয় শক পৃথিবীর ইতিহাসকে দুই অংশে বিভক্ত করিয়া দিতেছে, সেই রূপ বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি কাল ভারতবর্ষের ইতিহাসকে দুই অংশে বিভক্ত করিতেছে, এক্ষণে তাহাই হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া আমাদিগের অভিপ্রেত। বেদের কাল নিরূপণ বিষয়ে এই প্রণালী যার পরনাই উপযোগী হইতেছে। এই অভিনব ধর্ম্মের আবির্ভাব ব্রাহ্মণদিগের পৌরোহিত্য আধিপত্যের এত দূর পরিপন্থী হইয়াছিল যে তাঁহাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রেও তাহার ভুরি ভুরি নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৌদ্ধধর্ম্ম যখন আপনার জয় পতাকা সর্ব্বত্র উড্ডীন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন আর্য্য ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগের ধর্ম্ম উচ্ছেদ হইবার আশঙ্কায় রোষানলে প্রদীপ্ত হইয়া উহার প্রতি যে রূপ কটু দৃষ্টিতে দর্শন করিয়া ছিলেন, প্রাচীন গ্রন্থ সকল এখনও তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ফলত বৌদ্ধদিগের সহিত বিবাদই ঐ সমস্ত গ্রন্থের একটি ঐতিহাসিক সংস্রব সংস্থাপিত করিয়া দিতেছে। আমরা এই সূত্র অবলম্বন করিয়াই বৈদিক কাল নিরূপণে প্রবৃত্ত হইব।

এক জন ব্রহ্মবাদিনীর উক্তি।

(কোন্নগর হইতে প্রাপ্ত)

হে পরম করুণাময় পরমেশ্বর! আমাদের এই যে ব্রাহ্মসমাজ বয়োবৃদ্ধি সহকারে ক্রমশ উন্নতির পথেই অগ্রসর হইতেছে, তজ্জন্য তোমাকে অগণ্য ধন্যবাদ করি। আহা! যখন আমার মন ইহার উন্নতির অবস্থা স্মরণ করে, তখন যে কি অপার আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা রসে মগ্ন হয়, তাহা বলিতে পারি না। জগদীশ! এসকল মঙ্গলের

কারণ কেবল তোমারই অপার করুণা! নতুবা আমাদের ক্ষুদ্র বলে কিছুই হইতে পারে না। মনুষ্যের কি এমন সাধ্য আছে যে, সে কেবল নিজ বলে জগতের কোন মঙ্গল কার্য্য সাধন করিতে সক্ষম হয়? কখনই না। হে পরম পিতঃ! তুমি যে আমাদিগকে তোমার উপাসনার অধিকারী করিয়াছ, ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আর আমাদের কিছুই নাই! আহা! এই উপাসনা কি সমাজে কি পরিবারের মধ্যে কি নির্জ্জনে যে স্থানেই করি, সেই স্থানেই পরম শান্তি প্রাপ্ত হই। যখন আমরা পাপে তাপিত, শোকে আকুল কি অন্য কোন কারণে অস্থির-চিত্ত হই, তখন যদি কোন নির্জ্জন স্থানে গমন পূর্ব্বক একান্ত মনে নম্রভাবে তোমার উপাসনা করি, তাহা হইলে আমাদের সেই সকল দুঃখের আর লেশ মাত্রও থাকে না এবং মন একেবারে পবিত্র ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হয়। সেই রূপ কি বিপদে কি সম্পদে যদি আমরা প্রতিদিন সপরিবারে তোমার উপাসনায় প্রবৃত্ত হই, তবে আমরা যে কতদূর পর্য্যন্ত উন্নতি লাভ করিতে পারি, তাহা বলা যায় না। আহা! তাহা হইলে আমাদের নিকট বিবাদ কলহাদি কিছুই স্থান পাইতে পারে না, এবং সকলেই একমনা হইয়া তোমার প্রিয়কার্য্য সাধনে যত্নশীল হই। আর সামাজিক উপাসনায় যে কতদূর পর্য্যন্ত হিত সাধন হয়, তাহা অনেকেই কিছু না কিছু অবগত আছেন। কেন না এই সমাজই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের এবং চরিত্র সংশোধনের এক মহৎ উপায়। আহা! এই উপাসনার দ্বারাই মনুষ্যের সকল দুঃখ নিবারণ ও অনন্ত সুখের উৎপত্তি হয়। যখন কোন রোগী ব্যক্তি তাহার রোগ-যন্ত্রণায় নিতান্ত অস্থির হয়, তখন যদ্যপি সে একান্ত মনে প্রীতির সহিত ঈশ্বরের উপাসনা করে, তবে আর তাহাকে সেই যন্ত্রণা কাতর করিতে পারে না। যখন কোন গৃহী ব্যক্তি স্বীয় পুত্রের মৃত্যু-জনিত একেবারে শোকে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়েন, তখনও যদি তিনি চিত্ত স্থির করত সেই পরমেশ্বরের উপাসনায় মনোনিবেশ করেন, তাহা হইলে তিনি ঐহিক সুখ দুঃখ বিস্মৃত হইয়া ঈশ্বরের প্রেমে মগ্ন হওত পরম সুখ প্রাপ্ত হন। যে সময় কোন অবীরা নারী আপনাকে নিতান্ত দুরবস্থ ও অসহায় ভাবিয়া বিষাদ-সাগরে মগ্ন হন, সে সময়ও যদি তিনি ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক সেই দুঃখ বিনাশনের জন্য উপাসনায় প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তাঁহার সকল দুঃখ সকল চিন্তা নিবারণ হইয়া অপার আনন্দের উৎপত্তি হয়। কারণ, ঈশ্বর আমাদিগকে যে সকল দুঃখ ও শোক প্রদান করেন, তাহা কেবল আমাদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত। অতএব ঈশ্বরের উপাসনা দ্বারা তাঁহার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রীতি জন্মিলে, আর কোন দুঃখ কাতর করিতে পারে না। হে পরম পিতঃ পরমাত্মন্! যাহাতে আমরা সকলে অলীক সাংসারিক সুখে নিস্পৃহ হইয়া, প্রীতি ও ভক্তির সহিত তোমার উপাসনা করিতে পারি ও তোমার আজ্ঞা সকল সাধ্যমতে প্রতিপালন করিতে ত্রুটি না করি, এই রূপ ক্ষমতা প্রদান কর। জগদীশ! তোমা বিনা এমন কৃপাবান পিতা ও এমন হিতৈষী বন্ধু কোথায় পাইব? আহা! এখানকার কোন বস্তুই চিরস্থায়ী নয়, সকলের সহিতই বিচ্ছেদ হইবে। নাথ! তোমার সহিত যে সম্বন্ধ তাহাই কেবল চিরকালের নিমিত্ত। নাথ! তোমার বল প্রেরণ করিয়া এক্ষণে আমাদের দুর্ব্বল মনকে সবল কর। তুমিই আমারদের পরম গতি, তুমিই আমারদের পরম আশ্রয়।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

(FROM THE NATIONAL PAPER.)

As in his last, so in his present letter, Mr. Anglicanus has put forth a few propositions of his creed unsupported by any valid arguments at all. Without meaning any offence to the learned writer on "Christianity" we here beg to suggest in a friendly spirit that if his theological lucuberations are intended for the good of those opposed to his creed, which we presume to be the case, in as much as those orthodox in their religious belief have had enough of such teaching both in a learned and popular shape to need any more, his treatment of the subject, ought, we think, to be a little more comprehensive and convincing. Surely, he cannot expect us to believe that once in the

flight of ages past the Infinite and Immutable God assumed the form of a lowly man, partook of the pleasures and anxieties inherent in the mortal flesh, then being crucified and dead he descended into hell; rose again the third day from the dead; ascended into heaven, and sat on the right hand of God from whence he shall come to Judge the quick and the dead; that the Godhead instead of being one only indivisible Being, consists of three persons each infinite and of equal rank, having separate consciousnesses, and volitions. Surely, we say, he cannot expect us to belive these things simply because they chance to be included in the Athanasian creed. But it may be said the creed is based on the Bible, the word of God, that it contains nothing which cannot be deduced from the Christian Scriptures. Well then, waiving for the present the question as to whether or not we are justified in accepting as truth, every thing that may be contained within the lids of the Bible, does the Bible itself, we ask, *explicitly* teach us the doctrines of the Trinity and the Divinity of Christ,—doctrines which Mr. Anglicanus would have us believe and which for some centuries together the Christian Church has been peremptorily bidding the world either to accept or be damped for ever? There is not, we believe, one single passage in the whole compass of the Bible in which it is distinctly said that the being of God is threefold. On the contrary we constantly meet in the New Testament with passages, which distinctly declare the Unity of God. We cannot of course admit of inferences and deductions in so important a matter, for if those were allowed we do not know of anything into which the sense of some one or other of the numerous scriptural texts might not be tortured. Has not Polygamy been upheld in the name of the Bible? Have not passages been quoted from the scriptures to support the abominable system of slavery. If the object of any special Revelation, such as the Bible is declared to be, is to enlighten us on those points of which we cannot have any distinct knowledge from the ordinary works of nature, and if the doctrine of Trinity is one of these points, it is to be expected *prima facie* that it should have been set forth in such a manner as the commonest understanding may have had access to it. But so far is this from being the case that the word Trinity or some other word of the same import is not at all to be met with from the beginning to the end of the Bible. Again, Christian writers inform us of their religion having progressed in the midst of enemies who lost no opportunity in attacking what they deemed its vulnerable points. Now the Jews, veteran enemies to Christianity, pluming themselves as they used to do on their recognition of the Unity of God, could not have got a better handle with which to assail the Christians than the Trinity. But we have received no account of the Jews, intolerant as they were, of raising any the least objection on the score of this peculiar dogma of Christianity. The apostolic writings treat of other controversial subjects and other objections against Christianity; but are perfectly silent as to their most important subject, thereby clearly shewing that the first preachers of Christ's religion had no knowledge most probably of the doctrine of Trinity, that it was of latter invention, and reached its prefection at the hand of the schoolmen.

But we would nevertheless deny that there are certain passages in the Bible which confirm the popular notion of the Divinity of Christ such as "I and the Father are one," "the Father in me and I in Him." But on the other hand a larger number of passages run counter to the spirit of these texts such as "my Father is greater than I," "I am in my father, and ye in me, and I in you," "that they Holy Father, may be one, even as we" &c. So in this way it will be seen that by far the larger portion of the New Testament is filled with passages that unmistakeably tend to shew the inferiority nay creatureship of the "son" in relation to the "Father." If contradictions should be avoided, (for who can deny that the passages "I and the Father are one" and "my Father is greater than I" do contradict each other?) we must adopt one of the two alternatives, either admit of a greater latitude of interpretation; or hold Christ to be inconsistent and designing. We for one are not disposed to take such an uncharitable view of Christ's character as the latter hypothesis would imply. We would only rest satisfied with the observation that the Bible is anything but explicit in its ennunciation of the doctrines which constitute the life-blood as if it were of Popular Christianity.

But supposing for argument's sake that the Bible were as explicit as we could wish it to be in expounding the above doctrine, would we then be justified in accepting them as truths and nothing but truths? Repudiators of book revelation as we are, it cannot be expected of us we should accept any thing as true simply because of its having been mentioned as such in the Bible. In a former issue of this paper we attemped to shew that we are not justified in holding anything as the revealed word of God which does not coalesce with the dictates of our intuitional consciousness. Let us try the above doctrines by the application of this test and see how they stand the trial. Now the three persons constituting the Trinity are declared to have seperate consciousnesses and separate wills, to hold converse with each other and to be fond of each others' company, and yet are they said to be one and the same Being. Having all the characteristics of three different personalities we are yet to regard them as one indivisible unity!! Again the Divinity of Christ presupposes that we consider him possessing at the same time the properties of both human and divine natures; to be both finite and infinite at once; to be in short God-man. Now, no one we hope, will deny that these notions commonly entertained about the Trinity and the Divinity of Christ involve the most palpable contradictions. "Perplexities from the nature of Number, of time, of Being; in short all those various conceptions of the mind which are its ultimate facts, and beyond which no power of analysis can reach us; "these says Bishop Hampden while speaking on the Trinitarian controversies "I think," in his Bampton Lectures*** "are our stumbling blocks, causing the wisdom of God to be received as the foolishness of men. These have forced themselves on the form of Divine mystery, and given it that theoretic air, that atmosphere of repulsion, in which it is invested." The ground on which we reject these two fundamental doctrines of Christianity is not because of their mere difficulty, their mysteriousness, that our understanding is not capable of grasping them. We believe in many things which are not cognizable by the logical faculty. We, for instance, believe in the existence of an external world though we have no knowledge of as to how it comes in contact with our mind. We believe in the existence of an *unknown* underlying *substance* in which all the phenomena we perceive inhere. In short "the sphere of our belief is much more extensive than the sphere of our knowledge." We therefore repudiate the Trinity and the Divinity of Christ not because they are difficult of comprehension but because they are contradictory and clash with our intuitive preceptions of Number, Time and Being.

As this is a very important subject relating to the nature and attributes of the Supreme Being, to which it is impossible to do justice in the compass of a single newspaper article, we may resume our considerations bearing upon this matter in future numbers of our Paper.

দুর্ভিক্ষ উপশমের সাহায্যার্থ দান প্রাপ্ত।

পূর্ব্বে বিজ্ঞাপিত		৫৩৪৷৶০
শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর		১৫৷৶০
গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-জব্বলপুর		২৫
মাখন সিং দারগা ..	ঐ	২৫
জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	১০
যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায় ..	ঐ	৪
ঈশ্বরচন্দ্র বসু	ঐ	৫
মাষ্টর বিঃ উইলিএমস্ পঞ্জাব		৮
ডেপুটি কমিসনর আপীষ	ঐ	৬।০
হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	ঐ	৭
বৈদ্যনাথ দে	ঐ	৫
ভগবানচন্দ্র মল্লিক ..	ঐ	৩
কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়	ঐ	১
নিমাইচন্দ্র দত্ত	ঐ	২
মূলচাঁদ	ঐ	৫
লালা গঙ্গারাম	ঐ	৫
গোলাম মহম্মদ খাঁ	ঐ	৫
হাজিগোলাম মহম্মদ খাঁ ..	ঐ	৫
করমহাইডর	ঐ	৫
চণ্ডুলাল	ঐ	৪৷৹০
লালাঘঙ্কারাম	ঐ	১
চফমন	ঐ	১
উত্তম চাঁদ	ঐ	১
সেখ মিহির বক্স	ঐ	১
পুলিষ আমলা হইতে প্রাপ্ত	ঐ	৮
নির্ম্মল দাস	ঐ	১
		১৫৯৷৶০
		৬৯৪

দুর্ভিক্ষ-গ্রস্ত দশে প্রেরিত।

পূর্ব্বে বিজ্ঞাপিত	৪৫০
সম্প্রতি প্রেরিত	১০০
	৫৫০
স্থিত	১৪৪

কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের ১৭৮৮ শকের ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	৪২৯
পুস্তকালয়	১৪০৸৶১০
যন্ত্রালয়	১৬৫৷৶০
ডাক মাসুল	৪১৸৵০
দুর্ভিক্ষে দান প্রাপ্ত	১৫৯৷৶০
দান প্রাপ্ত	৶০
গচ্ছিত	৯৩ ৶০
	১০৩০(১০

ব্যয়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	১১১৷৶১৫
পুস্তকালয়	১০২৵০
যন্ত্রালয়	১৬২।৶১০
মাসিক বেতন	২২৬।৵৫
ডাক মাসুল	৫৯৷৶০
অনিরূপিত	২২৷৫
আলোকের ব্যয়	২১৷৷১০
দুর্ভিক্ষ উপসমার্থ মেদিনীপুরে প্রেরিত	১০০
গৃহ সংস্কার	১১৷৶৫
গচ্ছিত	১৫৪৷৫
	৯৭২(১৫

আয়	১০৩০(১০
পূর্ব্বকার স্থিত	২২১(৫
	১২৫১(১৫
ব্যয়	৯৭২(১৫
স্থিত	২৭৯

শ্রী সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

১৭৮৮ শকের ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের দানের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত রমণীমোহন চৌধুরী	২৫
" শ্যামলাল পাল	২
	২৭

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার জন্য দান।

শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ..	৪

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত কাশীনাথ দে	৫
" কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়..	১
	৬

অনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	২
" দুর্গাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ..	১
	৩
	৪০

আয়	৪০
পূর্ব্বকার স্থিত .	১১৫৸০
	১৫৫৸০

ব্যয়

ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার জন্য মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজে দান	২০
শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসের সাম্বৎসরিক দান আদায় জন্য সকারের কমিসন	১৵০
	২১৵০
স্থিত	১৩৪৷৷৵০

শ্রী সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

অশুদ্ধ শোধন।

গত মাসের পত্রিকায় "মহাত্মা হরদেব চট্টোপাধ্যায়ের পরলোক প্রাপ্তি" প্রস্তাবে অনবধানতা বশত শ্রাবণ মাসের চতুর্থ রাত্রিতে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি লিখিত হইয়াছে। বাস্তবিক তিনি ভাদ্র মাসের চতুর্থ রাত্রিতে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাসুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২৩। কলিগতাব্দ ৪৯৩৭। ২৫ কার্ত্তিক শনি বার।

একমেবাদ্বিতীয়ং
ষষ্ঠ কল্প
চতুর্থ ভাগ
অগ্রহায়ণ ১৭৮৮ শক
২৮০ সংখ্যা ৩৭ ব্রাহ্মসম্বৎ

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদ সংহিতা

প্রথমমণ্ডলস্য ত্রয়োদশানুবাকে একাদশং সূক্তং।

গোতমঋষিঃ পংক্তিশ্ছন্দঃ ইন্দ্রোদেবতা।

৮৯৫

১১। তা অস্য পৃশনায়ুবঃ সোমং শ্রীণন্তি পৃশ্নয়ঃ। প্রিয়া ইন্দ্রস্য ধেনবো বজ্রং হিন্বন্তি সায়কং রস্বীরন্নু স্বরাজ্যং।

১১। 'তাঃ' পূর্ব্বোক্তাঃ 'অস্য' ইন্দ্রস্য 'পৃশনায়ুবঃ' স্পর্শনকামাঃ 'পৃশ্নয়ঃ' নানাবর্ণাঃ গাবঃ ইন্দ্রেণ পাতব্যং 'সোমং' পয়সা 'শ্রীণন্তি' মিশ্রীকুর্ব্বন্তি। 'ইন্দ্রস্য' 'প্রিয়াঃ' প্রীতিহেতুভূতাঃ তাঃ 'ধেনবঃ' 'সায়কং' শত্রূণাং অন্তকারকং 'বজ্রং' আয়ুধং 'হিন্বন্তি' শত্রুষু প্রেরয়ন্তি। ইন্দ্রো যথা শত্রুষু বজ্রং প্রেরয়তি তথা ইন্দ্রস্যেমদং উৎপাদয়ন্তীত্যর্থঃ। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ।

১১। সেই সমস্ত ইন্দ্রের করস্পর্শ লাভার্থী নানা বর্ণ ধেনু ইন্দ্রের পেয় সোম রসে দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া দেয় এবং যাহাতে ইন্দ্র শত্রু-সংহারক বজ্র শত্রুগণের প্রতি নিক্ষেপ করেন, উহারা ইন্দ্রের এই রূপ হর্ষোৎপাদন করিয়া দেয়। ইন্দ্র উহাদিগকে যথোচিত প্রীতি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ঐ সকল ধেনুই দুগ্ধ প্রদান পূর্ব্বক লোকের আশ্রয়ে থাকিয়া ইন্দ্রের রাজ্য লক্ষ্য করিয়া অবস্থান করে।

৮৯৬

১২। তা অস্য নমসা সহঃ সপর্য্যন্তি প্রচেতসঃ। ব্রতান্যস্য সশ্চিরে পুরূণি পূর্বচিত্তয়ে বস্বীরন্নু স্বরাজ্যং।

১২। 'প্রচেতসঃ' প্রকৃষ্টজ্ঞানাঃ 'তাঃ' গাবঃ 'অস্য' ইন্দ্রস্য 'সহঃ' বলং 'নমসা' স্বকীয়েন পয়োরূপেণ অন্নেন 'সপর্য্যন্তি' পরিচরন্তি। 'পুরূণি' বহূনি 'অস্য' ইন্দ্রস্য 'ব্রতানি' শত্রুবধাদিরূপাণি বীর্য্যকর্ম্মাণি 'সশ্চিরে' সেবিরে জ্ঞাপয়ন্ত ইত্যর্থঃ। কিমর্থং 'পূর্ব্বচিত্তয়ে' যুযুৎসূনাং শত্রূণাং পূর্ব্বমেব প্রজ্ঞাপনায়। অনেন যুধ্যমানাবৃত্রাদয়ঃ সর্ব্বে মরুৎ প্রাপ্তাঃ কিমর্থং ভবদ্ভিঃ প্রাণাংস্ত্যজন্তইতি তেষাং বোধনায়েত্যর্থঃ। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ।

১২। ঐ সমস্ত প্রকৃষ্ট-জ্ঞান-সম্পন্ন ধেনু স্বীয় দুগ্ধ দ্বারা ইন্দ্রের বলবীর্য্য পরিবর্দ্ধিত করিয়া দেয় এবং যুদ্ধার্থী শত্রুগণের পরিজ্ঞানার্থ ইন্দ্রের শত্রু বধাদি রূপ বহুবিধ কার্য্য প্রচার করিয়া থাকে। উহারাই দুগ্ধ প্রদান পূর্ব্বক লোকের আশ্রয়ে

BLEED THROUGH.

থাকিয়া ইন্দ্রের রাজ্য লক্ষ্য করিয়া অবস্থান করে।

৮৯৭

গায়ত্রং ছন্দঃ

১৩। ইন্দ্রো দধীচো অস্থভির্বৃত্রাণ্যপ্রতিষ্কুতঃ। জঘান নবতীর্নব।

১৩। অত্র শাট্যায়নিন ইতিহাস মাচক্ষতে। আথর্ব্বণস্য দধীচো জীবতো দর্শনেনাসুরাঃ পরাবভূবুঃ। অথ তস্মিন স্বর্গতে অসুরৈঃ পূর্ব্বা পৃথিব্যভবৎ। অথেন্দ্র স্তৈরসুরৈঃ সহ যোদ্ধু মশক্নুবন্ তমুষিমন্বিচ্ছন্ স্বর্গং গত ইতি শুশ্রাব। অথ পপ্রচ্ছ তত্রত্যান্ নেহ কিমস্য কিঞ্চিৎ পরিশিষ্টমস্তীতি। তস্মা অব্রোচন্ অস্ত্যেতদাশ্বং শীর্ষং যেন শিরসা অশ্বিভ্যাং মধু বিদ্যাং প্রাব্রবীৎ। তদু নাবিত্ত যত্রাভবৎ ইতি। পুন রিন্দ্রোঽব্রবীৎ তদন্বিচ্ছতেতি। তস্মাঽন্বৈষিষুঃ। তচ্ছর্যণাবত্যনু বিদ্যা জহ্রুঃ। শর্য্যণাবদ্ধবৈ নাম কুরুক্ষেত্রস্য জঘনার্দ্ধে সরঃ স্যন্দতে। তস্য শিরসোঽস্থিভি রিন্দ্রোঽসুরান জঘান ইতি। 'অপ্রতিষ্কুতঃ' পরৈরপ্রতিশব্দিতঃ প্রতিকূল শব্দ রহিতঃ 'ইন্দ্রঃ' আথর্ব্বণস্য 'দধীচঃ' এতৎ সঙ্কল্পস্য ঋষেঃ 'অস্থভিঃ' অস্থশিরঃ সম্বন্ধিভিঃ অস্থিভিঃ 'নবতীর্নব' নবসংখ্যাকা নবতীঃ দশোত্তরাষ্টশতসংখ্যাকাঃ। তথা হি লোকত্রয়বর্ত্তিনো দেবাঞ্জেতুমাদাবাসুরী মায়া ত্রিধা সংপদ্যতে। ত্রিবিধাতীতানাগতবর্ত্তমান কালভেদেন তৎকালবর্ত্তিনো দেবাঞ্জেতুং পুনরপি প্রত্যেকং ত্রিগুণিতা ভবতি। এবং নব সম্পদ্যতে। পুনরপি উৎসাহাদি শক্তিত্রয় রূপেণ ত্রৈগুণ্যে সতি সপ্তবিংশতিঃ সংপদ্যতে। পুনঃ সাত্ত্বিকাদি গুণত্রয় ভেদেন ত্রৈগুণ্যে সতি একোত্তরাশীতিঃ সংপদ্যতে। এবং চতুর্ভিস্ত্রিকৈর্গুণিতায়া মায়ায়া দশসু দিক্ষু প্রত্যেক মবস্থানে সতি নব নবতয়ঃ সংপদ্যতে। এবম্বিধ মায়ারূপাণি 'বৃত্রাণি' আবরকাণ্যসুরজাতানি 'জঘান' হতবান।

১৩। যাঁহার বিরুদ্ধে কেহই বাক্য স্ফূর্ত্তি করিতে পারে না, সেই ইন্দ্র মহর্ষি দধীচির অস্থি দ্বারা দশোত্তর অষ্টশত সংখ্য অসুরগণকে সংহার করিয়াছিলেন।

৮৯৮

১৪। ইচ্ছ্বশ্বস্য যচ্ছিরঃ পর্ব্বতেষ্বপশ্রিতং। তদ্বিদচ্ছর্যণাবতি।

১৪। 'পর্ব্বতেষু' পর্ব্ববৎসু গিরিষু 'অপশ্রিতং' অপগত্য স্থিতং 'অশ্বস্য' অশ্বসম্বন্ধি দধীচঃ 'যৎ' 'শিরঃ' 'ইন্দ্রঃ' ইন্দ্রো বর্ত্ততে 'শর্যণাবতি' এতৎ সংজ্ঞকে সরসি 'তৎ' শিরঃ 'বিদৎ' অজ্ঞাসীৎ জ্ঞাত্বা তদাহৃত্য তদীয়ৈঃ অস্থিভি র্বৃত্রাণি জঘানেতি পূর্ব্বস্যা মৃচি সম্বন্ধঃ।

১৪। ইন্দ্র পর্ব্বতস্থ দধীচির অস্থি প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন কিন্তু ঐ অস্থি শর্যনাবৎ নামক সরোবরে আছে ইহা জানিতে পারিয়া তাহা আহরণ পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত অসুরগণকে সংহার করেন।

৮৯৯

১৫। অত্রাহ গোরমন্বত নাম ত্বষ্টুরপীচ্যং। ইত্থা চন্দ্রমসো গৃহে। ১। ৬। ৭।

১৫। 'অত্রাহ' অস্মিন্নেব 'গোঃ' গন্তুঃ 'চন্দ্রমসঃ' 'গৃহে' মণ্ডলে 'ত্বষ্টুঃ' দীপ্তস্য আদিত্যস্য সম্বন্ধি 'অপীচ্যং' রাত্রৌ অন্তর্হিতং স্বকীয়ং যৎ 'নাম' তেজঃ তৎ আদিত্যস্য রশ্ময়ঃ 'ইত্থা' ইত্থং অনেন প্রকারেণ 'অমন্বত' অজানন্। উদ্গমযে স্বচ্ছে চন্দ্রবিম্বে সূর্য্যকিরণাঃ প্রতিফলন্তি। তত্র প্রতিফলিতাঃ কিরণাঃ সূর্য্যে যাদৃশীং সংজ্ঞাং লভন্তে তাদৃশীং চন্দ্রেপি বর্ত্তমানা লভন্ত ইত্যর্থঃ। এতদুক্তং ভবতি। যত্রাত্রাবস্তর্হিতং সৌরং তেজঃ তৎ চন্দ্রমণ্ডলং প্রবিশ্যাহনীব নৈশং তমো নিবার্য্য সর্ব্বং প্রকাশয়তি। ঈদৃগ্ভূত তেজসা যুক্তঃ সূর্য্যশ্চন্দ্রঃ এব দ্বাদশাদিত্যেষ্বিন্দ্রস্যাপি পরিগণিতত্বাৎ। অতোঽহোরাত্রয়োঃ প্রকাশক ইন্দ্রএব ইতি ইন্দ্রস্ততঃ প্রতীয়মানত্বাৎ ইন্দ্রো দেবতেত্যেতৎ উপপন্নং ভবতি। ঈদৃগ্ভূতস্য তেজসঃ আশ্রয়ত্বেন চন্দ্রমসঃ প্রাধান্য বিবক্ষয়া চান্দ্রমস্যামিষ্টৌ বিনিযোগোঽপ্যুপপদ্যতে। ১। ৬। ৭।

১৫। এই রাত্রিকালে গমনশীল চন্দ্র মণ্ডলে যে তেজ অন্তর্হিত আছে, তাহাকেই দীপ্তিমান সূর্য্য-রশ্মি বলিয়া জানিবে। দ্বাদশাদিত্য মধ্যে পরিগণিত ইন্দ্রই সেই সূর্য্য। ১। ৬। ৭।

ব্রাহ্মধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কার।

এক্ষণে কেবল যে ধর্ম্ম-সংস্কারেই সকলে ব্যস্ত হইয়া আছেন, এমন নহে; সমাজ-সংস্কারের জন্যও ঘোরতর আন্দোলন চলিয়াছে। এক্ষণে ভারত বর্ষে সমুদায় বিষয়েরই পরিবর্ত্ত-লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। এইক্ষণে যে প্রকার জ্ঞান শিক্ষা হইতেছে, ইহাতে অনেকেই সমাজের বর্ত্তমান অবস্থাকে আর আপনাদের উপযোগী বোধ করিতেছেন না। যদিও সমাজের উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত অদ্যাপি রীতিমত প্রকাশ্য সম্প্রদায় নির্ম্মিত হয় নাই, তথাপি তদ্বিষয়ক উদ্যমের নিতান্ত অভাব নাই। যে ধর্ম্মের সহিত ইহ লোক ও পরলোকের সবিশেষ সম্বন্ধ, যে ধর্ম্ম বিষয়ক কুসংস্কার প্রায় তাবৎ উন্নতিকেই রুদ্ধ করিয়া রাখে, সেই ধর্ম্ম-সংস্কারই সকল অপেক্ষা গুরুতর কার্য্য। ব্রাহ্মসমাজ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সেই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ধর্ম্ম-সংস্কারের সহিত সমাজ-সংস্কারের অতি নিকটতর সম্বন্ধ—বিশেষত এক্ষণে সমাজ-সংস্কার লইয়া ব্রাহ্মগণের মধ্যে সাতিশয় আন্দোলন চলিয়াছে এবং অনেকে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারকে একীভূত করিয়া বুঝিতেছেন; এই জন্য এই দুইটি বিষয় বিশদ-রূপে বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক হইতেছে।

চির-সেব্য ধর্ম্ম ও নৈমিত্তিক কার্য্য এক ভাবে গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কার একাকার হইয়া মহান্ অনর্থ উপস্থিত করিবে। সমাজ-সংস্কার ও সভ্যতা-বর্দ্ধন যদি ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের অঙ্গ মধ্যে প্রবিষ্ট করা হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মধর্ম্ম কেবল সংস্কৃত ও সভ্য সমাজেরই ধর্ম্ম হইয়া থাকিবে। বিশ্বজনীন, আধ্যাত্মিক ও উদারতর বলিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের যে মহিমা কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, তাহার যথেষ্ট হানি করা হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম নিত্য-সেব্য; যেমন প্রতিদিন অন্ন-পান গ্রহণ করিতে হইবে, সেই রূপ প্রতিক্ষণে ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রতিপালন করিতে হইবে। সমাজ-সংস্কারের ভাব এ রূপ নহে; যখন যে বিষয়ে যত দূর সংস্কার করা আবশ্যক হইয়া উঠিবে, তখন তত দূর পর্য্যন্ত সিদ্ধ করিতে হইবে। কি যুবা কি বৃদ্ধ, কি স্ত্রী কি পুরুষ, কি সভ্য কি বর্ব্বর, ধর্ম্ম সকলেরই আশ্রয় ভূমি ও আরাম-স্থান; কিন্তু সমাজ-সংস্কারে অবচ্ছেদাবচ্ছেদে সকলেই অগ্রসর হইতে পারে না। সমাজ-সংস্কার ও সভ্যতা বর্দ্ধনের অন্ত নাই; যত দিন বিচিত্র-প্রকৃতি মনুষ্য-কুল পৃথিবীতে সমাজ-বদ্ধ হইয়া থাকিবে, ততদিন প্রতিদিনই সমাজ-সংস্কার ও সভ্যতার নূতন নূতন কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে হইবে। কিন্তু ঈশ্বরোপাসনা, সত্য-নিষ্ঠা, ন্যায়-ব্যবহার, আত্মসংযম প্রভৃতি ব্রাহ্মধর্ম্মের অঙ্গ সমুদায় দেশ কাল ও অবস্থার প্রতি নিরপেক্ষ হইয়া নিরন্তর প্রতিপালন করিতেই হইবে। ধর্ম্ম সকল কার্য্যেরই নিয়ামক; সমুদায়ই ধর্ম্মের অধীন করিয়া অনুষ্ঠান করিতে হইবে; কিন্তু ধর্ম্ম সমাজেরও অধীন নহে, রাজনীতিরও দাস নহে এবং কৃষি বাণিজ্যেরও মুখাপেক্ষী নহে। ব্রাহ্মধর্ম্ম একেশ্বর-প্রতিপাদক, অপৌত্তলিক ধর্ম্ম; যাঁহারা বিশ্বাস ও কার্য্যে এক মাত্র ঈশ্বরকে অঙ্গীকার করিবেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম তাঁহারদিগেরই নিজস্ব। সমাজ-সংস্কার প্রভৃতি সাংসারিক কার্য্য লইয়া ব্রাহ্মেরা যদি আপনার রুচি অনুসারে ধর্ম্মের অবিরোধে সহস্র মতে বিভক্ত হইয়া যান, ব্রাহ্মধর্ম্ম সেই সকলেরই সাধারণ সম্পত্তি হইবে। যে সকল বিধবা পরলোকবাসী পতির প্রতি আত্যন্তিক অনুরাগ নিবন্ধন আত্ম-সংযম পূর্ব্বক চিরজীবন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিবে, আর যাহারা দ্বিতীয় ভর্ত্তা গ্রহণ করিয়া পুনরায় গার্হস্থ্য ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবে; ব্রাহ্মধর্ম্ম উভয়েরই অবলম্বন হইবেন। যদি কোন স্ত্রী বা পুরুষ চিরজীবন

BLEED THROUGH.

অনুঢ়াবস্থায় অবস্থান করে, ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহারদিগের নিমিত্তও মুক্তদ্বার থাকিবেন। নিজ বর্ণেই অবস্থান কর, আর বর্ণান্তরের সহিত সংকীর্ণ হইয়া যাও; ব্রাহ্মধর্ম্ম উভয়েরই আশ্রয় হইবেন। ফলত ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ সকলকেই আহ্বান করিতেছেন এবং সকলেরই আরামস্থান ও শান্তিনিকেতন হইয়া আছেন।

সমাজ-সংস্কার ও সভ্যতা নিতান্ত বাঞ্ছনীয় হইলেও তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের লক্ষণ বলিয়া কখনই পরিগৃহীত হইতে পারে না; কিন্তু আমারদের এরূপ বলিবার বিলক্ষণ অধিকার আছে যে ব্রাহ্মেরা ব্যতীত সমাজ সংস্কারে ও সভ্যতা বর্দ্ধনে আর কে অগ্রসর হইবে? ব্রাহ্মধর্ম্ম উন্নতির সমুদায় প্রতিবন্ধক দূরীকৃত করিতেছে। ব্রাহ্মেরা যেমন ধর্ম্ম বিষয়ে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন; সেই রূপ এক্ষণে আপনার আপনার সামর্থ্য, অবস্থা ও অভিরুচি অনুসারে উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশুদ্ধ আচার-ব্যবহার প্রভৃতিতে সকল দেশের অগ্রগণ্য হইয়া মাতৃ-ভূমির মুখ উজ্জ্বল করিতে থাকুন। এ সকল বিষয়ে ব্রাহ্ম ব্যতিরেকে আমরা আর কাহার মুখ চাহিয়া থাকিতে পারি?

ব্রাহ্মেরা ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছার অনুকরণ করিয়া সাধ্যানুসারে সমাজ-সংস্কারে অগ্রসর হন; যে সকল ভয়ানক দোষে জন-সমাজ আকুলীভূত হইয়া আছে, উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা দূরীকৃত করেন; পরস্পরের স্বাধীনতা ও সুখ স্বচ্ছন্দতার অব্যাঘাতে সামাজিক নিয়ম-সকল পরিবর্ত্তিত, সংশোধিত ও সংস্থাপিত করেন; ইহা ধনজন বিদ্যা বুদ্ধি প্রভৃতি বহুবিধ উপকরণ-সাপেক্ষ হইলেও নিতান্ত প্রার্থনীয়, তাহার কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

থিওডোর পার্কর।

২৭১ সংখ্যক পত্রিকার ১৫০ পৃষ্ঠার পর।

যদি আমরা মনুষ্য জাতির ধর্ম্ম সংক্রান্ত ইতিহাস পর্য্যালোচনা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে মনুষ্যের সভ্যতার তিন প্রকার অবস্থায় উপাসনার তিনটি মত প্রস্তুত হইয়াছে। প্রথম জড়োপাসনার মত, দ্বিতীয় পুরুষোপাসনার মত, তৃতীয় একেশ্বরোপাসনার মত। যদি স্থির চিত্তে অনুধ্যান করা যায়, তাহা হইলে এই তিন শ্রেণীকেই বাহ্য ও অসম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হইবে, কিন্তু আপাতত আমাদিগের এই প্রস্তাবের বিশেষ উপযোগী বলিয়া উহা ঐ রূপেই কল্পিত হইল। এই তিন প্রকার উপাসনা প্রত্যেক জাতিতে প্রায় দৃষ্ট হয়। এক প্রণালী যে স্বতন্ত্র একটি জাতিকে অধিকার করিয়া রহিয়াছে তাহা নহে। দেখ খৃষ্ট পৌত্তলিক জাতিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াও এক মাত্র সত্য স্বরূপ ঈশ্বরের উপাসক হইয়াছিলেন। আবার এমনও অনেক লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা বিশুদ্ধ ধর্ম্মানুসারী অপৌত্তলিক জাতির মধ্যে সঞ্জাত ও প্রতিপালিত হইয়াও বহু সংখ্য দেবতার উপাসক হইয়াছে। সুতরাং ইহা দ্বারা এক প্রকার প্রতিপন্ন হইতেছে যে যাহার যে রূপ আধ্যাত্মিক উন্নতি, তাহার ধর্ম্মও তদনুরূপ উন্নত হয়।

যে ধর্ম্ম-প্রভাবে পশু পক্ষী প্রভৃতি অতি প্রকাণ্ড গ্রহ নক্ষত্র পর্য্যন্ত স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভৌতিক পদার্থ সমুদায়ের উপাসনা করা যায়, তাহাকে জড়োপাসনা বলে। এই জড়োপাসনার নানা প্রকার বিধি ও প্রণালী আছে। তৎসমুদায় অতি প্রাচীন কালের ন্যায় এক্ষণেও অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে বহুল পরিমাণে প্রচলিত হইয়াছে। যখন মনুষ্য সমাজ কএক পদ মাত্র উন্নতি

পদবীতে আরোহণ করে, যখন সভ্যতার অত্যল্পই উন্মেষ হয়, যখন সামাজিক আচার ব্যবহার নিতান্ত বন্য ও যৎসামান্য থাকে, যখন মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি কারণ অনুধাবন না করিয়া কার্য্য করে, যখন মনুষ্য প্রকৃতি ও আপনাকে জানিতে না পারে, তখনই এই জড়োপাসনা প্রবর্ত্তিত হয়। কোন কোন মহাত্মা কহিয়া থাকেন যে, মনুষ্যের ভ্রম জ্ঞানের পূর্ব্বে প্রমা জ্ঞান জন্মে; সুতরাং তাহারা সর্ব্বাগ্রেই ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস ও এক মাত্র তাঁহারই উপাসনা করে। মনুষ্যের ভাব মনুষ্যকে স্বভাবতই এক ঈশ্বরের দিকে লইয়া যায়। যদি ভাবের কার্য্য গুলি সম্পূর্ণ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে এই প্রকার অনুমান সঙ্গত, সন্দেহ নাই, কিন্তু যখন মনুষ্যের অসভ্যতার সহিত অনভিজ্ঞতার একান্ত প্রাদুর্ভাব থাকে, তখন ভাবের প্রকৃতি অনুসারে কার্য্য কদাচই অনুষ্ঠিত হয় না, সুতরাং তৎকালে ধর্ম্মভাব আপনার বিষয় ঈশ্বরকে বিস্মৃত হয়।

এই ধর্ম্মে পশুপক্ষী মৃৎ পাষাণ প্রভৃতি স্থাবর জঙ্গমাত্মক পদার্থ-সমুদায় দেবতা বোধে উপাসিত হইয়া থাকে। এই সমস্ত উপাস্য পদার্থ পশু পক্ষী ও মৃৎ পাষাণ রূপে পরিগণিত না হইয়া ঈশ্বরের স্বরূপ বলিয়াই পরিকল্পিত হয়। জড়োপাসকেরা কহিয়া থাকেন যে, প্রকৃতি ঈশ্বরের ছায়া; ঈশ্বর স্বয়ং প্রকৃতিরূপ ছদ্মমুখে অবস্থান করিতেছেন। সুতরাং এস্থলে স্থাবর জঙ্গমাত্মক পদার্থ সমুদায় স্বরূপ-বুদ্ধিতে কদাচই উপাসিত হইতেছে না। দেখ, ইজিপট্ দেশীয়েরা কুম্ভীরের উপাসনা করিয়া থাকে। উহারা কহে যে, এই জন্তু ঈশ্বরের প্রকৃত প্রতিরূপ; অন্যান্য জন্তুর ন্যায় ইহার জিহ্বা নাই এবং ঈশ্বরও আপনার মহিমা ও শক্তি স্বমুখে ব্যক্ত করিতে চাহেন না। এই রূপ যে জাতি যে কোন জন্তুর আরাধনা করে, সেই জন্তুর এই প্রকার এক একটি অসামান্য গুণের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। কোন জন্তুর বাত্যা প্রভৃতি কএকটি প্রাকৃতিক ঘটনা উপস্থিত হইবার স্বাভাবিক পূর্ব্বজ্ঞান, কোন জন্তুর অসম্ভব বশ্যতা, কোন জন্তুর আন্তরিক ভাবের অনববোধ, এই সমস্ত গুণ উহাদিগকে মনুষ্যের অতীত শক্তিতে ব্যবস্থাপিত করিয়া দিতেছে। এই সমস্ত গুণের সদ্ভাবই উহাদিগকে আরাধ্য করিয়াছে। এই সম্প্রদায় সামান্য পদার্থে সেই অনন্ত জ্ঞান অনন্ত শক্তি ঈশ্বরেরই উপাসনা করিয়া থাকে। কিন্তু যে মনুষ্যজাতির জ্ঞান ও শক্তি অবগত হওয়া যাইতেছে, এ অবস্থায় সে কদাচই উপাসনার উপযুক্ত হইতে পারে না।

এই কাল্পনিক ধর্ম্ম প্রকৃত সত্য ধর্ম্মের শৈশবাবস্থা। এস্থলে মনুষ্যের ধর্ম্মভাব নিতান্ত অনুন্নত অবস্থায় পোষিত হইতেছে। বাহ্য-জ্ঞান চিন্তার উপর আধিপত্য করিতেছে এবং প্রকৃতিতে ঈশ্বরত্ব আরোপিত হইতেছে। সমস্ত প্রকৃতিই ঈশ্বর। এই ধর্ম্মের প্রভাবে পূর্ণতা অপূর্ণতায় নিহিত এবং স্রষ্টা অপেক্ষা সৃষ্ট পদার্থই পূজিত হইতেছে। এই ধর্ম্মের আবার উচ্চ ও নীচ এই দুইটি প্রণালী আছে। পশুপক্ষীর আরাধনা ইহার নীচ প্রণালী এবং চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি প্রকাণ্ড জড়পিণ্ডের আরাধনা উচ্চ প্রণালী বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। গ্রিশ দেশীয় পণ্ডিত ও ভারতবর্ষীয় পূর্ব্বতন আচার্য্যেরা এই উচ্চ প্রণালীর অনুসারে বিশ্বকেই ঈশ্বর বোধ করিয়া আরাধনা করিতেন। তৎকালে তাঁহারা ঈশ্বরকে বিশ্ব হইতে স্বতন্ত্র দেখিতেন না। সুতরাং বিশ্বোপা-

BLEED THROUGH.

সনা ও জড়োপাসনা প্রায় একই প্রকার বলিতে হইবে।

এই সম্প্রদায় মধ্যে প্রত্যেকেরই পশু-পক্ষী চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি এক একটি নির্দ্দিষ্ট দেবতা আছে। এই সমস্ত পদার্থ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা ঈশ্বরের সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষ প্রতিরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এই সম্প্রদায়ীরা এই রূপ বিবেচনা করে যে, এই সমস্ত উপাস্য পদার্থ মনুষ্যের ন্যায় জীবনসম্পন্ন। এই অবস্থায় পুরোহিত বলিয়া একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সকলেই ইচ্ছানুসারে আপনার ইষ্ট দেবতার সন্নিহিত হইতে পারিত। এক জন মধ্যবর্ত্তী পুরুষের সাহায্য ব্যতিরেকেই প্রত্যেকে ঐ অভীষ্ট দেবতার উপাসনা ও তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে সমর্থ হইত। উপাসনার কিছুমাত্র নিয়ম ছিল না। উপাসকেরা স্ব স্ব ইচ্ছানুসারে উপাসনা সম্পন্ন করিত। এই ধর্ম্মে নির্দ্দিষ্ট কোন একটি অধিকার ও ধর্ম্মসংক্রান্ত মত প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। প্রত্যেকেই স্ব স্ব ধর্ম্মানুমোদিত বিষয় গোপন করিয়া রাখিত।

যত দিন মনুষ্যেরা ঘোরতর অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, তত দিন এই জড়োপাসনার প্রাদুর্ভাব দৃষ্টিগোচর হইত। অনন্তর যখন বস্তুগত গুণের প্রত্যাহার ও তাহার ব্যাপ্তি নিরূপণ করিবার শক্তি মনুষ্যের পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল, যখন বাহ্য প্রকৃতির গুণ উহাদের সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইল, তখন এক একটি গৃহের এক একটি প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান দেবতা প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। পরে সেই দেবতা এক একটি জাতির দেবতা বলিয়া পরিগণিত হইল। কিন্তু এই সমস্ত দেবতার শক্তি পরিমিত বলিয়া সকলেই স্বীকার করিত।

এই রূপে যখন পরিবার ও জাতি সাধারণের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেবতা কল্পিত হইল, তখন উহাঁদের ইচ্ছা হৃদয়ঙ্গম করাইতে এবং দুঃখ নিবৃত্তি ও সুখ বৃদ্ধির আনুকূল্য প্রার্থনা করিতে পুরোহিত আবশ্যক হইল। প্রথমত এই পুরোহিত দিগের এই রূপ ক্ষমতা ছিল যে ইহাঁরা কেবল আধ্যাত্মিক ব্যবস্থাই প্রদান করিবেন। পরিশেষে ইহাঁরা কত গুলি দেবরহস্য প্রস্তুত করিলেন। দেবগণকে সাধারণ-জ্ঞানের অবিষয়ীভূত বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। কত গুলি মত, বিধি ও প্রণালী প্রতিষ্ঠিত করিলেন। উপাসকদিগের প্রতি অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমশ তাঁহাদিগের রাজ্য শাসন শক্তি অধিকার করিবার স্পৃহা বলবতী হইয়া উঠিল। তখন তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া একটি ঐশ্বরিক রাজত্ব সংস্থাপন করিলেন। নিকৃষ্ট অনিয়ন্ত্রিত প্রভুত্ব আধিপত্য করিতে লাগিল। এই রূপ পৌরোহিত্য রীতি সর্ব্বাগ্রে আরব্ধ হইয়া বহু কাল চলিয়া আসিয়াছিল। এক্ষণেও যে জাতি সভ্যতার সুনির্ম্মল আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে, সেই জাতি মধ্যেও এই পৌরোহিত্যাধিকার নয়ন গোচর হইয়া থাকে।

দমেন সদৃশং ধর্ম্মং নান্যং লোকেষু শুশ্রুম।
দমোহি পরমোলোকে প্রশস্তঃ সর্ব্বধর্ম্মিণাং॥
সুখং দান্তঃ প্রস্বপিতি সুখঞ্চ প্রতিবুধ্যতে।
দমস্তেজোবর্দ্ধয়তি পবিত্রঞ্চ দমঃ পরং॥
অদান্তঃ পুরুষঃ ক্লেশং অভীক্ষ্ণং প্রতিপদ্যতে।
অনর্থাংশ্চ বহূনন্যান প্রসৃজত্যাত্মদোষজান্॥
সত্যং সৎসু সদা ধর্ম্মঃ সত্যং ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।
সত্যমেব নমস্যেত সত্যং হি পরমা গতিঃ॥
সত্যং নামাব্যয়ং নিত্যং অবিকারি তথৈবচ।
সর্ব্বধর্ম্মাবিরুদ্ধেন যোগেনৈতদবাপ্যতে॥

মহাভারত শান্তি পর্ব্ব।

বিজ্ঞান

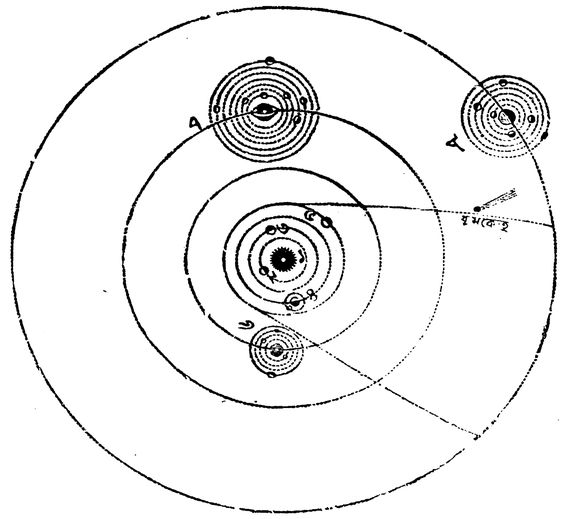

আমরা রজনীতে নভোমণ্ডলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দেখিতে পাই যে, নির্ম্মল নীলবর্ণ অতি বিস্তীর্ণ শূন্যময় প্রদেশে হীরকের ন্যায় উজ্জ্বল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিঃপদার্থ সমুদায় অবিরল ভাবে লম্বিত রহিয়াছে। এই সমস্ত দেখিবামাত্র বিস্ময়াবেশে অতিমাত্র অভিভূত হইয়া মনোমধ্যে স্বভাবতই এই রূপ প্রশ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে যে, যাঁহার অঙ্গুলি-সঙ্কেতে এই সমস্ত অদ্ভুত প্রকাণ্ড জড়পিণ্ড অসীম আকাশ মধ্যে প্রচণ্ড বেগে ভ্রাম্যমান হইতেছে, তিনি কি পৃথিবীর ন্যায় ইহাদিগকে মনুষ্য-সদৃশ কোন জীবের বাসোপযোগী করিয়া দিয়াছেন? ঐ সমস্ত জ্যোতিঃ পদার্থে কি এমন সকল জীব বাস করে যাহারা বিবেচনার নিমিত্ত বুদ্ধিবৃত্তি, স্মরণ করিবার নিমিত্ত স্মৃতি শক্তি এবং দয়া স্নেহ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায় অধিকার করিতেছে? উহাতে কি উষারাগ ও সন্ধ্যার শোভা পর্য্যায়ক্রমে জীবগণের নয়ন মন অপহরণ করে? ঐ সমস্ত স্থানে জলদজাল যথাকালে উদিত হইয়া কি উদ্ভিজ্জ রাজ্যের যথোচিত শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিয়া থাকে?

মনুষ্য এই কৌতূহল চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত দূরবীক্ষণের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা অতি দূরতর পদার্থ অপেক্ষাকৃত সমক্ষে আনয়ন পূর্ব্বক তাহার বিষয় অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু দূরবীক্ষণ দ্বারাও এই জ্ঞাতব্য বিষয় সুস্পষ্ট কাহারই হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। মনে কর, একটি পদার্থ সহস্র ক্রোশ ঊর্দ্ধে দৃষ্টি গোচর হইতেছে কিন্তু দূরবীক্ষণের সাহায্যে তাহাকে যেন দুই ক্রোশ ব্যবধানে আনয়ন করা গেল। এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, যে বস্তু দুই ক্রোশ অন্তরে আছে আমরা কি তাহার বিষয় সুস্পষ্ট কিছু জানিতে পারি। কখনই নহে। সুতরাং এই বিষয়ের যতদূর জ্ঞাত হওয়া যায়, বিজ্ঞানবিৎ মহাত্মাদিগের অ-

BLEED THROUGH.

ভ্রান্ত অনুমানই তাহার কারণ। এই পরিদৃশ্যমান পৃথিবীর ভৌতিক নিয়ম-সমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়া ইহাকে যেমন জীব জন্তুর বাসোপযোগী বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হয়, সেই রূপ দূরস্থ গ্রহ ও উপগ্রহ সমূহের সূর্য্যের সহিত সম্বন্ধ, গতি, ভৌতিক প্রকৃতি ও অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া উল্লিখিত বিষয়ের এক প্রকার মীমাংসা করা যায়।

এক্ষণে বিজ্ঞানের সাহায্যে যতগুলি গ্রহ ও উপগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে বুধ, শুক্র ও মঙ্গল গ্রহকে আমরা রঙ্গস্থলে আনয়ন করিলাম। এই তিনটি গ্রহ পৃথিবীর সহিত নিরন্তর সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে এবং ইহারা অন্যান্য গ্রহ অপেক্ষা সূর্য্যের সন্নিহিত। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে এই তিন গ্রহের বিষয় উল্লেখ করিয়া পরিশেষে অন্যান্য গ্রহের বিষয়ও বিবৃত করিব।

সর্ব্বস্রষ্টা পরমেশ্বর এই অধিষ্ঠানভূতা পৃথিবীকে সর্ব্বতোভাবে মনুষ্য ও অন্যান্য জীব জন্তুগণের বাসোপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ইহাতে যে রূপ ব্যবস্থা স্থাপন করিয়া দিয়াছেন মনুষ্য ও অন্যান্য জীব জন্তুর প্রকৃতির সহিত তৎসমুদায়ের বিলক্ষণ একটি সামঞ্জস্যও রাখিয়াছেন। দেখ, আমাদিগের দেহের কত অভাব; কখন ক্ষুধা কখন তৃষ্ণা উপস্থিত হইতেছে এবং বাহ্য জগতে সেই ক্ষুধার অন্ন ও তৃষ্ণার জলও আছে। যদি পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি না থাকিত, তাহা হইলে আমরা কখনই দুর্ব্বহ শরীর ভার ধারণ করিতে পারিতাম না। আবার যদি পৃথিবীর এই আকর্ষণী শক্তি প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক হইত, তাহা হইলে আমরা কখনই দ্রুত-পদে গমন করিতে পারিতাম না; কিন্তু জগদীশ্বর আমাদিগের স্বৈর গমনের সুবিধা বিধানের নিমিত্ত পৃথিবীর এই শক্তিকে পরিমিত করিয়া দিয়াছেন। আমরা নানা প্রকার কার্য্য বশত শারীরিক ও মানসিক ক্লেশে একান্ত ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইতেছি, কিন্তু বাহ্য জগতে পর্য্যায়ক্রমে দিবস ও রজনী উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে সতেজ ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত করিতেছে। নিরবচ্ছিন্ন এক রূপ ঋতু রাজত্ব করিলে মনুষ্যাদি জীব জন্তু ও তরু লতা প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ সমূহের জীবিত থাকা নিতান্ত অসম্ভব হইত; কিন্তু সময়ে সময়ে ঋতু পরিবর্ত্ত হইয়া সেই অনিষ্ট নিবারিত হইতেছে। আমরা আমাদিগের এই রূপ প্রকৃতি ও জগতের এই রূপ ভাব দেখিয়া অসঙ্কুচিত চিত্তে মুক্তকণ্ঠে কি স্বীকার করিতে পারি না যে এই পৃথিবী আমাদিগেরই বাসার্থ সৃষ্ট হইয়াছে?

এক্ষণে এই একটি জিজ্ঞাস্য উপস্থিত হইতে পারে যে, যে সকল গ্রহ নির্দ্দিষ্ট কাল মধ্যে সূর্য্যকে বেষ্টন করিতেছে, যদি তাহাদিগের আকৃতি ও প্রকৃতি পৃথিবীর অনুরূপ হয়; যদি ঐ সমস্ত স্থানে নিয়ত কাল বায়ুর সঞ্চার থাকে; সূর্য্যের আলোক ও উত্তাপ নিয়মিত রূপে নিপতিত হয়, যদি তথায় দিবস ও রজনী পর্য্যায় ক্রমে গমনাগমন করে ও ঋতু পরিবর্ত্তন হয়, তাহা হইলে কি এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না যে ঐ সকল দূরতর প্রদেশও মনুষ্যের ন্যায় কোন জীবের বাসভূমি হইবে? যদি আমরা প্রত্যক্ষ ও অনুমান কোন প্রমাণই না পাই, তাহা হইলে আমাদিগের অন্তর হইতে এই বিশ্বাস অবশ্যই উৎপন্ন হইবে যে, যিনি এই পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহা হইতেই ঐ সমস্ত গ্রহ নক্ষত্র নিঃসৃত হইয়া এই অসীম নিরালম্ব প্রদেশে লম্বমান হইতেছে। যখন তিনি এক বিন্দু জলবিম্বকে সহস্র সহস্র জীবের আবাসস্থান করিয়া দিয়াছেন, তখন

ঐ সমস্ত জ্যোতিঃ পদার্থকে জীব-শূন্য করিয়াছেন ইহা কখনই বোধ হয় না।

পূর্ব্বে যে বুধ, শুক্র ও মঙ্গল গ্রহের উল্লেখ করা গিয়াছে, তৎসমুদায়ে কি প্রকার প্রাকৃতিক গুণ বিদ্যমান রহিয়াছে, এক্ষণে তাহার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য হইতেছে। এই তিনটি গ্রহ পৃথিবীকে সমভিব্যাহারে লইয়া নিয়তকাল সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। ইহাদের আকার গোল এবং ইহাদিগের পরিমাণ-ফল প্রায় একই রূপ। কিন্তু মধ্যবর্ত্তী সূর্য্য হইতে ইহাদের পরস্পরের অন্তর অতিশয় বিস্ময়কর। বুধ গ্রহ অপেক্ষাকৃত সূর্য্যের সন্নিকৃষ্ট। ইহা সূর্য্য হইতে প্রায় ৩৬০০০,০০০ মাইল অন্তরে আছে। শুক্র গ্রহ সূর্য্য হইতে ৬৮০০০,০০০ মাইল এবং মঙ্গল গ্রহ প্রায় ২৫০,০০০,০০০ মাইল অন্তর। পৃথিবী সূর্য্যের ৯৫০০০,০০০ মাইল অন্তরে থাকিয়া উহা হইতে যে রূপ উপকার প্রাপ্ত হইতেছে, উল্লিখিত তিনটি গ্রহ তদপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে। ভূলোক-সদৃশ অন্য পঞ্চপঞ্চাশ গ্রহ ও উপগ্রহ এই বিশাল সূর্য্য লোকের চতুর্দ্দিকে প্রচণ্ডবেগে নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে, কিন্তু করুণাময় জগদীশ্বর ইহাদের প্রত্যেকেরই এমনি প্রাকৃতিক শক্তি প্রদান করিয়াছেন যে, সূর্য্য হইতে যতটুকু উপকার আবশ্যক, ইহারা অপেক্ষাকৃত সন্নিহিত ও দূরস্থ হইয়াও তাহাই প্রাপ্ত হইতেছে।

আমরা অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই যে, আলোক ও উত্তাপ এই দুই বস্তু উদ্ভিজ্জ ও জীব জন্তুর বিশেষ উপযোগী; এমন কি, আলোক ও উত্তাপ যে পরিমাণে আবশ্যক, তাহার অভাব উপস্থিত হইলে স্থাবর ও জঙ্গম কোন ভৌতিক পদার্থই শরীর ধারণ করিয়া থাকিতে পারে না। যেস্থানে কেবল শীত বা কেবল উত্তাপের প্রাদুর্ভাব, সে স্থান উদ্ভিজ্জ ও জীব জন্তুর একান্ত অনুপযোগী। শীত ও উত্তাপ এই দুই পদার্থের যথোচিত সামঞ্জস্য না থাকিলে উদ্ভিজ্জ ও জীব জন্তু ক্ষণমাত্রও অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না। উত্তাপের যেমন আবশ্যকতা আলোকেরও আবার সেইরূপ উপযোগিতা আছে। যে পরিমাণে আলোক আবশ্যক, তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইলে দর্শনেন্দ্রিয় কোনক্রমেই আপনার কার্য্য সাধন করিতে পারে না। কিন্তু জগদীশ্বরের কি আশ্চর্য্য করুণা, কি অদ্ভুত শক্তি! তিনি এই বিশাল বিশ্ব-রাজ্যে কেমন কৌশলে আলোক ও উত্তাপ পরিমিত রূপে পরিবেশন করিতেছেন।

এক্ষণে কি উপায়ে আলোক ও উত্তাপ প্রাপ্তির ব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছে, তাহা আলোচনা করা আবশ্যক। মনে কর একস্থলে একটি অগ্নিকুণ্ড আছে। এক্ষণে আমি কিরূপ উপায় উদ্ভাবন করিয়া তাহা হইতে একই প্রকারে আলোক ও উত্তাপ গ্রহণ করিব। আমি যদি সমসূত্রপাতে ঐ অগ্নির নিকট দিয়া গমন করি, তাহা হইলে যতক্ষণ তাহার নিকটে থাকিলাম, তদবধিই আলোক ও উত্তাপ লাভের সুবিধা হইল; কিন্তু সেই অগ্নি হইতে একটু অন্তর হইলেই তদ্বিষয়ে এককালে বঞ্চিত হইলাম। কিন্তু যদি সমসূত্রপাতে না গিয়া উহাকে প্রদক্ষিণ করি, তাহা হইলে যতক্ষণ ইচ্ছা আলোক ও উত্তাপ একই প্রকারে লাভ করিতে পারি। প্রদক্ষিণ করিতে হইলে মধ্যবিন্দু হইতে অন্তরটি একই রূপ থাকিবে; সুতরাং মধ্যবিন্দু হইতে যাহা লাভ করিতে হইবে, তাহা একই প্রকারে উপলব্ধ হইবে। তাহার ন্যূনাতিরেক কদাচই উপস্থিত হইবে না। গ্রহ সকল সূর্য্য হইতে যে আলোক

ও উত্তাপ লাভ করিতেছে, তাহাও এই নিয়মের অধীন। উহারা আলোক ও উত্তাপের উৎস সূর্য্যকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া নিরবচ্ছিন্ন উহাকে পরিবেষ্টন করিতেছে। এই উপায় দ্বারাই উহারা আলোক ও উত্তাপ একই প্রকারে প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

এক্ষণে এই একটি আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে যে, সকল গ্রহ সূর্য্যের সমান্তরালে নাই। কোনটা নিকট কোনটা বা অপেক্ষাকৃত দূরবর্ত্তী; সুতরাং নিকটস্থ গ্রহ যে পরিমাণে সূর্য্য হইতে আলোক ও উত্তাপ লাভ করিবে, দূরস্থ গ্রহটি সেই পরিমাণে কদাচই তাহা পারিবে না। সুতরাং যদি আলোক ও উত্তাপ উদ্ভিজ্জ ও জীবজন্তুগণের দেহধারণের একান্ত উপযোগী হয়, তাহা হইলে যে সমস্ত গ্রহ সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী থাকিয়া আলোক ও উত্তাপ পরিমিত রূপ প্রাপ্ত হইতেছে, তৎসমুদায়েই জীবজন্তুর বাস সম্ভবপর হয় এবং যাহাতে আলোক ও উত্তাপের অভাব আছে, তথায় উহাদের বাস একান্ত অসম্ভব হইয়া উঠে।

আমরা এই বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখিতে পাই যে, গ্রহগণের দূরতা বা নৈকট্য সূর্য্য হইতে আলোক ও উত্তাপ প্রাপ্তির প্রকৃত উপায় নহে। এই পৃথিবীতে যে উপায়ে উত্তাপ পাওয়া যায়, অগ্রে তাহাই নির্দ্ধারণ আবশ্যক, তাহা হইলে অন্যান্য গ্রহের বিষয়ও বিশদ হইয়া যাইবে। আমাদিগের এই অধিষ্ঠানভূতা পৃথিবী বায়ুমণ্ডলে বেষ্টিত রহিয়াছে। আমরা এই স্থানে যে, সূর্য্য হইতে উত্তাপ প্রাপ্ত হই, অত্রত্য বায়ুর ঘনত্বই তাহার কারণ। বায়ু যে পরিমাণে ঘন হইবে, উত্তাপও সেই পরিমাণে উপলব্ধ হইবে, সন্দেহ নাই। আমরা নিম্নদেশে যেরূপ উত্তাপ প্রাপ্ত হই, একটি পর্ব্বত-শিখরে আরোহণ করিলে আর সেই প্রকার পাই না। কারণ নিম্নে যেমন বায়ুর ঘনত্ব আছে, ঊর্দ্ধে সে রূপ নাই। বায়ু তরল হইলে তাহার উত্তাপ আকর্ষণ ও রক্ষণের ক্ষমতা থাকে না। সুতরাং যদি গ্রহ-সমূহ বায়ুমণ্ডলে পরিবেষ্টিত থাকে, তাহা হইলে উহারা সূর্য্য হইতে দূরে বা নিকটেই থাকুক অবশ্যই উত্তাপ প্রাপ্ত হইবে। যে গ্রহটি সূর্য্যের নিকট, তাহার শীতোত্তাপমান যেমন হইবে, দূরস্থ গ্রহের তদপেক্ষা কখনই অল্প হইবে না। দেখ যে স্থান দিয়া সূর্য্য গমনাগমন করে, সেই অযনবৃত্তে যে সমস্ত উন্নত পর্ব্বত আছে, তাহাদের শিখরদেশে কেন্দ্রের নিকটবর্ত্তী অক্ষাংশের ন্যায় শীতের প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে দূরত্ব ও নৈকট্য উত্তাপ প্রাপ্তির প্রকৃত কারণ নহে। ইহার অন্যথা হইলে অযনবৃত্তস্থ পর্ব্বতের উপরিভাগে শীতোত্তাপমান অবশ্যই অন্য প্রকার হইত।

এক্ষণে কি প্রকারে সূর্য্য হইতে আলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাও বিবেচিত হইতেছে। যে গ্রহ হইতে সূর্য্যের আকার যে পরিমাণে দৃষ্ট হয়, তথায় সেই আকারের অনুরূপ আলোক লাভ হইয়া থাকে। বুধ গ্রহ সর্ব্বাপেক্ষা সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী, উহাতে যে পরিমাণে সূর্য্যের আকার দেখা যাইবে, তাহার অপেক্ষা শুক্র গ্রহে, শুক্র গ্রহ অপেক্ষা পৃথিবীতে এবং পৃথিবী অপেক্ষা মঙ্গল গ্রহে উহার আকার আরও ক্ষুদ্র বোধ হইবে। সুতরাং বুধ-গ্রহে সূর্য্যের আলোক যে পরিমাণে নিপতিত হয়, শুক্রে তাহার অপেক্ষা অল্প হইবে এবং শুক্র অপেক্ষা পৃথিবীতে ও পৃথিবী অপেক্ষা মঙ্গলে আরও অল্প হইবে।

আমরা দেখিতেছি যে, আলোকের অল্পতা বা আধিক্য হইলে আমাদিগের দর্শন ক্রিয়ারও ব্যাঘাত জন্মে, সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন গ্রহে কি প্রকারে উহার সুবিধা হইতে পারে? আমরা এই সন্দেহ দূর করিবার নিমিত্ত আমাদিগের চক্ষের নির্ম্মাণ-প্রণালী ও তদ্দ্বারা কি প্রকারে দৃষ্টি ক্রিয়া সমাহিত হয়, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। আমাদিগের অক্ষিগোলকের উপরিভাগে যে একটি কৃষ্ণবর্ণ স্বচ্ছ বিন্দু আছে, তাহাকে তারকা বলে। সূর্য্যের আলোক সেই তারকা দিয়া অক্ষিগোলকের অভ্যন্তরস্থ একটি সূক্ষ্মত্বক্‌ময় আবরণকে স্পর্শ করে। ঐ আবরণের কতগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা আছে। সেই সমস্ত শিরার সাহায্যে ঐ সূক্ষ্মত্বক্‌ময় আবরণ আলোকের শক্তি মস্তিষ্কে সঞ্চারিত করিয়া দেয়। তখন আমাদিগের বিষয়ানুভব জন্মে। যদি আমাদিগের ঐ সূক্ষ্মত্বক্‌ময় আবরণের অনুভব শক্তি না থাকে এবং উহার যে পরিমাণে আলোক বহন করিবার সামর্থ্য আছে, তদপেক্ষা আলোকের পরিমাণ যদি অধিক হয়, তাহা হইলে আমরা কখনই বিষয়ানুভব করিতে পারি না। কিন্তু করুণাকর পরমেশ্বর এই উভয়ের কি অদ্ভুত সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া দিয়াছেন। আমাদিগের এই পৃথিবীতে যে পরিমাণে আলোক নিপতিত হয়, চক্ষের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তাহা বহন করিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত রূপে নির্ম্মিত হইয়াছে।

আলোকের আধিক্যই উজ্জ্বলতা গুণ পরিবর্দ্ধিত করিয়া দেয়। আমরা যখন কোন উজ্জ্বল তেজঃ পদার্থ দর্শন করি, যাহার আলোকের আধিক্য আমাদিগের দর্শনেন্দ্রিয়কে প্রতিহত করিয়া দেয়, তখন দর্শনেন্দ্রিয় স্বভাবতই সঙ্কুচিত হইয়া চক্ষে প্রতিফলিত আলোক সঙ্কোচ করিয়া আনে। ইহা দ্বারা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে যেখানে আলোকের আধিক্য, তথায় জীবগণের তারকা এত অল্প প্রশস্ত যে তাহার মধ্য দিয়া আলোকের আধিক্য সত্ত্বেও অল্প আলোক প্রবেশ করিতে পারে এবং তদ্দ্বারা অনায়াসেই দর্শনক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সুতরাং বুধ গ্রহে যদি সূর্য্যের সান্নিধ্য-নিবন্ধন আলোকের আধিক্য থাকে, তাহা হইলে মঙ্গল, শুক্র ও পৃথিবী অপেক্ষা তত্রত্য জীবের তারকা ক্ষুদ্র হইবে। এবং যাহাতে আলোকের অপেক্ষাকৃত অল্পতা আছে, তথায় চক্ষু সমধিক বিস্ফারিত হইবে।

সংস্কৃত সাহিত্য।

২৭৯ সংখ্যক পত্রিকার ১৫৬ পৃষ্ঠার পর।

বৈদিক কাল নিরূপণ করিতে হইলে এমন কতকগুলি গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করা আবশ্যক, যাহাদিগকে আমরা এই বিষয়ের এক একটি অব্যর্থ প্রমাণ-স্থল বলিয়া স্বীকার করিতে পারি। এই বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষে এক সময়ে ভূরি ভূরি গ্রন্থ প্রণীত ও প্রচারিত হইয়াছে, সুতরাং যে সমস্ত গ্রন্থ আমাদিগের এই বিষয়ের উপযোগী এবং যে সমস্ত গ্রন্থ অনুপযোগী অগ্রে তাহারই বিচার করা কর্ত্তব্য হইতেছে। আমরা দেখিতে পাই, এক্ষণে যতগুলি গ্রন্থ বীরচরিত-পূর্ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, তন্মধ্যে রামায়ণ ও মহাভারতই সর্ব্ব-প্রধান। আমরা যখন এই দুই বিস্তীর্ণ গ্রন্থের বিষয় পর্য্যালোচনা করি, তখন ইহার কোন্ কোন্ অংশ প্রাচীন, কোন্ কোন্ অংশ আধুনিক এবং কোন্ কোন্ অংশই বা বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রাদুর্ভাবের পর প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার কিছুই নির্ণয় করিতে সমর্থ হই না। সুতরাং এই দুই গ্রন্থ বৈদিক কাল নিরূপণ করিবার প্রমাণ-স্থল বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। আমরা দেখিতে পাই যে, রামায়ণ ও মহাভারতে বিস্তর প্রাচীন আ-

খ্যায়িকা ও বেদোক্ত ইতিহাস আছে এবং যাহাদিগের নাম বেদে উল্লিখিত হইয়াছে, এই দুই গ্রন্থে প্রসঙ্গত তাহাদিগকেও এক এক উপাখ্যানের নায়ক রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। উর্ব্বশী পুরূরবা, শকুন্তলা দুষ্মন্ত, উদ্দালক, শুনশ্যেফ, বৈদেহ জনক, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, যাজ্ঞবাল্ক্য, দীর্ঘতমা, কাক্ষীবান প্রভৃতির উপাখ্যান বেদ হইতে উদ্ধৃত করিয়া এই দুই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। যখন বেদোক্ত উপাখ্যানাদি এই দুই গ্রন্থে প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হইতেছে, তখন বোধ হয়, যে সময় মহাত্মা মহর্ষিগণ ভারতবর্ষীয় বীরগণের চরিত্র গ্রন্থবদ্ধ করেন, তখনও বৈদিক কালের উপাখ্যান সকল অনেকের অভ্যস্ত ছিল; অথবা যখন বীরচরিত-পূর্ণ বৈদিক সূক্ত-সমূহ মহাভারত নামক গ্রন্থ-মধ্যে সঙ্কলন করা হয়, তখন কেহ বৈদিক উপাখ্যানাদি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয় নাই। যে সকল আখ্যায়িকা বেদের সূক্ত মধ্যে দৃষ্ট হয় রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণ মধ্যে তাহাই সঙ্কলিত দেখা যায়; কিন্তু এই উভয়ের তুলনা করিলে বেদোক্ত আখ্যায়িকা সমূহের রচনা আড়ম্বর-শূন্য আদিম ও বিশদ বলিয়া বোধ হয়। দেবতা ও বীরগণের বল-বীর্য্যের পরিচায়ক পদ্য অন্যান্য আর্য্য বংশীয়দিগের গ্রন্থে যেমন দৃষ্ট হয়, এই ভারতবর্ষের অতি প্রাচীন কালেও তাহা দৃষ্ট হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্ত্তমান কালে যাহা বিদ্যমান রহিয়াছে, উহা যে কেবল রামায়ণ মহাভারতে আছে, তাহা নহে, বেদের মধ্যেও উহার প্রাদুর্ভাব নিরীক্ষিত হইয়া থাকে। বেদের সূক্ত অনুসন্ধান করিলে বিস্তর বীর-চরিত-চিত্রিত গাথা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ সমস্ত গাথার কএকটির সহিত হোমরের কএকটি পদ্যের সাদৃশ্য প্রদর্শন করা যাইতে পারে।

ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকের কোন কোন অংশে গাথা, নারশংসী, ইতিহাস ও আখ্যান* এই গুলি বেদের অংশ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে যখন ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকে এই সমস্ত নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তখন ইতিহাস আখ্যান প্রভৃতি নামে যে সমস্ত গ্রন্থ এক্ষণে প্রথিত আছে, প্রাচীন কালেও উহার অসদ্ভাব ছিল না। কিন্তু যদিও মহাভারতকে ইতিহাস ও রামায়ণকে আখ্যান বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় এবং যদিও এক্ষণে অনেকানেক গ্রন্থ পুরাণ বলিয়া প্রথিত আছে, ব্রাহ্মণভাগে তৎসমুদায়ের কিছুমাত্র উল্লেখ নাই†। বেদের যে যে অংশে দেবতা ও মনুষ্যদিগের উপাখ্যান ও সৃষ্টির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, সেই সমস্ত অংশে যে যে নাম প্রয়োগ করা যায়, মহাভারত রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থ সেই সেই নাম দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,

* ব্রাহ্মণানীতিহাসান্‌পুরাণানি কল্পান গাথা নারশংসীঃ। তৈত্তিরীয় আরণ্যক। ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানানি। বৃহদারণ্যক। ইতিহাসশ্চ পুরাণং চ গাথাশ্চ নারশংসীশ্চ। শতপথ ব্রাহ্মণ। সায়নাচার্য্য তৈত্তিরীয় আরণ্যকের টীকায় লিখিয়াছেন যে পুরাণ বলিলে ব্রহ্মাণ্ডাদি পুরাণ বুঝাইবে এবং ইতিহাস বলিলে মহাভারত বুঝিতে হইবে। কিন্তু ইহা সায়নাচার্য্যের পূর্ব্ব বাক্যের সহিত সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ হইতেছে। তিনি ঋগ্বেদের প্রবেশিকায় লিখিয়াছেন যে তৈত্তিরীয় আরণ্যকে ব্রাহ্মণানীতিহাসান প্রভৃতি যে কএকটি নামের উল্লেখ আছে, তৎসমুদায় বেদের অন্তর্গত করিয়া জানিবে, সুতরাং তৈত্তিরীয় আরণ্যকের টীকায় পুরাণ শব্দে ব্রহ্মাণ্ডাদি পুরাণ ও ইতিহাস শব্দে মহাভারতকে নির্দ্দেশ করা তাঁহার নিতান্ত অসঙ্গত হইয়াছে। কাত্যায়নও ইতিহাস পুরাণ শব্দে রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থকে গ্রহণ করেন নাই।

† মহর্ষি ব্যাস স্বয়ংই স্বপ্রণীত মহাভারত গ্রন্থকে কাব্য নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্রহ্মাও তাঁহার এই গ্রন্থের কাব্য নামই উপযুক্ত হইয়াছে বলিয়া অনুমোদন করেন। সুপ্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক বিশ্বনাথ কবি সাহিত্য দর্পণ নামক অলঙ্কার গ্রন্থ মধ্যে মহাভারত ও রামায়ণকে মহাকাব্য মধ্যে পরিগণিত করিয়া গিয়াছেন। কোন কোন স্থলে মহাভারতকে পঞ্চম বেদ বা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রণীত বলিয়া কার্ষ্ণ্য বেদ নামে গ্রহণ করা হইয়াছে।

মাত্র। বস্তুত কি সূত্র কি ব্রাহ্মণ বেদের কোন ভাগেই মহাভারত প্রভৃতি নামের উল্লেখ নাই। আশ্বলায়ন সূত্রের এক স্থলে ভারত এবং ঐ গ্রন্থের কোন কোন হস্তলিপিতে মহাভারত এই শব্দটি দেখিতে পাওয়া যায়*। কিন্তু ভারত বা মহাভারত এই শব্দটি একখানি বীর-চরিত-পূর্ণ গ্রন্থে আরোপ না করিয়া ঐরূপ গ্রন্থের সাধারণ নাম বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। আমরা পরে আশ্বলায়ন সূত্রের উৎপত্তি-কাল নিরূপণ করিব এবং তদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপাদন করা হইবে যে, মহাভারত গ্রন্থ উহার পূর্ব্বেই প্রস্তুত হইয়াছে। সুতরাং আশ্বলায়ন সূত্রে যদিও উহার নাম দৃষ্ট হয়, তাহা তাদৃশ ফলোপধায়ক হইতেছে না। আমরা বর্ত্তমান সময়ে মহাভারতকে যে রূপ দেখিতেছি, উহা পূর্ব্বতন মহর্ষিগণ দ্বারা রূপান্তরিত হইয়াছে। আশ্বলায়ন সূত্রের পূর্ব্বে বা উহার সম কালেই হউক মহাভারতের যে পূর্ব্বতন একটি আকার ছিল, অনেক অনুসন্ধান করিলেও তাহাতে উহাকে পুনঃস্থাপন করা এ ক্ষণে নিতান্ত সুকঠিন হইবে। অধ্যাপক লাসেন স্বপ্রণীত ভারতবর্ষীয়-পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত নামক গ্রন্থে এমন কতকগুলি বিষয় উদ্ভাবন করিয়াছেন যে তদ্দ্বারা মহাভারতের প্রাচীন অংশ আধুনিক অংশ হইতে অনেকাংশে স্বতন্ত্র করা যাইতে পারে। যে সমস্ত পূর্ব্বতন ইতিহাস ও গাথা বর্ত্তমান মহাভারত ও রামায়ণে সংকলিত ও সন্নিবেশিত হইবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয়দিগের হৃদয়ে জীবন্তভাবে অবস্থিত ছিল, তৎসমুদায় এক্ষণে যদি রামায়ণ ও মহাভারত হইতে নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া সম্ভব হয়, তাহা হইলে ভারত বর্ষের অতি প্রাচীন কালের বৃত্তান্ত সম্যক্ জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে এবং বৈদিক কাল নিরূপণেরও একটি সুবিধা হয়। কিন্তু আমরা যদি রামায়ণ ও মহাভারতের বর্ত্তমান আকার, ভাষা, ছন্দ এবং নীতি ও ধর্ম্মপ্রণালী পর্য্যালোচনা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, যখন বেদের বিষয়গুলি জনশ্রুতিতে নীত হইতেছে, যখন উহার মধ্যে কতকগুলি এক কালে বিস্মৃত ও কতকগুলি অযথাভূতরূপে গৃহীত হইয়াছে, সেই সময়ে ঐ সমস্ত গ্রন্থবদ্ধ করা হয়। যাহা মহাভারতের প্রধান অংশ বলিয়া পরিগণিত হইতেছে, সেই কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের বিষয় বেদে কিছুমাত্র উল্লেখ নাই। কুরু ও ভারতের নাম বেদের স্থানে স্থানে দৃষ্টিগোচর হয় বটে, কিন্তু পাণ্ডবদিগের নাম উহার কোন স্থানেই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অধিক কি, পাণিনি ব্যাকরণেও কুরু ও ভারতের নাম আছে কিন্তু পাণ্ডু বা পাণ্ডবদিগের নামের উল্লেখ মাত্র নাই। সুতরাং আশ্বলায়ন সূত্রকে যদি পাণিনির সমকালীন বা উহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে উহাতে যে ভারত এই শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে, উহা দ্বারা যাহাতে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, সেই মহাভারত কখনই বোধ হইতে পারে না।

আমরা এ ক্ষণে মহাভারতকে যে আকারে দেখিতেছি, ইহা পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, যাঁহারা এই বিস্তীর্ণ গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন, সেই সমস্ত মহাকবিদিগের বুদ্ধি ও ধর্ম্মগত

* আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে "ভারতধর্ম্মাচার্য্যাঃ" কোন কোন পুস্তকে "মহাভারতধর্ম্মাচার্য্যাঃ" এই দুইটি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু টীকাকার "মহাভারতধর্ম্মাচার্য্যাঃ" এই কথার কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই। ইহা দ্বারা বোধ হইতেছে, যে কেহ এই কথাটি মূল গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছে।

ভাব গ্রন্থের নায়কদিগের অপেক্ষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। যাঁহারা মনু-প্রণীত ব্যবস্থা অভ্যস্ত করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত ব্রাহ্মণ-কুল-প্রসূত কবিদিগের উপদেশের ভাব এই উপাখ্যানের বীররসের বিস্তর ব্যাঘাত করিয়াছে। কিন্তু আমরা যদি সবিশেষ অনুসন্ধান করি, তাহা হইলে পাণ্ডবদিগের আদিম ইতিহাস এই বিস্তীর্ণ গ্রন্থের মধ্যে মধ্যে উদ্ভিন্ন হইয়াছে তাহা দেখিতে পাই। সুতরাং আমরা এ ক্ষণে ইহা সুস্পষ্টই স্বীকার করিতে পারি যে, যে জাতির মধ্যে মহাভারতের পাঁচ জন প্রধান নায়ক সঞ্জাত ও প্রতিপালিত হইয়াছেন, সেই জাতি ব্রাহ্মণদিগের শাস্ত্র-ব্যবস্থার আধিপত্য কালের পূর্ব্বে অবশ্যই বিদ্যমান থাকিবে। ইহা কি কখন সম্ভব হয় যে, যে পাণ্ডবেরা বর্ত্তমান মহাভারত গ্রন্থে বেদ ব্যাকরণ ছন্দ জ্যোতিষ ও স্মৃতি শাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন, তাঁহারা শাস্ত্র-ব্যবস্থা অতিক্রম পূর্ব্বক একটি স্ত্রী ভ্রাতৃসাধারণ-ভোগ্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন? বেদে কথিত আছে এক ব্যক্তি বহু দার পরিগ্রহ করিতে পারে কিন্তু একটি স্ত্রীর অনেক পতি যার পর নাই অসঙ্গত *। সুতরাং মহাভারত গ্রন্থে পঞ্চপাণ্ডবের যে একমাত্র ভার্য্যা তাহা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ সন্দেহ নাই। কিন্তু যে সময়ে মহাভারত রচিত হইয়াছিল, তৎকালে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডবের বৃত্তান্ত লোকের হৃদয়ে এত জাগরূক ছিল যে এই রূপ ব্যবহারগত শাস্ত্রীয় বিরোধটি কবিগণকে অগত্যা স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছিল। যখন গ্রন্থকারেরা দেখিলেন যে এই বিরোধটি কোন ক্রমেই অতিক্রম করিতে পারিলেন না, তখন তাঁহারা উক্ত ব্যবহারে এই রূপ কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন যে শাস্ত্র-বিরোধী বলিয়া আপাতত উহাতে কেহ দোষারোপ করিতে পারিবেন না। তাঁহারা গ্রন্থের উপাখ্যান ভাগে লিখিয়াছেন যে ভীম ও অর্জ্জুন ভার্গব-কর্ম্মশালায় প্রত্যাগমন পূর্ব্বক জননীর নিকট গমন করিয়া হৃষ্ট মনে কহিলেন মাতঃ! অদ্য এক রমণীয় পদার্থ ভিক্ষালব্ধ হইয়াছে। তাঁহাদিগের জননী কুটীরের অভ্যন্তরে ছিলেন; তিনি পুত্রকে না দেখিয়াই কহিলেন, বৎসগণ! তোমরা যে ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য আনয়ন করিয়াছ, তাহা সকলে মিলিত হইয়া ভোগ কর †। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে পিতামাতার বাক্য প্রতিপালন করা পুত্রগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। সুতরাং পঞ্চ পাণ্ডবদিগকে শাস্ত্রের নির্দেশানুসারে মাতৃ-বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া রমণীরত্ন দ্রৌপদীকে ভ্রাতৃ সাধারণের ভার্য্যা বলিয়া প্রতিগ্রহ করিতে হইল। স্মৃতি-শাস্ত্র-কারেরা এই রূপ ব্যবহারকে সূক্ষ্ম ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন ‡। যদিও তাঁহারা কৌশলে

* বেদেঽপ্যেবং শ্রূয়তে একস্য বহ্ব্যো জায়া ভবন্তি নৈকস্যা এব বহবঃ পতয়ঃ সন্তি।

* গচ্ছাতু তাং ভার্গবকর্ম্মশালাং পার্থো পৃথাং প্রাপ্য মহানুভাবৌ। তাং যাজ্ঞসেনীং পরমং প্রতীতৌ ভিক্ষেত্যথাবেদয়তাং নরাগ্র্যৌ। কুন্তীগতা সাত্বনবেক্ষ্য পুত্রৌ প্রোবাচ ভুঙ্ক্ষেতি সমেত্য সর্ব্বে। মহাভারত আদিপর্ব্বান্তর্গত স্বয়ম্বর পর্ব্ব।

† ধর্ম্মো দ্বিবিধঃ স্থূলঃ সূক্ষ্মশ্চ। মন্দমতিভিরপি সুখেন বুধ্যমানঃ সশৌচাচমনসন্ধ্যাবন্দনাদিঃ স্থূলো ধর্ম্মঃ। শাস্ত্রপারংগতৈঃ পণ্ডিতৈরেব বোদ্ধুং যোগ্য ইতরেষামধর্ম্মভ্রান্তিবিষয়ো দ্রৌপদীবিবাহাদিঃ সূক্ষ্মো ধর্ম্মঃ। পরাশর সংহিতার সায়নাচার্য্য কৃত টীকা।

ধর্ম্ম দুই প্রকার স্থূল ও সূক্ষ্ম। শৌচাচমন সন্ধ্যাবন্দন প্রভৃতি যে সকল বিষয় মূর্খেরাও অনায়াসে বুঝিতে পারে, তাহার নাম স্থূল ধর্ম্ম।

দ্রৌপদী-বিবাহ প্রভৃতি সূক্ষ্ম ধর্ম্ম শাস্ত্র-পারদর্শী পণ্ডিতেরা বুঝিতে পারেন কিন্তু মূঢ়দিগের তদ্বিষয়ে অধর্ম্ম ভ্রান্তি উপস্থিত হয়।

যৌবনস্থৈব কৃষ্ণাহি বেদিমধ্যাৎ সমুত্থিতা। সাচ শ্রী শ্রীশ্চ ভূয়োভির্জুষ্যমানা ন দুষ্যতি।

দ্রৌপদী যৌবন সম্পন্না হইয়াই বেদি মধ্য হইতে উত্থিত হইয়াছিলেন। তিনি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী স্বরূপ, লক্ষ্মী অনেকের ভোগ্য হইলে কদাচই দূষিত হন না।

ইহার শাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদন করিয়াছেন কিন্তু কোন স্থানেই ইহাকে সাধারণ-নিয়ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই।

পাণ্ডু ধর্ম্মানুসারে দুইটি স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন; ইহাও আবার ব্যবস্থা শাস্ত্রের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ হইয়াছে। বহু বিবাহ শাস্ত্রের অননুমোদিত নহে, কিন্তু শাস্ত্রকারেরা কহিয়া থাকেন যে, দুই বা বহু পত্নীর পাণিগ্রহণ ধর্ম্ম্য হইতে পারে না। এই নিমিত্ত তাঁহারা সর্ব্বজ্যেষ্ঠা সহধর্ম্মিণী লোকান্তরিত পতির সহিত চিতাধিরোহণ করিতে পারিবে এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা দেখিতে পাই যে, পূর্ব্ব কালের উপাখ্যান জনশ্রুতিতে অব্যাহত হইয়া আসিতেছিল, সুতরাং গ্রন্থকর্ত্তারা কৌশলে তাহা প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারেন নাই। এই বহুবিবাহ অতি প্রাচীন কালে যে কেবল ভারতবর্ষেই ইতর সাধারণ সকলের মধ্যে প্রচলিত ছিল তাহা নহে। আমরা সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস-রচয়িতা মহাত্মা হিরোডোটসের গ্রন্থ পাঠ করিলে দেখিতে পাই যে, পূর্ব্ব কালে গ্রীশ দেশে থ্রেসীয় জাতির মধ্যে এই রূপ প্রথা প্রচলিত ছিল এবং যে রমণী স্বামীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রণয়িনী হইত স্বামীর সমাধির সহিত তাহারও সমাধি হইত। মহাত্মা মেলা গেটী জাতীয়দিগের এই রূপ ব্যবহারের বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সীদিয়, পসেনিয় ও টিউটন জাতিদিগের মধ্যেও এই প্রণালী অনুসৃত হইত। মহারাজ পাণ্ডুর মৃত্যু হইলে প্রিয় মহিষী মাদ্রী তাঁহার অনুমৃতা হইয়া ভর্তৃলোকে গমন করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং জ্যেষ্ঠা কুন্তী তদ্বিষয়ে এক কালে বঞ্চিত হন। মহাভারতে এই পরম্পরাগত প্রাচীন উপাখ্যানের বিধিবিরোধিতা দৃষ্ট হইতেছে বটে কিন্তু অনেক জাতিতে অনেক কাল এই ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

আমরা মহাভারতের ন্যায় রামায়ণেও দেখিতে পাই যে গ্রন্থকার পূর্ব্বপরম্পরা-প্রচলিত উপাখ্যানের স্থানে স্থানে অবৈধ ব্যবহার দর্শন করিয়া তৎকাল-দৃষ্ট ব্যবস্থানুসারে তাহার সংশোধনের চেষ্টা করিয়াছেন। রামায়ণে এক স্থলে বর্ণিত আছে যে, রাজা দশরথ মৃগয়ায় গমন করিয়া মৃগভ্রান্তিতে একটি ব্রাহ্মণ-কুমারকে বধ করেন। এই পাপ কার্য্যটি ব্রাহ্মণদিগের চক্ষে এমনি গুরুতর বোধ হইত যে এই পাপের আর প্রায়শ্চিত্ত নাই বলিয়া তাঁহারা নির্দ্দেশ করিতেন *। কিন্তু গ্রন্থকর্ত্তা পূর্ব্বপরম্পরা-প্রচলিত উপাখ্যান রূপান্তরিত না করিয়া কৌশলে লিখিয়াছেন যে ঐ ব্রাহ্মণকুমার রাজা দশরথকে সন্নিহিত দেখিয়া তাঁহাকে ব্রাহ্মণ-বধ-পাতক-ভয় হইতে মুক্ত করিবার নিমিত্ত কহিলেন, মহারাজ! আমি শূদ্রাগর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। আমরা আরও দেখিতে পাই যে ক্ষত্রিয়কুমার রামের ভুজবলে পরশুরামের পরাজয় নিতান্ত গর্হিত বিবেচনা করিয়া পরশুরামকে ক্ষত্রিয়াতনয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

* ন ব্রাহ্মণবধাৎ ভূয়ানধর্ম্মো বিদ্যতে ভুবি। তস্মাদস্য বধং রাজা মনসাপি ন চিন্তয়েৎ।। মনু ৮ অধ্যায়। ব্রহ্মহত্যা অপেক্ষা পৃথিবীতে অধিক পাপ আর কিছুই নাই; অতএব রাজা ব্রহ্মহত্যাকে মনেও স্থান দিবেন না।

পৃথিবী ও মনুষ্য।

২৭৫ সংখ্যক পত্রিকার ৬৬ পৃষ্ঠার পর।

আমরা যখন উন্নতির বিষয় পর্য্যালোচনা করি, উন্নতিশীল পদার্থ মাত্রেরই উন্নতি যে একই নিয়মের অধীন প্রতিপদেই তাহার পরিচয় পাইয়া থাকি। যখন ভৌতিক জ-

গতে প্রবেশ করি, দেখিতে পাই যে, দুইটি বিভিন্ন পদার্থের সমবায় না হইলে এবং ঐ দুইটি পদার্থ পরস্পর পরস্পরের সহকারিতা না করিলে কদাচই একটি নূতন পদার্থ উৎপন্ন হইয়া ভৌতিক রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন হয় না। ভূততত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বিযোগরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা এ ক্ষণে পঁয়ষট্টি মহাভূতের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন। সর্ব্বস্রষ্টা পরমেশ্বর আরও যে কত মহাভূতের সৃষ্টি করিয়াছেন অদ্যাপি তাহার কিছুই নিশ্চয় নাই। এই সমস্ত মহাভূতের সমবায় এবং ইহাদের পরস্পরের সহযোগিতা দ্বারা জীবলোকের উপযোগী বিবিধ বস্তু উৎপন্ন হইতেছে। আমরা জল আলোক প্রভৃতি যে সমস্ত বস্তু প্রতিনিয়ত ব্যবহার করিয়া থাকি, তৎ সমুদায় কতকগুলি আদিম উপাদানের রচনামাত্র। কিন্তু কি আশ্চর্য্য নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া ঐ সমস্ত আদিম উপাদান প্রতিদিন আমাদিগকে নানাবিধ ব্যবহার্য্য দ্রব্য উপহার প্রদান করিতেছে, তাহা চিন্তা করিলেও বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। জলেতে দুইটি মাত্র বাষ্প আছে। একটি হাইড্রজন আর একটি অক্ষিজন। এই দুই বাষ্পের গুণ স্বতন্ত্র, কিন্তু এই উভয়বিধ বাষ্প যখন মিলিত ও কার্য্য-সূত্রে বদ্ধ হয়, তখন আর ইহাদের স্বতন্ত্র-ভাব প্রত্যক্ষ হয় না। ইহারা উভয়ে যেন সখ্য ভাবে আর্দ্র হইয়াই সলিলরূপে পরিণত হয়। যে দুই বস্তু এতক্ষণ আমাদের অপ্রত্যক্ষ ছিল তাহারা এক্ষণে রূপান্তরিত ও নিরীক্ষিত হইল এবং ইহাদের পূর্ব্বের গুণ আর কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। এই দুই বাষ্প যে কেবল এক কার্য্যেরই উপযোগী তাহা নহে। উহারা আবার ভিন্ন ভিন্ন বাষ্পের সহিত মিশ্রিত হইয়া বিভিন্ন প্রকার পদার্থ উৎপাদন করিয়া থাকে। আবার এই সমস্ত বাষ্পের সহযোগে যে সকল পদার্থ প্রস্তুত হইল, তাহারাও অন্য পদার্থের সাহায্যে নানা প্রকার বস্তু উৎপাদন করিতেছে। এই রূপে ভৌতিক রাজ্যের যথোচিত শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। বাষ্প সহযোগে যে সমস্ত ঘটনা উৎপন্ন হয় তাহা নিতান্ত সূক্ষ্ম ও দুর্লক্ষ্য, কিন্তু ধাতু দ্বারা যে রূপ কার্য্যের উৎপত্তি হয়, তাহা সকলেরই প্রত্যক্ষ হইতে পারে। একটি তাম্র ও আর একটি দস্তা এই দুইটি ধাতু পরস্পর পরস্পরকে নিকটে পাইলে তাড়িতাগ্নির উৎপত্তি হইবে। আবার যদি এই দুই ধাতুকে সমান রূপে উত্তপ্ত না করিয়া পরস্পরকে পরস্পরের পার্শ্বে রাখ, দেখিতে পাইবে যে, তাড়িতাগ্নি ও উত্তাপ পরস্পর পরস্পরের নিকট গ্রহণ করিতেছে। এই দুই ধাতুর সংস্থান, পরিমাণ ও উত্তাপ বিভিন্ন প্রকার হইলেও উহাদের হইতে ঐ রূপ কার্য্য অবশ্যই ঘটিবে। জীব-দেহ যে নির্ম্মিত হয়, তাহা ও এই রূপ প্রক্রিয়ার অধীন।

ইন্দ্রিয়ের আধিক্যই উন্নতির কারণ। যাহার যে পরিমাণে ইন্দ্রিয় আছে, তাহার উন্নতি তদনুরূপ হইবে। আমরা ইতর জন্তুদিগের সহিত মনুষ্যের তুলনা করিলে এই বিষয় সুস্পষ্ট অবগত হইতে পারি। অন্যান্য জন্তুর কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রায় মনুষ্যদিগের তুল্য কিন্তু উহাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অভাব আছে। মনুষ্যের যে সামাজিক উন্নতি আছে এবং পশুরা যে তাহার আস্বাদনে এক কালে পরাঙ্মুখ, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অভাবই তাহার অদ্বিতীয় কারণ। এই সামাজিক উন্নতি সাধারণ-উন্নতির নিয়ম দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে। দুইটি বিষম পদার্থের পরস্পর সংযোগ দ্বারা যেমন জড় রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতেছে, মনুষ্যের সামাজিক উন্নতিও সেই রূপ। এস্থলে আমারা দেখিতে পাই যে, ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি-সম্পন্ন মনুষ্যের সমবেত কার্য্য দ্বারা সামাজিক উন্নতি হইতেছে। বিভিন্ন বাষ্প কার্য্য সাধন কালে বিভিন্ন ভাব-শূন্য না হইলে যেমন সলিলাকারে পরিণত হয় না, সেই রূপ সামাজিক উন্নতি-কালে সমাজের প্রায় সাধারণ মনুষ্যের ভাব এক রূপ না হইলে একটি নূতন সৃষ্টি হয় না। এই রূপ উন্নতির নিয়ম থাকাতেই সংসারের ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতেছে। যদি কার্য্য-কালে প্রত্যেকের ভাব স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র থাকে, তাহা হইলে আমরা কদাচই এই রূপ উন্নতি প্রত্যক্ষ করিতে পারিতাম না। জগৎস্রষ্টা ঈশ্বর এই জন্যই উন্নতির নিয়ম এই রূপ বিধান করিয়া দিয়াছেন। আমরা ইহা দ্বারা কেবল তাঁহারই অচিন্ত্য ও অননুমেয় জ্ঞানের সম্যক পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে কারণস্য কারণং বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি।

প্রেরিত পত্রের উত্তর।

ওঁ তৎসৎ।

বোলপুর—শান্তি-নিকেতন।

১৫ কার্ত্তিক ১৭৮৮ শক।

পরম কল্যাণাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ মিত্র মহাশয় সমীপেষু
এলাহাবাদ

আদর-ভাজনেষু—

পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃসন্তু।

তোমার ১২ শ্রাবণের পত্র পাইয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম। তুমি লিখিয়াছ যে কতিপয় বন্ধুবর্গের সহিত একত্র উপবিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম পুস্তক খানি পাঠ করিতেছিলাম। ইহা হইতে আমার নিকটে শুভ সংবাদ আর কি আছে? ঈশ্বর তোমার জ্ঞান উজ্জ্বল করিয়া তাহাতে আপনার সত্য-রূপ অমৃত-রূপ প্রকাশ করুন এবং তোমার হৃদয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুরাগ বৃদ্ধি করুন, এই আমর প্রার্থনা।

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম খণ্ডের সপ্তম অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্রুতিতে তোমার যে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নিরাকরণের জন্যে আমার উপরে যে ভারার্পণ করিয়াছ; তাহা অতি আদরের সহিত গ্রহণ করিলাম—ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলে আমার পরিশ্রমের যথেষ্ট পুরস্কার হইবে।

প্রথমতঃ ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রামাণ্য কিসের উপর নির্ভর করে, তাহা অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য-সকল আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ। সেই সকল সত্যের আলোক মনুষ্যের অন্তর্দৃষ্টিতেই পতিত হয়। শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ তন্ত্র উৎপত্তির পূর্ব্বে ব্রাহ্মধর্ম্ম ছিল এবং এ সকল যদিও একেবারে ধ্বংশ হয়, তথাপি তাহা থাকিবে। মনুষ্যের আত্মার সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্মের সৃষ্টি, এই হেতু ব্রাহ্মধর্ম্ম সনাতন আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম। বেদ পুরাণ বাইবল কোরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ-বিশেষে, বা ব্যাস চৈতন্য ঈসা মূসা প্রভৃতি ব্যক্তি বিশেষে ব্রাহ্মধর্ম্ম আবদ্ধ নহে—ইহা উন্নতিশীল আত্মার উন্নতিশীল ধর্ম্ম। যে আত্মা যত উন্নত হইবে, ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নত ভাব তাহার নিকটে তত প্রকাশ পাইবে। এই হেতু ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম শ্রুতির তাৎপর্য্যে এই প্রকার সূত্রপাত করা গিয়াছে যে "ব্রহ্মবিৎ ও ব্রহ্মবাদী হইবার জন্যে দেশ-বিশেষ, কি কাল-বিশেষ, কি জাতি-বিশেষের অপেক্ষা নাই। সকল দেশীয় ব্রহ্মবাদীদিগেরই উপদেশ দিবার অধিকার আছে।" কিন্তু অন্যান্য দেশের অন্যান্য ব্রহ্মবাদীদিগের উপদেশ এই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে সঙ্কলিত হয় নাই এবং এখানকার দর্শনকারদিগেরও সিদ্ধান্ত-সকল ইহাতে সন্নিবেশিত করা হয় নাই। প্রত্যুত ভারতবর্ষীয় পূর্ব্বতন ব্রহ্মবাদী ঋষিরা ব্রহ্ম-বিষয়ে যে সকল আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ সত্যের উপদেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই এই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম খণ্ডে সংকলিত হইয়াছে। সমুদয় বেদ ঋষিবাক্য—তাহার মধ্যে উপনিষদে ব্রহ্মবিষয়ের উপদেশ আছে। সেই সকল উপনিষদের মধ্যে যাহা কিছু ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধ বাক্য, তাহা পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম-সংগত যে সকল যথার্থ তত্ত্ব ও আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ সত্য, তাহাই এই ব্রাহ্মধর্ম্মের

প্রথম খণ্ডে সংকলিত হইয়াছে। এখন, বোধ হয়, ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম খণ্ডের সংকলনের সংকল্প কি তাহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছ।

এই সংকল্প ও প্রতিজ্ঞা-অনুসারে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম খণ্ডের সপ্তমাধ্যায়ে এই শ্রুতি উদ্ধৃত হইয়াছে যে "ন বভূব কশ্চিৎ" আপনি কিছুই হন নাই। ইহা কঠ ঋষির সহজ বাক্য। বেদান্তদর্শনকার শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য আসিয়া আপনার বুদ্ধি-কৌশলে এই সহজ সত্য হইতে এই অর্থ নিষ্পন্ন করিলেন যে যখন ঈশ্বর আপনি কিছুই হন নাই, তখন এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ সংসারও কিছুই হয় নাই—এ সকলই ভ্রম। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে কাহার এ ভ্রম? যদি এক ঈশ্বর ব্যতীত আর কেহই নাই, তবে ইহা ঈশ্বরেরই ভ্রম। ভ্রম-প্রমাদ-শূন্য ঈশ্বরের ভ্রম—একি বিষম কথা! অথচ দর্শনকারেরা ঈশ্বরের ভ্রম অঙ্গীকার না করিয়া আর আপনারদের অদ্বৈত পক্ষ রক্ষা করিতে পারেন না। অতএব এই শ্রুতিটির তাৎপর্য্য স্পষ্ট করিয়া সকলকে বুঝান গিয়াছে যে "জন্ম-মৃত্যু-বিকার-বিহীন, ভ্রম-প্রমাদ-শূন্য শুদ্ধ অপাপ-বিদ্ধ পরমাত্মা হইতে এই সমুদায়ই উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু তিনি আপনি কিছুই হয়েন নাই, দুগ্ধ পরিণত হইয়া যেমন দধি হয়, মৃত্তিকা রূপান্তর হইয়া যেমন ঘট হয়, এবং স্বর্ণ অবস্থান্তর হইয়া যেমন কুণ্ডল হয়, তিনি সে রূপ কোন বস্তু-রূপে পরিণত হয়েন নাই। রজ্জুতে যেমন সর্প ভ্রম হয়, মরীচিকায় যেমন জল ভ্রম হয়, এবং শুক্তিকায় যেমন রজত ভ্রম হয়, তাঁহাতে সে রূপ ভ্রম হইয়া যে এই জগৎ প্রকাশ পাইতেছে, তাহাও নহে। তিনি এই সমুদায় জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। জগৎ তাঁহা হইতে পৃথক্ পদার্থ। তিনি স্বয়ং জড়ও হন নাই, এবং জীবও হন নাই। তিনি সেব্য ও উপাস্য, এবং আমরা সকলে তাঁহার সেবক ও উপাসক।"

ভোনায় পত্রে সদানন্দ যোগীন্দ্র-প্রণীত বেদান্তসারের কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা অদ্বৈতবাদীদিগেরই সিদ্ধান্ত*। কিন্তু ভারতবর্ষে দর্শন শাস্ত্রের ষোলটি সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত ছিল, তন্মধ্যে ছয় দর্শন অদ্যাপি সকলেরই নিকটে প্রসিদ্ধ আছে। এই বিবিধ দর্শনের এক প্রকার মত নহে। সকলেই পরস্পরের মতে দোষারোপ করিয়া গিয়াছেন। এই সমুদায় দর্শনের মধ্যে একটির নাম শাঙ্কর দর্শন। এই দর্শনই এ দেশে বেদান্ত-দর্শন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। অধ্যারোপ ও অপবাদ ন্যায় এই বেদান্ত-দর্শনের মত। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য যে সকল শারীরক সূত্র অবলম্বন করিয়া অদ্বৈতবাদ প্রতিপন্ন করিয়াছেন, রামানুজাচার্য্য সেই সকল সূত্র হইতেই দ্বৈতবাদ প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন। পণ্ডিতেরা বিবিধ দর্শনকারদিগের বিবিধ প্রকার মতে বিক্ষিপ্ত চিত্ত হইয়া বলিয়া গিয়াছেন যে "দর্শনস্য দর্শনেন নো মনো হি নির্ম্মলং।" দর্শন-শাস্ত্রের দর্শন দ্বারা মন নির্ম্মল হয় না। দর্শন-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে নানা প্রকার মত অবগত হওয়া যায়, কিন্তু ইহার মধ্যে কোন্ মতটি যে সত্য তাহা নিরূপণ করা যায় না। এখানে ব্রাহ্মধর্ম্ম আসিয়া এই উপদেশ দেন যে আধ্যাত্মিক সত্য জানিতে হইলে আপনার আত্মাতে দৃষ্টি করিতে হইবে, আপনার আত্মাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। যে সকল সত্যে আমারদের আত্মা নিঃসংশয় হইয়া সায় দেয়, সেই সকল সত্যই আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ। যথা—এই জগৎ আছে, আমি আছি, ঈশ্বর আছেন, এই সকল সত্য আত্ম-প্রত্যয়-মূলক, আমার আত্মা ইহা না বিশ্বাস করিয়া থাকিতে পারে না। সত্য-ব্যবহার করিবে, ন্যায়-ব্যবহার করিবে—ঈশ্বরের উপাসনা করিবে, পিতা মাতাকে ভক্তি করিবে, পুত্র কন্যাকে স্নেহ করিবে, দরিদ্রের প্রতি দয়া করিবে; এ সকল আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ নীতি উপদেশ। মঙ্গল-স্বরূপ ঈশ্বরের রাজ্যে অমঙ্গল নাই—বিপদ্ সম্পদ উভয়ই আমারদের আত্মার উন্নতি ও মঙ্গলের হেতু ইহা আত্ম-প্রত্যয় রূপ শ্রদ্ধা। এই শরীরের নাশে আমারদের আত্মার বিনাশ নাই; কিন্তু এই আত্মা চিরকাল ঈশ্বরের রাজ্যে থাকিয়া অনন্ত উন্নতি লাভ করিতে থাকিবেন; এই

* অসর্পভূতে রজ্জৌ সর্পারোপবৎ বস্তুন্যবস্ত্বারোপঃ অধ্যারোপ?। অপবাদঃ নাম? রজ্জু বিবর্ত্তস্য সর্পস্য রজ্জ্বাএত্ববৎ বস্তুবিবর্ত্তস্যাবস্তুনোঽজ্ঞানদেঃ প্রপঞ্চস্য বস্তু মাত্রত্বং। বস্তু? সচ্চিদানন্দ মদ্বয় "ব্রহ্ম। তদুক্তং, স্বতস্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিকারইত্যাদীরিতঃ অতস্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃত ইতি।

আমারদের আধ্যাত্মিক আশা। ব্রাহ্মধর্ম্মের এই সকল আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ সত্যকে অবলম্বন করিয়া সৎ-পথে জ্ঞান-পথে ধর্ম্ম-পথে অগ্রসর হও—সত্য স্বরূপ ঈশ্বর তোমারদের নিকট প্রকাশিত হইবেন ইতি।

নিতান্ত শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রী দেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ।

নূতন পুস্তক।

জ্ঞানামৃত। এই পুস্তক পরমার্থসার আত্মবোধ ও প্রশ্নোত্তরমালা নামক সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ। ইহা শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ কর্ত্তৃক অনুবাদিত ও বর্দ্ধমান দ্বিজরাজ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ বেদান্ত দর্শনেরই ছায়া। সংসারে অনাসঙ্গ ও ঈশ্বরে জগৎভ্রম প্রভৃতি বেদান্ত দর্শনের মত। এক্ষণে এই মতের ভ্রম প্রমাদ প্রদর্শিত হইয়াছে।

বর্দ্ধমান মাসিক পত্রিকা। এই পত্রিকা প্রতিমাসে প্রকাশিত হইবে। ইহাতে যে সমস্ত বিষয় প্রকাশিত হইতেছে, স্থায়ী হইলে ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শিতে পারিবে।

নবপ্রবন্ধ। ইহাও একখানি মাসিক পত্রিকা। ইহার বিষয়গুলি উত্তম হইয়াছে। দীর্ঘজীবী হইলে ইহা দ্বারাও সমাজের শুভোদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে।

অবলা চরিত। ইহা শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রণীত ও ঢাকা বাঙ্গলা যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে ফিনিসিয়া হিমেন্স, হানামোর প্রভৃতি আটটি সুবিখ্যাত রমণীর জীবন-চরিত আছে। আমরা ইহা পাঠ করিয়া প্রীতিলাভ করিলাম।

কাব্যমঞ্জরী। ইহা গ্রন্থের প্রথম ভাগ মাত্র। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত ও কাব্য প্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে ভারত ভূমি, প্রভাত, সন্ধ্যা ও রাত্রি প্রভৃতি চতুর্দ্দশটি বিষয় বর্ণিত আছে। আমরা ইহা পাঠ করিয়া দেখিলাম, গ্রন্থকার স্থানে স্থানে বিলক্ষণ কবিত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

উদ্ধৃত।

ব্রহ্মসাধন।

ইহাই সমস্ত সাধনের ফল। ইহাই মানব-জীবনের শেষ লাভ। এই রূপ হইলেই মনুষ্য জন্ম সার্থক হয়। যখন আত্মা ঈশ্বরের সঙ্গে সম্মিলিত হয়, তখন সে একান্ত নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হয়; তাহার সকল আশা, সকল কামনা পূর্ণ হয়; তাহার সমুদায় বৃত্তি চরিতার্থ হয়। এ অবস্থাতে সাধক আত্মকাম ও সিদ্ধসংকল্প হইয়া ব্রহ্মের সহিত নিরন্তর অবস্থিতি করেন। এইরূপ ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইলে তাঁহার ব্রহ্মসাধন হইল।

যে কয়েকটী সোপান পরম্পরায় উত্থিত হইয়া মনুষ্য ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহা উপরে উল্লিখিত হইল। কিন্তু ইহাও বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে সাধনের কার্য্য সকল বিমিশ্র ভাবে কিম্বা অন্য প্রকারে সাধকের মনে ঘটিতে পারে। মনুষ্যের স্বাধীন আত্মা সাধন করিবে, সেই স্বতন্ত্র পুরুষ তাহাকে সিদ্ধি দান করিবেন; সুতরাং সাধক যে কত প্রকারে ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হইতে পারে, তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন। কোন ব্যক্তি হয়ত একবারেই তাঁহার সহচর ও অনুচর হয়েন, কোন কোন ব্যক্তিকে হয়ত অল্পমাত্র সাধন করিতে হয়, কিন্তু অধিকাংশ ব্যক্তির সম্বন্ধে সেরূপ ঘটে না। বাল্যকাল হইতে বহির্বিষয়ে মনকে সর্ব্বদা সঞ্চালন করিয়া অনেকে অতীন্দ্রিয় বিষয়ের প্রতি একান্ত উদাসীন হইয়া পড়ে। বাহ্য বিষয়ের চিন্তা করাই তাহাদের একমাত্র অভ্যাস। তাহাদিগের পক্ষেই সাধনের প্রয়োজন।

ঈশ্বরের সাধকের কতকগুলি লক্ষণ আছে, তদ্দ্বারা তাঁহাকে অন্য লোক হইতে বিলক্ষণ প্রভেদ করা যায়।

ঈশ্বরের সাধক যিনি তিনি অকপট ও ঋজু স্বভাব। তিনি লোকরঞ্জনের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া ঈশ্বরের সত্য পালনের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। সাংসারিক কুটিলতা ও কপটতা তাঁহাতে কিছুই নাই। তিনি ধর্ম্মপালনের নিমিত্ত লোকের সহযোগিতার অপেক্ষা করেন না। তিনি এই মাত্র জানেন যে আপনার যাহা কিছু হউক ঈশ্বরের সত্য পালন করিতেই হইবে। পরম

পিতার সত্য পালনই তাঁহার দৃঢ় ব্রত। তাহাতে তাঁহার শ্রান্তি নাই, আলস্য নাই, তিনি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া তাঁহার সত্যের অনুসরণ করেন। একটু অসত্য বা একটু কপটতা তাঁহার নিকট মহা ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে। যাহাতে মিথ্যাচরণের সম্ভাবনা মাত্র আছে, এরূপ কার্য্যে তিনি পদক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করেন না। ফলতঃ সত্য তাঁহার অন্নপান, সত্যই তাঁহার বল, সত্য পালনই তাঁহার চির ব্রত। তাহাতেই তাঁহার আনন্দ এবং তাহাতেই তাঁহার তৃপ্তি। এরূপ মহাশয় ব্যক্তিকে সকলেই ভক্তি করে; তিনি বিপক্ষপক্ষেরও পূজনীয় হয়েন।

ঈশ্বরের সাধক বিনম্র ও উদার স্বভাব। তিনি আধ্যাত্মিক মদশূন্য। তিনি আপনার অপূর্ণতা বিলক্ষণ রূপ উপলব্ধি করেন। তাঁহার নিকটে তাঁহার নিজের জ্ঞান ও শক্তি অতি সঙ্কীর্ণ বোধ হয়। তিনি সকল লোককে স্নেহের চক্ষে দর্শন করেন ও সকলের সহিত বিনীত ভাবে ব্যবহার করেন। তিনি এই জগতের লোকের মধ্যে নানা প্রকার বৈষম্য ভাব দৃষ্টি করেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার ভ্রাতৃভাবের ব্যত্যয় হয় না। তিনি নানা প্রকার সম্প্রদায়ের লোককে ও নানা প্রকার অবস্থাপন্ন লোককে সমান ভ্রাতৃভাবে স্নেহ করেন। তিনি জানেন যে ধার্ম্মিকদিগের মধ্যেও নানা মত বৈষম্য উপস্থিত হইতে পারে, কেন না সকল লোকের বুদ্ধি ও বিবেচনাশক্তি সমান নহে, আর তাঁহাদিগের মধ্যে কার্য্য বৈষম্যও হইতে পারে, তাহার কারণ এই যে অপূর্ণতা হেতু মনুষ্য তাহার মনের বৃত্তি গুলিকে সর্ব্বসামঞ্জসীভূতরূপে চালনা করিতে পারে না। কেহ স্বভাবতঃ ঈশ্বর প্রীতির দিকে, কেহবা স্বভাবতঃ ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনের দিকে ঢলিয়া পড়েন। কিন্তু ধার্ম্মিকদিগের এই মত-বৈষম্য অথবা কার্য্যবৈষম্য তাহার উদারতা খর্ব্ব করিতে পারে না। তিনি সকল প্রকার ধার্ম্মিক লোকের প্রতি সস্নেহ ভাবে দৃষ্টি করেন এবং সকলেরই আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন। তিনি পাপী ব্যক্তিকেও ঘৃণা করেন না। তিনি নিশ্চয় জানেন যে এমন কোন ধার্ম্মিক ব্যক্তি নাই যে সম্পূর্ণরূপে দোষ শূন্য এবং এমন কোন পাপী ব্যক্তি নাই যে সম্পূর্ণরূপে গুণ শূন্য। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ যেমন সম্পূর্ণরূপ সৌন্দর্য্য বিবর্জ্জিত নহে, তেমনি ঈশ্বর যে পাপী ব্যক্তির আত্মাকেও সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেন নাই, ইহার চিহ্ন সে আত্মা প্রকাশ করে। অতএব তিনি পাপী ব্যক্তির নিকট হইতেও কোন কোন বিষয়ের উপদেশ গ্রহণ করিতে ঘৃণা করেন না।

দুর্ভিক্ষ উপশমের সাহায্যার্থ দান প্রাপ্ত।

পূর্ব্বে বিজ্ঞাপিত	৬৯৪
শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ সিংহ জব্বলপুর..	৪
শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঐ	১০
	১৪
	৭০৮

দুর্ভিক্ষ-গ্রস্ত দেশে প্রেরিত।

পূর্ব্বে বিজ্ঞাপিত	৫৫০
স্থিত	১৫৮

কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের ১৭৮৮ শকের কার্ত্তিক মাসের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	৪৮৫০
পুস্তকালয়	৪৩৷৵১৫
যন্ত্রালয়	২৪
ডাক মাসুল	৬৸০
অনিরূপিত	২ ৶১০
দুর্ভিক্ষ	১৪
গচ্ছিত	২৪ ।৶১০
	১১৩৸১৫

ব্যয়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	২৪
যন্ত্রালয়	৪৩
অনিরূপিত	২৫৷৶১০
আলোকের ব্যয়	২৪
গচ্ছিত	৮৸৶১৫
	১২৫৷৶৫
আয়	১৬৩৸১৫
পূর্ব্বকার স্থিত	২৭৯
	৪৪২৸১৫
ব্যয়	১২৫৷৶৫
স্থিত	৩১৭৵১০

শ্রী সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাসুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২৩। কলিগতাব্দ ৪২৩১। ২৩ অগ্রহায়ণ শুক্রবার।

একমেবাদ্বিতীয়ং
ষষ্ঠ কল্প
চতুর্থ ভাগ
পৌষ ১৭৮৮ শক
২৮১ সংখ্যা
৩১ ব্রাহ্মসম্বৎ

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদ সংহিতা

প্রথমমণ্ডলস্য ত্রয়োদশানুবাকে একাদশং সূক্তং।

গোতমঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ ইন্দ্রোদেবতা।

৯০০

১৬। কো অদ্য যুংক্তেধুরি গা ঋতস্য শিমীবতো ভামিনো দুর্হৃণায়ূন্। আসন্নিষূন্হৃৎস্বসো মযোভূন্য এষাং ভৃত্যাম্ৃণধৎ স জীবাৎ।

১৬। 'অদ্য' অস্মিন্ কর্ম্মণি 'ঋতস্য' গচ্ছতঃ ইন্দ্রসম্বন্ধিনঃ রথস্য 'ধুরি' অশ্ববহনপ্রদেশে 'গাঃ' গতিমতঃ অশ্বান্ 'কঃ' 'যুঙ্ক্তে' কোনাম নিযোক্তুং শক্নোতি নকোপীত্যর্থঃ। কীদৃশান্ অশ্বান্ 'শিমীবতঃ' বীর্য্যকর্ম্মোপেতান্ 'ভামিনঃ' তেজসা যুক্তান্ 'দুর্হৃণায়ূন্' পরৈর্দুঃসহেন ক্রোধেন যুক্তান্। হৃণীযতিঃ ক্রুধ্যতিকর্ম্মা। 'আসন্নিষূন্' যেষাং আসনি আস্যে মুখপ্রদেশে শত্রূণাং প্রহরণার্থং ইষবো বাণাবর্ত্তন্তান্। 'হৃৎস্বসঃ' হৃৎস্থু শত্রূণাং হৃদযেষু অস্যন্তি ক্ষিপন্তীতি হৃৎস্বসঃ। 'মযোভূন্' ময়সঃ সুখস্য ভাবয়িতৄন্ স্বকীযানাং সুখপ্রদান্ ইত্যর্থঃ। 'যঃ' যজমানঃ 'এষাং' ঈদৃশানাং অশ্বানাং 'ভৃত্যাং' ভরণক্রিযাং রথবাহনক্রিযাং 'ঋণধৎ' সমর্দ্ধযতি স্তৌতীতি যাবৎ 'সঃ' যজমানঃ 'জীবাৎ' জীবনবান্ ভবেৎ।

১৬। অদ্য কোন্ ব্যক্তি ইন্দ্রের এই গমনশীল রথের ধুর-কাষ্ঠে বেগ-গামী অশ্বগণকে যোজিত করিতে সমর্থ হইবে। এই সকল অশ্ব বীর-কর্ম্মা, তেজস্বী ও দুঃসহক্রোধ-সম্পন্ন। ইহাদের মুখে শত্রুর প্রতি প্রহারার্থ শর-সমুদায় বদ্ধ রহিযাছে এবং ইহারা শত্রুগণের বক্ষঃস্থলে পাদ নিক্ষেপ করিয়া থাকে। যিনি এই সমস্ত সুখপ্রদ অশ্বগণের রথবাহন কার্য্যের স্তব করেন, তিনি জীবন লাভে সমর্থ হন।

৯০১

১৭। ক ঈষতে তুজ্যতে কো বিভায কো মংসতে সন্তমিন্দ্রং কো অন্তি। কস্তোকায ক ইভাযোত রাযেঽধি ব্রবত্তন্বে৩কো জনায়।

১৭। অনুপ্রহীতরি ইন্দ্রে আশ্রযতে সতি 'কঃ' 'ঈষতে' শত্রোর্ভীতঃ সন্ কোনির্গচ্ছতি ন কোপি ইত্যর্থঃ। 'কঃ' 'তুজ্যতে' কো হিংস্যতে শত্রুভির্হিংস্যোপি কশ্চিন্নাস্তি ইত্যর্থঃ। 'কঃ' যজমানঃ 'বিভায' বিভেতি ইন্দ্রে রক্ষকে সতি ভযমপি নোৎপদ্যতে দূরে তস্য শত্রুকৃতা হিংসা। 'অন্তি' অন্তিকে সমীপে 'সন্তং' অস্মাকং রক্ষকত্বেন বর্ত্তমানং 'ইন্দ্রং' 'কঃ' পুরুষঃ 'মংসতে' জানাতি বযমেব জানীমোনান্যঃ ইত্যর্থঃ। একঃ কঃ পুরুষঃ। যুদ্ধে সহা-

যার্থং ইন্দ্রে আগতে সতি 'কঃ' যজমানঃ 'তোকায়' পুত্রায় 'অধিব্রবৎ' হে ইন্দ্রাস্মদীয়ং পুত্রং রক্ষেত্যেবং রূপং অধিবচনং পক্ষপাতেন বচনং ব্রাহ্মণাধাধিক্রযাৎ ইতি যথা এবং রূপং অধিবচনং কো যজমানঃ কুর্য্যাৎ স্বয়মেবেন্দ্রো রক্ষতীতি-ভাবঃ। 'ইভায' গজায 'কঃ' অধিব্রবৎ 'উত' অপিচ 'রাধে' শত্রুভিঃ অপহ্রিযমাণায ধনায কঃ অধিব্রবৎ অপহ্রিযমাণং অস্মদীযং ধনং রক্ষ ইত্যধিবচনমপি কো যজমানঃ কুর্য্যাৎ ন কোপি ইত্যর্থঃ। অপিচ 'তস্মৈ' স্বকীযায শরীরায 'জনায' পরিজনায চ 'কঃ' অধিব্রবৎ স্বশরীররক্ষার্থং পরিজনরক্ষার্থং চেন্দ্রস্য অধিবচনং না পেক্ষিতং স্তুত্যা প্রীতইন্দ্রঃ স্বযমেব রক্ষতীত্যর্থঃ।

১৭। ইন্দ্র আগমন করিলে শত্রু-ভয়ে ভীত হইয়া কোন্ ব্যক্তি পলায়ন করে এবং কে হিংসিত ও কেই বা ভীত হইয়া থাকে? আমাদের রক্ষার্থ সন্নিহিত ইন্দ্রকে আর কে জানিতে পারে? ইহাঁর নিকট কাহাকে পুত্রের রক্ষা-বিধানের নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে হয়? হস্তীর নিমিত্ত কে প্রার্থনা করে এবং কেইবা আপনার ও পরিজনের রক্ষার নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়া থাকে? ইনি প্রীত হইয়া স্বয়ংই যজমানের সমুদায় রক্ষা করেন।

৯০২

১৮। কো অগ্নিমীট্টে হবিষা ঘৃতেন স্রুচা যজাতা ঋতুভির্ধ্রুবেভিঃ। কস্মৈ দেবা আ বহানাশু হোম কো মংসতে বীতিহোত্রঃ সুদেবঃ।

১৮। 'কঃ' যজমানঃ 'অগ্নিং' 'ঈট্টে ইন্দ্রার্থং হবির্নির্রূপ্য অগ্নিং স্তৌতি ইন্দ্রায হবির্নির্ব্বাপোহপি সম্যক্কর্ত্তুং ন শক্যতে ইন্দ্রস্য দুর্ব্বিজ্ঞানত্বাৎ। কো বা ইন্দ্রযাগার্থং অগ্নিং 'স্রুচা' জুহ্বা 'ধ্রুবেভিঃ' ধ্রুবৈঃ নিত্যৈঃ ঋতুভিঃ বসন্তাদিকালৈঃ উপলক্ষিতেন 'ঘৃতেন' 'হবিষা' 'যজাতৈ' যজেৎ। যদ্বা ঋতবঃ প্রযাজদেবতাঃ। ঋতবো বৈ প্রযাজা ইতিশ্রুতেঃ। তাভিঃ ধ্রুবৈঃ প্রকৃতৌ বিকৃতৌ চানুষ্ঠেযতযা নিশ্চলৈঃ ঋতুভিঃ সহ অগ্নিং আজ্যভাগদেবতাং ঘৃতেন হবিষা কো যজেৎ ন কোপীত্যর্থঃ। 'কস্মৈ' যজমানায 'হোম' হ্বাতব্যং প্রশস্যং ধনং 'আশু' শীঘ্রং 'দেবাঃ' 'আবহান্' আবহন্তি প্রযচ্ছন্তি ন কস্মাঅপীত্যর্থঃ। ইন্দ্র এব ধনস্য দাতা নান্যে দেবাঃ ইতীন্দ্রঃ জুষতে। 'বীতিহোত্রঃ' প্রাপ্তযজ্ঞঃ 'সুদেবঃ' শোভনদেবতাকঃ 'কঃ' যজমানঃ 'মংসতে' ইন্দ্রং সম্যক্ জানাতি ন কোপীত্যর্থঃ বহুবিধেন স্তোত্রেণ চিরকালোপাসনেন চেন্দ্রঃ প্রত্যক্ষো ভবতি নান্যেন প্রকারেণ ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ।

১৮। কোন্ ব্যক্তি ইন্দ্রের নিমিত্ত হবি নির্দ্দেশ করিয়া অগ্নিকে স্তব করিতে পারে? কোন্ ব্যক্তিই বা ইন্দ্র-যাগের নিমিত্ত স্রুক-পাত্র-পূর্ণ হবনীয় ঘৃত দ্বারা নিত্যপূজ্য প্রযাজ দেবতার সহিত অগ্নির যাগ করিতে সমর্থ হয়? ইন্দ্র ব্যতিরেকে কোন্ দেবতা যজমানকে শীঘ্র উৎকৃষ্ট ধন-সম্পত্তি প্রদান করিতে পারেন? কোন্ যজমান অন্য অন্য দেবতার যজ্ঞ করিয়া ইন্দ্রকে জ্ঞাত হইতে সমর্থ হয়।

৯০৩

বৃহতীচ্ছন্দঃ।

১৯। ত্বমঙ্গ প্র শংসিষো দেবঃ শবিষ্ঠ মর্ত্যং। ন ত্বদন্যো মঘবন্নস্তি মর্ডিতেন্দ্র ব্রবীমি তে বচঃ।

১৯। অঙ্গেত্যভিমুখীকরণে। 'অঙ্গ' 'শবিষ্ঠ' হে বলবত্তম ইন্দ্র 'দেবঃ' দ্যোতমানঃ 'ত্বং' 'মর্ত্ত্যং' মরণধর্ম্মাণং ত্বাং স্তুতবন্তং পুরুষং 'প্রশংসিষঃ' সম্যগনেন স্তুতমিতি প্রশংস। হে 'মঘবন্' ধনবন্ ইন্দ্র 'ত্বৎ' 'অন্যঃ' ত্বত্তোঽন্যঃ কশ্চিৎ 'মর্ডিতা' সুখযিতা নাস্তি। অতঃ কারণাৎ 'তে' তুভ্যং ইদং স্তুতিলক্ষণং 'বচঃ' 'ব্রবীমি' উচ্চারযামি।

১৯। হে মহাবল ইন্দ্র! তুমি দীপ্তিশীল। এ ক্ষণে যে তোমার স্তব করিতেছে, সেই ব্যক্তিকে তুমি প্রশংসা কর। হে মঘবন্! তোমা ভিন্ন আর কেহই সুখ-দাতা নাই; এই নিমিত্তই আমি তোমার স্তুতিবাদ করিতেছি।

৯০৪

সতোবৃহতীচ্ছন্দঃ।

২০। মাতে রাধাংসি মাত ঊতযো বসোঽস্মান্ কদা চনা দভন্। বিশ্বা চ ন উপমিমীহি মানুষ বসূনি চর্ষণিভ্য আ।১। ৬।৮।

২০। হে 'বসো' নিবাসযিতঃ ঈন্দ্র 'তে' তব সম্বন্ধীনি রাধোত্যেভিরিতি 'রাধাংসি' ভূতানি অস্মান্ 'কদাচন' কদাচিদপি 'মা' 'দভন্' মা বিনাশযন্তু। তথা 'ঊতযঃ' গন্তারঃ। যদ্বা 'ধূতযঃ' ইত্যত্র বর্ণলোপঃ। ধূতযঃ কম্পযিতারঃ 'তে' ত্বদীযাঃ মরুতশ্চ মা দভন্। হে 'মানুষ' মনুষ্যহিত ইন্দ্র 'চর্ষণিভ্যঃ' মন্ত্রদ্রষ্টৃভ্যঃ 'নঃ' অস্মভ্যং 'বিশ্বা' বিশ্বানি সর্ব্বাণি 'বসূনি' ধনানিচ 'আ' 'উপমিমীহি' সর্ব্বতঃ আহৃত্য অস্মৎসমীপে কুরু। সর্ব্বত্র বর্ত্তমানং ধনং অস্মভ্যং প্রযচ্ছেত্যর্থঃ।১।৩।৮।

২০। হে বাসপ্রদ ইন্দ্র! তোমার আশ্রিতদিগকে যেন কেহ কদাচ বিনাশ না করে। তোমার এই সঞ্চরণ-শীল সমীরণ হইতে যেন আমরা বিনষ্ট না হই। হে মনুষ্যহিত ইন্দ্র! আমরা মন্ত্রদ্রষ্টা, তুমি আমাদিগকে সমস্ত ধন প্রদান কর।১।৬।৮।

সিন্দূরীয়াপটী ব্রাহ্মসমাজ

তৃতীয় সাম্বৎসরিক বক্তৃতা।

১১ অগ্রহায়ণ ১৭৮৮ শক।

যিনি আমাদিগকে সংসারে আনয়ন করিয়াছেন, অতি যত্নের সহিত প্রতিপালন করিতেছেন, এবং এই ক্ষণ-ভঙ্গুর শরীরে সংযুক্ত করিয়াও মহাবিনাশ হইতে রক্ষা করিতেছেন, তিনিই আমাদের হৃদয়েশ্বর, তিনিই আমাদের গৃহ-দেবতা, তিনিই এই ব্রাহ্মসমাজের অধিষ্ঠাতা। তিনি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বান্তর্যামী, এবং তিনিই একমাত্র মুক্তিদাতা ও পতিত-পাবন। সমস্ত সংসার তাঁহারই মহিমা গান করিতেছে এবং তাঁহারই যশ ঘোষণা করিতেছে। আমরা তাঁহারই পবিত্র নামে উৎসব করিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মগণকে এই তৃতীয় বার আহ্বান করিয়াছি। আজি আমরা কি করিব? সম্বৎসর কাল যাঁহার করুণা অজস্র ভোগ করিয়াছি, আজি হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিব। তিনি আমাদিগকে পিতামাতা অপেক্ষাও অধিক স্নেহে প্রতিপালন করিয়াছেন, পাপতাপ হইতে রক্ষা করিয়াছেন, কত বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। কত নিদারুণ শোক হৃদয়কে বিদ্ধ করিয়াছিল, তিনি ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা প্রেরণ করিয়া কেমন অল্পে অল্পে শান্তি-সলিল দ্বারা তাহাকে শীতল করিয়াছেন। আজি সম্বৎসরের ঘটনা-সকল যতই স্মরণ করিতেছি, ততই তাঁহার প্রেমমুখের উজ্জ্বল জ্যোতি অন্তরে প্রতিভাত হইতেছে। ধন্য জগদীশ্বর! তুমিই ধন্য, তোমাকে কে বিস্মৃত হইতে পারে।

আজি কি দেখিতেছি? সেই আনন্দস্বরূপ ঈশ্বরের আনন্দ-লীলা এই গৃহে বিলসিত হইতেছে। যিনি সর্ব্বত্র বিদ্যমান, তিনি এখানেও বিদ্যমান আছেন। আজি হৃদয়ের প্রীতি-পুষ্পে তাঁহার পূজা করিব, মুক্তকণ্ঠে তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিব, অসংকোচে তাঁহার প্রেমামৃত পান করিব। আজি ঈশ্বরের জয় ঘোষণা করিব; আজি ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিব। যিনি ঈশ্বর, তিনিই আমাদিগের উপাস্য দেবতা; তিনি আমাদের হইতে দূরবর্ত্তী নহেন, তিনি প্রচ্ছন্নভাবে সকলের হৃদয়ে বাস করিতেছেন। তাঁহাকে লাভ করিবার নিমিত্ত স্থানান্তরে গমন করিতে হয় না; যে ব্যক্তি তাঁহাকে চায়, সে আপনার অন্তরেই তাঁহাকে লাভ করে। ঈশ্বর যাহার অন্তরে নাই, সে ঈশ্বরকে কোন স্থানেই লাভ করিতে পারে না। পবিত্র হৃদয় তাঁহার প্রিয় নিকেতন, যাঁহার হৃদয় যত পবিত্র হয়, তিনি সেই হৃদয়ের মধ্যে হৃদয়-স্বামী ঈশ্বরকে ততই দেখিতে পান। হৃদয় যদি পাপকলঙ্কে মলিন হয়, তবে ঈশ্বর-স্পৃহা পর্য্যন্ত

তাঁহার হৃদয় হইতে পলায়ন করে। পাপ-চিন্তা, পাপালাপ ও পাপানুষ্ঠান এই ত্রিবিধ পাপ দ্বারা হৃদয় দূষিত হয়। সাধু-চিন্তা, সাধু আলাপ ও সাধু কর্ম্মের অনুষ্ঠান হৃদয়কে পবিত্র করে। সেই পবিত্র হৃদয় দ্বারা মঙ্গল-স্বরূপ ঈশ্বরের পূজা করিতে হয়। এই আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মের আদেশ। আমরা চিরজীবনের নিমিত্ত এই ব্রাহ্মধর্ম্ম-ব্রত অবলম্বন করিয়াছি; কেবল পৃথিবীর জীবনে নয়, অনন্তকাল আমরা এই ব্রত প্রতিপালন করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। যে কএক দিন এই পৃথিবীতে অবস্থান করিব, যেরূপে হউক এই ব্রত রক্ষা করিতেই হইবে। যখন পৃথিবী হইতে অবসৃত হইব, যেখানে যাই এই ব্রতই আমাদের লক্ষ্য থাকিবে। যাঁহারা আমাদের এই ব্রতের প্রতিকূলতা করেন, তাঁহারা আমাদের হৃদয় হইতে শোণিত পান করেন। আমরা আর কিছুই চাহি না, নির্ব্বিঘ্নে মুক্ত-হৃদয়ে ঈশ্বরের আরাধনা করিতে পারিলেই আমরা চরিতার্থ হই। ধন, জন, যশ, মান যদি ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুকূল হইয়া আমাদের নিকট আইসে, আহ্লাদের সহিত গ্রহণ করিব; এই আমাদের সংকল্প। আমরা এরূপ অহঙ্কার করিতে পারি না যে, চির দিন আমরা অটল ভাবে ধর্ম্মপথে দণ্ডায়মান থাকিব; যদি দুর্ভাগ্যক্রমে পাপ-পঙ্কে পতিত হই, তখন কি করিব? কাঁদিতে কাঁদিতে সেই পতিত-পাবনেরই শরণাপন্ন হইব। তখন তিনি যে দণ্ড দিবেন, মস্তকে করিয়া বহন করিব। এই আমাদের সাহস।

আমরা নিশ্চয় জানিতেছি যে, যে সকল লোকে পরিবেষ্টিত হইয়া আছি, তাঁহারা আমাদের প্রাণগত উদ্দেশ্য না বুঝিয়া কত তিরস্কার করিবেন, কত বিরক্তি প্রকাশ করিবেন, কত পরিহাস করিবেন। তখন আমরা কি করিব? আরও বিনীত হইব, আরও বিনম্র হইব, আরও সহিষ্ণু হইব। কেবল এই প্রতীক্ষা করিব, ঈশ্বর তাঁহাদের পাষাণ-হৃদয়ে কখন প্রেম সঞ্চার করেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে আমরা যে রসের আস্বাদন পাইয়া এই পথে পদার্পণ করিয়াছি, ঈশ্বর যদি তাঁহাদের হৃদয়-রসনায় সেই রস এক বিন্দু বর্ষণ করেন, তাঁহাদিগকেও আমাদের ন্যায় ব্যাকুল হইতে হইবে। যিনি আমাদের অনিষ্ট চেষ্টা করিবেন, আমরা তাঁহার হিতানুষ্ঠান করিব। ইহাই আমাদের শিক্ষা। এই পবিত্র ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্যই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আজি তাহার তৃতীয় সাম্বৎসরিক মহোৎসব।

আমাদের উৎসব কেবল বাহ্য আড়ম্বরেই অলঙ্কৃত নহে, কিন্তু সেই প্রাণস্বরূপের আবির্ভাব ইহার জীবন্ত ভাব প্রকাশ করিতেছে। অদ্যকার উৎসব সাধুগণের সাধুভাব বর্দ্ধিত করিতেছে, অসাধুদিগকে সাধুভাবে আকর্ষণ করিতেছে; নির্ভয়-চিত্ত উদ্যোগী পুরুষের উৎসাহ দ্বিগুণ করিতেছে, দুর্ব্বল ভীরুগণের হৃদয়ে সাহস দান করিতেছে, ঈশ্বরের পিতৃ-ভাব প্রদর্শন করিতেছে, মনুষ্যের ভ্রাতৃভাব উজ্জ্বল করিতেছে, ইহ লোকেই সেই স্বর্গধামের আভাস প্রদর্শন করিতেছে। যে ব্রাহ্ম এই উৎসবের অংশভাগী হন, তাঁহার আত্মা সহস্রগুণ বল ধারণ করে। সর্ব্বসন্তাপহারী অমৃতময় পুরুষের আলিঙ্গনে আত্মাকে শীতল করা, তাঁহার প্রেমমুখ দর্শন করিয়া আত্মাকে জীবন্ত করা, তাঁহার পবিত্র জ্যোতিতে পবিত্র হওয়া এই উৎসবের উদ্দেশ্য। সংসারের সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে, বিপদের সহিত বন্ধুতা করিতে হইবে, শোক দুঃখের কশাঘাত সহ্য করিতে

হইবে, ঈশ্বরের পথে অগ্রসর হইতে হইবে, এই সকল বিষয়ে প্রস্তুত হইবার জন্য অমৃতময় পিতার নিকট অমৃত পান করা এবং ব্রহ্মপরায়ণ সাধু ব্রাহ্মের উৎসাহকর সংসর্গ লাভ করা এই উৎসবের উদ্দেশ্য।

হে পরমাত্মন্! তোমার চরণের মঙ্গল-ছায়াতে আমারদিগকে রক্ষা কর। আমারদের সকলের আত্মাকে তোমার পবিত্র জ্যোতিতে পবিত্র কর। অদ্যকার উৎসাহ যেন অদ্যই অবসন্ন না হয়; তুমি যেমন অদ্য আমাদিগকে দেখা দিতেছ, এই রূপ চির দিন নয়নের সমক্ষে থাকিয়া সর্ব্বদা পাপ তাপ বিঘ্ন হইতে আমারদিগকে রক্ষা কর। এ পৃথিবীতে আমারদের রক্ষা করিবার আর কেহ নাই; তুমিই আমারদের পিতা মাতা, তুমিই আমারদের সুহৃৎ। সংসারের অন্ধকার-মধ্যে তুমি আমাদের আলোক; ভয় ও দুর্ব্বলতার মধ্যে তুমি আমারদের বল; অনিত্য সম্পদের মধ্যে তুমিই আমারদের চির সম্পদ্। নাথ! যখন তোমার পথের পথিক বলিয়া তাবৎ সংসারীরা আমারদিগকে পরিত্যাগ করিবে, তখন তুমি একাকী নিকটে থাকিয়া চির-জীবন-সখা চির-সুহৃদ হইয়া আমারদিগকে আশ্রয় দিবে। তোমার ন্যায় সুহৃদ্ আর কোথায় পাইব? সংসার কেবল যন্ত্রণারই আধার, ইহার সুখ কেবল দুঃখের কারণ। অতএব, হে জীবনের জীবন! আমারদিগকে সংসার-পাশ হইতে মুক্ত কর, এবং আমারদের সমুদায় প্রীতি তোমাতে স্থাপিত কর। তোমার নাম প্রত্যেক পরিবারে কীর্ত্তিত হউক; সর্ব্বত্র তোমার মহিমা মহীয়ান্ হউক। হৃদয়নাথ! তুমিই ধন্য, তুমিই ধন্য।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

থিওডোর পার্কর।

২৮০ সংখ্যক পত্রিকার ১৬৬ পৃষ্ঠার পর।

বিশ্ব জগতের উপাসনাই জড়োপাসনার উচ্চ প্রণালী। এই স্থলেই পুরুষোপাসনার বিলক্ষণ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু কোন্ স্থলে জড়োপাসনার পরিসমাপ্তি ও পুরুষোপাসনার প্রারম্ভ হইতেছে, কেহই তাহা সবিশেষ নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। এই দুই প্রকার উপাসনা-প্রণালী পরস্পর এই রূপ সংশ্লিষ্ট যে, পরস্পরের চিহ্ন পরস্পরেই দেদীপ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কি বহু দেবতার উপাসনা কি জড়োপাসনা এই দুই প্রকার মতের মধ্যেই একটি অসংস্কৃত রীতি অনুসৃত হইয়া থাকে।

সাধারণের যে একটি কুসংস্কার আছে, তাহার মধ্যেও এই জড়োপাসনার কতকগুলি চিহ্ন দৃষ্ট হয়। এই সম্প্রদায় বজ্রাঘাত, ভূমিকম্প, লোকক্ষয় প্রভৃতি যে সমস্ত কার্য্য কখন কখন ঘটিয়া থাকে, তৎসমুদায় এবং নরাঙ্কিত প্রভৃতি দুর্নিমিত্ত সকল ঈশ্বরের বিশেষ বিশেষ কার্য্য বলিয়া স্বীকার করে। ইহারদিগের বিশ্বাস এই যে, ঈশ্বর স্থান বিশেষ ও সময় বিশেষে বর্ত্তমান থাকেন। তিনি মনুষ্যের উপবাসানুষ্ঠান কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্রতসাধন ও উপহার প্রদান প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা তুষ্টি লাভ করেন। এই পৃথিবীতে এমন কোন সম্প্রদায়ই নাই, যাহা এই জড়োপাসনা মতের কোন না কোন চিহ্ন দ্বারা অঙ্কিত হয় নাই। বর্ত্তমান খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে এই মতের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব দৃষ্টিগোচর হয়।

এই উপাসনার মত হইতে উপাসকদিগের আত্মার উন্নতি সম্পাদন, হিতকরী নীতির ও কোন রূপ শ্রীবৃদ্ধি সাধন হয় নাই। এই ধর্ম্ম-সংক্রান্ত কার্য্য সকল অনিয়ন্ত্রিত-ইচ্ছা-সম্ভূত অসঙ্গত ও অপ্রা-

কৃতিক বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। এই অবস্থায় পিশাচ-সিদ্ধ ও মায়াজীবিদিগের পৌরোহিত্যের প্রাদুর্ভাব হয়। ইহারা যে পরিমাণে ধর্ম্মের অধিকার বৃদ্ধি করে, সেই পরিমাণে সমাজ-মধ্যে অনিষ্টোৎপত্তি হইয়া থাকে। বৈরাগ্যে উৎসাহ প্রদান, উপাসকদিগের উপর দুর্ব্বহ কার্য্য-ভার নিক্ষেপ করাই ইহাদিগের ব্যবসায়। ঘৃণাকর ত্বক্‌ছেদ, ভয়ঙ্কর ত্যাগ-স্বীকারই ইহাদিগের ব্যবস্থা। ইহারা দেবতার নামে নরবলি প্রদান করিয়া থাকে। এই সমস্ত নরাধম পামর আপনাদিগের কপটাচারে সাংসারিক চক্ষু নিক্ষেপ এবং জ্ঞান ও বিশ্বাস এই দুইটির বিরোধ আলোচনায় প্রতিষেধ করিয়া ধর্ম্মকে শৈশবাবস্থায় ব্যবস্থাপিত করে। তথাচ এই সম্প্রদায় চিন্তা ও অনুশীলনে তৎপর হইয়া বিজ্ঞান ও শিল্পের সামান্য রূপ উন্নতি সাধন এবং যে সমস্ত কার্য্য এই ধর্ম্মের অনুমোদিত পরম্পরায় তাহারও অযৌক্তিকতা প্রতিপাদন করিয়াছে।

এই উপাসনার নীচ প্রণালী অনুসারে প্রাকৃতিক নিয়মকে পদতলে নিক্ষিপ্ত ও দলিত করা হইতেছে। উপাসকদিগের মত এই যে, প্রত্যেক বস্তুর জীবন আছে। সমুদায় দৃশ্য পদার্থেরই ক্ষয়, বৃদ্ধি ও পুনরুৎপত্তি আছে। বৎসরের ঋতু, আকাশের নানা প্রকার পরিবর্ত্ত ও এই রূপ প্রাকৃতিক ঘটনা সকল দেবগণের নিরঙ্কুশ ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। মায়াজীবি পুরোহিতগণ স্বেচ্ছাক্রমে নভোমণ্ডল ঘন ঘটায় আচ্ছন্ন ও মুষলধারে বারি ধারা নিপাতিত করিতে পারেন। মারণ উচ্চাটন প্রভৃতি অভিচারক্রিয়া-পারদর্শী বৃদ্ধারা চন্দ্র-মণ্ডল খণ্ড খণ্ড করিতে সমর্থ হয়। মায়া-জীবিরা দুশ্চিকিৎস্য পীড়ার আক্রমণ অনায়াসেই নিবারণ করিতে পারে। এই অবস্থায় প্রাকৃতিক নিয়ম অলৌকিক ঘটনার মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। যাহারা ইহার সাধারণ অপেক্ষা প্রাকৃতিক নিয়ম বিলক্ষণ অবগত আছে, সেই সমস্ত ধূর্ত্তেরাই ঐন্দ্রজালিক, অলৌকিক কার্য্যানুষ্ঠায়ী, পুরোহিত, জ্যোতিষিক, ভবিষ্যদ্বক্তা, চিকিৎসক এবং দেবতা ও মনুষ্যের মধ্যবর্ত্তী পুরুষ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

যখন মনুষ্যেরা হর্ষ বিষাদ ও সুখ দুঃখের ভাব সম্যক্ পরিজ্ঞাত হইতে লাগিল, তখন বিবেচনা করিল এই সমস্ত বিষয় কদাচই এক দেবতার কার্য্য হইতে পারে না। তখন তাহারা শুভ ও অশুভের স্রষ্টা দেবতাদিগের একটি বিভাগ কল্পনা করিল। এই বিভাগ নির্দ্দেশ প্রায় সকল ধর্ম্মেই দৃষ্ট হয়। খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ কর, তাহাতেও শুভাশুভের দেবতা স্বতন্ত্র দেখিতে পাইবে। উপাসকেরা এই দুই প্রকার দেবতারই অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। এক দেবতার ক্রোধ শান্তি ও আর একটি দেবতার প্রসন্নতার নিমিত্ত প্রচুর উপহার প্রদত্ত হইয়া থাকে। এই সমস্ত উপহার দেবতাদিগের চরিত্র এবং জাতিগত ও ব্যক্তিগত চরিত্রের অনুসারে নির্দ্দিষ্ট হয়।

এই সময়ে মনুষ্য-সমাজের আর এক প্রকার ভাব উপস্থিত। যখন প্রত্যেকেরই দেবতা স্বতন্ত্র এবং ঐ সমস্ত দেবতার মধ্যে প্রত্যেকেরই ভাব স্বতন্ত্র হইল, তখন মনুষ্যের মধ্যে যে একটি প্রীতি-সূত্র ছিল, তাহা উচ্ছিন্ন হইয়া গেল। মনুষ্যেরা পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে লাগিল। দেবগণের মধ্যে বিরোধ-ভাবই মনুষ্য-সমাজের বিরোধ-ভাব উদ্দীপিত করিয়া দিল। এই রূপে একটি পরিবার আর একটি পরিবারের প্রতি, একটি বংশ আর একটি বংশের প্রতি এবং একটি জাতি আর

একটি জাতির প্রতি ঘোরতর বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত হইত। যে জাতি অতিশয় নিষ্ঠুর তাহার দেবতাও যার পর নাই নিষ্ঠুর হন এবং বিপক্ষের শোণিতই তাঁহার প্রীতিকর উপহার হইয়া থাকে। যে সমস্ত বিদেশী দৈবাৎ উপস্থিত হইত, এই সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা তাহাদিগকে দেবগণের পূজোপহার বলিয়া বিবেচনা করিত। ঐ সকল ভণ্ড তপস্বীরাই স্বহস্তে আগন্তুক ব্যক্তির শিরশ্ছেদন করিয়া আপনার ইষ্ট দেবতার তৃপ্তি সাধন করিত। এই অবস্থায় যুদ্ধ বিগ্রহ প্রায়ই উপস্থিত হইত এবং উহা একটি স্বাভাবিক কার্য্য বলিয়া সমাজ-মধ্যে গণনা করিত। সংগ্রাম-কালে যাহারা বন্দীরূপে আনীত হইত, এই সম্প্রদায় তাহাদিগকে দেবতার সন্নিধানে বলি প্রদান করিত। ইহাদের সমুদায় চেষ্টা সৃষ্টি-রক্ষার্থ বিনিযোজিত না হইয়া সৃষ্টি-সংহারেই ব্যয়িত হইত। এই অবস্থায় যুদ্ধই পুরুষের কার্য্য ও ভূমি কর্ষণাদি স্ত্রী জাতির কার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল। দেবতারা স্বয়ং রণস্থলে আধিপত্য এবং বীরগণের শত্রু-শোণিত-সিক্ত হস্তকে পুরস্কার প্রদান করিতেন। ইঁহারাই যুদ্ধের দেবতা, ইঁহাদের হইতেই মনুষ্যের যুদ্ধ শিক্ষা ও যুদ্ধে উৎসাহ প্রদত্ত হইত।

ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে এই মতের ভূরি ভূরি নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহুদীরা প্রথমে জড়োপাসক ছিল। পরে এই মত পরিত্যাগ করিয়া পুরুষোপাসনা তৎপরে একেশ্বরোপাসনা অবলম্বন করে। এই জাতির সহিত নিরপরাধ শান্তস্বভাব কানানাইট জাতির ঘোরতর বৈরভাব জন্মে। এই দুইজাতি ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উপাসক ছিল। ইহুদিরা যে দেবতার উপাসনা করিত, সেই দেবতা কানানাইট দিগের উপাস্য ছিলেন না; এই নিমিত্ত তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উহাদের বিনাশ কামনা করেন। দেবতার আদেশানুসারে স্ত্রী, পুরুষ ও বালকেরা পর্য্যন্ত শত্রুর হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারিত না। পূর্ব্বকালে মেক্‌সিকো প্রভৃতি স্থানে এই রূপ প্রণালী অনুসৃত হইত। এক্ষণেও দক্ষিণ মহাসাগরের দ্বীপ-শ্রেণীতে এই ভীষণ কার্য্যের কএকটি দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে।

এই রূপ যুদ্ধ বিগ্রহ দ্বারা লোকের বুদ্ধিবৃত্তির চালনা হওয়াতে জাতি-সাধারণ্যে একটি উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত এবং ধর্ম্মের প্রকৃত ভাব অবগত হইবার অবসর উপস্থিত হইল। যুদ্ধ যে এমন নিষ্ঠুর, সেও মনুষ্য-হৃদয়ে বিজ্ঞানের আলোক প্রবেশিত করিয়া দিল। তখন মনুষ্য-সমাজে অপেক্ষাকৃত সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি হওয়াতে মনুষ্যত্ব মস্তক উন্নত করিবার প্রকৃত সময় প্রাপ্ত হইল। ধর্ম্মের সহিত নীতির সংযোগ হওয়াতে পৃথিবী মঙ্গল ও শান্তির আয়তন হইতে লাগিল। ফলত তৎকালে মনুষ্যের মনে এই রূপ ভাব উপস্থিত হইয়াছিল, যদি পরাজিত ব্যক্তিরা জেতৃবর্গের দেবতার অর্চ্চনা করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে আর বধ-দণ্ড প্রদান করা হইবে না। সমাজ-মধ্যে এই রূপ নিয়ম নির্দ্ধারিত হইলে শতশত ব্যক্তি প্রিয়তর প্রাণ রক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়াছিল; কিন্তু যদিও তাহারা অগত্যা জেতৃজাতিদিগের দেবতার প্রাধান্য স্বীকার করিত, তথাচ আপনাদের অভীষ্ট দেবতার উপাসনায় ক্ষান্ত হয় নাই। এই অবস্থায় কেবল বিজিত উপাসকদিগকে নয়, উপাস্যদিগকেও নিয়মে বদ্ধ হইতে হইয়াছিল। বিজিত জাতির দেবতাকে জেতৃজাতীয় দেবতার নিকট সম্পূর্ণ অধীনত্ব স্বীকার করিতে হইত। দেবতারা বিজিতদিগের দৈহিক রক্তের পরিবর্ত্তে দৈহিক পরিশ্রম আপনাদিগের তৃপ্তি

সম্পাদনের পক্ষে যথেষ্ট বিবেচনা করিতেন। কিন্তু পুরোহিতেরা এই রূপ পরিবর্ত্তের মুখে ব্যাঘাত প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। তাঁহারা এই পরিবর্ত্তকে দেবগণের অনুমোদিত নহে বলিয়া যাহারা শত্রু-হস্ত হইতে মুক্ত হইত, তাহাদিগকে যথোচিত ঘৃণা ও অবজ্ঞা করিতেন। কিন্তু পুরোহিতদিগের আদেশ ও উপদেশ তখন আর সম্যক্ প্রতিপালিত হইত না। যখন প্রকৃত সত্যের আলোক লাভ করিয়া মনুষ্য অনন্ত উন্নতির পথে অগ্রসর হয়, তখন কোন বিঘ্নই তাহাদের গতি রোধ করিতে পারে না।

পুরুষোপাসনা ধর্ম্মোন্নতির দ্বিতীয় সোপান। এস্থলে ইন্দ্রিয়-বোধের উপর চিন্তা-শক্তি আধিপত্য করে। এস্থলে প্রকৃতির নিয়ম ও পশুপক্ষী প্রভৃতি জীব জন্তুগণের অভ্যাস মনুষ্যের হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে। প্রকৃতি ও পশুপক্ষী উপাস্য পদার্থ বলিয়া আর বিবেচিত হয় না। জড়োপাসনার পর এই পুরুষোপাসনা জনসমাজ সম্পূর্ণ অধিকার করিয়াছিল। এই উপাসনাও আবার দুই প্রকার। একটি অন্ধ-শক্তির উপাসনা, আর একটি জ্ঞান-শক্তির উপাসনা। গ্রিশ দেশে এই পুরুষোপাসনার মত প্রচলিত হইবার প্রথমাবস্থায় অন্ধ-শক্তি উপাসনারই সম্যক্ প্রাদুর্ভাব ছিল। গ্রিশ দেশীয় দেবতারা পৃথিবী, আকাশ ও সমুদ্রের পুত্ররূপে কল্পিত হইয়া ছিল এবং আকাশ সমুদ্র প্রভৃতি পদার্থ সকল অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট দেবতা বলিয়া বিবেচিত হইত। এই দেশের পুরাবৃত্ত পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঐ দেশে এমন কতকগুলি প্রসিদ্ধ দেবতা ছিলেন যে, তাঁহারা প্রাকৃতিক শক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহেন। কিন্তু তৎপরে যে সমস্ত পুরাবৃত্ত প্রস্তুত হইয়াছে, তন্মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে একটি পূর্ণ আধ্যাত্মিক শক্তিকে দেবত্ব প্রদান করা হইয়াছে। সেই দেবতা ওলিম্পস্ পর্ব্বতের শিখর দেশ হইতে এই পৃথিবীকে শাসন করিতেন। তৎকালে মনুষ্যের আধ্যাত্মিক বৃত্তি সমুদায়কে দেবত্ব প্রদত্ত হইয়াছিল। তাহারা ঐ দেবতার অধীন ছিল। এই জ্ঞান-শক্তির দেবত্ব-কালে আর অন্ধ-শক্তির উপাসনা হইত না। এই অবস্থায় কেবল মনুষ্যকে দেবত্ব প্রদত্ত এবং সে উপাসিত হইত। এস্থলে উপাস্য ও উপাসকের প্রভেদ এই যে, উপাস্যেরা উপাসক দিগের ন্যায় মনুষ্য-গর্ভে সঞ্জাত ও প্রতিপালিত হইতেন বটে; কিন্তু তাঁহারা উপাসকদিগের ন্যায় মৃত্যুর বশম্বদ ছিলেন না। তাঁহারা চিরকালই নবযৌবন-সম্পন্ন হইয়া জীবিত থাকিতেন। তাঁহারা বিবাহাদি করিয়া বংশ বিস্তার করিতেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ প্রকৃতির উপর কেহ বা শিল্পের উপর আধিপত্য করিতেন। প্লুটো মৃত ব্যক্তিদিগের নিকেতন, নেপচুন সমুদ্র এবং ভূলোক ও দ্যুলোক শাসন করিতেন। কতগুলি দেবতাকে দ্রাক্ষা ক্ষেত্র প্রভৃতি স্থানের তত্ত্বাবধারণ করিতে হইত। এক দেবতা সুবর্ণ চক্র-চিহ্নিত রথে আরোহণ করিয়া দিবসের উপর, আর এক দেবী রজনীর উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেন। উৎকৃষ্ট প্রস্রবণ, সুন্দর বৃক্ষ, রমণীয় পর্ব্বত ইহাঁদের বাসস্থান ছিল। এমন কি, মনুষ্যের সুদৃশ্য আকারও দেবতার পবিত্র মন্দির বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইত। ফিবস আপোলো, থর, মার্স প্রভৃতি কতকগুলি দেবতা শিল্পের উপর আধিপত্য করিতেন। যাহাই হউক অনন্ত জ্ঞান অনন্ত শক্তি ও অনন্ত প্রীতি এই সমস্ত দেবতার মধ্যে কাহারই ছিল না। মনুষ্যের ন্যায় ইহাঁদের প্রত্যেকেরই সঙ্কীর্ণ ভাব দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে এবং মনুষ্যের যেমন নানা প্রকার চরিত্র-দোষ উপস্থিত হয়, এই সমস্ত দেবতাদিগের তাহাও দৃষ্ট হইত। মনুষ্যেরা যেমন লুব্ধ-স্বভাব, ইহাঁদের মধ্যেও অনেকে সেই রূপ আছেন। রোমিয়েরা শত্রুদিগের দেবগণকে শত্রু-নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনাদিগের দল-মধ্যে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত নানা প্রকার প্রলোভন দেখাইত। এই সমস্ত দেবতার মধ্যে সকলের শক্তি সমান রূপ ছিল না, এক জন দেবদলের অধিপতি হইতেন, তাঁহাকে দেবরাজ বলিয়া সকলে আহ্বান করিত, তিনি অন্যান্য দেবগণকে স্বেচ্ছানুসারে শাসন করিতেন।

সংস্কৃত সাহিত্য।

২৮০ সংখ্যক পত্রিকার ১৭৫ পৃষ্ঠার পর।

বৈদিক গ্রন্থ সমুদায় অতি পবিত্র বলিয়া চিরকালই প্রসিদ্ধ আছে, এই নিমিত্ত পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা উহার কোন অংশ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিতে সাহসী হন নাই। গ্রন্থকর্ত্তারা স্ব স্ব গ্রন্থে যে সমস্ত বিষয় সন্নিবেশিত করিয়া গিয়াছেন, তৎসমুদায় এক্ষণে অবিকৃতই দেখিতে পাওয়া যায়। এই বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষের স্থান-সন্নিবেশ ও প্রাকৃতিক গুণ যে রূপ বিভিন্ন প্রকার দৃষ্টিগোচর হয়, সামাজিক ব্যবহারও সেই রূপ। যে দেশের আয়তন অল্প তথাকার পূর্ব্বতন সামাজিক আচার ও ধর্ম্ম বিভিন্ন প্রকার হইলেও তাহা সম্যক্ নির্ণয় করা যাইতে পারে, কিন্তু যে দেশ অতিশয় প্রশস্ত, তাহার বিষয় সম্যক্ জ্ঞাত হওয়া সহজ নহে। এই ভারতবর্ষের বিষয়ও সেই রূপ। কিন্তু যদিও এই ভারতবর্ষে দেশ-ভেদে আচার বিভিন্ন প্রকার দৃষ্ট হয়, এবং এক্ষণে তাহার ইয়ত্তা করাও সুকঠিন, তথাচ ঐ সমস্ত আচার ব্যবহারের মধ্যে জনশ্রুতি যত গুলিকে বহন করিয়া আসিতেছিল, পৌরাণিক গ্রন্থকর্ত্তাদিগের অত্যুক্তি-দোষে তৎসমুদায় এক প্রকার অবিশ্বাস্য হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং বৈদিক গ্রন্থে যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই এক্ষণে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে এবং ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন আচার নিরূপণ করিতে হইলে বৈদিক গ্রন্থই অপেক্ষাকৃত আদরণীয় হইবে।

বৈদিক গ্রন্থ সর্ব্বালোচনা করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন আচার ব্যবহার যে বিভিন্ন প্রকার ছিল, গ্রন্থকর্ত্তারাও তাহা সুস্পষ্ট স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। যদিচ সমুদায় ভারতবর্ষকে এক রূপ আচার-সূত্রে বদ্ধ করা ব্রাহ্মণদিগের অভিপ্রেত ছিল কিন্তু তৎকালে তাঁহারা তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। শ্রৌতসূত্র এক খানি ব্যবহার-পদ্ধতি-নিরূপক গ্রন্থ। এই গ্রন্থ আলোচনা দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, ভারতবর্ষীয়েরা সকলেই যে এক রূপ আচার-নিষ্ঠ হইয়া ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় পবিত্র-স্বভাব হইবে, গ্রন্থকর্ত্তা তাহার আভাস দিয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থের এই রূপ উদ্দেশ্য থাকিলেও তাহা ফলে পরিণত হয় নাই। ব্যবহার-কালে সকলেই আপন আপন বংশ-পরম্পরা-প্রচলিত আচারই শ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠান করিত। কিন্তু গৃহ্য-সূত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে সূত্রকার বংশ-পরম্পরাগত আচারের অনুমোদন করিয়াছেন। উহার এক স্থলে স্পষ্টাক্ষরে এই রূপ লিখিত হইয়াছে যে দেশাচার ও কুলাচার যদি ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্ম-বুদ্ধির নিতান্ত পরিপন্থী না হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক ব্যক্তিই অকুণ্ঠিত হৃদয়ে তাহার অনুষ্ঠান করিবে*।

* পারস্কর গৃহ্য সূত্রের টীকায় এই রূপ উল্লিখিত হইয়াছে যে আপনার বংশ-পরম্পরা-প্রচলিত আচার পরিত্যাগ করিয়া অন্যের আচার অবলম্বন করা নিতান্ত অন্যায়।

শাখান্তরীয় কর্ম্মণে দোষমাহ বসিষ্ঠঃ। নজাতু পরশাখোক্তং বুধঃ কর্ম্ম সমাচরেৎ। আচরণ্ পরশাখোক্তং

ব্রাহ্মণদিগের ব্যবস্থা যদিও এই সমস্ত গৃহ্য কার্য্যের অনুমোদন করিতেছে কিন্তু তৎ সমুদায় শ্রুতিমূলক নহে, স্মৃতিই এই সকলকে সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। দেশ বিশেষ ও গ্রাম বিশেষের আচার ব্যবহার-সকল কতকগুলি যে শাস্ত্র-মূলক ও কতক গুলি যে শাস্ত্র-বিরুদ্ধ ব্রাহ্মণেরা তাহার উল্লেখ করিয়া কহিয়াছেন যে, যে সকল আচার কুলক্রমাগত তাহার পরিপন্থী হওয়া অনুচিত। আশ্বলায়নের গৃহ্যসূত্রে এই রূপ লিখিত আছে যে জনপদ-ধর্ম্ম ও গ্রাম-ধর্ম্ম নানা প্রকার। বিবাহ কালে এই সকল অনুসরণ করিবে কিন্তু যাহা সাধারণ-ধর্ম্ম আমরা তাহা নির্দ্দেশ করিব *। এই স্থলে টীকাকার লিখিয়াছেন যে জনপদাদি ধর্ম্মের সহিত যদি বক্ষ্যমাণ ধর্ম্মের বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে বক্ষ্যমাণ ধর্ম্মই প্রতিপালন করিবে। আমরা যাহা বলিব, তাহাই সাধারণ-ধর্ম্ম। যদি বিদেহ রাজ্যে উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার দৃষ্ট হয়, আর গৃহ্য-সূত্রে ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠানের বিধি থাকে, সে স্থলে গৃহ্য-সূত্রোক্ত ধর্ম্মই প্রতিপালন করিবে, দেশ-ধর্ম্ম প্রতিপালন করা নিষিদ্ধ †। গৌতম-সূত্রেও এই রূপ উল্লিখিত হইয়াছে যে, দেশাচার ও কুলচারের বিষয় যদি বেদের মধ্যে না থাকে, তাহা হইলে মাতুল-কন্যার পাণি-গ্রহণের ন্যায় যদি বেদ-ব্যবস্থার নিতান্ত বিরুদ্ধ না হয়, তাহা প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য ‡।

গোভিল-তনয়-প্রণীত গৃহ্য-সংগ্রহ-পরিশিষ্টে আছে যে বসিষ্ঠ বংশীয়েরা মস্তকের দক্ষিণে চূড়া ধারণ করিতেন। অত্রি বংশীয়দিগের তিন চূড়া ও আঙ্গিরসদিগের

শাখারণ্ডঃ স উচ্যতে। যঃ স্বশাখোক্ত মুৎসৃজ্য পরশাখোক্ত মাচরেৎ। অপ্রমাণমৃষিং কৃত্বা সোঽন্ধে তমসি মজ্জতে। স্মৃত্যন্তরেঽপি। স্বকর্ম্ম পর্য্যুৎসৃজ্য তু যদন্যৎ কুরুতে নর। অজ্ঞানাদথবা লোভাৎ স হৃতঃ পতিতো ভবেৎ। ছন্দোগ-পরিশিষ্টেঽপি। স্বশাখাশ্রয় মুৎসৃজ্য পরশাখাশ্রয়ং তু যঃ। কর্ত্তুমিচ্ছতি দুর্ম্মেধা মোঘং তস্য চ যৎকৃতং॥

মহর্ষি বসিষ্ঠ অন্য শাখার নিয়ম অবলম্বন করিবার দোষ কীর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি কহেন বিবেচক মনুষ্য অন্য শাখোক্ত কার্য্য কদাচই অনুষ্ঠান করিবেন না। যিনি অন্য শাখোক্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাকে শাখারণ্ড বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যিনি ঋষি-বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া স্বশাখোক্ত কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক পর-শাখোক্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি ঘোর অন্ধকারে নিমগ্ন হন। অন্য স্মৃতিতেও এই রূপ লিখিত হইয়াছে। যিনি আপনার শাখোক্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অজ্ঞানতা ও লোভ বশত অন্যের শাখোক্ত কার্য্য অনুষ্ঠান করেন, তিনি পতিত ও বিনষ্ট হন। ছন্দোগ পরিশিষ্টেও এই রূপ লিখিত আছে। যে মন্দ বুদ্ধি আপনার শাখাশ্রিত কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরশাখোক্ত কার্য্য করিতে ইচ্ছা করে, তাহার কার্য্য নিষফল হয়।

যদি কোন বংশে কোন কার্য্যের বিশেষ নিয়ম না থাকে, তাহা হইলে পর শাখোক্ত নিয়ম গ্রহণ করা অনুচিত নহে।

স্বশাখানুক্তমপি পরশাখোক্তং গ্রাহ্যং। তথাচ কাত্যায়নঃ যন্নামুতং স্বশাখায়াং পরোক্ত মবিরোধিচ। বিদ্বদ্ভিস্তদনুষ্ঠেয় মগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মবৎ। সূত্রান্তরানুক্তমপি স্মৃত্যুক্তং গ্রাহ্যং।

স্ব শাখায় যাহা উক্ত হয় নাই, তাহা যদি পর শাখায় উক্ত ও অবিরুদ্ধ হয়, তাহা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কাত্যায়ন কহিয়াছেন যে স্বশাখায় যে নিয়মের কিছুমাত্র উল্লেখ নাই, পর শাখায় যদি তাহার উল্লেখ থাকে এবং তাহা যদি বিরোধী না হয়, বিদ্বান ব্যক্তিরা অগ্নিহোত্রাদি কার্য্যের ন্যায় তাহার অনুষ্ঠান করিবে। যে নিয়ম সূত্রান্তরে নাই তাহা যদি স্মৃতিতে থাকে, গ্রহণ করিবে।

* অথ খলূচ্চাবচা জনপদধর্ম্মা গ্রামধর্ম্মাশ্চ তান্ বিবাহে প্রতীয়াৎ যত্তু সমানং তদক্ষ্যামঃ। আশ্বলায়ন সূত্র।

† জনপদাদিধর্ম্মাণাং বক্ষ্যমাণানাং ধর্ম্মাণাঞ্চ বিরোধে সতি বক্ষ্যমাণং ধর্ম্মমেব কুর্য্যাৎ ন জনপদাদিধর্ম্মমিতি। যৎ বক্ষ্যাম স্তৎ সর্ব্বত্র সমান মিত্যেবার্থঃ। বৈদেহেষু সদ্যএব ব্যবায়ো দৃষ্টঃ। গৃহ্যেষু ব্রহ্মচর্য্যং বিহিতং। তত্র গৃহ্যোক্ত মেব কুর্য্যাৎ ন দেশধর্ম্ম মিতি সিদ্ধং।

‡ টীকাকার হরদত্ত কহিয়াছেন যে, কোন কোন দেশে বেদের বিরুদ্ধ কতকগুলি আচার প্রচলিত আছে। তিনি লিখিয়াছেন যে, যখন সূর্য্য মেষ রাশিতে অবস্থিতি করিবেন, সেই সময় বালিকারা ভূতলে উমাদি চূর্ণ দ্বারা অশ্ব রথাদির সহিত তাঁহাকে নির্ম্মাণ করিয়া প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকালে পূজা করিবে। মার্গশীর্ষ মাসে ঐ সকল বালিকারা সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধাণ পূর্ব্বক প্রতি পল্লীতে পর্য্যটন করিয়া যাহা কিছু উপহার প্রাপ্ত হইবে, তাহা দেবতাকে দিবে। যখন পূর্ব্বফল্গুণী নক্ষত্রে সূর্য্যের সঞ্চার হয়, তখন ঐ সকল বালিকা উমা দেবীর পূজা করিয়া মাস ও লবণ প্রদান করিবে। যখন সূর্য্য উত্তর ফল্গুণীতে গমন করে, তখন উহারা ঐ দেবীর পূজা করিবে।

পঞ্চ চূড়া ধারণ করিবার প্রথা ছিল। ভৃগু বংশীয়েরা মস্তকের সকল মুণ্ডন ও অন্যে একটি শিখা ধারণ করিতেন *।

কর্ম্ম-প্রদীপে লিখিত আছে যে বসিষ্ঠোক্ত সমুদায় যজ্ঞ আমিষশূন্য করিয়া অনুষ্ঠান করিবে †।

আধুনিক ব্যবস্থা-সংগ্রহকার রঘুনন্দন এক স্থলে হরিবংশ হইতে এই রূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন, শক ‡ জাতীয়েরা মস্তকের অর্দ্ধ মুণ্ডন এবং যবন ¶ ও কাম্বোজেরা সর্ব্বমুণ্ডন করিত। পারদ জাতীয়েরা § কেশ উন্মুক্ত করিয়া রাখিত এবং পহ্নবেরা * শ্মশ্রু ধারণ করিত †।

এক্ষণে ইহা সুস্পষ্টই বোধ হইতেছে যে যখন এইরূপ এক একটি ব্যবহারের এই প্রকার এক একটি প্রবাদ আছে, ইহা দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, ভিন্ন ভিন্ন বংশের এক এক জন আচার-প্রবর্ত্তক ছিলেন। বোধ হয় পরিশেষে তাঁহারাই এক এক বংশের দেবতা বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকিবেন ‡। দেখ, বেদের যে যে অংশ কোন কোন বিখ্যাত ভদ্র বংশের অধিকৃত বলিয়া প্রথিত আছে, সেই সেই অংশে পুরূরবা কুৎস প্রভৃতি কত গুলি দেবতার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন গ্রন্থে এই সমস্ত দেবতাকে ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট নাস্তিক বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ইহা দ্বারাই বোধ হয় যে, ইহাঁরা আপনার বংশে যে আচার ব্যবহার প্রবর্ত্তিত করিয়া যান, তাহা অন্য বংশীয়দিগের অপ্রীতিকর হইয়াছিল। সুতরাং এই সমস্ত দেবতারা সাধারণের শ্রদ্ধাস্পদ হইতে পারেন নাই।

ঋগ্বেদের সূক্ত-মধ্যে যে কতকগুলি উপাখ্যান আছে, সেই সকল অ.র ব্রাহ্মণ-ভাগে পরিগৃহীত ও সবিস্তরে বর্ণিত হইয়াছে। সেই উপাখ্যান গুলি অনুধাবন করিয়া দেখিলে ইহাই বোধ হয় যে, এক্ষণে যাহা বেদ-মূলক বলিয়া সাধারণের সেব্য হইয়াছে, সেই নিয়মই

* দক্ষিণকপর্দ্দা বাসিষ্ঠা আত্রেয়া ক্ষিকপর্দ্দিনঃ।
আঙ্গিরসঃ পঞ্চ চূড়া মুণ্ডা ভৃগবঃ শিখিনোঽন্যে।

† বসিষ্ঠোক্তো বিধিঃ কৃৎস্নো দ্রষ্টব্যোঽত্র নিরামিষঃ। কর্ম্ম প্রদীপ।

‡ সিদিয়ান।

¶ গ্রিক।

§ পারদেনি দেশের অধিবাসী।

* কেহ কেহ পারসীকদিগকে পহ্নব নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

† অর্দ্ধং শকানাং শিরসো মুণ্ডয়িত্বা ব্যসর্জ্জয়ৎ।
যবনানাং শিরঃ সর্ব্বং কাম্বোজানাং তথৈবচ॥
পারদাঃ মুক্তকেশাশ্চ পহ্নবাঃ শ্মশ্রুধারিণঃ।
নিঃস্বাধ্যায় বষট্কারাঃ কৃতাস্তেন মহাত্মনা॥

‡ বৈদিক সময়ের পরে যখন বৈষ্ণব ও শৈব সম্প্রদায় উৎপন্ন হইয়াছে, তখন দেখিতে পাওয়া যায় যে ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন দেবতা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

চতুর্ব্বেদীচ যো বিপ্রো বাসুদেবং ন বিন্দতি।
বেদভারভয়াক্রান্তঃ স বৈ ব্রাহ্মণগর্দ্দভঃ॥
তস্মাদবৈষ্ণবত্বেন ব্রাহ্মণ্যাদি বিহীয়তে।
বৈষ্ণবত্বেন সং সিদ্ধিং লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥

নারায়ণং পরং ব্রহ্ম ব্রাহ্মণানাং হি দৈবতং।
সোম সূর্য্যোদয়ো দেবাঃ ক্ষত্রিয়াণাং বিশামপি॥
শূদ্রাদীনান্তু রুদ্রাদ্যা অর্চ্চনীয়াঃ প্রয়ত্নতঃ।
যত্র রুদ্রার্চ্চনং প্রোক্তং পুরাণেষু স্মৃতিষ্বপি॥
তদব্রহ্মণ্যবিষয় মেবমাহ প্রজাপতিঃ।
রুদ্রার্চ্চনং ত্রিপুণ্ড্রঞ্চ পুরাণেষু চ গীয়তে॥
ক্ষত্রবিট্ শূদ্র জাতীনাং নেতরেষাং তদুচ্যতে।
তস্মাৎ ত্রিপুণ্ড্রং বিপ্রাণাং ন ধার্য্যং মুনিসত্তমাঃ॥
বশিষ্ঠ স্মৃতি প্রথম অধ্যায়।

যে ব্রাহ্মণ চারি বেদ সম্যক্ অধ্যয়ন করিয়া বাসুদেবকে না লাভ করিতে পারেন, তিনি বেদভার ভয়ে আক্রান্ত ও ব্রাহ্মণের মধ্যে গর্দ্দভ বলিয়া পরিগণিত হন। অতএব বৈষ্ণব না হইলে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব অপগত হয়। কিন্তু বৈষ্ণব হইলে ব্রাহ্মণ সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন সন্দেহ নাই। নারায়ণ বিষ্ণুই পর ব্রহ্ম ও ব্রাহ্মণগণের দেবতা। চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি কএকটি কেবল ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের দেবতা। কিন্তু শূদ্রাদি জাতি যত্ন সহকারে রুদ্রাদি দেবতারই অর্চ্চনা করিবে। প্রজাপতি কহিয়াছেন যে পুরাণ ও স্মৃতির মধ্যে যে স্থলে রুদ্রের উপাসনার বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা ব্রাহ্মণের পক্ষে নহে। পুরাণে রুদ্রের আরাধনা ও ত্রিপুণ্ড্র ধারণ কীর্ত্তিত হইয়াছে কিন্তু ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র জাতির পক্ষেই তাহা বিহিত হয়; অন্য জাতির পক্ষে তাহা নিষিদ্ধ। অতএব হে মহর্ষিগণ! ত্রিপুণ্ড্র ধারণ ব্রাহ্মণের কদাচই কর্ত্তব্য নয়।

উহাতে প্রতিপালিত হয় নাই। ব্যবস্থা-শাস্ত্র প্রণেতা দিগের অভিপ্রায় এই যে কেবল ব্রাহ্মণই বেদাধ্যয়ন যজ্ঞ সাধন ও যজ্ঞীয় দক্ষিণা গ্রহণ করিতে পারিবে। অন্য জাতির ইহাতে কিছুমাত্র অধিকার নাই। মহর্ষি কাক্ষীবান এক জন প্রসিদ্ধ-বেদ প্রণেতা ছিলেন। ঋগ্বেদের প্রথম ও নবম মণ্ডলের সূক্ত-সকল তাঁহারই রচনা। লোকে বিশেষ কারণে তাঁহাকে ক্ষত্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিত। এক স্থলে এই রূপ উল্লিখিত হইয়াছে, ঐ মহর্ষি রাজা স্বায়ন হইতে প্রতিগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু মানব-ধর্ম্ম-শাস্ত্র-প্রণেতা মহর্ষি মনু কহিয়াছেন যে, ক্ষত্রিয়ের প্রতিগ্রহ নিতান্ত নিষিদ্ধ, উহা ব্রাহ্মণেরই ধর্ম্ম*। সুতরাং কাক্ষীবান ক্ষত্রিয় হইয়া রাজার নিকট যে প্রতিগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা মনু-বিরুদ্ধ হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু স্মার্ত্ত-কালের গ্রন্থকর্ত্তারা কৌশলে এই দোষ পরিহার করিয়া লইয়াছেন। তাঁহারা কহেন যে, কাক্ষীবান যদিও রাজা কলিঙ্গের পুত্র কিন্তু যাঁহার সূক্ত-সকল ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে দৃষ্ট হয়, সেই প্রাচীন ঋষি দীর্ঘতমা তাঁহার প্রকৃত পিতা। এই ভারতবর্ষের অতি প্রচীন কালে ক্ষেত্রজ-সন্তানোৎপাদনের প্রথা প্রচলিত ছিল। গ্রন্থকর্ত্তারা এই সম্ভাবনা করিয়া কাক্ষীবানকে কলিঙ্গের ক্ষেত্রজ পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু যদি স্থির চিত্তে বিবেচনা করা যায়, তাহা হইলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, ক্ষত্রিয়ের প্রতিগ্রহ নিতান্ত ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ। ব্রাহ্মণেরা ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া পরম্পরাগত উপাখ্যানটি রূপান্তরিত করিয়া লইয়াছেন। ঋগ্বেদের সূক্ত-প্রণেতা ঋষিগণ যে, ব্যবস্থা শাস্ত্রের অনুমোদিত কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন, ইহা যার পর নাই অসম্ভব। বৈদিক কাল স্মার্ত্তকালের পূর্ব্ববর্ত্তী। যখন ঐ সমস্ত মহর্ষি জীবিত থাকিয়া সূক্ত রচনা করেন, তখন ব্যবস্থা শাস্ত্র প্রণীত হয় নাই। যাহাই হউক, কাক্ষীবান রাজা কলিঙ্গের ক্ষেত্রজ পুত্র ছিলেন কি না তাহা নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন; কিন্তু ইহা সাহসের সহিত বলিতে পারা যায়, যখন কাক্ষীবান জীবিত ছিলেন, সেই সময়ে তিনি আবশ্যক হইলে কখন ধর্ম্ম যাজকের কার্য্য ও কখন বা রণস্থলে বীরের কার্য্য করিতেন। তাঁহার সময়ে জাতি বিশেষে কার্য্য বিভাগ কিছু মাত্র ছিল না। এই বিষয়ে অধ্যাপক লাসেন যে রূপ কহিয়াছেন, তাহা যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে। তিনি কহেন, কাক্ষীবানের পিতা মহর্ষি দীর্ঘতমা বঙ্গ দেশের দক্ষিণ বিভাগে অঙ্গ ও কলিঙ্গ দেশের এক জন প্রাচীন ধর্ম্ম-প্রচারক ছিলেন। ঐ সময় অন্যান্য মহর্ষিগণও ভারত বর্ষের বিভিন্ন অংশে আপনাদিগের আধিপত্য সংস্থাপনে প্রবৃত্ত হন। ইহা দ্বারা এই রূপ সম্ভাবনা করা যাইতে পারে যে ঐ সময়ের পরে জাতি-বিভাগ, প্রত্যেক জাতির বিভিন্ন কার্য্য ও অধিকার যে রূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তখনও সে রূপ হয় নাই। ঐ সময়ের পরে এই রূপ এক নিয়ম স্থাপিত হইয়াছিল যে, শূদ্রের সমক্ষে ঋগ্বেদ উচ্চারণ করিলে পাপ স্পর্শে। কিন্তু আমরা ঋগ্বেদ পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই যে উহার কতকগুলি সূক্ত শূদ্র কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়াছে। মহর্ষি কবষ ঐলূষ এক দাসীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ঋগ্বেদের দশম অনুবাকের কতকগুলি সূক্ত প্রণয়ন করেন। ঐ মহর্ষি এক সময়ে দাসী-পুত্র বলিয়া যজ্ঞস্থল হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন। তৎপরে দেবগণের বিশেষ অনুগ্রহ ভাজন বলিয়া পুনরায় তাঁহাকে যজ্ঞীয় কার্য্যে ব্রতী করা হয়*। তিনি যে দাসী-পুত্র ছিলেন, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ কৌশীতকী ব্রাহ্মণ এবং মহাভারতও ইহা সপ্রমাণ করিতেছে। এই সমস্ত নিদর্শন দ্বারা ইহাই বোধ হয় যে, জাতি বিচার স্বার্থপর স্মৃতি-শাস্ত্রকারদিগের দ্বারাই ভারত বর্ষে আনীত হয়। স্মৃতিকারদিগের পূর্ব্বে এক্ষণকার ন্যায় জাতিগত কার্য্যের বিধি কিছু মাত্র দৃষ্ট হয় না।

ন চক্ষুষা ন মনসা ন বাচা দূষয়েদপি।
ন প্রত্যক্ষং পরোক্ষং বা দুষণং ব্যাহরেৎ কুচিৎ ॥
ন হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি মৈত্রায়ণগতশ্চরেৎ।
নেদং জীবিত মাসাদ্য বৈরং কুর্ব্বীত কেনচিৎ ॥

* ত্রয়ো ধর্ম্মা নিষর্ত্তন্তে ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়প্রতি। অধ্যাপনং যাজনঞ্চ তৃতীয়শ্চ পরিগ্রহঃ। মনু ১০ অ, ৭৭ শ্লো।

* ঋষয়োবৈ সরস্বত্যাং সত্রমাসত। তে কবষং ঐলূষং সোমাদনয়ন্ দাস্যাঃ পুত্রঃ কিতবোঽব্রাহ্মণঃ কথং নো মধ্যে দীক্ষিষ্টেতি। তং বহির্ধস্যোদবহন্নত্রৈনং পিপাসা হন্ত সরস্বত্যাউদকং মা পাদিতি। স বহির্ধস্যোদূঢ়ঃ পিপাসয়া বৃত্তএতদপোনপ্ত্রীয়মপশ্যৎ প্রদ্রদবত্রা ব্রহ্মণে গাতুরেত্বিতি। তেনাপাং প্রিয়ং ধামোপাগচ্ছৎ। তমাপোঽব্রুবায়ংস্তং সরস্বতী সমন্তং পর্য্যধাবৎ। তস্মাদাপ্যেতর্হি পরিসারনিত্যাচক্ষতে। যদেনং সরস্বতী সমন্তং পরিসসার তে বাঋষয়োঽব্রুবন্ বিদুর্ব্বো ইমং দেবা উপেমং হ্বয়ামহা ইতি তথেতি তমুপাহ্বয়ন্ত। তমুপহূয় তদপোনপ্ত্রীয়মকুর্বত প্রদেবত্রা ব্রহ্মণে গাতুরেত্বিতি।

একদা ঋষিগণ সরস্বতী নদীতীরে যজ্ঞ আরম্ভ করেন, এবং দাসীপুত্র কিতব অব্রাহ্মণ কি রূপে আমারদিগের সহিত যজ্ঞে দীক্ষিত হইবে বলিয়া কবষ ঐলূষকে যজ্ঞীয় সোম হইতে নিরাকরণ পূর্ব্বক পিপাসায় ইহার প্রাণ নষ্ট হউক এই অভিসন্ধিতে যাহাতে সে সরস্বতীর জল পান করিতে না পায় এই জন্য তাঁহারা যজ্ঞ স্থানের বহিঃ প্রান্তরে তাঁহাকে বহন করিয়া লইয়া যান। পরে কবষ ঐলূষ সেই প্রান্তরে পতিত পিপাসায় কাতর হইয়া জলদাতা বরুণের উদ্দেশে ব্রহ্ম গান করেন, তাহাতেই তিনি বরুণ দেবের প্রিয় ধাম প্রাপ্ত হয়েন। তখন জল তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল ও সরস্বতী নদীও আসিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিল, এই নিমিত্তই জলের নাম পরিসার হইয়াছে। যে হেতু সরস্বতী নদী আসিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিল, সেই জন্য ঋষিরা কহিলেন, আমরা জানিলাম দেবতারা ইহাঁকে অহ্বান করিয়াছেন, অতএব আমরাও ইহাঁকে আহ্বান করি। পরে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া, ইনি ব্রহ্ম গান করুন ইনি সোমের অধিকারী হউন বলিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে যজ্ঞে দীক্ষিত করিলেন।

বিজ্ঞান

২৮০ সংখ্যক পত্রিকার ১৭১ পৃষ্ঠার পর।

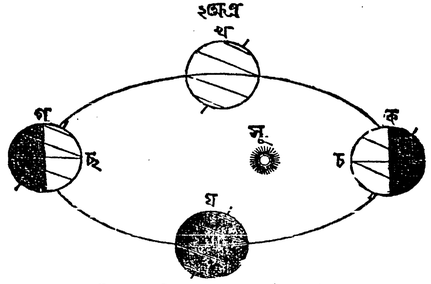

পৃথিবীস্থ জীব মাত্রেরই দুই প্রকার অবস্থা আছে। একটি জাগ্রদবস্থা আর একটি সুপ্তাবস্থা। যে সময় শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি-সমুদায় তেজস্বী থাকিয়া উহারা পরিশ্রম করে; সেই অবস্থাকে উহাদের জাগ্রদবস্থা এবং যে সময় শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি-সকল দুর্ব্বল হওয়াতে উহারা নিদ্রিত হয়, সেই অবস্থাকে উহাদের সুপ্তাবস্থা বলা যায়। এক্ষণে এই দুই অবস্থার সহিত জড় রাজ্যের কার্য্যগত কি রূপ ব্যবস্থা আছে, তাহার আলোচনা করা নিতান্ত আবশ্যক।

আমরা দেখিতেছি পৃথিবীতে পর্য্যায়ক্রমে যে দিবা রাত্রি উপস্থিত হইতেছে, ঐ দুই অবস্থার সহিত উহার একটি বিলক্ষণ সামঞ্জস্য আছে। জীবজন্তু যতক্ষণ জাগ্রত থাকিয়া পরিশ্রম করিতে পারে, সেই সময়ানুসারে দিবামান এবং যতক্ষণ উহাদের বিশ্রাম-জনিত তৃপ্তি-সুখ লাভ করা আবশ্যক, তদনুসারে রাত্রিমান স্থাপিত হইয়াছে। পরিশ্রম ও বিশ্রামের সহিত দিবা ও রাত্রির সময়-গত এইরূপ ব্যবস্থা স্থাপিত হওয়াতেই জীবজন্তু-সকল সুস্থ শরীরে কালযাপন করিতেছে। জীবজন্তুর যেমন এক সময় কার্য্যের ও আর এক সময় বিশ্রামের নিমিত্ত আবশ্যক,

উদ্ভিদ্‌জাতিও সেই নিয়মে আবদ্ধ আছে। দিবাভাগে উদ্ভিজ্জের একরূপ ভাব এবং রাত্রিকালে উহার বিপরীত আর এক প্রকার ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। দিবার আলোক ও উত্তাপ এবং রাত্রির ছায়া ও শীতলতা নিয়মিত না হইলে উদ্ভিজ্জের যথেষ্ট হানি জন্মে। যতক্ষণ আলোক ও উত্তাপ উহার স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রয়োজন হয় এবং যতক্ষণ রজনীর নীহার বিন্দু ও ছায়া উহাকে সজীব করিবার নিমিত্ত অপেক্ষিত হইয়া থাকে, সেই সময়ের অণুমাত্র ন্যূনাতিরেক হইলে এই রাজ্যে মহাপ্রলয় উপস্থিত হয় সন্দেহ নাই। ফলত ঈশ্বর জীবজন্তু ও উদ্ভিজ্জের প্রকৃতি অনুসারে দিবা ও রাত্রির পরিমাণ স্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে এক মাত্র তাঁহারই যে শুভাভিপ্রায় দেদীপ্যমান রহিয়াছে, তাহার আর কোন শংসয়ই নাই।

জীবজন্তুর পরিশ্রম যেমন আবশ্যক, বিশ্রামও সেইরূপ। ইহার সহিত দিবা রাত্রির কেমন এক আশ্চর্য্য সম্বন্ধ আছে। কএক ঘণ্টাকাল পরিশ্রমের নিমিত্ত আলোকের প্রয়োজন হয় এবং কএক ঘণ্টা বিশ্রামের জন্য আলোকের অভাবও আবশ্যক হইয়া থাকে। আলোক ও উহার অভাবের যে একটি কাল নির্দ্দেশ আছে, তাহা অতিশয় নিয়মিত। এক পদও তাহা অগ্রপশ্চাৎ হইবার নহে। কালগত এই নিয়মটি জড় রাজ্যে কেমন অদ্ভুত রূপে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। দেখ আমাদিগের অধিষ্ঠানভূতা এই পৃথিবী একটি মেরুদণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া প্রতিনিয়ত সূর্য্যকে পরিভ্রমণ করিতেছে। পৃথিবী ঐ মেরুদণ্ডের চতুর্দ্দিক একবার পরিভ্রমণ করিলে একটি দিবা ও একটি রাত্রি হয়। ইহাকে পৃথিবীর আহ্নিক গতি বলে। এই দিবারাত্রির পরিমাণ চব্বিশ ঘণ্টা। আমরা এক সময়ে সূর্য্যের আলোক ও আর এক সময়ে রজনীর ছায়া যে লাভ করিতেছি, এই আহ্নিক গতিই তাহার কারণ। পৃথিবীর এই ভ্রমণ ক্রিয়াটি এইরূপ নিয়মের অধীন যে, যে পরিমাণে ভ্রমণ করিলে পৃথিবীতে যতক্ষণ আলোক ও উত্তাপ প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক, তাহার অণুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটেনা এবং যতক্ষণ এই দুইয়ের অভাব উপযোগী হয়, তাহারও কিছুমাত্র ন্যূনাতিরেক উপস্থিত হয় না। জীবজন্তু ও উদ্ভিজ্জের সহিত এই ভ্রমণক্রিয়ার যে কোন একটি বিশেষ কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আছে তাহাও নহে; অথচ যতটুকু ভ্রমণ করিলে দিবার ব্যবস্থা এবং যতটুকু ভ্রমণ করিলে রাত্রির ব্যবস্থা স্থাপিত হয়, তাহারও কিছুমাত্র ব্যত্যয় হইতেছে না। যখন জীবজন্তু ও উদ্ভিজ্জের সহিত দিবা রাত্রির এই রূপ সম্বন্ধ কোন রূপ ভৌতিক ক্রিয়ার অধীন নহে, তখন সর্ব্বস্রষ্টা ঈশ্বর আমাদিগের মঙ্গলেরই নিমিত্ত যে এই প্রকার নিয়ম করিয়াছেন, তিনি যে এই পৃথিবীকে জীবজন্তুর বাস করিবার নিমিত্তই সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে কি আর কোন সংশয় থাকে?

যদি বর্ত্তমান নিয়মের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয়, তাহা হইলে পৃথিবীতে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইতে পারে। মনে কর, যদি দিবা ও রাত্রি-মান বর্ত্তমান অপেক্ষা অধিক হইত, তাহা হইলে আমাদিগকে পরিশ্রম ও বিশ্রামের একটি ব্যবস্থা করিতে হইত। আমরা দিবসের মধ্যে হয় ত একবার বিশ্রাম করিতাম এবং রাত্রির মধ্যেও হয় ত আমাদিগের পরিশ্রম করিতে হইত। আর যদি দিবামান ও রাত্রিমান বর্ত্তমান অপেক্ষা অল্প হইত, তাহা হইলেও আমাদিগকে পরিশ্রম ও বিশ্রামের একটি স্বতন্ত্র নিয়ম করিতে হইত। কিন্তু বর্ত্তমান যে দিবা রাত্রির পরিমাণ আছে, তাহা আমাদের দৈহিক অভাবের সম্পূর্ণ অনুরূপ। ইহা কোন রূপেই অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হয় না। ইহা দ্বারাই পৃথিবী যে আধার ও জীবজন্তু যে ইহার আধেয় ইহাই প্রতিপন্ন হয়।

এক সময়ে কতগুলি নাবিক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে যে উত্তর কেন্দ্রের যে অক্ষাংশে সূর্য্যকে কএক সপ্তাহ দেখিতে পাওয়া যায় না, তথায় তাহাদিগকে ঠিক্ পূর্ব্বাহ্ন ছয়টার সময় পরিশ্রম ও রাত্রি নয়টার সময় বিশ্রামের আবশ্যক হইত। যদিও তথায় দিবা রাত্রির নিয়ম সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তথাচ তাহারা আপনাদিগের প্রকৃতি অনুসারে দৈনিক ক্রিয়া অনুষ্ঠান করাতে সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছিল। সুতরাং দৈহিক অভাবের সহিত দিবা রাত্রির পরিমাণ-গত ব্যবস্থা না থাকিলে কখনই এই রূপ ঘটিতে পারে না। জীব জন্তুর ন্যায় উদ্ভিজ্জ রাজ্যেও সময়গত এই নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। কতগুলি পুষ্প নিয়মিত সময়ে বিকসিত ও নিয়মিত সময়ে মুকুলিত হইবেই হইবে। কোন প্রকার পুষ্প প্রাতঃকালে ছয় টার সময় কোনটি সাত টার সময় প্রস্ফুটিত হয় এবং কোনটা অপরাহ্ন ছয় টার ও কোনটা সাত টার সময় মুকুলিত হয়। সূর্য্য-কিরণ যে ইহাদের বিকাশের কারণ তাহাও নহে। একটি অন্ধকারময় গৃহে ঐ জাতীয় বৃক্ষ রোপিত করিয়া প্রত্যক্ষ করা হইয়াছে যে সূর্য্যের আলোক প্রাপ্ত না হইলেও নিয়মিত সময়ে ইহার পুষ্প বিকসিত ও নিয়মিত সময়ে মুকুলিত হইয়াছে।

কোন ভৌতিক নিয়ম দিবা ও রাত্রির পরিমাণকে জীব জন্তু ও উদ্ভিজ্জের অনুরূপ করিয়া দিতেছে, তাহা কোন রূপেই বোধ হয় না। আমরা এমন কোন ভৌতিক নিয়ম দেখিতে পাই না, যাহা পৃথিবীর দিবারাত্রি-মান ন্যূনাতিরেক হইবার ব্যাঘাত করিতেছে। পৃথিবী একমাসের মধ্যে একবার মেরুদণ্ডের উপর ঘুরিয়া আসিলে একটি দিন রাত্রির সৃষ্টি করিতে পারে। ইহা দ্বারা দিবামান পনর দিবস ও রাত্রিমান পনর দিবস হইবে। আবার এক ঘণ্টার মধ্যে এক বার ঘুরিয়া আসিলে আধ ঘণ্টা দিবা ও আধ ঘণ্টা রাত্রি হইবে। যদিও পৃথিবীর আহ্নিক গতি ভৌতিক নিয়মে এই রূপই হইত, তাহা হইলে জীব জন্তু ও উদ্ভিজ্জের যথেষ্ট ক্ষতি করিত। সুতরাং বর্ত্তমান নিয়ম ঈশ্বরের শুভাভিপ্রায় ভিন্ন কোন ভৌতিক কারণে যে ঘটিয়াছে, তাহা কোন রূপেই বোধ হয় না। যিনি স্বহস্তে এই প্রকাণ্ড জড় পিণ্ডকে অসীম নভোমণ্ডলে পরিভ্রমিত করিতেছেন, তিনিই এই হিতকর নিয়ম স্থাপন করিয়া দিয়াছেন।

যখন দেখিতেছি যে পৃথিবীর বর্ত্তমান আহ্নিক গতি দ্বারা স্থাবর জঙ্গম ভূতগণের অসংখ্য শুভোদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে, ইহার কিছু মাত্র ব্যতিক্রম উপস্থিত হইলে সকল বস্তু শংসয়-দশায় উপনীত হয়, তখন সহজেই মনোমধ্যে এই রূপ প্রশ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে যে অন্যান্য গ্রহেও এই রূপ ব্যবস্থা আছে কি না? যদি থাকে, তাহা পার্থিব ব্যবস্থার অনুরূপ কি না? আমরা যখন এই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই, দেখিতে পাই যে, সকল গ্রহেরই আহ্নিক গতি আছে এবং তাহাদের গতি এই রূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, তৎসমুদায়ে নিয়মিত রূপে দিবা রাত্রি উপস্থিত হইতে পারে। সুতরাং আমরা যেমন পৃথিবীতে থাকিয়া এক সময় সূর্য্যের আলোক আর এক সময় রজনীর

অন্ধকার দেখিতেছি, উহাতে অবশ্যই সেই রূপ আছে। কোন কোন গ্রহের দিবামান ও রাত্রিমান যে পৃথিবীরই অনুরূপ তাহাও আবিষ্কৃত হইয়াছে। দূরবীক্ষণ দ্বারা মঙ্গল গ্রহে প্রত্যক্ষ হইয়াছে যে এই গ্রহে চন্দ্রের ন্যায় কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণ রেখা আছে। যদি স্থিরভাবে ঐ গ্রহে কএক ঘণ্টা কাল দৃষ্টিপাত করা যায়, তাহা হইলে ঐ সমস্ত কৃষ্ণবর্ণ রেখা কখন দৃশ্য ও কখন অদৃশ্য হইতে দেখিতে পাই। ইহার কারণ এই যে, ঐ গ্রহটি পৃথিবীর ন্যায় সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। প্রদক্ষিণ কালে যে পৃষ্ঠ আমাদের সম্মুখে থাকে, তাহার রেখাগুলি ক্ষণকালের নিমিত্ত আমরা দেখিতে পাই; আর সেই পৃষ্ঠটি আমাদের চক্ষের অন্তরাল হইলে আমরা আর কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত তাহা দেখিতে পাই না।

এই গ্রহের যে একটি আহ্নিক গতি আছে, ইহা দ্বারাই তাহা অনায়াসে প্রতিপন্ন হইতেছে। জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে ঐ গ্রহের কৃষ্ণবর্ণ রেখা সকল যে স্থলে এক বার দৃষ্ট হইয়াছিল চব্বিশ ঘণ্টা সাঁইত্রিশ মিনিট ও বাইশ পলের পর পুনরায় সেই স্থলে দেখা গিয়াছে। এই গ্রহের ন্যায় বুধ গ্রহ তেইশ ঘণ্টা একুশ মিনিট ও একুশ পলে এবং শুক্র গ্রহ চব্বিশ ঘণ্টায় যে আহ্নিক গতি সম্পন্ন করিতেছে, ইহারও বিলক্ষণ যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে।

এই পৃথিবীতে পর্য্যায়ক্রমে দিবা রাত্রি উপস্থিত হইয়া যেমন শুভোদ্দেশ্য সমুদায় সংসাধন করিতেছে, ঐ সমস্ত গ্রহেও তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম নাই। পৃথিবীর দিবা রাত্রির পরিমাণ যেমন অত্রত্য জীব জন্তুর সম্পূর্ণ অনুরূপ হইয়াছে, ঐ সমস্ত গ্রহেও তদ্রূপ হইবে। পৃথিবীস্থ জীব জন্তুর পরিশ্রম ও বিশ্রাম যেমন আবশ্যক, ঐ সকল গ্রহেরও তাহার কোন অংশেই ন্যূন হইতে পারে না।

কি উপায়ে গ্রহ সমূহে দিবা ও রাত্রি পর্য্যায়ক্রমে গমনাগমন করিতেছে, তাহা আলোচনা করিতে হইলে উহার মেরুদণ্ড কি রূপে আছে, তাহা নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। পৃথিবী যে মেরুদণ্ডের উপর ভ্রমণ করিতেছে, তাহা কি রূপ ভাবে আছে, ইহা অনুধাবন করিলেই গ্রহ-সমূহের বিষয় বিশদ হইতে পারে। আমরা দেখিতেছি যে, পৃথিবীর মেরুদণ্ড যদি সূর্য্যের দিকে সম্পূর্ণ রূপ দণ্ডায়মান থাকে, তাহা হইলে পৃথিবীর সমুদায় অংশেই সম্বৎসর কাল দিবা রাত্রির ভাগ সমান হইবে। আর যদি উহা সূর্য্যাভিমুখে সম্পূর্ণ রূপ শয়ান থাকে, তাহা হইলে গ্রীষ্মকালের কয়েক সপ্তাহ সূর্য্যকে ঊর্দ্ধে এবং শীত কালে কএক সপ্তাহ নিম্নে থাকিতে হয়। ইহা দ্বারা এই ফল উৎপন্ন হয় যে পৃথিবীর একাংশে নিরবচ্ছিন্ন আলোক ও অপর অংশে কেবল অন্ধকার থাকে। এই রূপ হইলে পৃথিবী জীব জন্তুর বাস করিবার যে একান্ত অনুপযোগী হইত, তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। যদি মেরুদণ্ড সূর্য্যের দিকে দণ্ডায়মান থাকিত, তাহা হইলে এই রূপ ঋতু-পরিবর্ত্ত হইত না এবং এক্ষণে যে সমস্ত উপকার প্রাপ্ত হইতেছি, তদ্বিষয়েও সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইতাম। মেরুদণ্ডের যে দুই প্রকার অবস্থানের বিষয় উল্লিখিত হইল, তদ্ব্যতিরিক্তও উহাকে অন্য প্রকারে স্থাপন করা যাইতে পারে; তাহাও অধিবাসিদিগের পক্ষে যার পর নাই অসুখকর হয়। কিন্তু ধন্য তাঁহার জ্ঞান! ধন্য তাঁহার কৌশল! যিনি এক কটাক্ষপাতে এই পৃথিবীকে জীব জন্তুর সম্যক্ বাসোপযোগী

করিয়া স্থাপিত করিয়াছেন। এই পৃথিবী যে ভাবে সূর্য্যাভিমুখে স্থাপিত হইয়া অসংখ্য শুভ উদ্দেশ্য সংসাধন করিতেছে, তাহা অতি আশ্চর্য্য। পৃথিবীর মেরুদণ্ড সূর্য্যাভিমুখে শয়ান ও দণ্ডায়মানও নহে। উহা এই উভয়ের মধ্যবিধ ভাব অবলম্বন করিয়া সূর্য্যাভিমুখে হেলিয়া রহিয়াছে। পৃথিবী এই প্রকারে অবস্থিত আছে বলিয়াই আমরা ঋতু পরিবর্ত্ত ভোগ করিতেছি। আবার পৃথিবীর এই প্রবণ ভাব এই রূপ যে, ইহার প্রভাবে যে ঋতুর পর্য্যায় উপস্থিত হয়, তাহা এত কাল স্থায়ী হইবে যে, তদ্দ্বারা জীব জন্তু ও উদ্ভিজ্জের সম্পূর্ণ উপকার দর্শিবে, সন্দেহ নাই।

পৃথিবীর মেরুদণ্ড যে রূপে আছে, মঙ্গল গ্রহের মেরুদণ্ডও সেই রূপ রহিয়াছে। সুতরাং মঙ্গল গ্রহের ঋতু ও জল বায়ু পৃথিবীর অনুরূপই হইবে। বুধ ও শুক্রের মেরুদণ্ড কি রূপ ভাবে আছে, তাহা অদ্যাপি সম্পূর্ণ স্থির হয় নাই; কিন্তু আমাদিগের বোধ হয় উহা পৃথিবী ও মঙ্গল গ্রহের মেরুদণ্ড অপেক্ষা বিভিন্ন প্রকার হইবে না। সুতরাং ঐ দুই গ্রহে পৃথিবীর ন্যায় দিবা রাত্রির পরিবর্ত্ত ও ঋতু-পর্য্যায় উপস্থিত হয় এবং পৃথিবীর জলবায়ু যেমন স্থান বিশেষে বিভিন্ন প্রকার হইয়াছে ঐ দুইটি গ্রহেও ঐ রূপ ব্যবস্থা আছে।

উদ্ধৃত।

ব্রহ্মসাধন।

এক্ষণে ইহাও বলা কর্ত্তব্য যে তিনি পাপী ব্যক্তিকে উদার দৃষ্টিতে দেখেন বলিয়া পাপকে কখন উদার দৃষ্টিতে দর্শন করেন না। অন্যের সম্বন্ধে তিনি যেমন উদার, আপনার সম্বন্ধে তিনি তেমনি অনুদার। তিনি আপনার একটু পাপ বা পাপ ইচ্ছার জন্য অনুতাপানলে দগ্ধ হয়েন। অন্য ব্যক্তি যদি সর্ব্বাঙ্গীন ধর্ম্ম সাধন করিতে না পারেন, সে জন্য তিনি মনুষ্যের অপূর্ণতা জানিয়া তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ করেন না, কিন্তু আপনি ধর্ম্মের পূর্ণভাব আপনাতে আবির্ভূত করিতে না পারিলে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়েন।

ঈশ্বরের সাধক শান্ত ও শীতল স্বভাব। যে সকল কার্য্য ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য, তাহা তিনি প্রাণ-পণে যত্ন করিয়া সম্পাদন করেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার নিজের উষ্ণতা বা আড়ম্বর বা আসক্তি কিছুই প্রকাশ পায় না। তিনি স্বার্থপরতা-শূন্য হইয়া, নির্ম্মল বুদ্ধির সহিত ঈশ্বরের অভিপ্রায় গুলি বিবেচনা করেন এবং সরলচিত্তে তাহার সিদ্ধি বিষয়ে প্রাণ-পণে চেষ্টা করেন। তাঁহার শান্ত সমাহিত ও স্নিগ্ধ ভাব দেখিয়া সকলে বিগলিত হয়। ঈশ্বরের উপর তাঁহার সম্পূর্ণ নির্ভর। তিনি জানেন ঈশ্বর সকলই, তিনি নিজে কিছুই নহে। মনুষ্য কার্য্য করে ইহা যথার্থ বটে কিন্তু ঈশ্বর তাহার অভ্যন্তরে কার্য্য করেন। পাপ ব্যতীত ঈশ্বর সকল ঘটনাই বিধান করিতেছেন। মনুষ্যের যে কার্য্যের মূলে ঈশ্বরের কার্য্য নাই, তাহা নিষ্ফল হয়। ঈশ্বরের বলই মনুষ্যের বল। অতএব কোন বিষয়ে তাঁহার উদ্বেগ নাই, কোন বিষয়ে তাঁহার ব্যগ্রতা নাই, কোন বিষয়ে তাঁহার আড়ম্বর নাই। তিনি ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের সঙ্গে যোগ দিয়া চলিয়া যান। তিনি ঈশ্বরের অগ্রসর হইতে চাহেন না। তিনি বীজ বপন করেন কিন্তু শস্যোৎপাদন ঈশ্বরের হস্তে অর্পণ করেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, শেষ সকলই ভাল হইবে। ঈশ্বরের আদেশে ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে তিনি কার্য্য করেন, তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকেন। সংসারের আদেশে অথবা সাংসারিক বুদ্ধির উপদেশ অনুসারে তিনি আপনার জীবন পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে ইচ্ছুক নহেন কিন্তু ঈশ্বরের আদেশে তিনি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত। তিনি সম্পূর্ণ রূপে ঈশ্বরের অধীন। তিনি অন্য লোকের উৎসাহ দেখিয়া উৎসাহান্বিত হয়েন না এবং অন্য লোকের নিরুৎসাহে নিরুৎসাহ হয়েন না, কিন্তু তিনি স্বয়ং ঈশ্বর হইতে বল ও উৎসাহ প্রাপ্ত হন। তিনি

সেই শক্তির উপর স্থির ভাবে নির্ভর করেন, অতএব তিনি কোন বিষয়ের লাভ বা কোন বিষয়ের সিদ্ধিতে আপনার যশ ঘোষণা কিম্বা আপনার জয় প্রকাশ করেন না। তিনি সকল বিষয়েই ঈশ্বরের মহিমা ঘোষণা করেন।

ঈশ্বরের সাধক অতি গম্ভীর-প্রকৃতি। তিনি সর্ব্বদা তদ্‌গতচিত্ত তদ্‌গত প্রাণ হইয়া থাকেন। তাঁহার হৃদয়ে ঈশ্বর নিরন্তর বাস করেন, এজন্য তাঁহার ব্যবহারে শূন্য-হৃদয় ব্যক্তিদিগের ন্যায় লঘুতা দৃষ্ট হয় না। তিনি সর্ব্বদাই স্থিরচিত্ত। তাঁহার অন্তরের সেই গভীর ভাব তাঁহার সকল কার্য্যেই প্রকাশ পায়। কোন কারণে তিনি চপল ও লঘুচেতা ব্যক্তির ন্যায় ব্যবহার করেন না। তিনি সেই "নিস্তরঙ্গ অতি গম্ভীর সান্দ্রানন্দ সুধার্ণবে" সর্ব্বদা নিমগ্ন রহিয়াছেন। সেই সুধার্ণবের গাম্ভীর্য্যের প্রতিচ্ছায়া তাঁহার আত্মাতে পতিত হয়।

THE ABNORMAL PHENOMENA OF THE HUMAN MIND.

There is a great number of facts, widely observed, and many of them unquestionably established, which have never yet taken any place in a regular system of mental analysis, but have been regarded as bearing a purely abnormal character. Amongst these we may reckon, not only some of the more remarkable forms of dreaming, but more especially somnambulism, hallucination, presentiments, mental sympathies and antipathies, hypnotism, clairvoyance, ghost-seeing, and all the varied phenomena of what is now called "mediumship."

With regard to these latter phenomena, they have now become so widely epidemic, both in England and America as almost to demand some share of attention from the mental philosopher. For myself, the facts of the case have been for some years sufficiently intersting to become the object of somewhat close attention. I have had repeated opportunities of witnessing and examining the processes of spirit writing, spirit drawing, and all the other methods by which the denizens of another world are *supposed* to communicate their thoughts through the instrumentality of those now living on earth, and have thus gained ample means of comparing the *results*, with what I conceive to be both the ordinary and the hidden capacities of the human mind. The conclusion, I have drawn from these facts and considerations is to my own mind perfectly unquestionable.

First of all, I must freely confess that the arrogation of mediumship is not generally by any means a wilful deception. Many motives conspire to bring it about. There is the natural credulity of the human mind, which yearns for some sort of intercourse with the world of spirits, and has been the mainspring of endless forms of superstition, ever varying with the race and the age in which they have appeared. There is, next, the prompting of personal vanity, which is flattered by the idea of being made a *special vessel* for spiritual communication, secretly plumes itself upon a kind of superiority supposed to be thus conferred, and in this way prevents the healthy suspicions of delusion which from time to time arise in the mind from having their natural weight, or bringing the intellect back to a sounder state. And more than all this, there are the *startling facts themselves*, of intelligent actions performed, and thoughts and sentiments dictated and expressed, with which the volitional powers have no conscious connection. Such facts, to any one unacquainted with that new chapter of psychology which the investigatiin of the preconscious regions of mind unfolds, must seem strange and inexplicable indeed; and, combined with the other causes just mentioned, naturally enough bring about the entire delusion of which we are speaking. Moreover, I for one am not prepared to deny that all spiritual communication between this state of being and other more developed ones, is impossible. There may perhaps be facts well attested which are not acountable for on any other supposition; and it is but too easy for those who are tending to superstitious views to lay hold of a few really valid facts, and blindly carry out the analogy to cases in which other agencies, wholly different, are at work.

So much for some of the causes which have prompted to the belief in mediumship. With regard, next, to the facts themselves, the immense proportion of them come so manifestly under the category of preconscious and instinctive mental actions, that no one who has studied this sphere of mind with any degree of accuracy can for a moment fail to recognise them as such. The very beings who are supposed to communicate from the spiritual world are either historical characters, or persons who have had some kind of immediate connexion with the medium, both the one and the other clearly suggested by the mind's own thoughts or wishes. The *material suggested* uniformly coincides with the range of mental idea which the medium himself has cultivated, or been in some way connected with. I have never yet failed to see the stamp of his own individuality upon *every thing* emanating from him as a supposed spiritual dictation. On the contrary, the stamp of the being's individuality, from which the communication is said to come, is either wholly wanting, or is only seen as a faint imitation. Who can believe, that poets who wrote with such freshness, and such harmony of measure on earth, would communicate positive doggerel from the other world? Who can imagine that the lyric taste of a schillar, for example, should sink down in a higher sphere to the most bald and common place versification? O, to turn to another class of phenomena, who could suppose it possible that the great painters of Germany and Italy could guide the pencil of mortal now on earth, to make pictures which do not present a *single glimpse* of thir own native genius, either in design or execution?

If a person has a real poetic vein, no doubt it will produce some thing truly poetical under such spontaneous impulses; if he be a veritable artist, he may draw some thing really fine and noble; if he be a philosopher, he may scatter unconsciously some gems of philosophic thought, and so forth, *but you will never get any thing from any one's inspirations which does not already exist potentially in his mental habits or culture.* I have traced the process of spirit-writing and drawing, from the very first nervous twitches in which it commences up to its more developed form, and venture to affirm that the whole thing is, to the psychologist, as palpably a development of the unconscious form of mental operation, as writing an ordinary letter is the result of our conscious mental activity.

J. D. MORELL.

দুর্ভিক্ষ উপশমের সাহায্যার্থ দান প্রাপ্ত।

পূর্ব্বে বিজ্ঞাপিত	৭০৮
গোয়ালিয়া হইতে আগত	
এ, মস, ফনর সাহেব	২৫
মাষ্টর এইচ হপকীন	১৫
লালা নারায়ণ দাস	৩০
মিয়া হোসেন আলি	৩০
রাধাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী	২০
মাখনলাল বসু	৫
দেবিন দিন	১০
মহিল সিং	২
নন্দু সিং	২০
রাম দিন	১
মতিলাল সেন	২
বৃন্দাবন পাল	২
কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়	২
দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৫
দুর্গাপ্রসাদ	২
মাতাপ্রসাদ	৪
বিনায়কলাল	২
মুনশী দৌলাত রাও	৩
মুনশীপ্রসাদ লাল	৩
মুনশীমহম্মদ বক্‌স	৪
লালা চুনিলাল	৫
রূপচাঁদ	৪
মুলচাঁদ	৩
যদুনাথ চৌধুরি	৬
উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের যত্নে প্রাপ্ত...	৯৫
	৩০০
	১০০৮

দুর্ভিক্ষ গ্রস্ত দশে প্রেরিত।

পূর্ব্বে বিজ্ঞাপিত	৫৫০	
সম্প্রতি প্রেরিত	৩০০	
		৮৫০
স্থিত		১৫৮
		১০০৮

কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের
১৭৮৮ শকের অগ্রহায়ণ মাসের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	৬২৶০
পুস্তকালয়	৫৪৶১৫
যন্ত্রালয়	২৩৪৸১৫
ডাক মাসুল	৮৶০
দান	২৮
দুর্ভিক্ষে দান প্রাপ্ত	৩০০
গচ্ছিত	৪৭৷৷১০
	৭৩৪৸০

ব্যয়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	৬৪৷১০
পুস্তকালয়	৪২৷৷১৫
যন্ত্রালয়	১৯০৸৶০
ডাক মাসুল	১৯৷৷৶০
মাসিক বেতন	২১৪৷৷৶১০
অনিরূপিত	৪৸৫
আলোকের ব্যয়	২২৸১৫
কাগজ পত্রাদি	১১৷৷৶০
দুর্ভিক্ষ গ্রস্ত দেশে প্রেরিত	৩০০
গচ্ছিত	৪২৸/১০
	৯১৪৲৫
আয়	৭৩৪৸০
পূর্ব্বকার স্থিত	৩১৭/১০
	১০৫১৸/১০
ব্যয়	৯১৪৲৫
স্থিত	১৩৭৸/৫

শ্রী সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১ মাঘ রবিবার প্রাতঃকালে ৭৷৷০ সাড়ে সাত ঘণ্টার সময়ে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

কলিকাতা

সপ্তত্রিংশ সাংবৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ বুধ বার সপ্তত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে পূর্ব্বাহ্ণ ৮ ঘটিকার সময়ে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে ও অপরাহ্ণ ৭ ঘটিকার সময়ে প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

ব্রাহ্ম মহাশয়দিগের প্রতি নিবেদন যে তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় সাম্বৎসরিক দান আগামী ১১ মাঘের মধ্যে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে প্রেরণ করেন।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

তত্ত্ববিদ্যা।

প্রথম খণ্ড জ্ঞানকাণ্ড।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রণীত। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য এক টাকা।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাসুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২৩। কলিগতাব্দ ৪৯৩৭। ২০ পৌষ বৃহস্পতি বার।

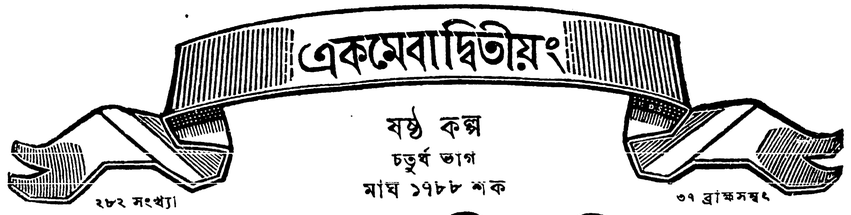

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বিজ্ঞাপন

কলিকাতা

সপ্তত্রিংশ সাংবৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ বুধ বার সপ্তত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে পূর্ব্বাহ্ণ ৮ ঘটিকার সময়ে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে ও অপরাহ্ণ ৭ ঘটিকার সময়ে প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

ঋগ্বেদ সংহিতা

প্রথমমণ্ডলস্য চতুর্দ্দশানুবাকে প্রথমং সূক্তং।

গোতমঋষিঃ জগতীচ্ছন্দঃ মরুতোদেবতা।

৯০৫

১। প্র যে শুম্ভন্তে জনযো ন সপ্তয়ো যামন্রুদ্রস্য সূনবঃ সুদংসসঃ। রোদসী হি মরুতশ্চক্রিরে বৃধে মদন্তি বীরা বিদথেষু ঘৃষ্বয়ঃ।

১। 'যে' মরুতঃ 'যামন্' যামনি গমনে নিমিত্তভূতে সতি 'প্র' 'শুম্ভন্তে' প্রকর্ষেণ স্বকীয়ানি অঙ্গানি অলঙ্কুর্ব্বন্তি 'জনয়ঃ' 'ন' জায়া ইব যথা যোষিতঃ স্বকীয়ানি অঙ্গানি অলঙ্কুর্ব্বন্তি তদ্বৎ। কীদৃশা মরুতঃ 'সপ্তয়ঃ' সর্পণশীলাঃ 'রুদ্রস্য' 'সূনবঃ' রোদয়তি সর্ব্বমন্তকালে ইতি রুদ্রঃ পরমেশ্বরঃ তস্য পুত্রাঃ 'সুদংসসঃ' শোভনকর্ম্মাণঃ। এতদেবোপাদয়তি 'হি' যস্মাৎ 'মরুতঃ' 'রোদসী' দ্যাবাপৃথিব্যৌ 'বৃধে' বৃদ্ধিপ্রদানাদিনা বর্দ্ধনায় 'চক্রিরে' কৃতবন্তঃ অতঃ সুদংসসঃ ইত্যর্থঃ। 'বীরাঃ' বিশেষেণ শত্রুক্ষেপণশীলাঃ 'ঘৃষ্বয়ঃ' ঘর্ষণশীলাঃ মহীরুহশিলোচ্চয়াদের্ভঞ্জকাইত্যর্থঃ। এবম্ভূতাঃ তে মরুতঃ 'বিদথেষু' বিদস্ত্যেষু

যষ্টব্যতয়া দেবানিতি বিদথাঃ যজ্ঞাঃ তেষু 'মদন্তি' সোমপানেন হৃষ্যন্তি।

১। যে সমস্ত বায়ু গমন-কালে স্ত্রীলোকের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ সর্ব্বতোভাবে অলঙ্কৃত করিয়া থাকেন। যাঁহারা রুদ্রের পুত্র, সাধুকারী ও সঞ্চরণশীল। যাঁহারা বারিবর্ষণাদি দ্বারা ভূলোক ও দ্যুলোকের উন্নতি সাধন করিয়াছেন, সেই সকল বিপক্ষোন্মূলন-সমর্থ বৃক্ষোৎপাটন-পটু বায়ু যজ্ঞে সোম পান দ্বারা পুলকিত হইয়া থাকেন।

৯০৬

২। ত উক্ষিতাসো মহিমানমাশত দিবি রুদ্রাসো অধি চক্রিরে সদঃ। অর্চন্তো অর্কং জনয়ন্ত ইন্দ্রিয়মধি শ্রিয়ো দধিরে পৃশ্নিমাতরঃ।

২। যে পূর্ব্বোক্তগুণবিশিষ্টাঃ 'তে' মরুতঃ 'উক্ষিতাসঃ' দেবৈঃ অভিষিক্তাঃ সন্তঃ 'মহিমানং' মহত্ত্বং 'আশত' আপ্নুবন্। 'রুদ্রাসঃ' রুদ্রস্য পুত্রাঃ উপচারাৎ জন্যে জনকশব্দঃ। তে রুদ্রপুত্রাঃ মরুতঃ 'দিবি' দ্যোতমানে নভসি 'সদঃ' সদনং স্থানং 'অধিচক্রিরে'। অধিকং সর্ব্বোৎকৃষ্টং কৃতবন্তঃ। 'অর্কং' অর্চনীয়ং ইন্দ্রং 'অর্চন্তঃ' পূজয়ন্তঃ 'ইন্দ্রিয়ং' ইন্দ্রস্য লিঙ্গং বীর্য্যং 'জনয়ন্তঃ' প্রহর ভগবোজহি বীরয়স্ব ইত্যেবং রূপেণ বাক্যেনোৎপাদয়ন্তঃ 'পৃশ্নিমাতরঃ' পৃশ্নেঃ নানারূপায়াঃ ভূমেঃ পুত্রাঃ মরুতঃ 'শ্রিয়ঃ' ঐশ্বর্য্যাণি 'অধিদধিরে' আধিক্যেন অধারয়ন্।

২। ঐ সমস্ত রুদ্রপুত্র বায়ু দেবগণ-কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া মহত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাঁরা অন্তরীক্ষে বাস করিয়া থাকেন। ইহাঁরা পূজনীয় ইন্দ্রের অর্চ্চনা এবং তাঁহার বল উৎপাদন করেন। ইহাঁরা ভূমির পুত্র ও ঐশ্বর্য্যের অধিকারী।

৯০৭

৩। গোমাতরো যচ্ছুভয়ন্তে অঞ্জিভিস্তনূষু শুভ্রা দধিরে বিরুক্মতঃ। বাধন্তে বিশ্বমভিমাতিনমপ বর্ত্মান্যেষামনু রীয়তে ঘৃতং॥

৩। 'গোমাতরঃ' গৌরূপা ভূমিঃ মাতা যেষাং তে মরুতঃ 'অঞ্জিভিঃ' রূপাভিব্যঞ্জকৈঃ আভরণৈঃ 'যৎ' যদা 'শুভয়ন্তে' স্বকীয়ানি অঙ্গানি শোভাযুক্তানি কুর্ব্বন্তি। তদানীং 'শুভ্রাঃ' দীপ্তাঃ মরুতঃ 'তনূষু' স্বকীয়েষু শরীরেষু 'বিরুক্মতঃ' বিশেষেণ রোচমানান্ অলঙ্কারান্ 'দধিরে' ধারয়ন্তি। অপি চ 'বিশ্বং' সর্ব্বং 'অভিমাতিনং' শত্রুং 'অপবাধন্তে' হিংসন্তি 'এষাং' মরুতাং 'বর্ত্মানি' মার্গান্ অনুসৃত্য 'ঘৃতং' ক্ষরণশীলং উদকং 'রীয়তে' স্রবতি। যত্র মরুতো গচ্ছন্তি বৃষ্ট্যুদকমপি তদনুসারেণ তত্র গচ্ছতীত্যর্থঃ।

৩। গোৰূপা পৃথিবী এই সমস্ত বায়ুর জননী। ঐ সকল দীপ্তিশীল বায়ু বেশ বিন্যাসের অভিলাষ হইলে সুশোভন উজ্জ্বল অলঙ্কার দ্বারা শরীর সুশোভিত করিয়া থাকেন। ইহাঁরা শত্রুবিনাশক। ইহাঁরা যে স্থানে গমন করেন, তথায় বারি বর্ষণ হয়।

৯০৮

৪। বি যে ভ্রাজন্তে সুমখাস ঋষ্টিভিঃ প্রচ্যাবয়ন্তো অচ্যুতা চিদোজসা। মনোজুবো যন্মরুতো রথেষা বৃষব্রাতাসঃ পৃষতী রযুগ্ধ্বং॥

৪। 'সুমখাসঃ' শোভনযজ্ঞাঃ 'যে' মরুতঃ 'ঋষ্টিভিঃ' আয়ুধৈঃ 'বিভ্রাজন্তে' বিশেষেণ দীপ্যন্তে তে মরুতঃ 'অচ্যুতা চিৎ' চ্যাবয়িতুং অশক্যানি দৃঢ়ানি পর্ব্বতাদীন্যপি 'ওজসা' স্বকীয়েন বলেন 'প্রচ্যাবয়ন্তঃ' প্রকর্ষেণ চ্যাবয়িতারঃ প্রেরয়িতারঃ ভবন্তি। উত্তরার্দ্ধঃ প্রত্যক্ষকৃতঃ। হে 'মরুতঃ' 'মনোজুবঃ' মনোবদ্বেগগতয়ঃ 'বৃষব্রাতাসঃ' বৃষ্ট্যুদকসেচনসমর্থসপ্তসংঘাত্মকাঃ যূয়ং 'রথেষু' আত্মীয়েষু 'পৃষতীঃ' পৃষত্যঃ ইতি মরুদ্বাহনানাং সংজ্ঞাঃ পৃষত্যো মরুতামিত্যুক্তত্বাৎ পৃষদ্ভিঃ শ্বেতবিন্দুভিঃ যুক্তাঃ মৃগীঃ 'যৎ' যদা 'অযুগ্ধ্বং' আভিমুখ্যেন নিযুক্তা অকৃঢ্বং তদানীং পর্ব্বতাদিকং প্রচ্যবত ইত্যর্থঃ।

৪। বায়ু সকল যজ্ঞশীল, আয়ুধ-ধারী, মনের ন্যায় বেগগামী ও বারি-বর্ষণ-সমর্থ। হে বায়ুগণ! যখন তোমরা মৃগীদিগকে রথে যোজিত কর, তখন স্বীয় বল-প্রভাবে নিশ্চল পর্ব্বতকেও চালিত করিতে সমর্থ হও।

৯০৯

ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ।

৫। প্র যদ্রথেষু পৃষতীরযুগ্ধ্বং বাজে অদ্রিং মরুতো রংহয়ন্তঃ। উতারুষস্য বিষ্যন্তি ধারা শ্চর্ম্মোদভি র্ব্যুন্দন্তি ভূম॥

৫। হে মরুতঃ 'পৃষতীঃ' 'যৎ' যথা 'রথেষু' 'প্রাযুগ্ধ্বং' প্রাযুযুজত। কিং কুর্ব্বতঃ 'বাজে' অন্নে নিমিত্তভূতে সতি 'অদ্রিং' মেঘং 'রংহয়ন্তঃ' বর্ষণার্থং প্রেরয়ন্তঃ 'উত' তদানীং 'অরুষস্য' আরোচমানস্য সূর্য্যস্য বৈদ্যুতাগ্নের্ব্বা সকাশাৎ বৃষ্ট্যুদকধারাঃ ভবন্তঃ 'বিষ্যন্তি' বিমুঞ্চন্তি। বিমুক্তাঃ তাশ্চ 'ধারাঃ' 'উদভিঃ' উদকৈঃ 'চর্ম্ম' 'ইব' পরিমিতং অল্পং চর্ম্ম যথা অপ্রযত্নেন ক্লেদ্যতে এবং 'ভূম' সর্ব্বাং ভূমিং 'ব্যুন্দন্তি' বিশেষেণ আর্দ্রাং কুর্ব্বন্তি।

৫। হে বায়ুগণ! তোমরা এক্ষণে মৃগী দিগকে রথে যোজিত কর। তোমরা অন্নের নিমিত্ত মেঘকে বারি বর্ষণে প্রেরণ করিয়া তৎকালে স্বয়ং ভাস্বর সূর্য্য হইতে বারি ধারা নিপাতিত করিয়া থাক। অল্প চর্ম্ম যেমন অনায়াসে আর্দ্র হয়, সেই রূপ ঐ সলিলে সমস্ত ভূমি আর্দ্র হইয়া যায়।

১০০

৬। আ বো বহন্তু সপ্তয়ো রঘুষ্যদো রঘুপত্বানঃ প্র জিগাত বাহুভিঃ। সীদতা বর্হিরুরু বঃ সদস্কৃতং মাদয়ধ্বং মরুতো মধ্বো অন্ধসঃ॥ ১। ৬। ৯।

৬। হে মরুতঃ 'বঃ' যুষ্মান্ 'সপ্তয়ঃ' সর্পণশীলাঃ অশ্বাঃ 'আবহন্তু' অস্মৎযজ্ঞং প্রাপয়ন্তু। কীদৃশাঃ সপ্তয়ঃ। 'রঘুষ্যদঃ' লঘু শীঘ্রং স্যন্দমানাঃ বেগেন গচ্ছন্তঃ ইত্যর্থঃ। 'রঘুপত্বানঃ' লঘু শীঘ্রং পতন্তঃ গচ্ছন্তঃ যূয়ং 'বাহুভিঃ' স্বকীয়ৈঃ হস্তৈঃ অস্মভ্যং দাতব্যং ধনং আহৃত্য 'প্রজিগাত' প্রকর্ষেণ গচ্ছত। হে 'মরুতঃ' 'বঃ' যুষ্মাকং 'সদঃ' সদনং বেদিলক্ষণং স্থানং 'উরু' বিস্তীর্ণং কৃতং। তত্র যৎ আস্তীর্ণং বর্হিঃ তৎ 'আ সীদত' তস্মিন্ বর্হিষি উপবিশত। উপবিশ্যচ 'মধ্বঃ' মধুররসস্য 'অন্ধসঃ' সোমলক্ষণস্য অন্নস্য পানেন 'মাদয়ধ্বং' তৃপ্তাঃ ভবত। ১। ৬। ৯।

৬। হে বায়ুগণ! বেগগামী অশ্ব সকল আমাদিগের যজ্ঞের নিকট তোমাকে আনয়ন করুক। তোমরা আগমন-কালে আমাদিগকে দেয় ধন লইয়া আইস। আমরা তোমাদিগের অধিষ্ঠান ভূমি প্রশস্ত করিয়াছি। তোমরা সেই ভূমিতে আস্তীর্ণ কুশের উপর উপবেশন করত মধুর সোম রস পান করিয়া তৃপ্ত হও। ১। ৬। ৯।

উদ্দীপন।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত।

ভ্রাতঃ! আর কত কাল মোহ-নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া থাকিবে, জাগ্রত হও। তুমি কি দেখিতেছ না সংসারের অসার কামনা তোমার দুর্ব্বল হৃদয়কে কলুষিত এবং দুর্নিবার পাপ করাল আস্য-কুহর বিস্তার করিয়া তোমার আত্মাকে চকিত করিতেছে। সাবধান, তুমি এখনই সেই ভয়-হরণ ত্রিভুবনাথের হস্তে আত্ম সমর্পণ কর। বিবেচনা কর যেন, সকলেই তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছে, কেবল তুমিই ইহাতে কৃতকার্য্য হও নাই। এক্ষণে তুমি অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা তাঁহাকে অনুসন্ধান কর, অবশ্যই দেখিতে পাইবে। তিনি তোমাকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত বাহু প্রসারণ করিয়া রহিয়াছেন এবং তোমার সুললিত সরল প্রার্থনা-বাক্য শ্রবণ করিবার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছেন। এক্ষণে তুমি শ্যামল-দূর্ব্বাদল-লাঞ্ছিত প্রান্তরে, কি বিহঙ্গ-কুল-কূজিত নিবিড় অরণ্যে, যে স্থলেই হউক, প্রভাতের সুস্নিগ্ধ-মারুত-হিল্লোলে, কি সন্ধ্যার আরক্ত-সূর্য্য-কিরণে যে সময়েই হউক, অনন্যমনে তাঁহাকে চিন্তা কর, এবং কৃতাঞ্জলিপুটে কাতর-হৃদয়ে এই রূপ প্রার্থনা কর, নাথ! আমি সংসার-ভয়ে ভীত হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইতেছি। আমি দেখিতেছি যে, তোমার

একান্ত বশীভূত হওয়াই আমাদের জ্ঞান এবং কায়মনোবাক্যে তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন করাই আমাদের সন্তোষ। আমি যখন জানিতেছি যে আমি তোমার ইচ্ছা অনুসন্ধান করি, তুমি কখন্ কি বল, সতর্ক হইয়া শ্রবণ করি, তখন ইহাও জানিতেছি যে, আমি তোমার ভৃত্য, চিরানুগত কিঙ্কর। এই সংসার অতি ভীষণ স্থান; এখানে অন্তরে শত্রু, বাহিরে শত্রু; কিন্তু ইহাও বিশ্বাস করি যে তুমি আমাদিগকে ধূলি-নির্ম্মিত দুর্ব্বল জীব বলিয়া জান। আমরা নিতান্ত ক্ষীণ হীন ও মলিন। এই নিমিত্তই তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি এবং এই নিমিত্তই কাতরতার সহিত কহিতেছি, হে বিশ্ব-জননি! আমি যেন তোমার স্নেহ-নেত্রের নিকটেই জীবিত থাকি এবং তোমার অলক্ষ্য বক্ষঃস্থলে প্রাণ ত্যাগ করিতে পারি।

ভ্রাতঃ! তুমি তোমার আত্মার আরাম-স্থান ঈশ্বরকে নির্জ্জনে পাইয়া এই রূপ বলিবে। তিনি প্রতিক্ষণই তোমার হৃদয়কে পাঠ করিতেছেন এবং প্রতিক্ষণই তোমার অন্ধকারময় গুপ্ত প্রদেশকে অনুসন্ধান করিতেছেন। তুমি তাঁহার অন্তর্ভেদি দৃষ্টির নিকট দণ্ডায়মান থাকিতে কদাচই ভীত হইও না। তুমি তাঁহার জ্বলন্ত চক্ষুর সমক্ষে অকুণ্ঠিত-হৃদয়ে দণ্ডায়মান হইলে উহার দুর্ব্বিষহ তেজে তোমার পাপ-রাশি ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে। সাংসারিকতা ও অপবিত্রতা লজ্জিত হইয়া দূরে পলায়ন করিবে এবং তোমার অন্তর্দৃষ্টি নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ হইবে। তখন তুমি জানিতে পারিবে, ঈশ্বরই আমার চির-পরিচিত প্রভু এবং আমি তাঁহার বিশ্বস্ত ভৃত্য। তুমি ভ্রমেও এই রূপ বিবেচনা করিও না যে আমার আত্মা পাষাণের ন্যায় কঠিন হইয়াছে, ইহা আর কিছুতেই দ্রব হইবার নহে। যখন সেই প্রেম-শশী তোমার হৃদয়াকাশে উদিত হইবেন, তখন তোমার এই দুর্ভেদ্য আত্মাও আর্দ্র হইয়া যাইবে। তাঁহার করস্পর্শে ইহা হইতে শোক সন্তাপ অপনীত ও সুখশান্তি অঙ্কুরিত হইবে। যাঁহারা পবিত্র-হৃদয়ে তাঁহাকে প্রীতি করেন, তিনি সেই সমস্ত সাধুদিগের সমক্ষে প্রীতির অনন্ত উৎস হইয়া বিরাজমান থাকেন। আমরা কখন্ তাঁহাকে আহ্বান করি, তন্নিমিত্ত তিনি সততই অপেক্ষা করিতেছেন, আমরা কখন তাঁহার নিকট কি প্রার্থনা করি, তন্নিমিত্ত তিনি সততই প্রস্তুত হইয়া আছেন। অনুরক্ত ভক্তকে তাঁহার অদেয় কিছুই নাই, তিনি সময়ে সময়ে আপনাকে দিয়াও আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন।

ভ্রাতঃ! জগতের সর্ব্বত্রই তাঁহার সৌন্দর্য্য সন্দর্শন কর। অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্র-পরিপূর্ণ লভোমণ্ডলে, জলজন্তু-বিলোড়িত সাগর-সলিলে, বৃক্ষের শ্যামল পত্রে, পক্ষীর সুচিক্কণ পতত্রে, নবকুসুমিত মনোহর উদ্যানে, তৃণ-গুল্ম-সঙ্কুল গভীর কাননে, উত্তুঙ্গ শৈল-শৃঙ্গে, দুর্লক্ষ্য কীটের সুশোভন অঙ্গে, তাঁহারই সৌন্দর্য্য। রজনীর মোহন-মূর্ত্তি চন্দ্রে, দিবসের উদয়াচল-চক্রবর্ত্তী তরুণ সূর্য্যে তাঁহারই মুখরাগ। গিরি-শিখরোপরি নিপতিত ধবল তুষার-শিলায় ও স্রোতস্বতীর লহরী-লীলায় তাঁহারই শোভা। পতিব্রতা ভার্য্যার মুগ্ধমধুর হাস্যে তাঁহারই উল্লাস এবং পবিত্র স্বভাব ভর্ত্তার হৃদয়ে তাঁহারই বিলাস। জগতের যা কিছু সৌন্দর্য্য যা কিছু ভাব সকলই তাঁহার।

থিওডোর পার্কর।

২৮১ সংখ্যক পত্রিকার ১৮৯ পৃষ্ঠার পর।

যে জাতি পুরুষোপাসনার মত অবলম্বন করিয়াছে, দেবত্ব-সম্পন্ন মনুষ্যই তাহাদিগের উপাস্য। এই জাতীয়েরা বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন কালের মনুষ্য-সমূহের কার্য্য এক মনুষ্যের বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকে। যাঁহারা পূর্ব্ব কালে কৃষি বাণিজ্যাদির সৃষ্টি করিয়া ছিলেন, পরিশেষে তাঁহারাই মনুষ্য-সমাজে দেবতা বলিয়া প্রতিপত্তি লাভ করেন। যে সমস্ত লোক জীবিতাবস্থায় জ্ঞানবত্ত্ব মহত্ত্ব ও সাধুত্ব নিবন্ধন জন-সমাজে সম্মান লাভ করিতেন, লোকান্তরিত হইলে তাঁহাদিগকেই দেবত্ব প্রদান করা হইত। লোকে এই রূপ বিবেচনা করে যে ঐ সমস্ত মহাত্মা এক সময়ে যেমন জীবিত ব্যক্তি দিগকে শাসন করিয়াছিলেন, এক্ষণে লোকান্তরিত ব্যক্তিদিগকেও সেই রূপ শাসন করিতেছেন। ইহাঁরা জীবিতাবস্থায় যে সমস্ত কার্য্যানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে যে গুলি প্রশংসা ও গৌরবের, তাহাই লোকের মনে জাগরূক থাকে, আর যে গুলি অপ্রশংসনীয় ও অনুদার, তৎসমুদায় তাঁহাদিগেরই সহিত পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করে। মনুষ্যেরা ইহাঁদিগের প্রতিমূর্ত্তি ও মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া ভক্তি ও শ্রদ্ধার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাকে। যিনি প্রথমে মনুষ্য বলিয়া পরিগণিত হইতেন, তিনিই দেবতা-বোধে পূজিত হন। জড়োপাসকদিগের দেবতার গুণ ও প্রকৃতির শক্তি এই সমস্ত মনুষ্য-দেবতাদিগের উপর আরোপিত হইয়া থাকে। যে মনুষ্য মহাবল পরাক্রান্ত ছিল, তাহাকে দেবত্ব প্রদান কালে তাহার হস্ত পদ ও মস্তকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয়। এই জাতি দিগের পুরাবৃত্ত অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই সমস্ত দেবতার অপূর্ণ ভাব ক্রমশ সাধারণকে পূর্ণ ভাবের আস্বাদনে সমর্থ করিয়াছে এবং অপূর্ণ মনুষ্য-দেবতারা পূর্ণ ঈশ্বরের অনুগত কিঙ্কর বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ঐ সময়েই একেশ্বরোপাসনার মত মনুষ্য-সমাজে প্রবেশ করিবার প্রকৃত অবসর প্রাপ্ত হয়। প্রত্যেক জাতির ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক ধর্ম্ম-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়া ধর্ম্মের যে অংশে দোষ দর্শন হইয়া থাকে, তাহা সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেন এবং যাহা প্রকৃত সত্য, তাহা প্রচার করিতে যত্নবান্ হন। কিন্তু তাঁহারা এই সুমহৎ কার্য্য সাধনে অধ্যবসায়ারূঢ় হইলে তাঁহাদিগকে যার পর নাই লোকের অত্যাচার সহ্য করিতে হয়। কেহ দেশান্তরিত, কেহ বা বিবিধোপায়ে নিহত হইয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃত সত্য মহাত্মা আরিষ্টটলের সহিত নিস্তব্ধ আনেক্‌সেগোরসের সহিত দেশান্তরিত এবং জগদ্বিখ্যাত সক্রেটিসের সহিত নিহত হয় নাই। যাঁহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এই সত্যের প্রবল বিপক্ষ ছিলেন, সত্য তাঁহাদিগেরই হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে এবং তাঁহাদের বংশীয়েরাই ঐ সমস্ত নিহত মহাপুরুষদিগের কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়াছেন। ফলত সত্য অবসর প্রাপ্ত হইলে কদাচই প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে না।

পুরুষোপাসনায় পৌরোহিত্যের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এই পৌরোহিত্য ভারতবর্ষ ও ইজিপ্ট দেশে স্বতন্ত্র শ্রেণিভুক্ত ও বংশপরম্পরাগত হইয়া জাতি ও জাতিগত কার্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে, কিন্তু গ্রিশ দেশে ঐ রূপ দৃষ্ট হয় না। ঐ দেশে এই প্রকার স্বাধীন ভাবই ভাবী উন্নতির সোপান হয়। আমাদিগের বোধ হয় পৃথিবীর আদিমাবস্থাতে যেমন পৈতৃক ধনে পুত্র পৌত্রাদির অধিকার ব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছে, ধর্ম্মযাজকের কার্য্যেও তদ্রূপ ছিল। এই পুরো-

হিত-শ্রেণী সাংসারিক কার্য্যে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া দেবগণের ভাব পরিজ্ঞানে নিযুক্ত থাকিতেন। এই অবস্থাতেই শিক্ষিতের একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীর সৃষ্টি হয় এবং তাঁহারাই মানবজাতির উন্নত অভাব সকল উদ্ভাবন করিয়া দেন। দেবগণের ভাব পরিজ্ঞানে যত্নই ইহাঁদিগকে প্রকৃতির অনুশীলনে প্রবর্ত্তিত করে। সুতরাং এই উপায়েই বিজ্ঞানের উন্নতি হয়। ঐ সমস্ত পুরোহিত দেবতাদিগের সন্তোষ সাধনের উদ্দেশে প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ এবং গীত বাদ্য ও কাব্য প্রভৃতি সুকুমার বিদ্যার যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিয়াছিলেন। ইহাঁদিগের কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন দেশে লোকের অভিরুচি অনুসারে বিভিন্ন প্রকার দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইজিপ্ট দেশে ধর্ম্মযাজকেরাই জাতির প্রথা সংস্থাপন ও ভয়ানক উৎপীড়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু গ্রিশ দেশে উৎপীড়নের ভাব প্রায়ই ছিল না। ইতর সাধারণ সকলেই অনেকাংশে আপনাদিগের স্বাধীনতার অব্যাঘাতে কার্য্য করিতে পারিত। যখন এই পুরোহিতের অধিকার একটি স্বতন্ত্র শ্রেণিভুক্ত ছিল, তখন ইহার প্রভাবে জনসমাজের বহুতর অনিষ্ট সাধিত হয়। কিন্তু যখন ইহা কোন শ্রেণীতে আবদ্ধ ছিল না, তখন ইহার গুণে কোন কোন জাতির মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

এই বহু দেবদেবীর উপাসনা-কালে যুদ্ধ মানবজাতির একটি স্বাভাবিক কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইত। এই অবস্থায় ধর্ম্ম এক জাতীয় মনুষ্যকে এক প্রীতি-সূত্রে বদ্ধ করিয়াছিল বটে, কিন্তু এক ব্যক্তিকে আর একটি ব্যক্তি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করে। দেবতারা পরস্পর পরস্পরের বিরোধী ছিলেন। জিহোবা ও বল দেব কখনই ঐকমত্য অবলম্বন করিতে পারেন নাই। সুতরাং ইহাঁদের উপাসকেরাও নির্দ্দয় ভাবে পরস্পর পরস্পরের প্রতি যার পর নাই অত্যাচার করিত। কিন্তু এই যুদ্ধ বিগ্রহ দ্বারা জন-সমাজে সভ্যতা প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছিল। এক্ষণকার বাণিজ্যের ন্যায় পূর্ব্বকালের যুদ্ধ বিলক্ষণ স্বার্থ সাধন করিত। যুদ্ধই একটি জাতির সৌভাগ্য বর্দ্ধনের প্রধান সোপান হইয়াছিল। পরাজিতেরা জেতৃজাতিদিগের অধিকারভুক্ত হইয়া উহাদের উৎকৃষ্ট শিল্প সাহিত্য ও রুচির আচার ব্যবহারের অংশভাগী হইত এবং আপনাদিগের যা কিছু উৎকর্ষ, তদ্দ্বারা উহাদিগকে উন্নত করিয়া দিত। এক সময়ে গ্রিশ দেশীয়েরা রোমকদিগের নিকট পরাজিত হইয়া উহাদিগকে শিল্প ও পদার্থ বিদ্যার সম্পূর্ণ অধিকারী করিয়াছিল এবং নির্ব্বাসিত ইহুদীরা বাবিলোনিয়দিগের নিকট অধ্যাত্ম বিদ্যার শিক্ষা লাভ করে। গথ দেশীয়েরা রোমকদিগকে পরাজয় করিয়াছিল কিন্তু রোমকদিগের খৃষ্টীয় ধর্ম্ম ঐ জাতির উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য লাভ করে। যখন ধর্ম্ম, ঈর্ষা দ্বেষ প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির সহিত মিলিত হয়, তখনই যুদ্ধের আবশ্যকতা উপস্থিত হইয়া থাকে। এই নর-শোণিত-লোলুপ যুদ্ধই আবার মানবজাতিকে বিজ্ঞানের পথে অগ্রসর করিয়া দেয়। কিন্তু যখন মনুষ্যজাতি বিজ্ঞানের তীক্ষ্ণতর আলোকে সত্যের উজ্জ্বল মুখ নিরীক্ষণ করে, তখন রক্তপাত একটি ভয়ঙ্কর পাপ বলিয়া তাহাদের হৃদয়ঙ্গম হয়, তখন যুদ্ধ স্বহস্তেই আপনার সমাধি স্থান প্রস্তুত করে এবং সৃষ্টির শক্তি সংহার শক্তিকে এক কালে উন্মূলিত করিয়া দেয়।

এই সম্প্রদায়ে দেবতা-সংক্রান্ত যুদ্ধই প্রায় উপস্থিত হইত। এই অবস্থায় বীরগণের শারীরিক শক্তি এবং ধর্ম্মযাজক-

দিগের চিন্তা-শক্তি জন-সমাজের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিল। বিজিত ব্যক্তিরা বিপক্ষের অধীনতা স্বীকার করিলে তাহাদিগকে আর বধ-দণ্ড প্রদান করা হইত না। এই রূপে দাসত্বের সৃষ্টি হয়। জেতৃ জাতীয়েরা বন্দীদিগকে দাসত্বে নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করে। জড়োপাসনা-কালে বন্দিগণের যে রূপ অবস্থা ছিল, পুরুষোপাসনা-কালে তাহার সম্যক্ পরিবর্ত্ত লক্ষিত হয়। কিন্তু বলিতে কি ধর্ম্ম-সংস্কারের সহিত লোকের অন্তঃকরণে যে এই রূপ করুণভাব সঞ্চার হইতে বহু কাল অতীত হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। যদি সমাজ-মধ্যে এই রূপ পরিবর্ত্ত না হইত, বোধ হয়, তাহা হইলে মানবজাতি এত দিন সম্পূর্ণ উচ্ছিন্ন হইয়া যাইত। সুতরাং দাসত্ব প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়া সমাজের যে যথেষ্ট শুভ সাধন করিয়াছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ইহা দ্বারা আর একটি উপকার হয় এই যে, যে সমস্ত অসভ্য জাতি পরিশ্রমে যৎপরোনাস্তি কাতর ছিল, বিপক্ষের হস্তগত হইয়া তাহাদিগকে অগত্যা আলস্য পরিত্যাগ করিতে হয়। সুতরাং রীতিমত পরিশ্রমের আবশ্যকতা অনেকেরই হৃদয়ঙ্গম হইয়া উঠে; ইহা দ্বারা জাতিসাধারণের প্রকৃত উন্নতি অলক্ষিত ভাবে আস্পদ লাভ করে। এই রূপে দাসত্ব-প্রথা জন-সমাজে প্রবিষ্ট হইয়া পৃথিবীতে আর এক প্রকার অভিনব ভাব আনয়ন করিয়াছিল। কিন্তু যখন সত্যতার অপেক্ষাকৃত উন্নতি সহকারে একেশ্বরোপাসনা প্রবর্ত্তিত ও লোকের স্বার্থপরতা অনেকাংশে তিরোহিত হয়, তখন এই ঘৃণিত কুপ্রথা প্রীতিকর বলিয়া আর বোধ হয় নাই। যাহাই হউক, যখন দাসত্বের নিয়ম প্রচলিত হয়, তখন কি ধর্ম্মযাজক কি যোদ্ধা সকলেই ইহা যত্নের সহিত পোষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু যাহারা শত্রুর আয়ত্ত ও দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইত, তাহারা যোদ্ধাদিগের অপেক্ষা ধর্ম্ম-যাজক-শ্রেণী হইতেই অধিক পীড়ন সহ্য করিত। ধর্ম্মযাজকেরা ঐ সমস্ত বিজিতদিগের আত্মাকে আপনাদের চিরানুগত কিঙ্কর করিয়া রাখিতেন। তাঁহাদিগের এই রূপ নির্দ্দয় ব্যবহারে বোধ হইত যেন তাঁহারা আপনার ভিন্ন অন্যের প্রকৃতিকে স্বতন্ত্র বিবেচনা করিতেন। যিনি এই সমস্ত হতভাগ্যদিগকে রণক্ষেত্র হইতে বন্দী রূপে আনয়ন করেন, তাঁহার মৃত্যু হইলে পুরোহিতেরা প্রথমাবস্থায় উহাদিগকে ঐ মৃত দেহের সহিত সমাহিত বা চিতাগ্নিতে দগ্ধ করিত। কিন্তু শেষাবস্থায় প্রভুর মৃত্যুর পর উহাদিগকে দাসত্ব বন্ধন হইতে মুক্ত করা হইত।

এই সম্প্রদায়ে ধর্ম্মযাজকদিগের বিশেষ কার্য্য এই যে, ইহাঁরা ধর্ম্মের ব্যবস্থা প্রদান করিতেন কিন্তু ঐ ব্যবস্থা যুক্তিসঙ্গত কি না, তাহার বিচারে অন্যের স্বাধীনতা অপহরণ করিয়া রাখিতেন। এই শ্রেণী কেবল চিন্তা ও কল্পনাতেই কালক্ষেপ করিতেন। আর যোদ্ধার শ্রেণীকে কেবল কার্য্যানুষ্ঠানেই নিযুক্ত থাকিতে হইত। অতি প্রাচীন কালে শাসনের ভার পুরোহিতদিগের হস্তে ন্যস্ত থাকিত। দেবগণের সহিত এই পুরোহিতদিগের সংযোগ ছিল। ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে, মাইনস্ মোজেস্ প্রভৃতি কএক ব্যক্তি সাক্ষাৎ ঈশ্বর হইতেই নিয়ম প্রণালী অধিকার করিয়াছিলেন। যদি ইহাদিগকে কেহ অসম্মান করিত, তাহাকে বজ্রধর দেবতার ক্রোধের ফল ভোগ করিতে হইত।

গ্রিশ দেশে ইহার বিপরীতও দৃষ্ট হয়। যখন মহাকবি হোমর জীবিত ছিলেন, সেই সময় হইতে বহু দিবস ধর্ম্ম-যাজন শক্তি রাজ্য-

শাসন শক্তি অপেক্ষা গৌরবের বলিয়া বিবেচিত হইত না। তৎকালে মনুষ্যদিগের প্রবৃত্তি অন্যরূপ হইয়াছিল। ঐ সময়ের মধ্যে এমন কতক গুলি লোক জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন যে তাঁহাদিগকে রাজ্য শাসন, যুদ্ধ ও পৌরোহিত্য কিছুই করিতে হইত না। তাঁহারা দার্শনিক। তাঁহারা বিজ্ঞানেরই সমধিক আলোচনা করিতেন। যদিও তাঁহারা ধর্ম্মযাজকের পদ রীতিমত গ্রহণ করেন নাই, তথাচ তাঁহাদিগের দ্বারা অধ্যাত্ম বিদ্যার বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল। কিন্তু যে দেশে এক ব্যক্তির হস্তে সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক ভার অর্পিত হয়, তথায় ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। তথায় বিদ্রোহ ব্যতিরেকে আর কিছুই দৃষ্ট হয় না। যে সমস্ত বিদ্যা-প্রভাবে মনুষ্যের যথার্থ উন্নতি হইতে পারে, তাহার কিছু মাত্র উন্নতি হয় না। এই প্রথা যে মানব-সমাজের তাদৃশ প্রীতিকর ছিল না, তাহাও সপ্রমাণ হইতে পারে। ইহুদিদিগের মধ্যে সামুএলের ইতিহাসই ইহার একটি নিদর্শন। দেশস্থ ব্যক্তিরা পুরোহিতের শ্রেণীকে ক্ষমতা বিহীন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, কিন্তু ঐ শ্রেণী তাহা রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করেন। পরিশেষে যখন পুরোহিতেরা দেখিলেন যে, তাঁহারদের প্রভুত্ব আর কিছুতেই রক্ষা হয় না, তখন তাঁহারা এক ব্যক্তিকে ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ ভাজন এই ভান করিয়া রাজ সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। ঐ ব্যক্তি পুরোহিতের আদেশানুসারেই সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠান করিত। যাহাই হউক ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে সাংসারিক ভার পুরোহিতের শ্রেণী হইতে আচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা যে অনেক স্থলেই হইয়া ছিল, তাহার ভুরি ভুরি নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই প্রণালী বহুকাল মনুষ্য সমাজে বর্ত্তমান ছিল। ঐ সময়ে ইহার প্রভাবে জনসমাজেরও বিলক্ষণ অনিষ্টোৎপত্তি হয়।

জড়োপাসনায় যেমন পশুপক্ষীকে দেবত্ব প্রদান করা হইত, পুরুষোপাসনায় সেইরূপ মনুষ্যে দৈবশক্তির আরোপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যাঁহারা মনুষ্য-সমাজে মহাপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত হইতেন, লোকে বিশ্বাস করিত যে, তাঁহারা দেহান্তে চিরযৌবন সম্পন্ন হইয়া অমরগণের মধ্যে উপবেশন পূর্ব্বক রাজদণ্ড গ্রহণ করিবেন। যে আত্মা আশ্রয়-ক্ষেত্র দেহকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহারও পৃথিবীস্থ মনুষ্যের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য আছে। ঐ আত্মা মনুষ্যের অভিভাবক হইয়া মনুষ্যের নানা প্রকার শুভ সাধন করিয়া থাকে। অসভ্যাবস্থার কথা দূরে থাকুক, সভ্যতার অবস্থাতেও এই বিশ্বাস লোকের অন্তঃকরণ-বৃত্তি আকর্ষণ করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই অবস্থাতেও এই রূপ মহাপুরুষ ঈশ্বরের আত্মজ বলিয়া অভিহিত হন। তাঁহার জন্ম অলৌকিক, তাঁহার শক্তিও অলৌকিক। তিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বরের অবতার। তিনিই এক জন মনুষ্য ও ঈশ্বরের মধ্যবর্ত্তী পুরুষ। এই রূপ ভাব খৃষ্ট ধর্ম্মের মধ্যেও প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু যাঁহারা স্বাধীনতার সহিত নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করেন, ইহা তাঁহাদিগকে কখনই আকর্ষণ করিতে পারে না। এক জন মনুষ্যকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা যার পর নাই অসঙ্গত। বুদ্ধিবৃত্তি বিচার শক্তি নিতান্ত কলুষিত না হইলে খৃষ্ট ধর্ম্মের এই বিশ্বাসে কখনই অনুমোদন করা যাইতে পারে না।

সংস্কৃত সাহিত্য।

২৮০ সংখ্যক পত্রিকার ১৯৩ পৃষ্ঠার পর।

বেদের কাল-নিরূপণ বিষয়ে পুরাণ ও বীর-চরিত-পূর্ণ গ্রন্থ সকল প্রমাণ-স্থল বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। মহর্ষি মনু-প্রণীত মানব-ধর্ম্ম-শাস্ত্রও ইহার একটি নিরপেক্ষ প্রমাণ নহে। আমরা দেখিতে পাই যে, যিনি এই ধর্ম্ম শাস্ত্র সঙ্কলন করেন, বৈদিক গ্রন্থ সকল তাঁহার বিলক্ষণ আয়ত্ত ছিল। এই ধর্ম্ম-শাস্ত্রে এমন অনেক শ্লোক আছে যে, তাহা ব্রাহ্মণ ও সূত্রের স্থান বিশেষের অনুবাদ বৈ আর কিছুই নহে। বৈদিক কালের পর যে সমস্ত সামাজিক নিয়ম স্থির হইয়াছিল, ঐ গ্রন্থে তাহাও সংগৃহীত হইয়াছে।

যাঁহারা ভারতবর্ষীয় গ্রন্থ-সমূহের প্রাচীনত্বে সন্দেহ করিয়া থাকেন, তাঁহারাও এই ধর্ম্ম-শাস্ত্রের প্রাচীনত্বে সম্যক্ অনুমোদন করিয়াছেন। কোন পুরাবৃত্ত-লেখকই ইহাকে এই অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন নাই। ফলত এই গ্রন্থ অতিশয় প্রাচীন, কিন্তু মহাত্মা উইলিয়ম জোন্‌স এই গ্রন্থ প্রণয়নের যে কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা অভ্রান্ত বলিয়া বোধ হয় না এবং অন্যান্য সুবিজ্ঞ পণ্ডিতেরাও এই বিষয় যে রূপ স্থির করেন, তাহাও তাদৃশ যুক্তি-সঙ্গত ও প্রামাণিক নহে। তাঁহারা যে রূপ প্রমাণ অবলম্বন করিয়া ইহার কাল নির্দ্ধারিত করুন কিন্তু কেহই খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব ৮৮০ হইতে ১২৮০ শতাব্দির অধিক অগ্রসর হন নাই।

মনু ও মহাভারত যে সময়ে প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা যদি সম্যক্ নিরূপণ করা যায়, তাহা হইলে বেদের কাল-নির্দ্ধারণ বিষয়ে আর কোন সংশয়ই থাকিতে পারে না। মনু ও মহাভারত অপেক্ষা বেদ বহু কাল পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়াছে। মহাভারতের মধ্যে কতক অংশ বৌদ্ধ ধর্ম্মের পূর্ব্বে যে রচিত হয় এবং কতক গুলি যে খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রাদুর্ভাবের পরে সঙ্কলিত হইয়াছিল, ইহাতে সাধারণের বিশ্বাস হউক বা নাই হউক, কিন্তু যে মহাভারত ও মনুর প্রণয়ন-কাল নিরূপিত হয় নাই, বেদ সেই দুই খানি গ্রন্থ অপেক্ষা বহু কাল পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়াছে, এই কথা বলিলে বেদের কাল নির্দ্ধারণ বিষয়ে বিশেষ কি উপকার হইল। সুতরাং এই বিষয়ে আমাদিগকে একটি স্বতন্ত্র প্রণালী অবলম্বন করিতে হইতেছে। যাহা ভারতবর্ষীয় সমস্ত পুরাবৃত্তের মূল, সেই বেদের প্রণয়ন-কাল নিরূপণে যত্ন করিতে হইলে, বেদের পরে যে সমস্ত গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাতে যে সাহায্য পাওয়া যায়, তাহার উপর নির্ভর না করিয়া বৈদিক কাল নিরূপণ করা কর্ত্তব্য হইতেছে। যদি বেদের কাল নির্দ্ধারিত হয়, তাহা হইলে বেদের সহিত বৈদিক কালের পরে যে সমস্ত গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে, তাহাদের একটি সম্বন্ধ নির্দ্ধারিত হইতে পারে। কিন্তু আমরা এমন কথা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, বৈদিক কালের প্রমাণ বেদই এবং বেদের পরে যে সমস্ত গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাদের সহিত উহার সম্বন্ধ এই যে, বেদের শাসনেই উহারা শাসিত হইতেছে। উহাদের দ্বারা বেদের কোন বিশেষ সাহায্য হইতে পারে না।

বেদ হইতে দুইটি উদ্দেশ্য সাধন হইতে পারে। ইহার সাহায্যে সমস্ত ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর পুরাবৃত্ত অবগত হওয়া যায়। পৃথিবীর পুরাবৃত্ত বিষয়ে বেদে যাহা উল্লেখ নাই, তাহা অন্য কোন ভাষা প্রদান করিতে পারে না। যে সময়ের বৃত্তান্ত কোন গ্রন্থেই পাওয়া যায় না, যে সময়ের আচার ব্যবহারাদি অনুমান দ্বারা নির্ণয় করিতে হয়, বেদ সেই সমস্ত অভাব মোচন করিতেছে। অত-

এব যদি কেহ মানবজাতির পুরাবৃত্ত জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করেন, যদি কেহ প্রাচীন কালের কোন গ্রন্থ পুস্তকালয় ও চিত্রশালিকায় সংস্থাপনের অভিলাষ করেন, তাহা হইলে ঋগ্বেদকেই তাঁহার লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। ফলত ইহা অপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ পৃথিবীতে আর কিছুই নাই। ঋগ্বেদই সকল গ্রন্থ অপেক্ষা এই অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে।

ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত বেদ হইতেই অনেকাংশ উপলব্ধ হইতে পারে। অনেকে কহিয়া থাকেন যে, ভারতবর্ষে এমন কোন সংস্কৃত গ্রন্থ নাই, যাহা দ্বারা পুরাবৃত্ত পরিজ্ঞানের বিশেষ সাহায্য হইতে পারে। এই বাক্যটি নিতান্ত ভ্রান্তি-মূলক। এক্ষণে সংস্কৃত ভাষাকে যে দৃষ্টিতে দেখা হয়, তাহাতে অনায়াসেই এই কুসংস্কার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইতে পারে; কিন্তু যিনি অনুসন্ধানকে সহায় করিয়া এই ভাষাকে মন্থন করেন, তাঁহার মুখ দিয়া এই বাক্য কদাচই নির্গত হইতে পারে না।

আমরা মহাকবি বাল্মীকি ও ব্যাসের সরল সুমধুর কবিতা সকল পাঠ করিয়া প্রীত হই; কবি-কেশরী কালিদাসের স্বভাবোক্তি-পরিপূর্ণ গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিয়া যার পর নাই আনন্দ অনুভব করি এবং ভবভূতির ভাব-গর্ভ প্রগাঢ় রচনা আমাদের কর্ণ-কুহরে মধুধারা বর্ষণ করিতে থাকে ইহা যথার্থ, মহর্ষি কপিলের দর্শন শাস্ত্র আমাদিগের চিত্ত মোহিত করিয়া থাকে ইহাও সত্য; কিন্তু এই সমস্ত ও অন্যান্য অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ কোন্ সময়ে কি উদ্দেশে প্রস্তুত হইয়াছিল এবং এই সমস্ত গ্রন্থ দ্বারা তৎকালে সমাজের কি পর্য্যন্ত উপকার সাধিত হয়, যখন ইহা জানিতে না পারিতেছি, তখন সিসিরো ও ইস্‌কাইলস-প্রণীত গ্রন্থের ন্যায় তৎসমুদায় আমাদিগকে সম্পূর্ণ আকর্ষণ করিতে পারে না। মনুষ্যের স্বভাবই এই যে, যদি কেহ ভূতপূর্ব্ব কোন মনুষ্যের মস্তক ভূ-গর্ভে পায় এবং ঐ মনুষ্য হইতে যদি মানবজাতির কিছু মাত্র উন্নতি হইয়া থাকে ইতিহাসে তাহার অণুমাত্র পরিচয় প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে ঐ মস্তককে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে দর্শন করে, কিন্তু যাঁহার যত্নে পৃথিবীর ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, ইতিহাসে যদি তাঁহার বিষয় কিছুমাত্র উল্লেখ না থাকে, তাহা হইলে তাঁহার সম্পূর্ণ অবয়ব প্রাপ্ত হইলেও তাহাতে কেহই তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না।

অন্যান্য জাতির যে সমস্ত ইতিবৃত্ত আছে, তৎসমুদায় প্রস্তুত হইবার কাল যেমন নিঃশংসয়ে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, বেদের সে রূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এই প্রকাণ্ড গ্রন্থ যে একটি আদিম ইতিহাস এবং ইহার চারি কল্পের যে একটি বাস্তবিক আনুপূর্ব্বিকতা আছে, তাহা সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ করাযাইতে পারে। এক্ষণে এই সমস্ত গ্রন্থকে যদি শ্রেণীবদ্ধ করা যায় এবং বেদ যে এক খানি আদিম ইতিহাস, তাহা যদি সপ্রমাণ করিতে পারি, তাহা হইলে ভারতবর্ষে প্রাচীন ইতিবৃত্তের অভাব আছে বলিয়া যে এক অমূলক কিম্বদন্তী আছে, তাহা উন্মূলিত হয়, সন্দেহ নাই।

বেদের পর যে সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে, যদিও তৎসমুদায়ের সৃষ্টি-কাল নির্দ্দিষ্ট নাই, তথাচ ঐ সকল গ্রন্থ যে এক দিনেই প্রস্তুত হইয়াছে, পূর্ব্বে যে, উহাদের কোন চিহ্নই ছিল না, বৈদিক প্রমাণানুসারে এ কথা কিছুতেই স্বীকার করা যাইতে পারে না। আমরা দেখিতেছি যে, সকল গ্রন্থই বেদকে অবলম্বন করিয়া প্রস্তুত হইয়াছে। মানব-ধর্ম্মশাস্ত্র যদিও আদি কালের কোন ঋষি দ্বারা প্রণীত হয় নাই, এই রূপ স্বীকার কর, তথাচ যাঁহাকে বহুকালাবধি ব্যবস্থাপকের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছিল, এই গ্রন্থ এমন এক ব্যক্তি যে প্রস্তুত করিয়াছেন, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। যে সময় সংস্কৃত ভাষার অসম্ভাবিত উন্নতি হইয়াছিল, শকুন্তলা ও বিক্রমোর্ব্বশী প্রভৃতি নাটক যদিও সে সময়ে প্রস্তুত হয় নাই, কিন্তু যে সময়ে সংস্কৃত ভাষার বিলক্ষণ চর্চ্চা হইতেছিল, সেই সময়ে যে প্রস্তুত হয়; তাহাতে আর কোন সংশয়ই থাকিতে পারে না। যাহাই হউক, যদিও এই সমস্ত গ্রন্থের প্রাচীনত্বে সংশয় উপস্থিত হইতে পারে কিন্তু যাহা পৃথিবীর পুরাবৃত্তের মধ্যে অগ্রগণ্য হইয়াছে, যাঁহারা পৃথিবীর পূর্ব্বতন মনুষ্যের উৎকর্ষ পরিজ্ঞানে উৎসুক হইয়াছেন, সর্ব্বাগ্রে যে গ্রন্থ তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করে, সেই বেদের প্রাচীনত্বে কাহারই সংশয় হইতে পারে না। কিন্তু যে গ্রন্থ জেন্দভেস্তা ও হোমর অপেক্ষা প্রাচীন, ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের সেই গ্রন্থ প্রায় তিন সহস্র বৎসর পরে সম্পূর্ণ কলেবরে যে প্রকাশিত হইয়াছে, ইহাও বিশ্বাস করা সুকঠিন। যাহা এত প্রাচীন, তাহা অবশ্যই ক্ষয়োন্মুখ হয়, কিন্তু সেই ক্ষয়োন্মুখ অবস্থা হইতে এই গ্রন্থকে রক্ষা করিয়া ইহার যে আকার খৃষ্টিয় শকের প্রায় ৮০০ শত বৎসর পূর্ব্বে ছিল, সম্পূর্ণ সেই আকারে যে ইহা মুদ্রিত হইয়াছে, ইহা বিশ্বাস করাও নিতান্ত সুকঠিন। হোমরের পূর্ব্বে লোকের কবিত্বের ভাব দৃষ্ট হয় না; কিন্তু যে বেদ লাইকরগসের সময়ে ছিল, তাহাতে কবিত্বের বিলক্ষণ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, সুতরাং যে সময়ে জড়োপাসনার পরিবর্ত্তে দেবদেবীর উপাসনা প্রবর্ত্তিত হয় নাই, হোমরের পূর্ব্ব সেই সময়ে যে এই রূপ কবিত্বের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা বিশ্বাস করাও সুকঠিন। যাহা হউক, যে গ্রন্থ বহুকালাবধি এই রূপ আশ্চর্য্য প্রকারে রক্ষিত হইয়াছে, তাহার বিষয় অনুসন্ধান করা আমাদের কর্ত্তব্য এবং পূর্ব্বতন মনুষ্যেরা ইহাতে যে রূপ আত্মমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহার সঙ্কলন করাও আমাদের কর্ত্তব্য।

বিজ্ঞান।

২৮০ সংখ্যক পত্রিকার ১৭৯ পৃষ্ঠার পর।

যে বায়ুমণ্ডল পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, ইহার সহিত জীবজন্তু ও উদ্ভিজ্জের একটি বিশেষ সম্বন্ধ আছে। যে শ্রেণী নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা জীবনী শক্তি অধিকার করিতেছে, তাহাদের ত কোন কথাই নাই, কিন্তু যে উদ্ভিজ্জ জীব-শ্রেণীর সমধর্ম্মী নহে, বায়ু তাহারও বিশেষ উপযোগী। নিশ্বাস প্রশ্বাস বহন-রূপ কার্য্য ব্যতিরেকে বায়ুর আরও কএকটি বিষয়ে সবিশেষ উপযোগিতা দৃষ্ট হইতেছে। আমরা যে শব্দ গ্রহণ করিতেছি, বায়ুই তাহার কারণ। আমরা যখন পরস্পর উপবিষ্ট হইয়া কথোপকথন করি, তখন বায়ু বার্ত্তা-হারকের ন্যায় পরস্পরের বাক্য পরস্পরের কর্ণে বহন করিয়া থাকে। আবার আমরা যে বাক্য প্রয়োগে সমর্থ হইতেছি, ইহাতেও বায়ুর সম্পূর্ণ সহকারিতা দৃষ্ট হয়। যদি বায়ু না থাকিত, তাহা হইলে আমাদিগের কর্ণ ও বাক্‌যন্ত্র থাকিলেও আমরা মূক ও বধির হইয়া থাকিতাম। বায়ুর আর একটি গুণ আছে। ইহা সূর্য্যের আলোক সর্ব্বত্র সঞ্চারিত করিয়া দিতেছে। যদি এই বায়ু না থাকিত, তাহা হইলে যে স্থলে সমসূত্রপাতে সূর্য্যের আলোক পতিত হইতেছে, সেই সমস্ত স্থানই প্রকাশিত হইত, তদ্ভিন্ন অন্যান্য স্থান ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন

হইয়া থাকিত। আমরা যে স্থান হইতে সূর্য্যকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিতাম, তথায় আলোক, আর যে স্থলে সূর্য্য অপ্রত্যক্ষ থাকিত, তথায় দুর্ভেদ্য অন্ধকার থাকিত। সুতরাং যে স্থলে দিবা তাহার একটু অন্তরে রাত্রির ভাব সহজেই দেখিতে পাইতাম। বায়ুর আর একটি শক্তি এই যে, ইহা আলোক ধারণ করিয়া রাখিতে পারে, এই নিমিত্ত সূর্য্য অস্তমিত ও অদৃশ্য হইলেও ক্ষণ কাল পৃথিবীতে আলোক লাভ করা যায়। এই বায়ুর গুণেই মেঘ উৎপন্ন হইয়া পৃথিবীর নানা প্রকার শুভ সংসাধিত হইয়া থাকে।

আমরা অন্তরীক্ষে দৃষ্টি পাত করিলে দেখিতে পাই যেন একখানি নীলবর্ণের চন্দ্রাতপ অবনীরূপ অতি বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গনে লম্বিত রহিয়াছে। ঐ নীলবর্ণটি বায়ুর, বায়ুর আধিক্যই ঐ রূপ বর্ণানুভবের কারণ। আমরা যে গৃহে বাস করিয়া থাকি, তাহাতে যে পরিমাণে বায়ু থাকিলে ঐরূপ বর্ণানুভব হয়, তাহা নাই, এই নিমিত্ত ঐ নীলিমা গৃহমধ্যে প্রত্যক্ষ হয় না। যিনি সমুদ্রযাত্রা করিয়াছেন, তিনি এই বিষয়টি সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন। সমুদ্র হইতে এক পাত্র-জল লইলে তাহার কোন বর্ণই প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু যে সলিলরাশি সুগভীর সাগরের বক্ষঃস্থলে পোষিত হইতেছে, তাহার বর্ণ অনায়াসেই প্রত্যক্ষ হয়। যদি নভোমণ্ডলে বায়ু না থাকিত, তাহা হইলে উহা নিবিড় অন্ধকারে নিরন্তর আচ্ছন্ন দৃষ্ট হইত।

এই বায়ু হইতে যে সমস্ত অত্যাশ্চর্য্য প্রাকৃতিক কার্য্য উৎপন্ন হইতেছে, তৎ সমুদায় উদ্ভিদ্-রাজ্য ও জীব-শ্রেণীর সম্পূর্ণ আবশ্যক। সূর্য্য ও পৃথিবী হইতে যে তেজ উৎপন্ন হয়, তাহা বায়ু কর্ত্তৃক রক্ষিত ও সর্ব্বত্র সংক্রামিত হইয়া থাকে। যদি বায়ু না থাকিত, তাহা হইলে পৃথিবীর কি শোচনীয় অবস্থাই ঘটিত। ইহার ঐকান্তিক অসদ্ভাবের কথা দূরে থাকুক, যদি ইহার পরিমাণ এক্ষণকার অপেক্ষা ন্যূন হইত, তাহা হইলেও পৃথিবীতে বৃক্ষ লতাদি কিছুই উৎপন্ন হইত না। ভূমির যত ঊর্দ্ধে উত্থিত হইবে, বায়ুর ঘনত্ব ততই অল্প অনুভূত হইতে থাকিবে। ইহা প্রত্যক্ষ হইয়াছে যে, ভূমি হইতে চতুর্দ্দশ সহস্র ফীট ঊর্দ্ধে জলের তরলতা থাকিতে পারে না। হিমালয় প্রভৃতি অত্যুচ্চ পর্ব্বতের শিখর দেশ যে নিরবচ্ছিন্ন তুষার-শিলায় আচ্ছন্ন থাকে, ইহাই তাহার কারণ। সুতরাং এই কারণ বশত সমুদ্র নদ নদী সমুদায়ই তুষারে আবৃত থাকিত, মনুষ্যের বাণিজ্য কার্য্যের সুবিধা হইত না এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতি পরস্পর নানা প্রকার সম্বন্ধ সূত্রে বদ্ধ হইয়া এই রূপ সামাজিক উন্নতি লাভ করিতে পারিত না। করুণাময় ঈশ্বর এই নিমিত্তই বায়ুকে এই সমস্ত অভাব মোচনের উপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাতে যে তাঁহারই শুভাভিপ্রায় দেদীপ্যমান রহিয়াছে, তাহার আর কোন সন্দেহই নাই।

দূরবীক্ষণ দ্বারা দৃষ্ট হইয়াছে যে, বুধ ও শুক্র গ্রহে নভোমণ্ডল উষা ও সন্ধ্যা-রাগে রমণীয় বেশ ধারণ করে এবং মঙ্গল গ্রহে মেঘের উদয় হয়। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ও সূর্য্যাস্তের পরেও আমরা কিয়ৎক্ষণ যে আলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকি তাহা বায়ুর আলোক রক্ষণ ও সংক্রমণ শক্তির ফল ভিন্ন যে আর কিছুই নহে, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং বুধ ও শুক্র গ্রহে বায়ু না থাকিলে কখনই ঐরূপ কার্য্য সম্ভব হইতে পারে না। জল সূর্য্যের উত্তাপ ও বায়ু দ্বারা বাষ্প রূপে পরিণত হয়, ঐ বাষ্প জল হইতে উৎপন্ন হইবামাত্র নিকটস্থ বায়ু অপেক্ষা ক্রমশ লঘু হইতে থাকে। উহা যত লঘু হয়, ততই ঊর্দ্ধে উঠে এবং পরিশেষে এমন এক স্থানে পৌছে, যথায় শীত ও তেজ দ্বারা উহা পুনরায় পূর্ব্বাকার প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তৎকালে উহার পরমাণু এত সূক্ষ্ম হয় যে, উহা মেঘাকারে উপরে ভাসমান থাকিতে পারে। সুতরাং মঙ্গল গ্রহে যখন মেঘ দৃষ্ট হইয়াছে, তখন উহাতে যে বায়ু বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা উল্লেখ করা পুনরুক্তি মাত্র।

যখন ঐ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বাষ্প শীত ও তাড়িত আকর্ষণে জল-বিন্দুর আকার প্রাপ্ত হয়, তখন বায়ু আর উহার ভার ধারণ করিতে পারে না, সুতরাং ঐ সকল জল-বিন্দু বৃষ্টির আকারে পৃথিবীতে নিপতিত হয়। যদি শীতাংশ অধিক হয়, তাহা হইলে ঐ সমস্ত সূক্ষ্ম বাষ্প তুষারের আকারে পরিণত হইয়া থাকে, আবার তাড়িত উত্তাপ দ্বারা উহা শিলা রূপে ভূতলে পতিত হয়।

এক্ষণে ইহাই নির্ণীত হইতেছে যে, যে সমস্ত পদার্থ পৃথিবীকে জীব জন্তুর বাসোপযোগী করিয়াছে, যদি ঐ সকল গ্রহে সেই সকল পদার্থের অভাব না থাকে, তাহা হইলে উহাতে জীবের বাস নাই, এ কথা কে স্বীকার করিতে পারে? এমন কি আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিতেছি, উহাতে যে সমস্ত জীব জন্তু আছে, তাহারা আমাদিগেরই ন্যায় দৈহিক ও সামাজিক উন্নতি অনেকাংশে লাভ করিতেছে। জগদীশ্বর উহাতে উন্নতির যে সমস্ত উপাদান প্রদান করিয়াছেন, তাহা কদাচই ব্যর্থ হইবার নহে।

অমিত্রাশ্চ ন সন্তোষাং যে চামিত্রা ন কস্যচিৎ।
য এবং কুর্ব্বতে মর্ত্ত্যাঃ সুখং জীবন্তি সর্ব্বদা॥

গণেশ পুরাণ ও বৌদ্ধধর্ম্ম।

পূর্ব্ব কালে এই ভারতবর্ষে হিন্দু জাতির মধ্যে যত প্রকার ধর্ম্ম জন-সমাজ অধিকার করিয়াছিল, তৎসমুদায়ই বেদ-মূলক। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম বেদোক্ত ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিপরীত। এই নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরা ইহাকে অতি কঠোর দৃষ্টিতে দর্শন করিতেন। বৌদ্ধেরাও আপনাদিগের ধর্ম্মই সার ধর্ম্ম বিবেচনা করিয়া তৎকাল-প্রচলিত বেদোক্ত ধর্ম্মে বিদ্বেষ প্রদর্শন করিত। এই কারণে বৌদ্ধদিগের সহিত বেদোক্ত ধর্ম্মাবলম্বীদিগের ঘোরতর বিবাদ হয়। ঐ সময় উভয় পক্ষই আপনাদিগের মত সমর্থন করিবার নিমিত্ত বহুল গ্রন্থ প্রচার করেন। যাহাতে এই ধর্ম্মের-বৃত্তান্ত প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা দর্শন শাস্ত্র। দর্শন শাস্ত্রের পর কতকগুলি পুরাণ প্রস্তুত হইয়াছিল। আমরা সেই সমস্ত পুরাণের মধ্যে গণেশ পুরাণ পাঠ করিয়া দেখিলাম যে, গ্রন্থকর্ত্তা গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মকে অনুস্যূত করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে এই বিষয়টি সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করাইবার নিমিত্ত গণেশ পুরাণের উপাখ্যান-ভাগ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

গণেশ পুরাণ অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত নহে। ইহা একখানি উপপুরাণ। এই পুরাণ দুই কাণ্ডে বিভক্ত। ইহার উভয় কাণ্ডেই গণেশের উপাসনা প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে। এই পুরাণে গণপতি বেদান্ত-প্রতিপাদিত ব্রহ্মের ন্যায় বর্ণিত হইয়াছেন। ইহাতে কোন স্থলে ধ্যান ও কোন স্থলে প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ প্রভৃতি কাল্পনিক পূজা-পদ্ধতি দ্বারা তাঁহার উপাসনা বিহিত হইয়াছে।

এই পুরাণে প্রসঙ্গত গৃৎসমদের উপাখ্যান উত্থিত হইয়াছে। গৃৎসমদ বিদর্ভ-

দেশের * রাজা ভীমের পৌত্র। এই রূপ বর্ণিত আছে যে, এই রাজা পুত্রের অভাবে বংশ রক্ষা হইল না দেখিয়া সংসারে বিরক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক অরণ্যে প্রস্থান করেন। তথায় মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁহারই আদেশানুসারে দেব-প্রধান গণেশের আরাধনা করেন। অনন্তর এই দেবতার প্রসাদে মহারাজ ভীমের রুক্মাঙ্গ নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। একদা ঐ পুত্র মৃগয়ায় গমন পূর্ব্বক মৃগের অনুসরণ-ক্রমে গন্তব্য পথ বিস্মৃত হইয়া এক মহর্ষির পর্ণশালায় উপনীত হন। ঋষি-পত্নী তাঁহার রূপে মোহিত হইয়া তাঁহার নিকট আপনার কোন অসৎ অভিসন্ধি প্রকাশ করেন; কিন্তু রাজকুমার তাহাতে সম্মত না হওয়াতে তিনি তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন। একদা দেবরাজ ইন্দ্র ভীমতনয় রুক্মাঙ্গের বেশ ধারণ পূর্ব্বক ঐ মহর্ষির পর্ণ-কুটীরে উপস্থিত হন। এই ছদ্মবেশী ইন্দ্র হইতেই গৃৎসমদের উৎপত্তি হয়। কিন্তু অনেকে কহেন যে ভীমতনয় রুক্মাঙ্গই তাঁহার জন্ম-দাতা।

একদা গৃৎসমদ মগধ দেশে কোন যজ্ঞোপলক্ষে গমন করেন। তথায় অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে জারজ বলিয়া বিলক্ষণ অবমাননা করিয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক এই রূপ অপমানিত হইয়া তাঁহাদিগের সংসর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কএকটি মুনির সহিত নিরন্তর পরমাত্মস্বরূপ গণেশের ধ্যান ধারণায় কালাতিপাত করিতেন। এই রূপে কিছুকাল অতীত হইলে গণেশ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন এবং তাঁহার প্রার্থনানুসারে তাঁহাকে সকল ব্রাহ্মণের মধ্যে প্রাধান্য, ব্রহ্ম-জ্ঞান ও পুষ্পক বন প্রদান করেন।

* এক্ষণে ইহা বেরার নামে প্রসিদ্ধ।

এক দিন গৃৎসমদ পুষ্পক বনে ধ্যান করিতেছিলেন, ইত্যবসরে যদৃচ্ছাক্রমে নেত্র উন্মালন করিয়া দেখিলেন যে, একটি বালক তাঁহার নিকট আগমন করিতেছে। পরে সেই বালক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিল, তপোধন! দেবতা আমাকে আপনার নিকট সমর্পন করিলেন, এক্ষণে আপনি আমার রক্ষক হউন। গৃৎসমদ বালকের এই বাক্যে সম্মত হইয়া তাঁহাকে সুতনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করত গণেশোপাসনার নিমিত্ত ধ্যানের শিক্ষা দিয়াছিলেন। ঐ বালকও গুরূপদিষ্ট ধ্যানে মনোনিবেশ পূর্ব্বক অল্পকাল মধ্যে গণেশকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার নিকট ত্রিভুবন পরাজয় করিবার বর প্রার্থনা করে। গণেশ তাহার ইচ্ছানুরূপ বর প্রদান করিয়া কহিয়াছিলেন, বৎস! শিবের অস্ত্র ব্যতিরেকে আর কিছুতেই তোমার মৃত্যু হইবে না। আমার বর-প্রভাবে তোমার লৌহ, রজত ও সুবর্ণময় তিনটি পুরী হইবে এবং তুমি দেহান্তে পরমাত্মায় লীন হইয়া যাইবে।

এই বালকটি ত্রিপুরাসুর। এই অসুর বরলাভে উদ্দৃপ্ত হইয়া অবিলম্বে ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণকে পরাভূত করিয়াছিল। দেবতারাও তাহার ভয়ে হিমালয়ের এক গহ্বরে পলায়ন করিয়াছিলেন। অনন্তর ঐ দুর্বৃত্ত অসুর যজ্ঞাদি সমস্ত বিলুপ্ত করিয়া ব্রহ্মলোক ও বিষ্ণুলোক অধিকার করিয়াছিল। পরিশেষে কৈলাস পর্ব্বতে মহাদেবের নিকট গমন করিয়া তাঁহার সম্মতি ক্রমে উহাও অধিকার করে। এই অবসরে মহর্ষি নারদ ঋষি ও দেবগণের নিকট গমন করিয়া কহিয়াছিলেন, এই ত্রিপুরাসুর ধ্যান-বলে গণেশকে প্রসন্ন করিয়া এই রূপ প্রভুত্ব লাভ করিয়াছে, অতএব তোমরা যদি অসুর-নির্দ্দিষ্ট উপাসনা-প্রণালী অবলম্বন কর, তাহা হইলে গণেশ তোমাদিগের উপরও প্রসন্ন হইবেন। অনন্তর দেবতা ও অন্যান্য ঋষিগণ নারদের এই বাক্যে সম্মত হইয়া ধ্যান-বলে অবিলম্বে গণেশকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। গণেশও তাঁহাদিগের দুর্দ্দশা দূর করিবার নিমিত্ত প্রতিশ্রুত হইয়া এক ব্রাহ্মণের বেশে ত্রিপুরেশ্বরের নিকট গমন পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, অসুর-রাজ! তুমি যদি অনুমতি কর, তাহা হইলে আমি তোমার নিমিত্ত লৌহ, রজত ও সুবর্ণময় তিন পুরী প্রস্তুত করিয়া দিই। পরে তিনি ত্রিপুরেশ্বরের আদেশ ক্রমে ঐ তিন পুরী প্রস্তুত করিলে, অসুর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পুরস্কার প্রদানের ইচ্ছা করিয়াছিল। তখন গণেশ কহিয়াছিলেন, কৈলাসে যে চিন্তামণি নামক গণেশের প্রতিমূর্ত্তি আছে, তাহাই আমার এই পরিশ্রমের প্রকৃত পুরস্কার। অতএব তুমি আমাকে তাহাই আনয়ন করিয়া দেও। তখন অসুরেশ্বর মহাদেবের নিকট এই বলিয়া এক দূত পাঠাইয়াছিল যে, যদি তুমি স্বেচ্ছাক্রমে আমাকে চিন্তামণি প্রদান কর, ভালই, নতুবা আমি বল পূর্ব্বক তাহা লইয়া আসিব। মহাদেব এই বাক্য শ্রবণে কুপিত হইয়া ঐ অসুরের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। পরিশেষে তিনি তাহার বল-বিক্রমে পরাভূত হইয়া হিমালয়ের গুহা-মধ্যে পলায়ন করেন। তখন ত্রিপুরাসুর জয়লাভে দর্পিত হইয়া চিন্তামণির মন্দির ভগ্ন করিয়া ঐ দেবতাকে উত্তোলন পূর্ব্বক আনয়ন করিয়া ছিল। এদিকে নারদ মহাদেবকে অসুরের নিকট পরাভূত ও যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ দেখিয়া তাঁহার নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে জয় লাভার্থ গণেশের উপাসনা করিতে উপদেশ দেন। মহাদেবও গণেশের আরাধনা করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করেন। পরে তিনি পুনরায় দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া ঐ অসুরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ত্রিপুরাসুরও আপনার সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে তাঁহার সহিত তুমুল সংগ্রাম করে। পরিশেষে সে মহাদেবের ভুজ-বলে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া পরমাত্মায় লীন হইয়া যায়।

এই উপাখ্যানে রূপক ছলে বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতি ও অবনতি উভয়ই বর্ণিত হইয়াছে। ত্রিপুরেশ্বর নূতন উপাসনা-প্রণালী অবলম্বন করিয়া যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি কাল্পনিক অনুষ্ঠান সকল উচ্ছিন্ন করিয়াছিল। এই পুরাণের চত্বারিংশ অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ত্রিপুরাসুর সমুদায় দেবগণ ও ঋষিদিগকে পরাজয় করত যজ্ঞকুণ্ড, পুণ্য-ক্ষেত্র, দেবালয়, ধার্ম্মিকদিগের আশ্রয়-স্থান ছিন্ন ভিন্ন ও উৎসন্ন করে। তাহার ভয়ে স্বাহা, স্বধা ও বষট্‌কার পৃথিবী হইতে তিরোহিত হইয়া যায় এবং বেদের আলোচনা রহিত হয়। আমরা যখন মহাবংশে অশোক রাজার জীবন-চরিত পাঠ করি, তখন দেখিতে পাই যে, তিনি যখন বেদোক্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৌদ্ধধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন তাঁহা হইতে এই রূপ কতক গুলি অত্যাচার সংঘটিত হইয়াছিল। সুতরাং বৌদ্ধেরা যে রূপে পৌত্তলিকদিগের ক্রিয়া কলাপ উচ্ছিন্ন করে, অসুর-কৃত এই কার্য্যের সহিত তাহার বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। ইহা দ্বারা এই রূপ প্রতিপাদিত হইতেছে যে, গৃৎসমদ কালসহকারে বৈদিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বুদ্ধের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন, এবং বেদের মধ্যে স্বহস্তে যে সমস্ত দেবতার স্তুতিবাদ রচনা করেন, তাঁহাদিগের প্রতি আর তাঁহার কিছু মাত্র ভক্তি ছিল না। কারণ ত্রিপুরাসুর তাঁহারই শিষ্য। ত্রিপুরা-

সুর দেবতাদিগের প্রতি যে রূপ অত্যাচার করে, তাহা তাঁহারই শিক্ষিত, সন্দেহ নাই।

দেবতা দিগের উদ্দেশে যাগ যজ্ঞ ও তাঁহাদিগের স্তুতি গান বেদোক্ত ধর্ম্মে উপাসনার উৎকৃষ্ট প্রণালী বলিয়া প্রথিত আছে। কিন্তু গৃৎসমদ ও ত্রিপুরাসুর ধ্যানই প্রকৃত উপাসনা বলিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিতেন। যখন গৃৎসমদ মগধ দেশে মুনিগণ কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া তাঁহাদিগের সংসর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক নিভৃত স্থানে বাস করিয়াছিলেন, তখন তিনি ধ্যান দ্বারাই গণেশকে প্রসন্ন করেন এবং ত্রিপুরাসুরও তাঁহার শিষ্য হইয়া উপাসনার ঐ রূপ প্রণালী অবলম্বন করে। বৈদিক উপাসনা প্রার্থনা-প্রধান ছিল। বেদ অনুসন্ধান করিলে তাহার প্রচুর নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার পূর্ব্বে ধ্যানের প্রথা কিছুমাত্র প্রচলিত ছিল না। বৌদ্ধেরাই উহা প্রচলিত করিয়া যায়। গৃৎসমদ ও ত্রিপুরাসুরের এই উপাসনা প্রণালী দেবতারা কিছুই জানিতেন না, নারদ গিয়া তাঁহাদিগকে ইহার বিষয় অবগত করেন, এবং ইহা তাঁহাদিগের মধ্যেও প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের বিষয় সম্পূর্ণ উল্লেখ করা হইয়াছে।

বৌদ্ধেরা নির্ব্বাণকে মুক্তি বলিয়া থাকে। বৈদান্তিক মুক্তি ও নির্বাণ প্রায় একই প্রকার। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্বে এই রূপ মুক্তির ভাব লোকের মনে উদিত হয় নাই। লোকান্তরে বৈষয়িক সুখই সাধারণের প্রার্থনীয় ছিল। কেহ সূর্য্যলোকে কেহ বা চন্দ্রলোকে গমন করিয়া নানাপ্রকার সুখ ভোগ করিবে, দেবগণের নিকট এই রূপই প্রার্থনা করিত। কিন্তু ত্রিপুরেশ্বর মহাদেবের হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়া ব্রহ্মে লীন হইয়া গেল, এই বাক্য দ্বারা বৌদ্ধমতে মুক্তির যে আভাস দেওয়া হইয়াছে, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।

গৃৎসমদের স্ত্রীপুত্রাদি কিছুই ছিল না। তিনি ঐ বালকটিকে দত্তক পুত্র রূপে প্রতিগ্রহ করিয়া ছিলেন। ইহাও বৌদ্ধ সন্ন্যাসী দিগের একটি চিহ্ন। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা বিবাহাদি কিছুই করেন না এবং একটি দত্তক পুত্র প্রতিগ্রহ করিয়া তাহাকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া থাকেন।

এই সমস্ত দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, গ্রন্থকার কৌশলে বৌদ্ধ ধর্ম্মের মত এবং উন্নতি ও অবনতি স্বপ্রণীত গ্রন্থের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছেন, এবং বেদের সূক্তকার গৃৎসমদ যে বৈদিক ধর্ম্মের বন্ধনমুক্ত হইয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহাও বিলক্ষণ প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়স্থ বিক্রেয় পুস্তকের মধ্যে যে সকল পুস্তক ব্রাহ্মসমাজের নিজ সম্পত্তি, তৎসমুদায় আগামী ১১ মাঘ বুধবার সাম্বৎসরিক উৎসবের দিবস অর্দ্ধ মূল্যে বিক্রীত হইবে, যাঁহার সুলভ মূল্যে পুস্তক লইবার ইচ্ছা হয়, তিনি মূল্য পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

পৌত্তলিক প্রবোধ পুস্তক পুনর্ম্মুদ্রিত হইয়া এই সমাজে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য ।০ আনা।

বিজ্ঞাপন।

বহরমপুর ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ২২ মাঘ রবিবার প্রাতঃকালে ৭॥০ টার সময় এবং অপরাহ্ণ ৭॥০ টার সময় বহরমপুরে সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ৬ ফাল্গুন রবিবার সন্ধ্যাকালে বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের অষ্টম সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাসুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১২২৩। কলিগতাব্দ ৪২৩৭। ৬ মাঘ শুক্র বার।

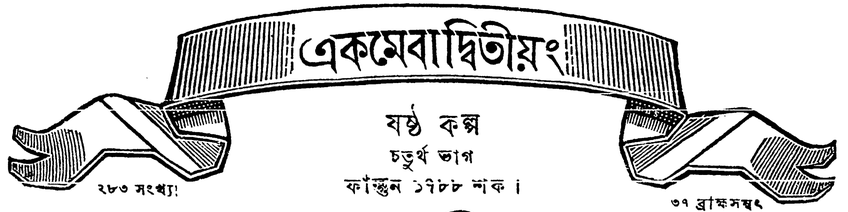

ষষ্ঠ কল্প
চতুর্থ ভাগ
ফাল্গুন ১৭৮৮ শক।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদ সংহিতা

প্রথমমণ্ডলস্য চতুর্দ্দশানুবাকে প্রথমং সূক্তং।

গোতমঋষিঃ জগতীচ্ছন্দঃ মরুতোদেবতা।

১০০১

৭। তেঽবর্ধন্ত স্বতবসো মহিত্বনা নাকং তস্থুরুরু চক্রিরে সদঃ। বিষ্ণুর্যদ্ধাবদ্বৃষণং মদচ্যুতং বয়ো ন সীদন্নধি বর্হিষি প্রিয়ে।

৭। 'তে' মরুতঃ 'অবর্ধন্ত' বৃদ্ধিং গতাঃ। কীদৃশাঃ 'স্বতবসঃ' স্বাশ্রয়বলাঃ নান্যস্য কস্যচিদ্বলমপেক্ষন্তে। বৃদ্ধিং প্রাপ্য চ 'মহিত্বনা' মহিম্না মরুত্ত্বেন 'নাকং' স্বর্গং 'আ তস্থুঃ' আস্থিতবন্তঃ। 'সদঃ' সদনং নভোলক্ষণং স্থানঞ্চ স্বকীয়নিবাসায় 'উরু' বিস্তীর্ণং 'চক্রিরে' যৎ যেভ্যোমরুদ্ভ্যঃ যদর্থং 'বৃষণং' কামাভিবর্ষকং 'মদচ্যুতং' মদস্য হর্ষস্যাসেক্তারং যজ্ঞং 'বিষ্ণুঃ হাবৎ' বিষ্ণুরেবাগত্য রক্ষতি। তে মরুতঃ 'বয়ঃ ন' পক্ষিণো যথা শীঘ্রমাগচ্ছন্তি এবং শীঘ্রমাগত্য 'বর্হিষি অধি' অস্মদীয়ে যজ্ঞে 'প্রিয়ে' প্রীতিকরে 'সীদন্' সীদন্তু উপবিশন্তু তে অবর্ধন্ত।

৭। বিষ্ণু যাঁহাদিগের নিমিত্ত কামপ্রদ হর্ষজনক যজ্ঞকে রক্ষা করেন, যাঁহারা অন্যের বল অপেক্ষা করেন না, সেই মরুদ্গণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া মহিমা-প্রভাবে স্বর্গে অবস্থান ও আকাসরূপ বাসস্থানকে বিস্তার করিয়াছেন। তাঁহারা পক্ষীর ন্যায় শীঘ্র আসিয়া এই প্রীতিকর যজ্ঞে উপবেশন করুন।

১০০২

৮। শূরা ইবেদ্যুযুধয়ো ন জগ্ময়ঃ শ্রবস্যবো ন পৃতনাসু যেতিরে। ভয়ন্তে বিশ্বা ভুবনা মরুদ্ভ্যো রাজান ইব ত্বেষসন্দৃশো নরঃ।

৮। 'ইৎ' ইত্যেতৎ সমুচ্চয়ে। 'শূরাঃ ইব ইৎ' শৌর্য্যোপেতাঃ যুযুৎসবঃ পুরুষা ইব চ 'যুযুধয়ঃ' 'ন' শত্রুভির্যুধ্যমানাঃ পুরুষাইব চ 'জগ্ময়ঃ' শীঘ্রং গচ্ছন্তো মরুতঃ 'শ্রবস্যবঃ ন' শ্রবসমন্নমাত্মন ইচ্ছন্তঃ পুরুষাইব 'পৃতনাসু' সংগ্রামেষু 'যেতিরে' প্রযতন্তে বৃত্রাদিভির্যুদ্ধে ব্যাপ্রিয়ন্তে। তাদৃশেভ্যঃ 'মরুদ্ভ্যঃ' 'বিশ্বা ভুবনা' সর্ব্বাণি ভূতজাতানি 'ভয়ন্তে' বিভ্যতি। যে 'নরঃ' বৃষ্ট্যাদে নেতারঃ মরুতঃ 'রাজান ইব' রাজমানা নৃপতয ইব 'ত্বেষসন্দৃশঃ' দীপ্তসন্দর্শনাঃ উগ্ররূপতয়া দ্রষ্টুমশক্যা ভবন্তি তেভ্য ইত্যর্থঃ।

৮। শৌর্য্যশালী, যুদ্ধোদ্যত পুরুষের ন্যায় শীঘ্রগামী মরুৎগণ অন্নার্থী পুরুষের ন্যায় যুদ্ধ করিয়া থাকেন, বৃষ্টি প্রভৃতি আনয়ন করেন, রাজাদিগের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য হন এবং সমস্ত ভুবন তাঁহাদিগকে ভয় করে।

১০০৩

৯। ত্বষ্টা যদ্বজ্রং সুকৃতং হিরণ্যয়ং সহস্রভৃষ্টিং স্বপা অবর্তয়ৎ। ধত্ত ইন্দ্রো নর্য্যপাংসি কর্ত্তবেঽহন্বৃত্রং নিরপাংৌজদর্ণবং।

৯। 'স্বপাঃ' শোভনকর্ম্মা 'ত্বষ্টা' বিশ্বনির্ম্মাতা 'যদ্বজ্রং' 'অবর্তয়ৎ' ইন্দ্রং প্রত্যগময়ৎ দত্তবানিত্যর্থঃ কীদৃশং 'সুকৃতং' সম্যক্ নিষ্পাদিতং 'হিরণ্যয়ং' সুবর্ণময়ং 'সহস্রভৃষ্টিং' অনেকাভির্ধারাভির্যুক্তং তদ্বজ্রং 'ইন্দ্রঃ' 'ধত্তে' ধারয়তি। কিমর্থং 'নরি' অত্র মূসস্বস্কাং মূশব্দেন সংগ্রামোঽভিধীয়তে। সংগ্রামে 'অপাংসি' শত্রুহননাদি লক্ষণানি কর্ম্মাণি 'কর্ত্তবে' কর্ত্তুং এবং বজ্রং ধৃত্বা তেন বজ্রেণ 'বৃত্রং' বৃষ্ট্যুদকস্যাবরকং 'অর্ণবং' অর্ণসা উদকেন যুক্তং মেঘম্ 'অহন্' অবধীৎ অপাং তেন নিরুদ্ধা অপশ্চ সঃ 'নিরৌজং' নিঃশেষেণাধোমুখমপাতয়ৎ প্রবৃষ্টা অকরোদিত্যর্থঃ।

৯। কর্ম্মকুশল বিশ্বকর্ম্মা যে সুজাত সুবর্ণময় সহস্র-ধার বজ্র ইন্দ্রকে দেন, ইন্দ্র তাহা সংগ্রামে শত্রু নাশের নিমিত্ত ধারণ করেন। তিনি তদ্দ্বারা বৃত্রকে নিহত ও জলপূর্ণ মেঘ সকলকে নিঃশেষে অধঃ পতিত করেন।

১০০৪

১০। ঊর্দ্ধং নুনুদ্রেঽবতং তওজসা দাদৃহাণং চিদ্বিভিদুর্বি পর্ব্বতং। ধর্মন্তো বাণং মরুতঃ সুদানবো মদে সোমস্য রণ্যানি চক্রিরে।

১০। অত্রেয়মাখ্যায়িকা। গোতম ঋষিঃ পিপাসয়া পীড়িতঃ সন্ মরুত উদকং যযাচে। তদনন্তরং মরুতোঽদূরস্থং কূপ মুদ্ধৃত্য যত্র স গোতম ঋষি স্তিষ্ঠতি তাং দিশং নীত্বা ঋষিসমীপে কূপমবস্থাপ্য তৎপার্শ্বে আহাবং চ কৃত্বা তস্মিন্নাহাবে কূপ মুৎসিচ্য তমৃষিং তেনোদকেন তর্পয়াঞ্চক্রুঃ। অয়মর্থ অনযোক্তয়াচ প্রতিপাদ্যতে। 'তে' মরুতঃ 'অবতং' অবস্তাৎ তলোভবতীত্যবতঃ কূপঃ। কূপনামস্বচাবতোঽবট ইতি পঠিতং। তং 'ঊর্দ্ধং' উপরি যথা ভবতি তথা 'ওজসা' স্বকীয়েন বলেন 'নুনুদ্রে' প্রেরিতবন্তঃ উৎখাতবন্ত ইত্যর্থঃ। এবং কূপমুৎখায় ঋষেরাশ্রমং প্রতি নযন্তোমরুতো মার্গ মধ্যে 'দাদৃহাণং' প্রবৃদ্ধং গতিনিরোধকং 'পর্ব্বতঞ্চিৎ' পর্ব্বন্তং শিলোচ্চযমপি 'বিবিভিদুঃ' বিশেষেণ বভঞ্জুঃ। 'সুদানবঃ' শোভনদানা তে মরুতঃ 'বাণং' শতসংখ্যাভিস্তন্ত্রীভির্যুক্তং বীণাবিশেষং 'ধমন্তঃ' বাদযন্তঃ 'সোমস্য মদে' সোমপানেন হর্ষে সতি 'রণ্যানি' স্তুত্যানি রমণীযানি ধনানি 'চক্রিরে' স্তোতৃভ্যঃ কুর্ব্বন্তি।

১০। দান শীল মরুদ্গণ স্বীয় তেজে কূপকে ঊর্দ্ধে উদ্ধৃত করিয়াছেন, গতিরোধক পর্ব্বতকে নিঃশেষে ভেদ করিয়াছেন এবং সোমপানে হৃষ্ট হইয়া শততন্ত্রী বীণা বাদ্য করিতে করিতে স্তোতৃগণকে রমণীয় ধন দান করেন।

১০০৫

১১। জিহ্মং নুনুদ্রেঽবতং তযা দিশাসিঞ্চন্নুৎসং গোতমায তৃষ্ণজে। আ গচ্ছন্তীমবসা চিত্রভানবঃ কামং বিপ্রস্য তপযন্ত ধামভিঃ।

১১। মরুতঃ 'অবতং' উদ্ধৃতং কূপং যস্যাং দিশি ঋষির্ব্বর্ত্ততি 'তযা দিশা' 'জিহ্মং' বক্রং তির্য্যঞ্চং 'নুনুদ্রে' প্রেরিতবন্তঃ। এবং কূপং নীত্বা ঋষ্যাশ্রমে অবস্থাপ্য 'তৃষ্ণজে' তৃষিতায গোতমায ঋষযে তদর্থং 'উৎসং' জলপ্রবাহং কূপাৎ উদ্ধৃত্য 'অসিঞ্চন্' আহাবে অবানযন্। এবং কৃত্বা 'ইমং' এনং স্তোতারং ঋষিং 'চিত্রভানবঃ' বিচিত্র দীপ্তযঃ তে মরুতঃ 'অবসা' ঈদৃশেন রক্ষণেন সহ আগচ্ছন্তি তৎসমীপং প্রাপ্নুবন্তি। প্রাপ্য চ 'বিপ্রস্য' মেধাবিনঃ গোতমস্য 'কামং' অভিলাষং 'ধামভিঃ' আযুর্যোধারূপৈঃ উদকৈঃ 'তর্পযন্ত' অতর্পযন্।

১১। মহর্ষি গোতম তৃষিত হইয়া যে দিকে অবস্থান করিতে ছিলেন, মরুদ্গণ সেই উৎখাত কূপকে সেই দিক্ দিয়া বক্র ভাবে প্রেরণ করিলেন, এবং তাঁহার নিমিত্ত জলপ্রবাহ সেচন করিলেন। বিচিত্রদীপ্তি মরুদ্গণ এই রূপে সেই বিপ্রের নিকট আগমন করিয়া প্রীণদ জল দ্বারা তাঁহার পিপাসা শান্তি করিয়াছিলেন।

১০০৬

ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ।

১২। যাবঃ শর্ম্ম শশমানায সন্তি ত্রিধাতূনি দাশুষে যচ্ছতাধি। অস্মভ্যং তানি মরুতো বি যন্ত রযিং নো ধত্ত বৃষণঃ সুবীরং। ১। ৬। ১০।

১২। হে 'মরুতঃ' 'বঃ' যুষ্মাকং সম্বন্ধীনি 'যা' যানি 'শর্ম্ম' শর্ম্মাণি সুখানি গৃহানি বা কীদৃশানি 'ত্রিধাতূনি' পৃথিব্যাদিষু ত্রিষু স্থানেষু অবস্থিতানি 'শশমানায' যুষ্মান্ স্তুতিভিঃ ভজমানায দাতুং সম্পাদিতানি পূর্ব্বোক্তলক্ষণানি শর্ম্মাণি যানি সন্তি যানি চ 'দাশুষে' হবির্দ্দত্তবতে যজমানায 'অধিযচ্ছত অধিকং প্রযচ্ছথ হে মরুতঃ 'তানি' সর্ব্বাণি শর্ম্মাণি 'অস্মভ্যং' 'বিযন্ত' বিশেষেণ প্রযছত। কিঞ্চ হে 'বৃষণঃ' কামানাং বর্ষিতারঃ মরুতঃ 'নঃ' অস্মভ্যং 'সুবীরং' শোভনৈর্বীরৈঃ পুত্রাদিভির্যুক্তং রযিং ধনং 'ধত্ত' দত্ত। ১। ৬। ১০।

১২। হে মরুৎগণ! ভুবন ত্রয়ে তোমাদিগের যে সকল সুখ ভক্তজনের নিমিত্ত সঞ্চিত আছে, যাহা যজমানকে অধিক রূপে দান করিয়া থাক, তাহা আমাদিগকে বিশেষরূপে দান কর এবং হে কামপ্রদ মরুদ্গণ! আমাদিগকে বীর পুত্র প্রভৃতি ধনসম্পত্তি বিতরণ কর। ১। ৬। ১০।

সপ্তত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১৭৮৮ শক ১১ মাঘ।

প্রাতঃকাল।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ বেদিতে উপবেশন করিয়া স্বাধ্যায়ান্ত উপাসনা সমাপ্ত এবং শ্রীযুক্ত বেচরাম চট্টোপাধ্যায় ভক্তি পূর্ব্বক একটি সুললিত প্রার্থনা করিলে সঙ্গীতান্তে সভাভঙ্গ হইল।

সায়ংকাল।

শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বেদিতে উপবেশন করিলে শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন—

প্রতি বর্ষেই এগারই মাঘ উপস্থিত হয়, প্রতি বর্ষেই এই মধুময় মহোৎসব আমারদিগকে আকর্ষণ করে এবং প্রতি বর্ষেই আমরা একত্র সমাগত হইয়া ইহার আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকি। এই এগারই মাঘ সাধারণের নিকট সম ভাবেই উদয় হইয়া থাকে; কিন্তু কেবল ব্রাহ্মেরাই এই সময়ে অপার আনন্দ লাভ করেন—কিসের জন্য? আমারদিগের সহিত ব্রাহ্ম সমাজের ও ব্রাহ্মসমাজের সহিত এগারই মাঘের যে মধুময় সম্বন্ধ আছে, তাহারই গুণে এগারই মাঘ আমাদের নিকট মধুর ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। এগারই মাঘ শূন্য পদার্থ, কিন্তু পরিপূর্ণ আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বর ব্রাহ্মসমাজকে যে মাধুর্য্যরসে পরিপূর্ণ করিয়াছেন, তাহা এই এগারই মাঘেও বিলক্ষণ সংক্রামিত হইয়াছে।

তিমিরাচ্ছন্ন আকাশে প্রথম সূর্য্যোদয়ের ন্যায় এই অন্ধকারিত দেশে যে দিন এই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল, সেই দিন—সেই প্রথম এগারই মাঘ কি শুভ ক্ষণে প্রভাত হইয়াছিল? কে জানিত যে সেই দিনই আমাদের চির স্মরণীয় হইয়া থাকিবে? কিন্তু বস্তুত সে দিন আর নাই, সাঁইত্রিশ বৎসর হইল, সে দিন অতীত হইয়া গিয়াছে—আজি আমরা অষ্টত্রিংশ এগারই মাঘে উপস্থিত হইয়া নবতর কল্যাণতর আনন্দরসে আপূরিত হইতেছি। আবার খানিক পরে এ দিনও অবসন্ন হইবে। এই আলোক নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে। এই নব পল্লব ও পুষ্পমালা শুষ্ক হইয়া পড়িবে। যাঁহারা উৎসবার্থী বা দর্শনার্থী হইয়া এই উৎসবভূমি অলঙ্কৃত করিয়াছেন, তাঁহারাও বিচ্ছিন্ন হইয়া কে কোথায় চলিয়া যাইবেন।

কিন্তু ভয় হয়, আজি সেই আনন্দময়ের আনন্দ যে পরিমাণে লাভ করিতে পারি-

য়াছি, মহোৎসবের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাহাতেও কি বঞ্চিত হইতে হইবে! আজি তাঁহার প্রেম জ্যোতি হৃদয়মুকুরে যে প্রকার প্রতিফলিত হইয়াছে, এই আলোকের সঙ্গে সঙ্গে তাহাও কি নির্ব্বাণ হইতে থাকিবে! আজি সেই অতীন্দ্রিয় স্নিগ্ধ মূর্ত্তি যে প্রকার প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাও কি আবার তিরোহিত হইবে! আজি আশা কামনা, শ্রদ্ধা ভক্তি, অনুরাগ প্রীতি যে প্রকার চরিতার্থ হইতেছে, তাহা কি আর হইবে না!

হা! চিত্তের চঞ্চলতা স্মরণ হইলে সমুদায় শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। আজি যার জন্য অনুতাপের অগ্নি জ্বালিয়া হৃদয় দগ্ধ হইতে যায়, কালি আবার প্রগাঢ় অনুরাগের সহিত তাহাতেই প্রবৃত্ত হয়। যে এক বার সন্ন্যাসী হইয়া—সর্ব্বত্যাগী হইয়া প্রাণস্বরূপ ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করে, সেই আবার চির-জীবন-সম্বল ধর্ম্ম-রত্ন সুদূরে নিক্ষিপ্ত করিয়া পাপময় হ্রদে অবগাহন করিয়া থাকে। আমারদের অদূরদর্শী মোহময় আত্মা পৃথিবীর মলিন পদার্থেই আসক্ত হইতে চায়, ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করে না, পরিণাম ভাবিয়া দেখে না, অমৃত বোধে বিষ পান করে।

এই দুরবস্থ আত্মাকে উদ্ধার করিবার নিমিত্তই ব্রাহ্মধর্ম্ম আবির্ভূত হইয়াছেন এবং সময়ে সময়ে এই মহোৎসবকে আনয়ন করিয়া তাহাতে নূতন জীবন সঞ্চারিত করিতেছেন। এই উৎসব কেবল উৎসবের জন্যে নয়, বিষয়াসক্ত বিমুগ্ধ হৃদয়ের উদ্বোধনের নিমিত্ত। হে মঙ্গল স্বরূপ পরমেশ্বর! অদ্যকার ভাব যেন চিরস্থায়ী হয়, তোমার নিকট এই প্রার্থনা করি।

অনন্তর শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় এই রূপে উদ্বোধন করিলেন।

যিনি অখিল বিধাতা, বিশ্বমাতা; তিনিই আমারদিগের মুক্তিদাতা, উপাস্য দেবতা। যাঁহা হইতে চন্দ্র সূর্য্য, গিরি নদী সাগর, সকলই নিঃসৃত হইয়াছে, আমরা সকলে তাঁহা হইতেই উৎপন্ন হইয়া তাঁহার দ্বারাই জীবিত রহিয়াছি। ভূলোক দ্যুলোক যাঁহার যশঃ প্রচার করিতেছে, এই দীপালোক যাঁহার প্রেমালোক বিকীর্ণ করিতেছে, এই বিচিত্র পুষ্পমালা সকল এখানে যাঁর অমৃত সৌরভ—যাঁর হস্তের চিহ্ন প্রকাশ করিতেছে; আমরা এই পবিত্র উৎসব সমাজে আজ শুভ ১১ মাঘে সেই দেব-দেবেরই পূজা করিতে সকলে এক-হৃদয় হইয়া একত্রিত হইয়াছি।

কিছুই ছিল না, যিনি এই সকলই সৃষ্টি করিলেন, যিনি জড় শরীরের সঙ্গে অশরীরী বিজ্ঞানময় আত্মাকে আবদ্ধ করিয়া দিয়া আপনার জ্ঞান বিজ্ঞানের, শিল্প নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন; যিনি শরীরের জন্য অন্নপান, আত্মার জন্য জ্ঞান ধর্ম্ম বিধান করিয়া আপনার অতুল দয়ার পরিচয় প্রদান করিলেন, যিনি জগতের-জ্যোতি ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রেরণ করিয়া ভারতবর্ষে—এই বঙ্গদেশের নিবিড় মোহান্ধকার তিরোহিত করিলেন, পৃথিবীর উন্নতি সাধন করিলেন; আজি সেই "একদেব ত্রিভুবন-পরিপালক" পরমেশ্বরের সন্নিধানে কৃতজ্ঞতা উপহার লইয়া সকলে আগমন করিয়াছি। বিজ্ঞান-নয়ন উন্মীলিত করিয়া সেই বিজ্ঞান-ঘন জ্যোতির জ্যোতিকে এখানে সকলে প্রত্যক্ষ সন্দর্শন কর। সেই ত্রিভুবনরাজকে অন্তরে বাহিরে দেদীপ্যমান অবলোকন করিয়া সকলে উৎসাহ-পূর্ণ হৃদয়ে তাঁর পবিত্র চরণে প্রীতিপুষ্প অর্পণ কর। ভক্তিভরে তাঁর পদে প্রণিপাত করিয়া সকলে তাঁর উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হও। যোড়করে তাঁর যশোগানে রসনাকে নিয়োগ কর।

অনন্তর স্বাধ্যায়ান্ত উপাসনা সমাপ্ত হইলে শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ব্রাহ্মধর্ম্মের কয়েকটী শ্লোক তাৎপর্য্যের সহিত পাঠ করিলেন এবং শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এই বক্তৃতা পাঠ করিলেন—

অদ্য কি শুভ দিন। অদ্য প্রীতি-রূপ শশধরের সুশীতল কিরণে বিশ্ব সংসার উদ্ভাসিত হইতেছে। অদ্যকার এই সুখময় সময় আমারদিগের পক্ষে পরম পবিত্র ও প্রার্থনীয়। যিনি অদ্য সমাজস্থ হইয়া কেবল এই আলোক-মালা-মণ্ডিত সভার বাহ্য শোভা দেখিতেছেন, তিনি এই স্থানের অনির্ব্বচনীয় অপূর্ব্ব শোভার কিছুই আস্বাদ পাইতেছেন না। অদ্য এই সভার বাহ্য শোভা অপেক্ষা অনন্ত-গুণ শোভাকর রমণীয় জ্যোতি তাঁহার কিছুমাত্র প্রত্যক্ষ হইতেছে না। অদ্য আমরা এক বৎসর পরে সাম্বৎসরিক কার্য্য সম্পাদনার্থ ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হইয়াছি। এই এক বৎসরের মধ্যে সূর্য্য অনুক্রমে দ্বাদশ রাশি ভোগ করিয়াছেন; সমুদায় ঋতু পর্য্যায় ক্রমে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে; পৃথিবীও গিরি নদী নির্ঝর অরণ্য গ্রাম নগর প্রভৃতি সমুদায় বক্ষে বহন করিয়া সূর্য্যকে এক বার প্রদক্ষিণ করিয়াছে। ব্রাহ্মগণ! এই সময়ের মধ্যে তোমরা কত দূর উন্নতি করিলে অদ্য এই স্থানে এক বার তাহা চিন্তা কর। এই উন্নতি ধনের নয়, মানের নয়, যশের নয়, প্রভুত্বেরও নয়; ইহা আধ্যাত্মিক উন্নতি। যদি এই উন্নতি লাভে যত্ন করিয়া থাক, তবে গত বৎসর তোমারদিগের যথার্থই উন্নতি লাভ হইয়াছে, গত বৎসরের প্রত্যেক মুহূর্ত্ত সৎব্যবহারেই পর্য্যবসিত হইয়াছে।

অদ্য সপ্তত্রিংশ বৎসর আমারদিগের এই পবিত্র ব্রাহ্মসমাজের বয়ঃক্রম হইল। এই অল্প কালের মধ্যে ইহার যে রূপ অসম্ভাবিত উন্নতি হইয়াছে, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে এক্ষণে উৎসাহের সহিত মুক্ত কণ্ঠে এই রূপ বলা যাইতে পারে যে ভবিষ্যতে পৃথিবীস্থ সমস্ত জাতি ও সমস্ত ব্যক্তিরই ইহা আশ্রয়ণীয় হইবে। ইহা যে সাধারণ ধর্ম্ম, অচির কাল মধ্যে এই বাক্য সার্থক হইবে। পৃথিবীতে সমুদ্র যেমন এক, সেই রূপ ধর্ম্মও এক; আমাদিগের এই সনাতন ধর্ম্ম অনতিবিলম্বে সেই একের স্থান অধিকার করিবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের এই রূপ উন্নত অধিকার ঈশ্বর স্বয়ংই প্রদান করিয়াছেন। ব্রাহ্মগণ! এক্ষণে তোমরা এক বার আলোচনা করিয়া দেখ, আমারদিগের এই পবিত্র ধর্ম্ম ক্রমশ আপনার পথ কেমন পরিস্কার করিয়া লইতেছে; পৌত্তলিকতার দুর্ভেদ্য দুর্গ ভেদ করিয়া কেমন অগ্রসর হইতেছে; সমুদায় বিঘ্ন বিপত্তি তুচ্ছ করিয়া লোকের প্রীতিদৃষ্টি কেমন আকর্ষণ করিতেছে; আমরা যখনই ইহা চিন্তা করি, তখনই বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হই; আমারদিগের আশা বলবতী হয় এবং মন আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি এই পবিত্র স্বর্গীয় ধর্ম্মকে ভূতলে উপনীত করিয়া যে কি পর্য্যন্ত উপকার সাধন করিয়াছেন, তাহা ব্যক্ত করা নিতান্ত সুকঠিন। আমরা এই উন্নত ধর্ম্মের নিমিত্ত তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ ঋণী রহিয়াছি। তিনি যদি এই বঙ্গ দেশে ইহার প্রতিষ্ঠাপনে যত্ন না করিতেন; তাহা হইলে আমারদিগের দুর্দ্দশার আর পরিসীমা থাকিত না। কত মনুষ্য কুসংস্কার পাশে জড়িত ও অজ্ঞানান্ধ-কূপে নিপতিত হইয়া মনুষ্য-নামের গৌরব পরিহার করিত—কত মনুষ্য বিদ্যার সুনির্ম্মল আলোকে উদ্ভাসিত হই-

য়াও তৃপ্তিকর ধর্ম্মের অনন্তাবে হীন-ভাব ধারণ করিত—কত মনুষ্য অনৈসর্গিক ধর্ম্মে প্রকৃত প্রীতি লাভ করিতে না পারিয়া অধার্ম্মিকতা ও নাস্তিকতা অবলম্বন করিত—কত মনুষ্য পাপ-পঙ্কে কলুষিত বিষয়োপভোগ-নিরত ও পারত্রিক-শুভ-প্রত্যাশা-বিরহিত হইয়া আরণ্য পশুর ন্যায় অনেকের অসুখের কারণ হইত। কিন্তু ধন্য সেই মহাত্মাকে,যিনি বিদ্যার উন্নতি, জ্ঞানের উন্নতির মুখে এই পবিত্র নিত্য ধর্ম্ম নিক্ষিপ্ত করিয়া জীবলোককে মহা বিনাশ হইতে পরিত্রাণ করিয়াছেন ; যিনি এই দুর্গম কণ্টকাকীর্ণ অন্ধকারময় পথে আলোক প্রদান পূর্ব্বক সুখ-সঞ্চারের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। সেই মহাত্মার ধৈর্য্য, সাহস ও কার্য্য-দক্ষতা অতি অদ্ভুত। তিনি এই বঙ্গভূমির তাদৃশ গাঢ়তর তমোময় অবস্থায় নানা প্রকার বিঘ্ন বিপত্তি সহ্য করিয়াও এই পবিত্র ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। এই ধর্ম্ম শৈশবাবস্থাতেই যে রূপ চতুর্দ্দিক্ হইতে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাতেই ইহার ভাবী উন্নতির এক প্রকার আশাচ্ছেদ হয়; কিন্তু এক মাত্র রাজা রামমোহন রায়ের কায়িক, বাচিক ও মানসিক সাহায্যে ইহাকে কেহ তৎকালে উন্মূলিত করিতে সমর্থ হন নাই। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, পূর্ব্বে যাহাঁরা এই ধর্ম্মের জীবনে আঘাত করিবার নিমিত্ত গাঢ়তর যত্ন ও অধ্যবসায় প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহারদিগের সন্তানেরাই ইহার জীবন প্রদান করিবার নিমিত্ত যথোচিত পরিশ্রম করিতেছেন। পূর্ব্বে যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের নাম শ্রবণ করিলে কর্ণে হস্তার্পণ করিতেন, এক্ষণে তাঁহারদিগের সন্তানেরাই ব্রাহ্মধর্ম্মের নাম শ্রবণ করিয়া কর্ণে যেন অমৃত ধারা বর্ষণ হইল, এই রূপ বিবেচনা করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বীদিগের সহিত সামাজিক কোন কার্য্যে সংস্রব হইলেই প্রায়শ্চিত্ত করিতেন, এক্ষণে তাঁহারদিগেরই সন্তানেরা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছেন। পূর্ব্বে যাঁহারা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের কোন কথা কর্ণগোচর হইলে কোপে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতেন, এক্ষণে তাঁহাদিগেরই সন্তানেরা স্বমুখে ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিতেছেন। পূর্ব্বে যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের পথে কণ্টক রোপণ করিতেন,এক্ষণে তাঁহাদিগেরই সন্তানেরা সেই পথের কণ্টক অবরোপণ করিতেছেন। আশ্চর্য্য সত্যের মহিমা! সত্যের বলেই ব্রাহ্মধর্ম্ম জীবিত রহিয়াছে—সত্যের প্রভাবেই ব্রাহ্মধর্ম্ম এক্ষণে সর্ব্বত্র আপনার জয় পতাকা উড্ডীন করিতেছে এবং দিন দিন আপনার অধিকার বিস্তার করিতেছে।

ব্রাহ্ম ধর্ম্ম এক মাত্র সত্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। ইহা কোন গ্রন্থ-বিশেষে বা ব্যক্তি-বিশেষে আবদ্ধ নহে। ইহা উন্নত প্রাসাদে রাজার ধন, পর্ণ কুটীরে দরিদ্রের ধন; ইহা গ্রন্থালয়ে পণ্ডিতের ধন ও বর্ণজ্ঞান হীন কৃষকেরও ধন—ইহা অবস্থা-বিশেষ, দেশ-বিশেষ, কাল-বিশেষ, সম্প্রদায়-বিশেষ ও জাতি-বিশেষের আয়ত্ত নহে। ইহা প্রত্যেকের আত্মাতেই স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত রহিয়াছে। জবা-কুসুম-সঙ্কাশ ভাস্কর, নবোদিত পূর্ণিমার শশধর, অন্তরিক্ষ-বিক্ষিপ্ত নক্ষত্র-জাল,চিত্র বিচিত্র বিহঙ্গের সুস্বর, অতি বিস্তীর্ণ সাগর গিরিশিখর-নিপতিত-নির্ঝর, তরুরাজি-বিরাজিত নব কুসুমিত অরণ্য, ও নব দূর্ব্বাদল-লাঞ্ছিত অতিবিস্তীর্ণ জনশূন্য প্রান্তরই ইহার পুস্তক। স্বয়ং ঈশ্বরই ইহার উপদেষ্টা। মনুষ্য মাত্রেরই ইহাতে সম্পূর্ণ অধিকার। এই প্রকারই ইহার উদারতা, এই প্রকারই ইহার প্রশস্ততা। মনুষ্যের সৃষ্টি অবধি ইহার সৃষ্টি হইয়াছে,

এবং মনুষ্যের আত্মার ন্যায় ইহা অক্ষয় ও অনন্ত জীবন ধারণ করিবে। জ্ঞান ও ভাবই ইহার প্রাণ, স্বয়ং ঈশ্বরই ইহার লক্ষ্য এবং উন্নতিই ইহার কার্য্য। ইহা প্রত্যেক আত্মাকেই নূতন জীবন, নূতন বল, নূতন স্ফূর্ত্তি, ও নূতন আশা প্রদান করে, প্রত্যেক আত্মাকেই সেই মহান্ আত্মার সহিত যুক্ত করিয়া ব্রহ্মানন্দে যোগানন্দে পরিপূর্ণ করে। ইহা মনুষ্যের হৃদয়-কন্দরে কুসংস্কার-রূপ গাঢ়তর অন্ধকার ভেদ করিয়া দৃষ্টিকে প্রশস্ত করিয়া দেয়। ঈশ্বর আত্মার অতি গভীরতম প্রদেশে অবস্থান করিয়া গুরুর ন্যায় শিক্ষা দেন, বন্ধুর ন্যায় সৎপথ প্রদর্শন করেন,পিতার ন্যায় শাসন ও জননীর ন্যায় অকৃত্রিম স্নেহ বিতরণ করেন—এই ধর্ম্মেরই প্রভাবে আমারদিগের এই রূপ বিশ্বাস। ঈশ্বর বৈরনির্য্যাতনোদ্দেশে আমারদিগকে দণ্ড প্রদান করেন না—প্রত্যুত স্নেহ-পূর্ণ দৃষ্টিতে আমারদিগকে সংশোধন করাই যে তাঁহার উদ্দেশ্য, এই ধর্ম্মেরই এই রূপ উদার ভাব। তিনি স্বয়ংই পাপীদিগের পাপ হর্ত্তা ও পুণ্যবন্তদিগের পুরস্কর্ত্তা—এই ধর্ম্মেরই এই রূপ প্রশস্ত ভাব। আমরা জিতেন্দ্রিয় বিশুদ্ধ-চিত্ত প্রীতিপূর্ণ ও ভক্তি-সম্পন্ন হইলেই অকুতোভয়ে তাঁহার নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে আপনারদিগের সুসঙ্গত বিশুদ্ধ কামনা-সকল অকপটে ব্যক্ত করিতে পারি—এই ধর্ম্ম-প্রভাবেই আমারদিগের এই রূপ স্বাধীনতা। এই জগতে ইচ্ছায় ইচ্ছায় যোগ হইলে যেমন আত্মায় আত্মায় যোগ হয়; সেই রূপ ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত আমারদিগের ইচ্ছার যোগ হইলে এই ক্ষুদ্র আত্মার সহিত সেই মহান্ আত্মার যোগ স্থাপিত হয়,আমরা নয়নে নয়নে প্রাণে প্রাণে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করি এবং তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব জন্মে—এই ধর্ম্মেরই এই উপদেশ।

ব্রাহ্মগণ! তোমারদিগের প্রত্যেকের আত্মা-রূপ অত্যুন্নত পর্ব্বতে আত্মপ্রত্যয়-মূলক সত্য-রূপ উৎস হইতে এই ধর্ম্ম-স্বরূপ স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইয়া সেই প্রশান্ত সাগরে অমৃত সাগরে নিপতিত হইতেছে। এই প্রবল স্রোত প্রবাহিত হইবার কালে বিষম ভূমি সমুদায় ইহার প্রতিরোধে কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না। যে সমস্ত স্থান দিয়া এই স্রোত নিঃশব্দে অতিক্রম করিতেছে ঐ সমস্ত স্থান উর্ব্বর, বহু-ফল-প্রদ ও জীবন্ত হইয়া যাইতেছে। এই সমস্ত স্থানের ভাব ও মাহাত্ম্য অন্য বিধ। এক্ষণে তোমরা ইহার শাখা প্রশাখা চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ করিয়া দেও—ইহার স্বাস্থ্যকর সলিল পান করিয়া সকলে সুশীতল হউক। ধর্ম্ম যেমন যৌবন-তরঙ্গ উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র তরণী; সেই রূপ গতায়ুঃ বৃদ্ধদিগের বৃদ্ধাবস্থার একমাত্র অবলম্বন। উহা যেমন পুরুষের পৌরুষের মূল, সেই রূপ মহিলাদিগের প্রিয়তার নিদানভূত। ইহা সকলেরই আবশ্যক, সকলেই এই ধর্ম্মের নিমিত্ত তৃষিত চাতকের ন্যায় প্রতীক্ষা করিতেছে—এক্ষণে তোমরা প্রস্তুত হও, পৃথিবীর তাবৎ জাতিকে, প্রত্যেক মনুষ্যকেই ব্রাহ্মধর্ম্মের অধিকারী কর। যাহারা অদ্যাপি ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় না লইয়াছে, তাহাদিগকে তাহার আশ্রয়ে আনিতে সাধ্যানুসারে যত্নবান্ হও। যাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য পৃথিবীর এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত প্রচারিত হয়, তাহাতে শরীর মন সমর্পণ কর। "কেহ বা বক্তা হইয়া অগ্নিময় বাক্যে সকলের চিত্ত আকর্ষণ কর, কেহ বা সুনিপুণ গ্রন্থকার হইয়া এই ধর্ম্মের সত্য-সকল সাধারণের মনে মুদ্রিত করিতে যত্নবান্ হও এবং কেহ বা পরিব্রাজক হইয়া কৃষকদিগের ন্যায় সামান্য রূপে জীবন কাল

অতিবাহিত করত ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে ব্রাহ্মধর্ম্মের জয়-পতাকা উড্ডীন কর"—স্বাধীনতার অব্যাঘাতে সকলেরই হৃদয়ে প্রবিষ্ট হও। এই সত্য ধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়া যদি কাহারো কোপদৃষ্টিতে নিপতিত হও, প্রীতি-পূর্ণ-হৃদয়ে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবে, অবমানিত হও, যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিবে। ঈশ্বরের কার্য্য সাধন করিতে গিয়া কোন বিপদকেই বিপদ বলিয়া অনুধাবন করিবে না। তোমারদিগের প্রত্যেকেরই হস্তে অতি গুরুতর কার্য্যের ভার অর্পিত আছে, ইহা বহন করিতে হইলে ধৈর্য্য চাই, বল চাই, প্রগাঢ় যত্ন ও পরিশ্রম চাই। সকলকে লইয়া উন্নত হওয়াই তোমারদিগের যথার্থ গৌরব। জ্ঞান ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার, ভিন্ন বলিয়া স্বতন্ত্র সম্প্রদায় রূপে পরিচিত হওয়া শ্রেয়স্কর নহে।

ভ্রাতৃগণ! তোমরা ব্রহ্ম-জ্ঞানে কত দূর উন্নত হইয়াছ। পাপে নিপতিত হইলে সেই পতিতপাবনকে তো স্মরণ করিয়া থাক। দুর্ব্বৃত্ত ইন্দ্রিয়গণ বল প্রকাশ পূর্ব্বক তোমারদের স্বাধীনতা বিলুপ্ত করিতে উদ্যত হইলে কম্পিত-কলেবরে ঈশ্বরের দ্বারে তো উপস্থিত হইয়া থাক। তোমারদের চতুর্দ্দিকে ঈশ্বর যে সমস্ত সৌন্দর্য্য বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছেন, উহারা তো প্রদাতার হস্তকে বিস্মৃত করিয়া দেয় না। ইচ্ছা হইলেই তো সেই সর্ব্ব সন্তাপহারক নয়ন-মন-মোহন মূর্ত্তি দেখিতে পাও। ঘোরতর দুঃখে বিপদে নিপতিত হইলে তো তাঁহার প্রসন্ন মুখ দেখিয়া থাক। সম্পদে উল্লসিত হইলেও তো চিরানুগত ভৃত্যের ন্যায় তাঁহার পদানত হও। সত্যের নিমিত্ত, ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত, প্রাণ পরিত্যাগ ও সর্ব্ব স্বান্ত করিতেও তো প্রস্তুত আছ। তোমারদের চক্ষের উপর অনন্ত সুখ বিস্তীর্ণ রহিয়াছে, সৎ কর্ম্মই সেই সুখের প্রসূতি, স্বয়ং ঈশ্বরই তাহার আস্পদ্। এক্ষণে তাহা প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকট বিনীত হৃদয়ে কাতর ভাবে এই রূপ প্রার্থনা কর, হে ঈশ্বর! তুমিই আমারদিগকে সেই অমৃতের অধিকারী কর; তোমা ভিন্ন আমারদিগের আর কেহ গতি নাই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

অনন্তর শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় জ্ঞান ভাব ভূষিষ্ঠ এই উৎকৃষ্ট বক্তৃতাটি পাঠ করিলেন—

দেব-লোকে দেবতারা সম্মিলিত হইয়া অহর্নিশি যে ভুবনেশ্বরের আরাধনা করিতেছেন, এখানে এই নরলোকে মর্ত্ত্যলোকে তাহার অনুরূপ সুখ-প্রদর্শন কে আনয়ন করিল? সহস্র সহস্র বিধ কুসংস্কার ও কাল্পনিকতার নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে কে এই গগনস্পর্শী ব্রহ্মাগ্নি এখানে প্রজ্বলিত করিয়া চারিদিক আলোকময় করিল? কাহার প্রভাবে বহুকাল আচরিত সৃষ্ট বস্তুর পূজার্চনার মধ্যে এখানে অজর অমর, অশোক অভয় "অকাল-মূর্ত্ত" পরমেশ্বরের আরাধনার সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর সুপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইল? কে এই নির্জ্জীব বঙ্গবাসিগণের নিরুদ্যম চিত্তে প্রকৃত জীবনের সঞ্চার করিল? এই সমস্ত কার্য্যই সেই একমাত্র স্বর্গীয় সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্মের অপরাজিত পরাক্রম প্রভাবেই সুনিষ্পান্ন হইয়াছে। ভারতবর্ষের—বঙ্গদেশের এই সুখময় কল্যাণময় পরিবর্ত্তন কেবল এক ব্রাহ্ম সমাজের প্রসাদেই আনীত হইয়াছে। আমরা সকলে সেই ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠার দিন স্মরণ করিয়া—এ দেশের যুগান্তর প্রবেশ দিবস বলিয়াই আজ এই পুণ্যাহ শুভ

১১ মাঘে সকলে আনন্দ মনে কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে সেই বিশ্ব বিধাতা মঙ্গল-দাতা পরমেশ্বরের পূজা করিতে এই প্রশস্ত উৎসব-সমাজে আগমন করিয়াছি।

আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাব! আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য ব্রাহ্মধর্ম্মের পরাক্রম! যে স্বর্গীয় ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম-রূপ স্পর্শ-মণির সংস্পর্শে মানব-হৃদয় মধুময় অমৃতময় হইতেছে, সেই সনাতন ব্রাহ্ম-ধর্ম্মানুমত আচরণ অনুষ্ঠানে বঙ্গদেশও আনন্দময় উৎসব ক্ষেত্র হইয়া উঠিতেছে। দেখিতেছি, ব্রাহ্মধর্ম্মের এক একটী উৎসবে এক একটী নগর এক একটী গ্রাম সমুজ্জ্বলিত হইতেছে—এক একটী পরিবার জ্ঞান-ধর্ম্ম সুখ-শান্তিতে সমুন্নত হইতেছে।

বঙ্গদেশের যে যে স্থান অলীক নৃত্য-গীতের আড়ম্বরে—ঘৃণিত ক্রিয়া-কলাপের অত্যাচারে দূষিত কলঙ্কিত হইয়াছিল, যেখানে সহস্র সহস্র আত্মা প্রেয়ের অবলম্বন করিয়া মৃতকল্প হইয়া পড়িয়াছিল; সেখানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবেশ করিয়া আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলকেই জাগ্রৎ করত শ্রেয়ের পথে পরিচালন করিতেছেন। যে গৃহ, যে পরিবার, বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদ অভাবে ভগ্ন-উদ্যম হইয়া পড়িয়াছিল; সেখানে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রবিষ্ট হইয়া স্বর্গীয় আনন্দ-উৎসবের সহস্র-দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়া তাঁহারদিগের হৃদয়-কমল প্রস্ফুটিত করিতেছেন। যে জাতি প্রকৃত ধর্ম্মালোক অভাবে কুসংস্কারজালে—মোহ-পঙ্কে নিপতিত হইয়া সকলের হেয় অশ্রদ্ধেয় হইয়াছিল; দুর্ব্বলের বল, অগতির গতি জ্ঞানজ্যোতি ব্রাহ্ম ধর্ম্ম সেই জাতির মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহারদিগের অবনত মস্তক উন্নত করিতেছেন—বিকৃত হৃদয় প্রকৃতিস্থ করিয়া প্রকৃত ধর্ম্মাচলে আরোহণ করিবার বল বুদ্ধি শক্তি বিধান করিতেছেন। প্রাতঃকালের সূর্য্যের ন্যায় ব্রাহ্ম ধর্ম্ম এই পূর্ব্বদিক্ হইতে সকল প্রকার বাষ্প কুজ্ঝটিকা ভেদ করিয়া সহস্র-রশ্মিতে দিগ্‌দিগন্ত আলোকময় করিয়া উদিত হইতেছেন।

এই পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের বল স্বর্গীয় বল। ইহাঁর পরাক্রম স্বর্গীয় পরাক্রম। জগতে সুখ-শান্তি—আত্মার অনন্ত উন্নতি-সাধন উদ্দেশে সর্ব্বমঙ্গলালয় পরমেশ্বর ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের অমূল্য অক্ষয় অবিনশ্বর বীজ, প্রতি আত্মার অন্তরতম প্রদেশে অতি যত্নের সহিত নিহিত করিয়া দিয়াছেন। তিনি স্বয়ংই সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও প্রচারক হইয়া উন্নতি সাধন করিতেছেন। ঈশ্বর স্বয়ংই ইহাকে রক্ষা করিতেছেন বলিয়া জগতের বিবিধ ধর্ম্ম-বিপ্লবেও এই অমূল্য নিধি কাহারো কর্ত্তৃক অপহৃত হয় নাই।

সংসারে কত পরিবর্ত্ত, কত বিপ্লাবনে রাজ্য রাজা বিনষ্ট হইতেছে; কত দেশ বিদেশ উচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে; তথাচ ব্রাহ্মধর্ম্মের অমূল্য অক্ষয় বীজ বিনষ্ট হয় নাই। পৃথিবীতে কত প্রবল পরাক্রমশালী ধর্ম্মযোদ্ধা-সকল জন্ম গ্রহণ করিয়া আপনারদিগের বুদ্ধি, প্রত্যক্ষ ও প্রবৃত্তি অনুসারে চালিত হইয়া সত্যের পরিবর্ত্তে অসত্য, ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে অধর্ম্ম প্রচার করিয়া লোকদিগকে মহাভ্রমে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন; কিন্তু সেই সমস্ত অত্যাচার প্রপীড়নে ব্রাহ্মধর্ম্ম-বীজ অন্তরিত বা বিলুপ্ত হয় নাই। কত স্বার্থপর মাহাতেজা প্রচারক-দল এই নরলোকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যাঁহারা আপনারদিগের বুদ্ধি-চাতুর্য্যে বল-বিক্রমে সহস্র সহস্র মনুষ্যকে স্বধর্ম্মে আনয়ন করত পুষ্ট-দল হইয়া কত দেশ বিদেশ রাজ্য সাম্রাজ্য অধিকার করিয়া আপনাদিগের কুটিল মনোরথ সংসিদ্ধ করিয়া ছিলেন। কত

নিরীহ নির্দ্দোষী দৃঢ়-ব্রত সাধুকে স্বধর্ম্মে-দীক্ষিত করিতে অপারগ হইয়া শিরশ্ছেদন করত নিষ্কলঙ্ক শোণিত প্রবাহে মেদিনীকে দূষিত কলিঙ্কত করিয়াছিলেন। কত যথার্থ ঈশ্বরবাদী তন্নিষ্ঠ মহাপুরুষদিগের প্রচারিত প্রকৃত সাধু মত তাঁহারদিগের বিশ্বাস-বিরুদ্ধ বলিয়া অম্লানবদনে কাহাকে কারারুদ্ধ কাহাকে বা অবৈধ উপায়ে বিনষ্ট করিয়াছিলেন—কুত্রাপি বা বিরুদ্ধধর্ম্মাবলম্বী জনসাধারণকে পর্ব্বতসম নরচিতা প্রস্তুত করিয়া অনল-সহযোগে ভস্মীভূত করিয়াছিলেন—কোন স্থানে বা সাধারণ নরকুলের জ্ঞান-গিরি সদৃশ গ্রন্থ-স্তূপ অগ্নি দাহ দ্বারা এক কালে ভস্মসাৎ করিয়া আপনারদিগের প্রচারিত ধর্ম্ম-মতকে নির্ব্বিরোধ ও নিঃশত্রু করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ধর্ম্মের নামে জগতীতলে এই সমস্ত অকথ্য কার্য্যাবলী সংঘটিত হইয়াছে, এবম্বিধ হৃদয়-বিদীর্ণকর শোচনীয় ব্যাপার-সকল অনুষ্ঠিত হইয়াছে; কিন্তু পবিত্র ব্রাহ্ম ধর্ম্ম এতাবৎ আসুরিক অত্যাচারে উপদ্রবেও বিলুপ্ত হয় নাই—প্রকৃত সত্যের প্রবাহ কোন রূপে অবরুদ্ধ হয় নাই। বরং ইতিহাস পুরাবৃত্ত-সূত্রে এই সমস্ত শোচনীয় ঘটনা যে পরিমাণে অনুস্যূত হইয়াছে, সেই পরিমাণেই ব্রাহ্মধর্ম্মের অমূল্য সত্য-রাজির অনির্ব্বচনীয় প্রভা লোক-সমাজে অধিকাধিক-রূপে বিকীরিত হইয়াছে। আমরা এখন সেই ইতিহাস-দর্পণে সত্যের অপরাজিত শক্তি, ধর্ম্মের সুমহান্ মঙ্গলময় মধুময় ভাব, অবলোকন করিয়া কৃতার্থ হইতেছি।

ব্রাহ্মধর্ম্ম এক দেশের, এক জাতির, এক সময়ের নয়। ব্রাহ্মধর্ম্মের যোগ ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের সঙ্গে। ব্রাহ্মধর্ম্মের আধিপত্য স্বর্গ মর্ত্ত্য সকল লোকেই। যে দিন পৃথিবীর সৃষ্টি, সেই দিনই ব্রাহ্মধর্ম্মের রচনা হইয়াছে। যে দিন ধরা-ধামে জ্ঞান-ধর্ম্ম-সমন্বিত আত্মার আবির্ভাব, সেই দিন হইতেই এখানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়াছে। কোন মনুষ্য-বিশেষও ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের নিয়ন্তা নহে, যে তাঁহার অনুপস্থানে ইহা হীন-বল হইয়া পড়িবে। কোন মনুষ্যও এ ধর্ম্মের আদর্শ ও নিয়ামকও নহে, যে ঈশ্বরের এই উন্নতিশীল রাজ্যে তদপেক্ষা আর কেহ অধিকতর সাধু-চরিত প্রভাবশালী হইলে ইহা নিষ্প্রভ হইয়া যাইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের নিয়ন্তা নিয়ামক, আদর্শ প্রবর্ত্তক, সত্য সুন্দর মঙ্গল-পূর্ণ পবিত্র পরমেশ্বর। ব্রাহ্মধর্ম্মের সহায় সুহৃৎ সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর স্বয়ংই। সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্মের বল অদ্যও যেমন, কল্যও সেই রূপ। ব্রাহ্মধর্ম্ম যেমন পুরাকালে অসত্য অধর্ম্মের প্রবল পরাক্রমের মধ্য হইতে আপনি ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে উত্থিত হইয়াছেন, তেমনি বর্ত্তমান সময়েরও নানা বিধ উপদ্রব অত্যাচারের অভ্যন্তরেও তিনি অব্যাহত থাকিয়া সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করত কেবল বিশ্ববিজয়ী ব্রহ্ম নামের জয় ঘোষণা করিতেছেন, ভবিষৎ কালেও তিনি অপরাজিত পরাক্রম সহকারে সকল শত্রু নিপাত করিয়া নিরবচ্ছিন্ন একমেবাদ্বিতীয়ং পরমেশ্বরেরই যশ প্রচার করিবেন।

ভূমণ্ডলে মনুষ্য পশু পক্ষী, দানব দৈত্য অসুর পর্য্যন্ত ঈশ্বরের মহোচ্চ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ আত্ম-শুদ্ধির পরিবর্ত্তে বহুবিধ কৃচ্ছ্র-সাধন ইন্দ্রিয়-লৌল্যকর হৃদয়-বিকৃতকর ব্যাপার-সকল আদরের সহিত প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; সহজ-জ্ঞান ও আত্ম-প্রত্যয়ের পরিবর্ত্তে অমূলক অনর্থকর বিবিধ কুসংস্কারের সূত্র-পাত হইয়াছে; প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান অভ্রান্ত বিশ্ব-রূপ গ্রন্থের বিনিময়ে নানা বিধ

কল্পিত উপাখ্যান স্তূপ ঈশ্বর-প্রণীত অকাল্পনিক ধর্ম্ম-গ্রন্থ-রূপে পরিগৃহীত হইয়াছে; দোষ-গুণ-বিশিষ্ট ক্ষীণ হীন মলিন মানবও পাপ-ত্রাতা মুক্তি-দাতা বলিয়া পরিপূজিত হইয়াছে। দেখ! এই সমস্ত পর্ব্বত-সমান বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া—পৃথিবীর এত দুঃখ দুর্দ্দিনের বিদ্রোহ পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্ম স্বীয় অপরাজিত পরাক্রম-সহকারে একাদিক্রমে কেবল ঈশ্বরের যশ ঘোষণা করিতে করিতে দিন দিন অভ্যুদিত হইতেছেন। এমন ঘন নিবিড় মোহান্ধকার ভেদ করিয়া মঙ্গল-গর্ভ ব্রাহ্মধর্ম্ম কেমন মনোহর বেশে সহস্র রশ্মিতে এখানে প্রকাশিত হইয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের এই অতুল্য প্রভাব, অনির্ব্বচনীয় শক্তি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে কে না বিস্মিত ও চমৎকৃত হয়?

ব্রাহ্মধর্ম্মের অপরাজিত পরাক্রম যেমন ভূত কালে, তেমনি এই বর্ত্তমান সময়েও তাহার মঙ্গলময় কল্যাণময় আধিপত্য। জন-সমাজ এক পিতার পুত্র, এক রাজ্যেশ্বরের প্রজা হইয়াও বহুবিধ দূষিত সাম্প্রদায়িক ভাবে যে এত কাল পরস্পর বিবাদ দ্বন্দ্বে, দম্ভ বিদ্বেষে, শতধা বহুধা হইয়া বিযুক্ত বিচ্ছিন্ন ভাবে বিচরণ করিতেছিল; ব্রাহ্মধর্ম্ম এক অদ্বিতীয় জগৎ-পিতার আরাধনার বিশুদ্ধ পদ্ধতি প্রকাশ করিয়া সকলকে ভ্রাতৃ-ভাবে আবদ্ধ করত তাঁহারই পদানত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম বিশ্ববিজয়ী ব্রহ্ম-নামের মধুর নিনাদে সকল যূথ-ভ্রষ্ট দিশাহারা মানব-কুলকে সচকিত করিয়া এক পথেই আকর্ষণ করিতেছেন। মানব-প্রকৃতি যে এত দিন অপরিষ্কৃত অপরিশুদ্ধ আদর্শের অনুকরণ করিয়া বদ্ধ-ভাবে অবস্থান করত বিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল; ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহার সম্মুখে নির্দ্দোষ নিষ্কলঙ্ক পূর্ণ পরিশুদ্ধ ভূমা ঈশ্বরকে তাহার এক মাত্র আদর্শ রূপে সংস্থাপন করিয়া তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া তুলিতেছেন। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া মনুষ্যের আশা ভরসা, শিক্ষা, উন্নতি, যাহা এই অধোলোকেই আবদ্ধ ছিল; ব্রাহ্মধর্ম্ম উন্নতিশীল আত্মার সম্মুখে অনন্ত উন্নতির দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দিয়া তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করিতেছেন। তাহার আশা-লতাকে সেই অনন্ত-উন্নত আশ্রয়-তট পরমেশ্বরেরই পদ-তলে সংলগ্ন করিয়া দিয়া অনন্তকাল পর্য্যন্ত সুখের পর সুখ, আনন্দের পর কল্যাণতর আনন্দ সম্ভোগে অধিকারী করিতেছেন। এত দিন কাল্পনিক ধর্ম্ম পিতা পুত্রে, ঈশ্বর মনুষ্যে, উপাস্য উপাসকের মধ্যে যে অনতিক্রমণীয় ব্যবধান ঘোষণা করিয়া মানব-কুলকে আধ্যাত্মিক দাসত্ব শৃঙ্খলে চির-বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল; ব্রাহ্মধর্ম্ম সেই সমস্ত মধ্যস্থ, সকল আবরণ ও আচ্ছাদন দূরে নিক্ষেপ করত পিতা পুত্রে উপাস্য উপাসকে ঈশ্বর মনুষ্যে যে প্রকৃত সম্বন্ধ ও অধিকার, তাহা সুন্দর রূপে বুঝাইয়া দিয়া সকল প্রকার দাসত্ব ও অধীনতা হইতে মুক্ত করত আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা প্রদান করিতেছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম স্পষ্টাক্ষরে জন-সাধারণকে এই উপদেশ দিতেছেন, যে যিনি সমুদায় বিশ্ব রাজ্যের একাধিপতি, তিনিই ধর্ম্ম রাজ্যের এক মাত্র রাজা। যিনি সহস্র লোক মণ্ডলের এক মাত্র নিয়ন্তা ও বিধাতা, তিনিই মানব-কুলের পাপ-পুণ্যের অদ্বিতীয় শাস্তা ও পুরস্কর্ত্তা! তাঁহার বিশ্ব-রাজ্য পরিশাসনে যেমন অন্যের হস্ত নাই, তেমনি তাঁহার ধর্ম্ম-রাজ্যের মধ্যে অন্য আর কাহারও আধিপত্য ও কর্ত্তৃত্ব নাই।

সূর্য্য যত পুরাতন হইতেছে, পৃথিবী যত প্রজা দ্বারা পূর্ণ হইতেছে, জ্ঞান যত বিস্তৃত

হইতেছে; ব্রাহ্মধর্ম্ম ততই স্বীয় স্বর্গীয় পরাক্রম বিস্তার করত সকল প্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এই সমস্ত অক্ষয় অমূল্য উজ্জ্বল সত্য প্রচার করিতেছেন। অকাল্পনিক ব্রাহ্মধর্ম্ম সকল প্রকার কাল্পনিক দূষিত মত খণ্ডন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে এই জগতী-তলে কেবল "মহেশের মহদ্‌যশ ঘোষণা" করিতেছেন। ঘোর তামসী অমানিশার পর, পৌর্ণমাসীর পূর্ণ-কল চন্দ্রমার অভ্যুদয়ের ন্যায় এখানে এই মোহান্ধ মর্ত্ত্য লোকে মঙ্গল-গর্ভ ব্রাহ্মধর্ম্ম পূর্ণ-প্রভায় উদিত হইয়া স্বকীয় সুস্নিগ্ধ সুধাময় আলোকে ঈশ্বরের মঙ্গল-মূর্ত্তি অত্যুজ্জ্বল-রূপে অতি মনোহর-রূপে প্রকাশ করিয়াছেন।

আজ সম্মুখে এই যে দেব-স্পৃহনীয় মনোহর দৃশ্য, ইহা ব্রাহ্ম ধর্ম্মই এখানে আনয়ন করিয়াছেন। ঈশ্বর-আরাধনাতে দেব-মনুষ্যের যে তুল্য অধিকার, ইহা কেবল ব্রাহ্মধর্ম্মই এই জগতীতলে প্রদর্শন করিয়াছেন। এমন মনোহর দৃশ্য নর-লোকে আর কোথাও নাই, মনুষ্যের এমন উন্নত অধিকার কুত্রাপি কোন ধর্ম্মেই দৃষ্ট হয় না। সেই অনন্ত অরূপী পূর্ণ ব্রহ্ম এখানে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, আমারদের নয়ন-তারা জগজ্জীবন পরমেশ্বর এখানে বিরাজ করিতেছেন, আর আমরা সকলে তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া প্রীতি কুসুম তাঁহার চরণে অর্পণ করিতেছি। শরীরে শরীরে আত্মার ব্যবধান আছে, আকাশেতে বায়ুরও আবরণ আছে; কিন্তু আমারদিগের আত্মা ও ঈশ্বরে কোন ব্যবধান নাই, কোন আবরণও নাই। চক্ষু উন্মীলন করিলে যেমন তিনি ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্ট হয় না, তেমনি চক্ষু নিমীলিত করিলে "আত্মার নিভৃত নিলয়ে সুরম্য নিকেতনে তাঁহার মঙ্গল-মূর্ত্তি ভিন্ন আর কিছুই লক্ষিত হয় না। এখানে আমরা অন্তস্ফূর্ত্ত বাক্যে যে তাঁহার পূজা করিতেছি, তিনি এখানে বর্ত্তমান থাকিয়া তাহা শ্রবণ করিতেছেন।" পুত্র যেমন অবাধে অক্লেশে পিতার সম্মুখে গমন করে, ব্রাহ্মধর্ম্ম তেমনি সরল স্বাভাবিক নিয়মেই আমারদিগকে সেই পরম পিতার অভিমুখীন করিয়াছেন। পৈতৃক ধন সম্পত্তির উপরে পুত্রের যেমন স্বাভাবিক স্বত্ব, ঈশ্বরের অসীম অনন্ত মঙ্গল ভাবেও যে আমারদিগের তেমনি স্বাভাবিক অধিকার, ইহা পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম স্পষ্টাক্ষরে বুঝাইয়া দিতেছেন। পিতা পুত্রের মধ্যে যেমন মধ্যস্থ নাই, ঈশ্বর ও মনুষ্যের মধ্যে সেইরূপ কোন ব্যবধান নাই—কোন আবরণ ও আচ্ছাদন নাই। এই অমূল্য সত্য আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছি। এই অক্ষয় অধিকার আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতেই লাভ করিয়াছি। আমরা পৈতৃক ধন সম্পত্তির ন্যায় এখান হইতে সেই পরম পিতার অক্ষয় অনন্ত ভাবের অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছি, অনন্ত কাল লোকলোকান্তরে তাঁহারই আদর্শ অনুকরণ করিয়া ক্রমশ দেবত্ব মহত্ত্ব লাভ করিতে থাকিব। সেই অমৃতের পুত্র বলিয়া যেমন আমারদিগের আত্মা অমর হইয়াছে, সেই রূপ আমরা অনন্তের সন্তান বলিয়া অনন্ত উন্নতি লাভে অধিকারী হইয়াছি। ঈশ্বরই আমারদিগের সর্ব্বস্ব। তিনি যেমন আমারদিগের স্রষ্টা, পাতা, অন্নদাতা, প্রভু, পিতা; সেই রূপ তিনিই কেবল আমারদিগের জ্ঞান-দাতা ভয়-ত্রাতা মুক্তি দাতা গুরু। সেই স্নেহময়ী জগন্মাতার নিরাপদ ক্রোড়েই যেমন আমরা লালিত পালিত হইতেছি, তেমনি তাঁহারই মুখের স্নেহময় মধুময় উপদেশ শুনিয়া, তাঁহার নিষ্কলঙ্ক মঙ্গল ভাব দেখিয়া, তাঁহাকে সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ আদর্শ করিয়াই আমরা ধর্ম্ম-পথে

অগ্রসর হইতেছি। পিতার গৃহে প্রচুর অন্ন-পান লাভ করিতে পারিলে কে আর অন্যের গৃহে মুষ্টি-ভিক্ষার জন্য লালায়িত হয়? পিতার নিকট হইতে অজস্র-রূপে সুখ-সম্পদ লাভ করিতে সমর্থ হইলে কে আর ভ্রাতার ক্ষুদ্র সংকীর্ণ বিষয়ের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে? অগণ্য সূর্য্যালোকে নিত্য-বিচরণ করিতে পাইলে কে আর খদ্যোতের অকিঞ্চিৎকর সামান্য জ্যোতির প্রার্থনা করে? অনাদ্যনন্ত ভূমা পরমেশ্বর স্বয়ংই যাহারদিগের ঐহিক পারত্রিক সকল প্রকার সুখ সম্পদের বিধাতা, সেই "ধর্ম্মাবহ পাপনুদ" পবিত্র পরমেশ্বরই যাহারদিগের পাপ-ত্রাতা মুক্তি-দাতা; জ্ঞান ধর্ম্মের জন্য তাঁহার সৃষ্ট একান্ন-পালিত ভ্রাতার দ্বারস্থ হইয়া আপনার ক্ষুদ্রতা লঘুতা প্রকাশ করিতে কেন তাহাদিগের অভিরুচি হইবে? দেবতাদিগের সঙ্গে একাসনে আসীন হইয়া—পিতৃ-ধনে তুল্য অধিকার প্রাপ্ত হইয়া কার আর তুল্য-সম্পদ্ ভ্রাতার নিকটে অকারণে আপনার স্বাধীনতা বিক্রয় করিতে প্রবৃত্তি হইবে?

ব্রাহ্মধর্ম্ম অপৌত্তলিক ধর্ম্ম। এ ধর্ম্মে কোন সৃষ্ট জীবের একাধিপত্য নাই। এ ধর্ম্মে স্বর্গের কুঞ্চিকা বা মুক্তির দ্বারও কোন মনুষ্য বা দেবতা বিশেষের হস্তেও রক্ষিত নাই। যে ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করে, ঈশ্বর স্বয়ংই তাহার ঐহিক পারত্রিক সকল মঙ্গল বিধান করেন।

পৃথিবীর প্রথম দিন হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম এক ঈশ্বরের ভাব প্রচার করিয়া আসিতেছেন, বর্ত্তমান সময়েও সহস্রবিধ কাল্পনিক ধর্ম্মকে স্বীয় পদাবনত করিয়া আপনি উন্নত হওত এক ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করিতেছেন, ভবিষ্যৎ কালেও এই অমূল্য অক্ষয় সত্য ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়া জগতে সুনির্ম্মলা শান্তি বিস্তার করিবেন। যতদিন না মানবকুল শান্তং শিবমদ্বৈতং একমেবাদ্বিতীয়ং পূর্ণ ব্রহ্মের শরণাগত পদানত হইবে, যতদিন না পৃথিবীর এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত অকৃত অমৃত ঈশ্বরের স্তুতি-রবে পরিপূর্ণ হইবে, যত দিন না ভূমণ্ডলে অখণ্ড ভ্রাতৃভাব বিস্তার হইবে; ততদিন ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার উন্নত লক্ষ্য সংসিদ্ধ হইবে না। ঈশ্বরের এই সুমহান্ আদেশ প্রতিপালনের জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম এই জগতীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন—ঈশ্বরের এই মহদভিপ্রায় সংসাধন করিতে তাঁহারই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া অটল ভাবে দণ্ডায়মান হওত শত-সহস্র শত্রুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতেছেন। পরিণামে যদি আরো কোটি কোটিবিধ বাধা বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়, আরো বিভিন্নতর নবীন সম্প্রদায় সংরচিত হয়, ব্রাহ্মধর্ম্মের স্রোত কিছুতেই অবরুদ্ধ হইবে না। অপৌত্তলিক ব্রাহ্ম ধর্ম্ম স্বীয় স্বর্গীয় পরাক্রম-প্রভাবে গম্ভীর-ভাবে উৎসাহ-সহকারে সমর-ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে থাকিবেন। কেবল জয় লাভের জন্য নয়—যতক্ষণ না পরাজিত কলুষিত আত্মাকে শোধিত সংস্কৃত করিয়া ঈশ্বরের পদতলে আনয়ন করিবেন, যতক্ষণ না তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া ঈশ্বরের অভিমুখীন করিতে পারিবেন, ততক্ষণ ব্রাহ্মধর্ম্ম কখনই নিরস্ত হইবেন না। পৃথিবী হইতে বিবাদ বিষম্বাদ, দন্দ্ব, কলহ তিরোহিত হইয়া যত দিন না এই ভূলোক দেব-লোক স্বর্গলোকের প্রতিরূপ হইয়া উঠিবে; তত দিন ব্রাহ্মধর্ম্মের মঙ্গল-সংকল্প সুসম্পন্ন হইবে না।

ব্রাহ্মগণ উৎসাহিত হও—ঈশ্বরের মহিমাকে মহীয়ান্ করিতে হৃদয়কে বিশুদ্ধ কর, রসনাকে প্রমুক্ত কর, আত্মাকে উন্নত কর।

তোমরা যে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ—সেই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রভাবেই তোমারদের সকল আশা পূর্ণ হইবে জগতে অপার শান্তি বিস্তার হইবে। সেই এক ঈশ্বরের পূজা হইতেই তোমরা ঐহিক পারত্রিক সকল সুখ সম্পদ লাভ করিবে। যিনি ত্রিভুবনের অধীশ্বর, ভূলোক ও দ্যুলোকের একাধিপতি, তাঁহারই লক্ষ্য সম্পন্ন করিতে তোমারা দণ্ডায়মান হইয়াছ, তাঁর রাজ্যে তাঁরই যশ প্রচার করিতে তোমরা উত্থিত হইয়াছ। তিনিই তোমারদিগের সহায় সুহৃদ সকলই। যাঁর নামে ওষধি বনস্পতি প্রফুল্লিত হয়, তাঁর নামে মনুষ্যের নিদ্রিত-আত্মা কেন না জাগ্রত হইবে।

দেখ! প্রত্যক্ষ দেখ! যখন এই বঙ্গভূমি ঘোর মোহ-নিদ্রায় অভিভূত হইয়া কাল যাপন করিতেছিল, যখন পৌত্তলিকতার একাধিপত্যে সমুদায় বঙ্গদেশ নিস্তব্ধ ভাবে কালাতিপাত করিতেছিল, সেই ঘোর নিস্তব্ধ রজনীতে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় একাকী এখানে উচ্চৈঃস্বরে জয় জগদীশ বলিয়া উত্থিত হইলেন। তাঁর সেই গম্ভীর নিনাদে বঙ্গ-দেশের চির-নিদ্রা ভঙ্গ হইল—সহস্র সহস্র আত্মা জাগ্রৎ হইল, সেই মহেশের মহদ্যশ ঘোষণা করিতে প্রবৃত্ত হইল! এখানকার এই ব্রহ্ম ও ব্রাহ্ম নামের কলরবে পৃথিবীর সমুদ্র-পর্ব্বত-ব্যবহিত স্থান-সকলও প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। দেখ, আজ-কাল ভূলোকের চারি দিক্ ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোচনায় কেমন পূর্ণ হইয়াছে। এখন আর অন্য কোন বিবাদ বিষম্বাদ নাই, কেবল ব্রাহ্মধর্ম্মের অপৌত্তলিক ভাব প্রচার করিতেই সকলে ব্যগ্র ও ব্যাকুল হইয়াছেন, আত্মাকে পরিশুদ্ধ করিয়া ঈশ্বরেতে অর্পণ করিবার জন্য ব্যস্ত রহিয়াছেন। যে পরিমাণে এই মহান্ লক্ষ্যটী সুসম্পন্ন হইবে, সেই পরিমাণেই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার-পথ প্রমুক্ত ও প্রশস্ত হইতে থাকিবে, পৃথিবীর সেই চির-প্রার্থনীয় কাল ততই নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিবে, মানব কুল ততই গম্ভীর-শান্তি সাগরে অবগাহন করিবে।

হে বিপদ্-বারণ দুঃখ-ভঞ্জন পরমেশ্বর! তুমি তোমার ব্রাহ্মধর্ম্মকে এখানে প্রেরণ করিয়া আমারদের সকল বিপত্তি, সকল দুঃখ নিবারণ করিয়াছ, আমরা তোমাকে পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছি। বল বীর্য্য স্বাধীনতা, সুখ সম্পদ্ সৌভাগ্যের অভাবে আর আমরা কাতর নহি, তোমাকে পাইয়াই আমারদের সকল অভাব ও অনটন বিদূরিত হইয়াছে। এমন যে ক্ষীণ হীন, মলিন পরাধীন বঙ্গ-ভূমি, তোমার ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাবে ইহার সৌভাগ্যের সহস্র-দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে। তোমার প্রসন্ন-মুখ দেখিয়াই আমরা সকল দুঃখ মনস্তাপ বিস্মৃত হইয়াছি। তোমার প্রতি ঐহিক পারত্রিক সকল মঙ্গলের নির্ভর করিয়া—তোমার হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিয়া আমরা নিরাপদ্ ও নির্ব্বিঘ্ন হইয়াছি। আমরা দেখিতেছি—প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, তোমার ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতিতেই বঙ্গ-দেশের উন্নতি, তোমার ব্রাহ্মধর্ম্মের জয়েই আমারদের জয়।

হে অকিঞ্চন-গুরু! যেমন তুমি এই বঙ্গ-দেশে তোমার ব্রাহ্মধর্ম্মের বিমল-জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া ইহার মহত্ত্ব সাধন করিলে, তেমনি তুমি সমুদায় পৃথিবীতে—সকল আত্মাতে তোমার সত্য সুন্দর মঙ্গল ভাব উদ্দীপ্ত করিয়া দিয়া পৃথিবীর উন্নতি সাধন কর, মনুষ্য নামের গৌরব রক্ষা কর। আজ যেমন তোমার ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসাদে বঙ্গ-দেশে সহস্র সহস্র আত্মা তোমার যশ কীর্ত্তন করিতেছে, এমনি দেবস্পৃহনীয় মহোৎসব-দ্বার তুমি সকল দেশে—সমুদায় পৃথিবীতে প্রমুক্ত করিয়া এখান হইতে বিবাদ বিষম্বাদ বিদ্বেষ অসূয়া বিদূরিত করিয়া জগতে অক্ষয় সুখ শান্তি বিস্তার কর। সমুদায় মানবকুলকে তোমার শরণাগত পদানত করিয়া তোমার পবিত্র নামের মঙ্গল ধ্বনিতে সমুদায় লোকমণ্ডল প্রতিধ্বনিত কর। এই ভূলোকে, দেব লোক—স্বর্গ লোকের আভাস প্রদর্শন কর। বিনীত ভাবে যোড় করে তোমার সন্নিধানে এই মাত্র প্রার্থনা করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

অনন্তর চারিটি ব্রহ্ম-সঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

থিওডোর পার্কর।

২৮২ সংখ্যক পত্রিকার ২০৮ পৃষ্ঠার পর।

যে জাতির যেরূপ আদিম অবস্থা সে তদনুসারে ধর্ম্মের সহিত নানাপ্রকার কল্পনা সংযোগ করিয়া দিয়াছে। কোন কোন জাতি কহিয়া থাকে যে তাহারা ভূগর্ভ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এই নিমিত্ত তাহারা যে স্থানে বাস করে তাহার আদিম অধিকারী বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দেয়। কেহ কেহ আপনাদিগকে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে। কোন কোন জাতি কহে যে প্রকৃত অসভ্যাবস্থা হইতেই তাহারা উৎপন্ন হইয়াছে, স্বয়ং ঈশ্বর তাহাদিগকে সেই অবস্থা হইতে উদ্ধার করেন। কাহারও মত এই রূপ যে, প্রকৃত সভ্যাবস্থাই মানব জাতির আদিম অবস্থা। এই সত্যটি হিব্রু দিগের মধ্যে প্রচলিত দৃষ্ট হইয়া থাকে। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা উহাদের নিকট হইতেই এই মত অধিকার করিয়াছে। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা কহিয়া থাকেন যে আদি অবস্থা যারপর নাই সুখের অবস্থা ছিল। মানবজাতি সেই অবস্থা হইতে স্বদোষে এক কালে পরিভ্রষ্ট হইয়াছে। সুতরাং প্রথম অবস্থার ধর্ম্মই মনুষ্যের বৈধ ধর্ম্ম।

এই স্থলে একটি জিজ্ঞাস্য উপস্থিত হইতেছে। মানবজাতির আদিম অবস্থা কোনটি। উহারা প্রকৃত সভ্য ও এক ঈশ্বরের উপাসনার অবস্থাতে কি উৎপন্ন হইয়াছে? না অসভ্য ও জড়োপাসনার অবস্থাতে উৎপন্ন হইয়াছে? মানব জাতি অবনত হইয়াছে? কি ক্রমশ উন্নত হইতেছে? এই সমস্ত প্রশ্ন ইতিহাস-মূলক; সুতরাং ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা ইহার সিদ্ধান্ত করা কর্ত্তব্য। অপ্রামাণিক সিদ্ধান্ত ভিত্তি-বিরহিত চিত্র-রচনার ন্যায় নিতান্ত নিরর্থক। আমাদিগের অধিষ্ঠান-ভূতা এই পৃথিবীর বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, ইহা প্রতিক্ষণই পূর্ণাবস্থায় ক্রমশ উন্নত হইতেছে। এক সময়ে ইহার এই রূপ আকার হইয়াছিল যে, তরু গুল্মাদি ও পশু পক্ষী প্রভৃতি জীবজন্তু ব্যতিরেকে ইহার আর কোনরূপ অধিবাসী ছিল না। তৎপরে যখন ইহা কালের পরিণামানুসারে ক্রমশ পূর্ণাবস্থায় উপনীত হইতে লাগিল, তখন ইহা মনুষ্যের বাসোপযোগী হইয়া উঠে। মনুষ্যের অবস্থা বিষয়েও এই দৃষ্টান্ত সম্পূর্ণ উপাদেয় বোধ হইতে পারে। মানবজাতি যে নিতান্ত অনুন্নত অবস্থা হইতে ক্রমশ উন্নত অবস্থা অধিকার করিতেছে, ইহা দ্বারাই তাহা সুস্পষ্ট প্রতিপন্ন হয়। এই নিদর্শন অনুসরণ করিয়া কেহ কেহ কহিয়াছেন যে, মনুষ্য প্রথমত নিকৃষ্ট অসভ্যাবস্থায় সৃষ্ট হইয়াছিল। প্রকৃতির উপাসনাই ইহার আদিম ধর্ম্ম এবং প্রতিবেসীর প্রতি রাক্ষসবৎ ব্যবহারই ইহার নীতি ছিল। এক্ষণে যে সমস্ত সভ্য জাতি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, ইহারা সকলেই আদি নিকৃষ্ট অবস্থা হইতে ক্রমশ অভ্যুদয় লাভ করি-

য়াছে এবং প্রকৃত সত্য ধর্ম্ম অধিকার করিবার পূর্ব্বে জড়োপাসনা ও পুরুষোপাসনার দুর্ভেদ্য দুর্গ ভেদ করিয়া অগ্রসর হইয়াছে।

কতক গুলি স্বমতাভিমানী কবিগণ কহিয়া থাকেন যে, আদিকালে একটি স্ত্রী ও এক পুরুষ সৃষ্ট হইয়াছিল। ঐ দম্পতী ধর্ম্ম, নীতি ও অন্যান্য শক্তি সম্পূর্ণ রূপ অধিকার করে। তৎপরে উহারা ঐ অবস্থা হইতে স্খলিত হয়। কিন্তু তৎকালে কএকটি লোক সত্যকে জীবন্ত ভাবে রক্ষা করিয়াছিল। যখন মানব জাতি পাপভার-গ্রস্ত ও অসভ্যাবস্থায় নিপতিত হয়, তখন ঐ সমস্ত সত্য জনশ্রুতিতে প্রবাহিত হইয়া উহাদিগকে ক্রমশ উদ্ধার করে। এখনও কতকগুলি সৌভাগ্য-সম্পন্ন মনুষ্য সেই সমস্ত সত্য লাভ করিয়া পাপ ও অসভ্যতা হইতে মানবজাতিকে পরিত্রাণ করিতেছেন।

হিব্রুজাতির পৌরাণিক গ্রন্থ ব্যতিরেকে এই মত কোনগ্রন্থই সপ্রমাণ করিতে পারে না। কিন্তু কেবল ফিনীসিয়, পারসীক ও চীনদিগের মধ্যে যে এই রূপ এক কিম্বদন্তী আছে, তাহাই এই মতের কথঞ্চিৎ পোষকতা করিতে পারে। এক্ষণে আমরা যদি এই সমস্ত কিম্বদন্তীর অপ্রকৃত প্রমাণ সমুদায় স্বীকার করি, তাহা হইলে বিষয়টি অসত্যে পর্য্যবসিত হয়। যাঁহারা এই মত স্বীকার করেন, তাঁহারা কহিয়া থাকেন যে, অনেক জাতির মধ্যে এই রূপ প্রবাদ আছে যে, এক সময়ে সত্যযুগ ছিল। যাহাই হউক, যদি এই মত সাধারণের মধ্যে প্রচলিত থাকে, তাহা হইলেও ইহা সপ্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। মনুষ্যের স্বভাবই এই যে আপনার নীচ অবস্থা অপেক্ষা পূর্ব্বাবস্থাকে উৎকৃষ্ট করিয়া দেখে; সে পূর্ব্বাবস্থাকে অলঙ্কৃত করিয়া বর্ণনা করে এবং পূর্ব্বাবস্থাকে স্মরণ করিয়া পরিতৃপ্ত হয়। কোন কোন জাতির মধ্যে যে এই মত প্রচলিত দৃষ্ট হইয়া থাকে, ইহা তাহাদিগের ঐ রূপ মনোবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্তই কল্পিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। গ্রিক জাতীয়েরা সত্যযুগকে পশ্চাদ্ভাগে নিরীক্ষণ করে; কিন্তু হিব্রুদিগের মধ্যে অনেকানেক ধর্ম্মশীল মনুষ্যেরা সম্মুখেই স্বর্গ রাজ্য উপস্থিত হইবার প্রত্যাশা করিয়া থাকেন। যাহাই হউক, যদি সবিশেষ অনুসন্ধান করা হয়, তাহা হইলে মানব জাতি যে নিকৃষ্ট অবস্থা হইতে ক্রমশ উৎকৃষ্ট অবস্থায় উপনীত হইতেছে, এই মতটি অনেক জাতির মধ্যেই প্রচলিত দেখা যাইতে পারে।

কেহ কেহ এই রূপও কহিয়া থাকেন যে, পূর্ব্বতন কোন সুসভ্য জাতির সাহায্য ব্যতিরেকে কোন জাতিই অসভ্যাবস্থা হইতে উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। এই বাক্য নিতান্ত অপ্রামাণিক! চীন, মেক্সিকো ও পেরু দেশীয়েরা কোন্ জাতির নিকট সাহায্য লাভ করিয়া উন্নত হইয়াছিল? অন্য দেশের সহায়তায় কোন কোন দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল বটে, কিন্তু যে দেশের সহায়তা লব্ধ হইতেছে, তাহার শ্রীবৃদ্ধি-কল্পে কোন্ দেশ আদর্শ হইয়াছিল? আমাদিগের এই রূপ বিশ্বাস আছে যে যদি কোন জাতি সহস্র বৎসর কাল আলোকের নিমিত্ত আলোকের উপকরণ ব্যবহার শিক্ষার্থ পর্য্যবসিত করে, তাহা হইলেও চারি সহস্র বৎসরের মধ্যে সে এক খানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ও রমণীয় নগরী প্রস্তুত করিতে সমর্থ হয়।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাসুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২৩। কলিগতাব্দ ৪৯৬৭। ২৩ ফাল্গুন বুধ বার।

SAHITYA PARISHAD LIBRARY ১৯১ বি

একমেবাদ্বিতীয়ং

ষষ্ঠ কল্প
চতুর্থ ভাগ
চৈত্র ১৭৮৮ শক।

২৮৪ সংখ্যা ৩৭ ব্রাহ্মসম্বৎ

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদ সংহিতা

প্রথমমণ্ডলস্য চতুর্দ্দশানুবাকে দ্বিতীয়ং সূক্তং।

গোতমঋষিঃ গায়ত্রীচ্ছন্দঃ মরুতোদেবতা।

১০০৭

১। মরু॑তো॒ যস্য॒ হি ক্ষয়ে॑ পা॒থা দি॒বো বি॑মহসঃ। স সু॑গো॒পাত॑মো॒ জনঃ॑।

১। হে 'বিমহসঃ' বিশিষ্টপ্রকাশাঃ 'মরুতঃ' 'দিবঃ' অন্তরিক্ষলোকাদাগত্য 'যস্য' 'হি' যস্য খলু যজমানস্য 'ক্ষয়ে' যজ্ঞগৃহে 'পাথ' সোমং পিবথ 'সঃ' 'জনঃ' জাতো যজমানঃ 'সুগোপাতমঃ' শোভনৈঃ পালকৈঃ অত্যন্তং যুক্তোভবতি।

১। হে দীপ্তিশীল মরুদ্গণ! তোমরা অন্তরীক্ষ হইতে আগমন করিয়া যে যজমানের গৃহে সোম পান করিয়া থাক, সেই ব্যক্তি সুরক্ষিত হয়।

১০০৮

২। য॒জ্ঞৈর্বা॑ যজ্ঞবাহসো॒ বিপ্র॑স্য বা মতী॒নাং। মরু॑তঃ শৃণু॒তা হব॑ং।

২। হে 'যজ্ঞবাহসঃ' যজ্ঞস্য বোঢ়ারঃ 'মরুতঃ' যূয়ং 'যজ্ঞৈঃ' 'বা' বা শব্দঃ সমুচ্চয়ে। যজ্ঞৈশ্চ যজমানস্য 'মতীনাং' স্তুতীনাং সম্বন্ধিনঃ 'বিপ্রস্য' বা অযজমানস্য মেধাবিনশ্চ 'হবং' আহ্বানং শৃণুত। যজ্ঞবতো যজমানস্য যাগরহিতস্য স্তোতুশ্চাহ্বানং ভবদ্ভিঃ শ্রোতব্যং যতো ভবন্তো যজ্ঞস্য বোঢ়ারঃ স্তুতিপ্রিয়াশ্চেতি ভাবঃ।

২। হে যজ্ঞবাহক মরুদগণ! তোমরা যজমান ও স্তোতার আহ্বান শ্রবণ কর।

১০০৯

৩। উ॒ত বা॒ যস্য॑ বা॒জিনোঽনু॒ বিপ্র॒মত॑ক্ষত। স গন্তা॒ গোম॑তি ব্র॒জে।

৩। 'উত' 'বা' অপিচ 'যস্য' যজমানস্য 'বাজিনঃ' হবির্লক্ষণান্নোপেতা ঋত্বিজঃ 'বিপ্রং' মেধাবিনং মরুদ্গণং 'অন্বতক্ষত হবিঃপ্রদানাদিনা তীক্ষ্ণীকুর্ব্বন্তি। 'সঃ' যজমানঃ 'গোমতি' বহুভিঃ গোভিঃ যুক্তে 'ব্রজে' গোষ্ঠে 'গন্তা' গমনশীলো ভবতি।

৩। যে যজমানের হবিরূপ অন্নসম্পন্ন ঋত্বিক্গণ মেধাবী মরুদ্গণকে হবি প্রদান দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন, সেই যজমান বহুসংখ্য গোসম্পন্ন গোষ্ঠে গমন করেন।

১০১০

৪। অ॒স্য বী॒রস্য॑ ব॒র্হিষি॑ সুতঃ সোমো॒ দিবি॑ষ্টিষু। উ॒ক্থং মদ॑শ্চ শস্যতে।

৪। 'দিবিষ্টিষু' যজনীয় দিবসেষু 'বর্হিষি' যজ্ঞে 'বীরস্য' শত্রুক্ষেপণ কুশলস্য অস্য মরুদ্গণস্য যাগার্থং 'সোমঃ' 'সুতঃ' ঋত্বিগ্ভিঃ অভিষুতো ভবতি। 'উক্থং' মরুদ্দেবতাকং শস্ত্রং 'মদশ্চ' মদি ধাতুনা যুক্তা মরুতো দেবাঃ সোমস্য মৎসন্নিত্যাদিকা মারুতী নিধিষ্টাস্য মরুদ্গণস্য কর্ম্মার্থং 'শস্যতে' হোত্রা পঠ্যতে। 'দিবিষ্টিষু' ইষ্টয়ঃ এষণানি গমনানি দিবো দ্যোতমানস্য সূর্য্যস্য যেষু দিবসেষু তে তথোক্তাঃ।

৪। যজ্ঞীয় দিবসে অনুষ্ঠিত যজ্ঞে মহাবীর মরুদ্গণের যাগার্থ সোম সংস্কৃত হয় এবং মরুদ্দৈবত উক্থ শস্ত্র ও মারুত-মন্ত্র মরুদ্গণের প্রীতির নিমিত্ত হোতা কর্ত্তৃক পঠিত হইয়া থাকে।

১০১১

৫। অস্য শ্রোষন্ত্বা ভুবো বিশ্বা যশ্চর্ষণীরভি। সূরং চিৎসস্রযীরিষঃ। ১। ৬। ১১।

৫ 'অস্য' যজমানস্য স্তুতিং মরুতঃ 'আ' আভিমুখ্যেন 'শ্রোষন্তু' শৃণ্বন্তু। 'যঃ' মরুদ্গণঃ 'বিশ্বাঃ' 'চর্ষণীঃ' সর্ব্বান্ শত্রুভূতান্ মনুষ্যান্ 'অভিভুবঃ' অভিভবতি। তাদৃগগুণকারা মরুতঃ শৃণ্বন্তু ইত্যর্থঃ। 'সূরং' 'চিৎ' স্তুতেঃ প্রেরয়িতারং যজমানমপীতো মরুদ্ভিঃ প্রত্তান্যন্নানি 'সসবীঃ' প্রাপ্তানি ভবন্তু। ১। ৬। ১১।

৫। যাঁহারা সকল শত্রুভূত মনুষ্যগণকে অভিভব করিয়া থাকেন, সেই মরুদ্গণ যজমানের স্তুতিবাক্য সম্যক শ্রবণ করুন। ইহাঁরদিগের কর্ত্তৃক প্রদত্ত অন্ন স্তুতিবাদক যজমানকে প্রাপ্ত হউক। ১। ৬। ১১।

মাসিক ব্রাহ্মসমাজ।

১ মাঘ ১৭৮৮ শক।

অদ্য আমারদিগের কি সুপ্রভাত! অদ্য সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা সূর্য্যের সূর্য্য, জ্যোতির জ্যোতি পরমেশ্বরের আহ্বানেই গাত্রোত্থান করিয়াছি। যিনি তরুণ প্রভাকরকে এই প্রাতঃকালে প্রেরণ করিয়া জগতের অন্ধকার বিদূরিত করিলেন, তিনি স্বয়ংই আমারদিগের অন্তরাকাশে অভ্যুদিত হইয়া হৃদয়ের মোহান্ধকার বিনষ্ট করিলেন। এখন তাঁহারই প্রকাশে আমরা অন্তর্ব্বাহ্য সকলই আলোকময়—সুধাময় অবলোকন করিতেছি। বাহিরে আমারদিগের নবোন্মীলিত চর্ম্ম-চক্ষু যাঁহার হস্তের চিহ্ন অবলোকন করিতেছে, অন্তরে আত্মার নিভৃত নিলয়ে বিজ্ঞান-নয়ন, সেই জ্যোতির সাগর প্রেমের আকর পরমেশ্বরেরই মঙ্গল মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ সন্দর্শন করত কৃতার্থ হইতেছে।

এই প্রাতঃকাল তো প্রতিদিনই পর্য্যায়ক্রমে আমারদিগের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। প্রতিদিনই তো প্রভাকর উজ্জ্বল-বেশে উদিত হইয়া জগতের শোভা সম্পাদন ও সুখসাধন করিতেছে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সূর্য্যোদয় সন্দর্শন-জনিত এমন পবিত্র মধুর আনন্দ প্রত্যহ অনুভব করিতে পারি না। কেমন করিয়াই বা অনুভূত হইবে? পশু পক্ষী সকল সূর্য্যের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকে বলিয়াই সূর্য্যোদয়ে তাহারা জীবন ও জ্যোতি পাইয়া জাগ্রৎ ও প্রফুল্লিত হয়, আমরা ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলিত তৃষিত হইয়া জাগ্রৎ হই না বলিয়াই এমন দেব-স্পৃহনীয় পবিত্র আনন্দ সম্ভোগ করিতে পারি না। সূর্য্যের প্রকাশে যখন চারিদিক্ প্রকাশিত হয়, আমারদের আত্মা তখন আত্ম-জ্যোতি বিহীনে চারিদিক্ অন্ধকার অবলোকন করে। চিত্র পুত্তলিকাকে বিবিধ সুরম্য সুসজ্জিত স্থানে আনয়ন করিলে সে কি সন্দর্শন করিবে? মৃত-মধুমক্ষিকাকে মধুপূরিত পর্ব্বত-সমান কুসুম রাশির মধ্যে সংস্থাপন করিলে কি ফল লাভ হইবে? ঈশ্বরই যে চক্ষুর চক্ষু, প্রাণের প্রাণ, তাঁর আবির্ভাবেই যে আত্মা জীবিত, তাঁর অভাবেই যে সে মৃত হইয়া পড়ে; সেই জন্যই যখন সেই

প্রাণের প্রাণকে লাভ করিতে না পারি, তখন এই সকলই প্রাণ-শূন্য শোভাশূন্য অর্থ শূন্য বোধ হয়। যখন তাঁর অনুরাগ-আলোকে চারিদিক্ অবলোকন করি, তখন সকলই সুসজ্জিত মধুরামৃত দেখিতে পাই।

প্রতিদিন প্রাতঃকালে বৃক্ষ লতা সকল শিশির-ধৌত হইয়া পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হয়, আমরা এই রমণীয় সময়ে কোথায় উৎসাহ ও অনুরাগের সহিত ঈশ্বর-পূজায় প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার প্রীতি-সরোবরে অবগাহন করত পরিস্নাত ও পরিস্নিগ্ধ হইব, না আগ্রহের সহিত বিষয় অনলে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাতঃকালের এমন স্বাভাবিক স্নিগ্ধ ভাবকেও উগ্র করিয়া তুলি। কোথায় হৃদয়ের শ্রদ্ধা ভক্তিকে উন্নত করিব, কোথায় ঈশ্বরের স্নিগ্ধ মঙ্গল জ্যোতিতে প্রীতি-কলিকাকে প্রফুল্ল প্রস্ফুটিত করিব, না স্বার্থপরতা বিষয়কামনা চরিতার্থ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া প্রত্যূষের এমন প্রসন্ন ভাবকেও বিষণ্ণ করিয়া ফেলি। সেই জন্যই প্রেমময় অমৃতময়ের সাক্ষাৎকার লাভ-জনিত প্রাতঃকালের এমন অমৃতময় মধুময় ভাব অনুভব করিতে সমর্থ হই না।

আমারদিগের সাধু ইচ্ছা থাকিলে, তাঁহাকে পাইবার জন্য প্রাণগত স্পৃহা থাকিলে, সহস্র বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়াও তিনি আমারদিগের আশা পূর্ণ করেন। কাল রজনী যোগে যখন বিশ্রাম-শয্যায় শয়ন করি, তখন এই আশা উদ্যমে প্রফুল্লিত হইয়া নয়ন-যুগল নিমীলিত করিয়াছিলাম, যে, কল্য প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা উত্থিত হইয়া সেই দেব-দেবের পূজার্চ্চনা করিতে ব্রহ্ম-মন্দিরে গমন করিব। কোথায় আমরা নিদ্রাবেশে হত-চেতন—হতজ্ঞান হইয়া আলস্য-শয্যায় পতিত ছিলাম, কোথায় অন্ধকারের মধ্যে অবস্থান করিতে ছিলাম, সেই অন্তর্যামী পুরুষ—সেই স্নেহময়ী জননী আমারদিগের হৃদয়ের ভাব, আত্মার ক্ষুধা তৃষ্ণা অবগত হইয়া প্রত্যূষেই স্বয়ং স্নেহভরে আহ্বান করিলেন, "বৎস উত্থান কর, রজনী অবসান প্রায় হইয়াছে, আমি তোমারদের পূজা গ্রহণের জন্য উপস্থিত হইয়াছি।" আমরা তাঁর সেই সস্নেহ মধুর আহ্বানে রোমাঞ্চিত-শরীরে সচকিত হইয়া গাত্রোত্থান করিলাম। তাঁহাকেই প্রণাম প্রণিপাত করিয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া দূরদূরান্তর হইতে এখানে আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছি। তিনিও আমারদিগের প্রার্থনানুরূপ তাঁহার সেই সর্ব্ব-সন্তাপ-নাশিনী মঙ্গল মূর্ত্তি এখন আমারদিগের সম্মুখে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি মাতার ন্যায় স্নেহের সহিত এই সুপ্তোত্থিত সন্তান-সকলকে তাঁহার সুশীতল ক্রোড়ে স্থান দান করিয়াছেন। হে সাধু-সজ্জন সকল! তোমরা এখন যাঁর ক্রোড়ে সুখে অবস্থান করিতেছ, একবার জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ, স্নেহময়ী জগন্মাতা তোমাদিগকে কেমন অনিমিষ-নেত্রে, সস্নেহে নিরীক্ষণ করিতেছেন। তাঁহার ক্রোড়শায়ী হইয়া তাঁহাকে বিস্মৃত হইও না, জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন করিয়া তাঁর পবিত্র প্রফুল্ল আনন সন্দর্শন করিয়া জীবনকে স্বার্থক কর। বালকেরা যেমন ব্যাকুলিত হইয়া এই প্রাতঃকালে মাতার নিকটে অন্নপান যাচ্ঞা করিতেছে, আইস আমরা সকলে সরল ভাবে বিনম্র হৃদয়ে তদপেক্ষা অধিকতর আগ্রহের সহিত আত্মার ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ জন্য তাঁহার নিকটে তাঁহাকেই প্রার্থনা করি। যিনি সহস্র জীবের সহস্রবিধ কামনা পূর্ণ করিতেছেন, আমরা কি অশ্রু-পূর্ণ-নয়নে যোড়করে তাঁর দ্বারে আসিয়া তাঁহাকে প্রার্থনা করিয়া নিরাশ হইব?

তিনি আমারদের এমন মাতা নন, যে তাঁর নিকটে কেহ যাচ্ঞা ও প্রার্থনা করিয়া নিরাশ হয়। প্রার্থনা না করিলেও যিনি আমারদিগের অভাব অপ্রতুল জানিয়া প্রতিক্ষণ অসংখ্য অযাচিত সুখ বিধান করিতেছেন, তখন কি তাঁহাকে আমারদিগের হৃদয়ের এই গূঢ় গম্ভীর অভাব অবগত করিলে তিনি তাহা পূর্ণ করিবেন না? যশ মান ধন ঐশ্বর্য্য নয়, কেবল তাঁহাকে দেখিতে চাহিলে কি তিনি আমারদিগকে নিরাশ করিবেন? কখনই না। তিনি আমাদের ব্যাকুলতা কাতরতা দেখিলে, তিনি আমারদের অন্তস্ফূর্ত্ত সকরুণ প্রার্থনা বাক্য শ্রবণ করিলে নিশ্চয়ই আমারদিগের নিকটে প্রকাশিত হইয়া সকল অভাব বিদূরিত করিবেন, সকল আশা পূর্ণ করিবেন। হে স্নেহময়ী জগন্মাতা! আমরা সমস্ত রজনী নিদ্রাতে অভিভূত হইয়া তোমাকে দেখিতে পাই নাই, তুমি কৃপা করিয়া আমারদিগের নিকটে উজ্জ্বল রূপে প্রকাশিত হও। আমরা তোমার জন্য ক্ষুধিত পিপাসিত হইয়া এখানে আগমন করিয়াছি, তুমি দর্শন দিয়া আমারদের আত্মার ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ কর। আমরা তোমার পূজার জন্য প্রাতঃপ্রস্ফুটিত প্রীতি-কুসুম লইয়া এখানে আগমন করিয়াছি, তুমি আমারদের পূজা গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ কর। আমরা অবিচ্ছেদে তোমার মঙ্গলরূপ সত্য স্বরূপ দর্শনের অভিলাষী হইয়া তোমার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি, তুমি আমারদিগের নিকট চির প্রকাশিত থাকিয়া এ জীবনকে সার্থক কর। এই প্রাতঃ সূর্য্যের ন্যায় আমারদের নিকটে ক্রমে ক্রমে তুমি তোমার পূর্ণ প্রভা প্রকাশ কর, যে আমরা দিন দিন অধিকতর উৎসাহ ও অনুরাগের সহিত তোমার ধ্যান ধারণায়, পূজার্চ্চনায় নিযুক্ত থাকিয়া এ জীবন কাল অতিবাহিত করি। হে ঈশ্বর! তুমি আমারদের এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রহ্ম-বিদ্যালয়।

একাদশ উপদেশ।

ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি ও মহাপ্রলয়।

"যে পূর্ব্ব পুরুষের শক্তি হইতে এই সকল বস্তু উৎপন্ন হইয়া স্বীয় স্বীয় শক্তি লাভ করিয়াছে, যদি তিনি তাহারদিগকে সংহার করিবার ইচ্ছা করেন, তবে স্বীয় স্বীয় শক্তির সহিত সমুদায় বস্তু তাঁহার শক্তিতে লয় হইয়া তাঁহাতেই পুনর্ব্বার গমন করিবেক, তাহারদিগের চিহ্নমাত্রও কুত্রাপি দৃষ্ট হইবেক না।"

ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম, পূর্ণ-মঙ্গল পরমেশ্বরকে সৃষ্টি-কর্ত্তা, স্থিতি-কর্ত্তা বলিয়া যেমন প্রতিপন্ন করেন, সেই প্রকার প্রলয়-কর্ত্তা বলিয়া যে উপদেশ প্রদান করেন, তাহার উদ্দেশ্য কি? অবশেষে ঈশ্বর এই সমুদয় জগৎ সংসারকে একেবারে যে ধ্বংশ করিবেন, এক সময়ে যে মহাপ্রলয় উপস্থিত হইবেই হইবে, ব্রাহ্মধর্ম্মের ইহা সিদ্ধান্ত নহে, কিন্তু ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি প্রতিপন্ন করাই ইহার উদ্দেশ্য—ঈশ্বরের শক্তিতে কিছুই অসাধ্য নাই, ইহাই প্রতিপন্ন করা ইহার উদ্দেশ্য। এই জন্য উক্ত হইয়াছে "যদি তিনি তাহারদিগকে সংহার করিবার ইচ্ছা করেন, তবে স্বীয় স্বীয় শক্তির সহিত সমুদায় বস্তু তাঁহার শক্তিতে লয় হইয়া তাঁহাতেই পুনর্ব্বার গমন করিবেক, তাহারদিগের চিহ্নমাত্রও কুত্রাপি দৃষ্ট হইবেক না।"

এই জগৎ পূর্ব্বে কিছুই ছিল না এবং আপনা হইতেও উৎপন্ন হয় নাই; সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর ইহাকে অসৎ অবস্থা হইতে উৎপন্ন করিয়া রক্ষা করিতেছেন। সমুদায় জগৎ তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যে বস্তুতে যত প্রকার শক্তি আছে, তাহা তিনিই প্রয়োজন অনুসারে বিতরণ করিয়াছেন। কি আত্মা কি জড় উভয়েই তাঁহার অলৌকিক শক্তি দ্বারা নিজ নিজ সত্তা ও সমুদায় শক্তি লাভ করিয়া বিচিত্র কার্য্য-সকল চির কাল সম্পাদন করিতেছে। সেই সত্তা ও সেই সমস্ত শক্তি স্বতন্ত্রস্বরূপ পরমেশ্বরের নিতান্ত পরতন্ত্র। যেমন বাক্য-প্রয়োগ, গতিক্রিয়া ও হস্ত-সঞ্চালন আমাদের ইচ্ছার নিরপেক্ষ হইয়া স্বতন্ত্ররূপে সম্পন্ন হইতে পারে না, প্রত্যুত আমাদের ইচ্ছার নিতান্ত পরতন্ত্র হইয়া থাকে, সেই রূপ জগতের কোন পদার্থ ঈশ্বরেচ্ছা-নিরপেক্ষ হইয়া সত্তা ও শক্তি অধিকার করিতে পারে না। আমাদের ক্রিয়ার সহিত আমাদের যে রূপ যোগ, সমুদায় জগতের সহিত ঈশ্বরের সেই রূপ যোগ। সমস্ত জগৎ পরম কারণ পরমেশ্বরেরই কার্য্য। আমরা কর্ত্তৃত্ব সহকারে যে সকল কার্য্য করি ও জড় জগৎ প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে যে সকল ঘটনা উপস্থিত করে, ঈশ্বর তৎসমুদায় কার্য্যের সাক্ষাৎ কর্ত্তা নহেন বটে, কিন্তু আমাদের ও আমাদের কর্ত্তৃত্ব শক্তির এবং জড় জগতের ও সমুদায় প্রাকৃতিক নিয়মের সাক্ষাৎ কর্ত্তা। আমাদের ক্রিয়া তাঁহার সাক্ষাৎ কার্য্য নহে কিন্তু আমরা তাঁহার সাক্ষাৎ কার্য্য। ঈশ্বর কোন সৃষ্ট বস্তুকে সৃষ্টি শক্তি দেন নাই, এই জন্য তাহারা কোন বস্তুকে সৃষ্টি করিতে পারে না; সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর বস্তু-সকলকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আমাদের সত্তা ও শক্তি আমাদের নিতান্ত অনায়ত্ত; কিন্তু তাহা আমাদের ইচ্ছায়ত্ত ক্রিয়ায় পরমেশ্বরের অতিমাত্র আয়ত্ত। অতএব আমরা যেমন ইচ্ছা করিলেই আমাদের ক্রিয়া-সকল প্রতিসংহার করিতে পারি; সেই রূপ ঈশ্বর যদি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে কি আত্মা কি জড় সমুদায় পদার্থ স্বস্ব শক্তির সহিত ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে, তাঁহার যে শক্তি এই সৃষ্টি-রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা তাঁহাতেই অব্যক্ত রূপে অবস্থান করিবে;—পূর্ব্বের ন্যায় পুনর্ব্বার জগতের অসৎ অবস্থা উপস্থিত হইবে।

কিন্তু অদ্যাপি ঈশ্বরের পালনী ইচ্ছা বর্ত্তমান রহিয়াছে; এই সুস্নিগ্ধ ইচ্ছা যে ভবিষ্যতে ভীষণ সংহার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবে, তাহার তো কোন লক্ষণই লক্ষিত হইতেছে না। এবং তিনি সৃষ্ট পদার্থকে যে সকল শক্তি প্রদান করিয়াছেন, সমস্ত জগতে যে সকল নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন, যে কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলে সমুদায় পদার্থ বদ্ধ হইয়া আছে, তৎসমুদায় তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা কর, তাহাতে সংহারের কোন কারণই উপলব্ধ হইবে না, প্রত্যুত তাহাতে কেবল মঙ্গলেরই চিহ্ন—উন্নতিরই নিদর্শন দেখিতে পাইবে। সুতরাং ইহা বলা বাহুল্য যে, জগতের মধ্যেও জগৎ-সংহারের কোন কারণ বিদ্যমান নাই। কি আত্মা কি জড় কাহারও এমন কোন শক্তি নাই যে, ইহারা পরস্পরকে বা আপনাকে ধ্বংস করিতে পারে। যে শক্তি আছে, তদ্দ্বারা বস্তু সকলের অবস্থান্তর উৎপন্ন হইতে পারে কিন্তু কোন নূতন বস্তু উৎপাদন বা পুরাতন বস্তু ধ্বংস হইতে পারে না। ফলতঃ ঈশ্বর স্বহস্তে ধ্বংস না করিলে জগতের এক কণামাত্র পদার্থও কদাপি বিনাশ প্রাপ্ত হইবে না। ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে ইহার কিছুই অবশিষ্ট থাকিতে পারে না। কেন না ঈশ্বর সর্ব্ব-শক্তিমান্ ও জগৎ তাঁহার সম্পূর্ণ পরতন্ত্র।

বস্তুত মহাপ্রলয়ের সম্ভাবনা নাই; ঈশ্বরকে সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্তা বলা কেবল তাঁহার অনন্ত শক্তির পরিচয় দিবার নিমিত্ত। তিনি যেমন সর্ব্বশক্তিমান্, তেমনি

পূর্ণমঙ্গল। তাঁহার যাহা ইচ্ছা হয়, তিনি তাহাই করিতে পারেন, কিন্তু যাহা মঙ্গল, তিনি কেবল তাহাই ইচ্ছা করেন। উদার প্রীতি, অসীম করুণা, অখণ্ড ন্যায়, পরিপূর্ণ মঙ্গল ভাব কদাপি তাঁহার ইচ্ছা হইতে পৃথক্ হইতে পারে না। যে ঘটনায় পাপ ও পুণ্য একই ফল প্রসব করিবে, যে ঘটনায় দয়া ও নিষ্ঠুরতা একাকার হইবে, জ্ঞান-সমুদ্র মঙ্গলময় ঈশ্বরের রাজ্যে তাহা কখনই উপস্থিত হইবে না। সেই "একোবশী" পরমেশ্বর কোন বিকারের বশবর্ত্তী নহেন, তিনি স্বতন্ত্র স্বরূপ; পরিপূর্ণ প্রজ্ঞা তাঁহার চক্ষু, অপ্রতিহত ইচ্ছা তাঁহার হস্ত, মঙ্গল কার্য্যই তাঁহার সংকল্প। তিনি বিনা প্রমাদে সমুদায় দর্শন করেন এবং অবাধে স্বীয় সঙ্কল্পিত মঙ্গল কার্য্য সম্পাদন করেন। তিনি মঙ্গলের প্রসূতি, ধ্বংস তাঁহার ভাবের বিপরীত বস্তু, আমাদের কল্পনা মাত্র। সেই অনন্ত-মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বর অনন্ত কালের জন্য বিশ্ব সংসার সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি ইহাকে কোন কালেই ধ্বংস হইতে দিবেন না। আত্মা-সকল চির কালই অনন্ত উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। জড় জগৎ চির কালই বিবিধ প্রকারে আত্মার আনুকূল্য করিতে থাকিবে। আত্মার পৌরুষ দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইবে, প্রকৃতির মুখশ্রীও ক্রমশ পরিপুষ্ট ও উৎকৃষ্ট হইতে থাকিবে। লোকান্তর-সকল জীব-পুঞ্জে দিন দিন পরিপূর্ণ হইবে। আমরা নব নব লোকে ঈশ্বরের নব নব মহিমা অনুভব করিতে থাকিব! ভোগের অন্ত নাই, দৃশ্যের সীমা নাই, ভোক্তার বিনাশ নাই; দ্রষ্টার বিশ্রাম নাই; কার্য্য অশেষ, কর্ত্তা চিরায়ুঃ, পথ অসীম, পথিক অক্লান্ত। ভয় নাই, মৃত্যু নাই, নৈরাশ্যের কারণ নাই; সংসার চিরস্থায়ী, তুমি চিরজীবী। ঈশ্বরকে বিশ্বাস কর—তিনি মঙ্গলময় পিতা, আমরা চিরঞ্জিবী সন্তান, জগৎ অক্ষয় গৃহ।

থিওডোর পার্কর।

২৮৩ সংখ্যক পত্রিকার ২৩২ পৃষ্ঠার পর।

কেহ কেহ কহেন যে, মনুষ্যের প্রথমাবস্থায় একেশ্বরের উপাসনা প্রচলিত হইয়াছিল। যখন মনুষ্যজাতির স্বাতন্ত্র্য আছে এবং মনুষ্যের ঈশ্বর-জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ, তখন এই সিদ্ধান্ত যে অভ্রান্ত ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু ইতিহাস ইহার অন্যথা প্রতিপাদন করিতেছে। ইতিহাস-পাঠে ইহা সুস্পষ্টই অবগত হওয়া যায় যে, অধিকাংশ লোক জড়োপাসনা ও বহুদেব দেবীর উপাসনা অবলম্বন করিয়া আছে। বর্ত্তমানের কথা দূরে থাকুক, অতি প্রাচীন কালেই ধর্ম্মের হীনাবস্থা প্রত্যক্ষ হয়। সুপ্রসিদ্ধ ইতিবৃত্ত-লেখক মহাত্মা হিরোডোটস্ যে সমস্ত অসভ্য জাতির বৃত্তান্ত প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহারদিগের কি আধ্যাত্মিক কি সামাজিক সকল প্রকার অবস্থা এক্ষণকার অসভ্যদিগের অবস্থা অপেক্ষা যৎসামান্য ছিল। পূর্ব্বে যে সমস্ত জাতির উল্লেখ করা হইয়াছে, উহারদের আদি অবস্থা যত অনুসন্ধান করা যায়, নীতি, ধর্ম্ম ও সমাজের দশা ততই নীরস বোধ হইয়া থাকে। এই সকল ও অন্যান্য জাতি সর্ব্বাগ্রে জড়োপাসক ছিল। ফলত ঐতিহাসিক প্রমাণ দৃষ্টে ইহা স্পষ্টই বোধ হয় যে, কোন জাতিই আদি অবস্থায় প্রকৃত সত্য ধর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। সুতরাং আদি কালে সত্যযুগের কল্পনা নিতান্ত অমূলক বলিয়াই বোধ হয়।

ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস যেমন সাধারণ, পরকালে বিশ্বাসও সেই রূপ। কি অসভ্য

কি সভ্য সকল জাতির মধ্যেই এই এই বিশ্বাসের ভাব প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। ধর্ম্মের যত প্রকার-ভেদ আছে, কোন স্থলেই ইহা বিস্মৃত হয় নাই। এক্ষণে ইহার কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, মনুষ্যের স্বাভাবিক যে এক অনন্ত ইচ্ছা ও অমরত্বের ভাব আছে, তাহার প্রভাবেই এই নৈসর্গিক বিশ্বাস উৎপন্ন হইয়াছে। সভ্য জাতির তো কথাই নাই, যে সমস্ত জাতি নিতান্ত অসভ্য, যাহাদিগের সহজ জ্ঞানই একান্ত প্রবল, আমরা তাহারদিগের মধ্যে এই স্বাভাবিক বিশ্বাস বিদ্যমান দেখি। উহারা কল্পনা বলে এমন একটি স্থান প্রস্তুত করিয়া লইয়াছে, যথায় মৃত মনুষ্যের আত্মা আহূত হইয়া পার্থিব অন্যায় ব্যবহারের নিমিত্ত দণ্ড ও সৎ কার্য্যের নিমিত্ত প্রকৃত পুরস্কার লাভ করে। এই পরলোকের বিশ্বাস সাধারণেরই যে বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু যে জাতির যেরূপ স্বভাব ও অবস্থা তদনুসারে সে পরলোকের ব্যবস্থা সঙ্কলন করিয়াছে। কোন কোন জাতি লোকান্তরকে সংগ্রাম-স্থান, কেহ কেহ শান্তি-স্থান, কেহ কেহ ইন্দ্রিয়-বৃত্তি উপভোগের স্থান, কেহ কেহ আধ্যাত্মিক বৃত্তি চরিতার্থ করিবার স্থান, কেহ কেহ পরিবর্ত্তের স্থান, কেহ কেহ উন্নতির স্থান বলিয়া কল্পনা করিয়াছে। যে জাতি লোকান্তরগত যে রূপ ব্যবস্থা স্থাপন করে, তদ্দ্বারা তাহার ঐহিক জীবনের অবস্থা সম্পূর্ণ অবগত হওয়া যায়। এই লোকান্তরগত ব্যবস্থা বিষয়ে পৌত্তলিক খৃষ্টান ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মত পরস্পর সম্পূর্ণ বিরোধী। যাহাই হউক মনুষ্যের পরলোকের ভাব যে যথার্থ, ইহাতে আর সংশয় নাই; কিন্তু পরলোকের অবস্থাগত নির্ণীত ভাব সমুদায় কেবল বিষয়-নিষ্ঠ, সুতরাং উহার যাথার্থ্যের পক্ষে সন্দেহ উপস্থিত হইবার সম্পূর্ণই সম্ভাবনা। মনুষ্যের অসভ্যাবস্থা অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারদিগের ঐ অবস্থায় ধর্ম্মের ন্যায় পরলোকের মতও নিতান্ত অসংস্কৃত ছিল।

অসভ্যাবস্থায় মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি যার পর নাই নিস্তেজ হইয়া থাকে। যখন সভ্যতার ক্রমশ উন্মেষ হয়, তখন তাহারা পরকালের প্রমাণ অনুসন্ধান করে। ঐ অবস্থায় পরকালের স্বতোত্থিত ভাব উহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারে না এবং ঈশ্বরের অনন্ত মঙ্গল ভাব যে প্রত্যেক মনুষ্যের শুভ সাধনে উদ্যত আছে, উহারা তাহাও সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত থাকে। সুতরাং পরকাল-বিষয়ে উহারদিগের সম্পূর্ণ সন্দেহ উপস্থিত হয়। সহজজ্ঞানের সহিত বুদ্ধির বিরোধ জন্মে এবং বুদ্ধি এককালে সহজ জ্ঞানের পরিপন্থী হইয়া উঠে। কিন্তু যখন কোন একটি ঘটনা-সূত্র উহাদিগের মনে এমন একটি ভাব উদ্বোধিত করিয়া দেয়, যাহা তর্কশাস্ত্র-প্রতিপাদিত সত্য ভাব অপেক্ষাও সার, তখন উহারদের পরকালের প্রতি নৈসর্গিক বিশ্বাস প্রবল হইয়া উঠে। এক্ষণে পরলোক-বিষয়ে স্বতন্ত্র তিনটি বিষয় উপলব্ধ হইতেছে; প্রথম, পরকালে বিশ্বাস; দ্বিতীয়, পরকালের নির্ণীত অবস্থা; তৃতীয়, পরকালের প্রমাণ। প্রমাণ ও অবস্থা প্রকৃত নাই হউক, কিন্তু বিশ্বাস যে দুরপনেয় তাহাতে আর কোন সংশয়ই নাই।

কেহ কেহ কহিয়া থাকেন যে, পেট্রিয়ার্চেরাও পরলোকের বিষয় সুস্পষ্ট বুঝিয়াছিল, কেহ কেহ কহেন যে প্রাচীন বাইবলে ইহার উল্লেখও নাই। যাহাই হউক এই দুই কথাই অযৌক্তিক। হিব্রুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের কোন কোন অংশে পরলোক-

বিষয়ে কত গুলি অবিশ্বাস্য ও কাল্পনিক অভিপ্রায় আছে বটে, কিন্তু উহাতে পরলোকের উপর একটি দৃঢ় বিশ্বাসের ভাব দেখিতে পাওয়া যায় এবং কোন কোন অংশে পরলোকের প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাসের চিহ্নও দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে যে যে অংশ অগ্রে প্রস্তুত হইয়াছিল, তৎসমুদায়ে পরলোক যে মনুষ্যের একান্ত প্রয়োজনীয় ইহার কিছুমাত্র আভাস নাই; নিয়ম পুস্তক ইহার কিছুই নির্ণয় করিয়া যায় নাই এবং ইহুদিদিগের উপাসনা প্রণালীতেও ইহার কোন চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহারা কখন দেহের শোণিতকে, কখন নিশ্বাসকে এবং কোন স্থলে রক্তাশয় ও কোন স্থলে অন্ত্রকে আত্মার আশ্রয় স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। যাহাই হউক পরলোকের ভাব এই সমস্ত পুস্তকে নিতান্ত অস্পষ্ট রহিয়াছে। মৃত ব্যক্তিদিগের অবস্থা নিতান্ত তমোময় ও নিরানন্দময় বলিয়া উহাতে উল্লিখিত হইয়াছে।' পরলোকে ভৃত্য প্রভুর সহিত সম্পর্ক শূন্য এবং প্রভুরও মহিমার ছায়া মাত্র অবশিষ্ট থাকে বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে আরও দেখা যায় যে, মৃত মহাপুরুষেরা জীবিত ব্যক্তির শিক্ষা বিধানের নিমিত্ত পুনরায় আহূত হইতে পারেন। ইনক ও ইলিজা ঈশ্বরের অতিশয় প্রিয় পাত্র ছিলেন। এই নিমিত্ত উহাঁরদিগকে মৃত্যু যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় নাই। ঈশ্বর স্বয়ংই উহারদিগকে পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত করেন। এতদ্ভিন্ন ধর্ম্ম পুস্তক সংক্রান্ত অন্যান্য অংশ পরলোকের বিষয় এক কালে অস্বীকার করিয়াছে।

ইহুদিদিগের নির্ব্বাসন স্থান হইতে প্রত্যাগমন করিবার পর পরলোকের মত অপেক্ষাকৃত সুস্পষ্ট হইয়াছিল। ইজেকিএল মৃত্যুর পর দেহের পুনরুত্থানের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। এই মতটি বোধ হয়, জোরোষ্টার অপেক্ষা প্রাচীন। সোলোমনের জ্ঞান নামক পুস্তক এবং মাকাবির চতুর্থ পুস্তকে এই মত বিষদ ভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। মাকাবির দ্বিতীয় পুস্তকে মৃত্যুর পর মনুষ্য মাত্রেরই পুনরুত্থানের বিষয় দৃষ্ট হয় এবং উহাতে আরও কহে যে, ধার্ম্মিকেরা লোকান্তরে সুখ ও নিষ্ঠুর লোকেরা লজ্জা প্রাপ্ত হইবে। তথায় সকলেই পূর্ব্ব-পরিচিত পার্থিব বন্ধুগণকে দেখিতে পাইবে এবং চিরাবলম্বিত ব্যবসায় গ্রহণ করিবে।

খ্রিষ্টের সময় ফারিসিসেরা মৃত্যুর পর পুনরুত্থান, পুণ্যের নিমিত্ত পুরস্কার ও পাপের নিমিত্ত দণ্ড স্বীকার করিত। ইহারদিগের মধ্যে কেহ কেহ পুনর্জ্জন্ম ও এই জন্মের পূর্ব্বে জন্মান্তরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিত। ইসেনেস মৃত্যুর পর পুনর্জ্জন্ম স্বীকার না করিয়া আত্মার অমরত্ব ও পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কারের বিষয়ে বিশ্বাস প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার মত এই যে আত্মা সূক্ষ্ম বায়বীয় পদার্থ। উহা দেহরূপ কারাগারে বদ্ধ হইয়া আছে। মৃত্যু উহাকে এই বদ্ধভাব হইতে মুক্ত করিয়া দেয়। তখন এই জীবিত আত্মা আনন্দিত হইয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া থাকে। আমরা মহাত্মা ফিলোর আত্মার বিষয়ে এই রূপ অভিপ্রায় দেখিতে পাই। বোধ হয়, খ্রিষ্টের সময় যাহারা পরলোকে বিশ্বাস করিত, তাহারদিগের প্রত্যেকেরই চিন্তাশীল মনে এই সমস্ত ভাব উদিত হইয়াছিল। কিন্তু সাদ্দুসিস্ এই মতে আস্থা প্রদর্শন করেন নাই।

অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে এই বিশ্বাসের ভাবটি সাধারণ। ইহারদিগের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া প্রণালী ও মৃত ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত প্রার্থনা আলোচনা করিলে ইহা অনায়াসেই প্রতিপন্ন হয়। আমেরিকার অসভ্যেরা মৃত

যোদ্ধাগণের ধনুর্ব্বাণ প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র ও পরিচ্ছদ সমাধিক্ষেত্রে উহাদিগের সহিত নিখাত করিয়া রাখে। সীদিয়, গথ, আমেরিকান ও অর্দ্ধ সভ্য গ্রীকেরা কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে তাঁহার সহিত তাঁহার অশ্ব বা ভৃত্য, স্ত্রী বা বন্দীকে ভূগর্ভে নিখাত বা চিতাগ্নিতে দগ্ধ করিত। ইহাদিগের অভিপ্রায় এই যে, মৃত ব্যক্তির সহিত অশ্বাদি নিখাত করিলে মৃত ব্যক্তিরা লোকান্তরে সসম্ভ্রমে গমন করিতে পারিবেন। পুনর্জ্জন্ম, মৃত ব্যক্তির দেবত্ব প্রাপ্তি, উহার সম্মানার্থ নানা প্রকার অনুষ্ঠান, সমাধি-কালে বিবিধ দ্রব্য প্রদান, এই সমুদায়ই পরলোকের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাসের চিহ্ন। ইজিপ্টিয়, গল্ ও স্কান্দিনেভিয়েরা মৃত্যুকে জীবনের একটি আবশ্যক ঘটনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। লুকান নামক এক ব্যক্তি কহিয়াছেন যে, স্কান্দিনেভিয়েরা যখন আত্মার অনন্ত কাল অবস্থিতির বিষয় বিশ্বাস করে, তখন উহারা অতিশয় সাহসী সন্দেহ নাই।

প্রায় সকল অসভ্য জাতিই মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকে। তাহাদিগের মত এই যে, মৃত্যু হইলে এক কালে সমুদায় নির্ব্বাণ হয় না, প্রত্যুত উহা একটি জীবনের পরিবর্ত্ত বিশেষ। উহারা কহে যে স্বর্গ পৃথিরীর ন্যায়। পৃথিবীতে যে সমস্ত অভাব আছে, স্বর্গে তাহার কিছুমাত্র দৃষ্ট হয় না। ফলত উহারা পৃথিবীকে ভূষিত করিয়া স্বর্গ রূপে দর্শন করিয়া থাকে। প্রথমত উহাদের এই রূপ ভাব ছিল যে পরলোক দণ্ড পুরস্কারের স্থান নহে। ঐ স্থানে ঈশ্বরের বিচার-সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত নাই। কিন্তু সময় যত অতীত হইতেছে, ততই উহাদিগের পরলোক বিষয়ে অভিপ্রায় বিশুদ্ধ ভাব ধারণ করিতেছে। পনি জাতীয়েরা মৃত ব্যক্তিদিগের স্থান একটি, স্কান্দিনেভিয়েরা দুইটি, পারসীকেরা সাতটি এবং হিন্দুরা চব্বিশটি কল্পনা করিয়া থাকে।

সংস্কৃত সাহিত্য।

২৮২ সংখ্যক পত্রিকার ২১১ পৃষ্ঠার পর।

বৈদিক গ্রন্থ সমুদায় পর্য্যালোচনা করিলে তাহা হইতে এমন কত গুলি লক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, তাহার সাহায্যে বৈদিক কালের গ্রন্থ ও বৈদিক কালের পর যে সমস্ত গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা অনায়াসেই বিচার করিয়া লওয়া যাইতে পারে। এক্ষণে প্রত্যেক গ্রন্থের বিশেষ বিশেষ নিগূঢ় লক্ষণ উদ্ধার করা তাদৃশ সহজ নহে; কিন্তু পাঠ মাত্রেই যে সমস্ত আমাদিগের বোধগম্য হয় এই উভয় কালগত গ্রন্থ-সমুদায়ের শ্রেণী-বিভাগ বিষয়ে তাহাই যথেষ্ট হইবে। বৈদিক কালের গ্রন্থ আলোচনা করিলে ইহাই দৃষ্ট হয় যে এক্ষণকার ব্যাকরণ অনুসারে যে সমস্ত পদ সিদ্ধ হইয়া থাকে, বৈদিক গ্রন্থ কর্ত্তারা তাহা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিলেন। এই নিমিত্ত ব্যাকরণ-কারেরা বেদের এই রূপ নিরঙ্কুশ ব্যবহারকে বৈদিক প্রয়োগ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং এই অসাধারণ লক্ষণ দ্বারা উভয় কালগত গ্রন্থ সহজেই নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। মনু-প্রণীত ধর্ম্ম-শাস্ত্রে কতক গুলি প্রাচীন বৈদিক রীতি অনুসৃত হইয়াছে। গ্রন্থকার বেদোক্ত সূক্ত শ্লোক রূপে পরিণত করিতে গিয়া কোন কোন স্থলে বৈদিক শব্দ ও বৈদিক প্রণালী স্বগ্রন্থ-মধ্যে অবিকল রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তিনি যেরূপ ভাষার রীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার সহিত উহার সম্পূর্ণ বিষম্যাদিত্ব লক্ষিত হইয়া থাকে। এমন কি, বৈদিক

গ্রন্থে ঐ সকল শব্দ ও প্রণালীর যে একটি সুন্দর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাতে তাহার অনেক ব্যত্যয় হইয়াছে।

বৈদিক গ্রন্থে যে রূপ গদ্য আছে, বৈদিক কালের পরে যে সমস্ত গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে, তৎসমুদায়ে ঐ রূপ গদ্যের অনুকরণ দেখা যায় না। গদ্যের ন্যায় পদ্যও উভয় কালীন গ্রন্থের বিভেদ নির্দ্দেশের বিশেষ প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। কতক গুলি বৈদিক ছন্দ বৈদিক কালের পরেও অন্যান্য গ্রন্থে পরিগৃহীত হইয়াছে বটে কিন্তু এই সমস্ত গ্রন্থে এমন সকল ছন্দ আছে, যাহা বৈদিক গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। সুতরাং ইহাও এই উভয় কালীন গ্রন্থ সমূহের বিভেদ জ্ঞানের একটি প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে।

এই ছন্দোগত বৈচিত্র্যই বৈদিক ও অবৈদিক গ্রন্থের স্বরূপ-গত বৈচিত্র্য সুস্পষ্টই প্রতিপাদন করিতেছে। ভারতবর্ষে যে সকল গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে, ছন্দোগত বৈচিত্র্য যে কেবল তাহাদিগের মধ্যে ব্যবধান স্বরূপ হইয়া কাল বৈসম্য প্রদর্শন করিতেছে, তাহা নহে, অন্যান্য স্থানে অতি প্রাচীন কালীন অন্যান্য জাতির গ্রন্থের কালগত সীমার নির্ণয় করিতে হইলে ছন্দই বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে। যদি এক জন কবি কোন এক ছন্দকে সাধারণের শ্রুতিসুখকর করিতে পারেন, তাহা হইলে অন্যান্য কবিরাও তাঁহার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিতে যত্নবান হন। ক্রমশ এই অভিনব ছন্দঃ-প্রিয়তা এত প্রবল হইয়া উঠে যে উহা প্রাচীন প্রথা এক কালে অতিক্রম করে এবং পূর্ব্বতন যে সমস্ত কবিতা এক সময়ে সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া ছিল, তাহা এক কালে বিস্মৃত করিয়া দেয়।

এক্ষণে ইহাই নির্ণীত হইতেছে যে, অনুষ্টুপ ছন্দের শ্লোক বৈদিক কালে সম্যক অপরিজ্ঞাত ছিল। সুতরাং ঐ সমস্ত অনুষ্টুপ শ্লোক-সঙ্কলিত গ্রন্থ যে বৈদিক সময়ের পরে প্রস্তুত হয়, তাহা উল্লেখ করা নিরর্থক। কেহ কেহ এইরূপ কহিতে পারেন যে বেদের সুক্ত মধ্যে এবং ব্রাহ্মণ ও সূত্রে অনুষ্টুপ ছন্দ আছে; সূত্র মধ্যে যে বিষয় গদ্য প্রণালী অনুসারে একবার উল্লিখিত হইয়াছে, সেই বিষয় অনুষ্টুপ ও ত্রিষ্টুপ্ ছন্দে পুনরায় সংক্ষেপে বর্ণিত দৃষ্ট হয়। এই আপত্তি তাদৃশ বলীয়ান বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না। কারণ এক সময়ে এই ছন্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। এমন কি এই ছন্দ যখন প্রচলিত হইতে আরম্ভ হয়, তখন ইহাতে বহুসংখ্য পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে। বৈদিক গ্রন্থ মধ্যে ইহার সদ্ভাব আছে বটে কিন্তু পুরাণাদির ন্যায় অবিরল নহে। সুতরাং এই অনুষ্টুপ ছন্দই সংস্কৃত সাহিত্যের সময়-বিভাগ বিষয়ে বিশেষ প্রমাণ স্থল, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়।

যে সমস্ত গ্রন্থ কেবল অনুষ্টুপ শ্লোকে প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা বৈদিক সময়ের নহে। সুতরাং রামায়ণ, মহাভারত পুরাণ ও অন্যান্য দর্শন বৈদিক সময়ের অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। এক্ষণে কোন্ গ্রন্থ বৈদিক কালের তাহা নিরূপণ করা কর্ত্তব্য।

বৈদিক কালের মধ্যেও চারিটি কল্প উপস্থিত হইয়া ছিল। প্রথম ছন্দঃ কল্প, দ্বিতীয় মন্ত্র কল্প, তৃতীয় ব্রাহ্মণ কল্প, চতুর্থ সূত্র কল্প। এই চারিটি কল্পের যে ক্রম বিভাগ আছে, তাহা অনায়াসেই সপ্রমাণ হয়। যদি সূত্র কল্পের আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে ইহার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ কল্পের অস্তিত্ব স্বীকার করা কর্ত্তব্য। এই রূপ চারি কল্পেরই অনুক্রম সুস্পষ্টই অনুভূত হয়।

সূত্র কল্প বৈদিক ও অবৈদিক এই দুই প্রকার গ্রন্থের মধ্যে একটি যোগ বিধান করিয়া দিতেছে; সুতরাং ইহা সাহিত্য সংক্রান্ত ইতিহাসের বিশেষ উপযোগী। এমন কতকগুলি গ্রন্থ দৃষ্ট হয় যে যদিও ঐ সকল গ্রন্থ নিরবচ্ছিন্ন অনুষ্টুপ ত্রিষ্টুপ্ ও অন্যান্য ছন্দে রচিত হইয়াছে, যদিও পরবর্ত্তী অন্যান্য সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত ঐ সকল গ্রন্থের সাদৃশ্য আছে, তথাচ তৎ সমুদায়কে সূত্র কল্পের অন্তর্গত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে *।

যাঁহারা সূত্র কল্পের গ্রন্থ পর্য্যালোচনা না করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে উহার রীতি হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া নিতান্ত সুকঠিন। যে সমস্ত গ্রন্থ এই কল্পে লিখিত হইয়াছে, তৎসমুদায় কেবল অনতিদীর্ঘ সূত্র পরিপূর্ণ। ঐ সকল সূত্র সংক্ষিপ্ত ভাবে পরস্পর সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। সংক্ষিপ্ত রচনাই এই সকল গ্রন্থের বিশেষ রীতি। ব্যাকরণ ছন্দ পদার্থ বিজ্ঞান প্রভৃতি যে কোন বিষয়ের মত ইহাতে অভিব্যক্ত আছে, তৎ সমুদায় নিতান্ত অবিষদ। তাহাদের কঙ্কাল মাত্র ইহাতে অবশিষ্ট আছে। ইহার মধ্যে কোন একটি পদ্ধতির বিশেষ স্থল গুলির সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে বটে কিন্তু এই সকল গ্রন্থে অভিপ্রায়-গত একটি সংযোগ কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। কোন সুবিখ্যাত পণ্ডিত কহিয়াছেন যে, সূত্রগ্রন্থ সমূহে রচনার জটিলতা নিবন্ধন অভিপ্রায়ের একটি সুস্পষ্ট বিশুদ্ধতা সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়াছে। উহাতে নিষেধ, সঙ্কোচ ও পরিসংখ্যা, সাধারণ বিধি সমূহকে এত বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে, যে, তৎসমুদায়ের পরস্পর যোগ অবধারণ করা অসাধ্য হইয়া উঠে। এই সমস্ত সূত্রগ্রন্থে টীকার সাহায্য না লইলে ইহার তত্ত্ব কিছুই অভিব্যক্ত হয় না।

এই রূপ গ্রন্থ উত্তরোত্তর অনেক প্রস্তুত হইয়াছে। ঐ সকল গ্রন্থে সংক্ষিপ্ত ভাবে যে কেবল মূল মত গুলি প্রকটিত আছে, তাহা নহে, গণিত বিদ্যার প্রণালী অনুসারে উহাতে এই রূপ এক নূতন সাঙ্কেতিক ভাষা প্রস্তুত হইয়াছে যে তাহাতে সমুদায় মতই পরিণত দেখা যায়। গণিত শাস্ত্রে ক, খ, গ, ইত্যাদি বর্ণের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝাইয়া না দিলে যেমন ঐ গুলি অসম্বদ্ধ বোধ হয়, ঐ সমস্ত গ্রন্থে অবিকল সেই রূপই দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সকল সাঙ্কেতিক শব্দ সমূহ বোধ-সুলভ করিবার নিমিত্ত প্রতি সূত্রেরই টীকা আছে। উহার নাম পরিভাষা। এই সমস্ত পরিভাষা কণ্ঠস্থ না করিলে এই সকল গ্রন্থে এক পদও অগ্রসর হইতে পারা যায় না। আবার অনুবৃত্তি ও নিবৃত্তির নিয়ম না জানিলে প্রস্তুত বিষয়টির মর্ম্মগ্রহ করাও সুকঠিন হইয়া উঠে। প্রথমত সূত্রগ্রন্থ একটি অধিকার লইয়া আরব্ধ হয়। কিন্তু যে পর্য্যন্ত না এই রূপ কোন এক নূতন বিষয় আইসে, ততক্ষণ ইহার উল্লেখ মাত্র থাকে না; ইহার মধ্যে প্রারব্ধ বিষয় বুঝিয়া লইতে হয়। গ্রন্থকার প্রস্তুত বিষয়ে বক্তব্য ব্যক্ত করিয়া একটি প্রথম নিয়ম স্থাপন করেন। এই নিয়ম পরবর্ত্তী যে নিয়ম প্রস্তুত বিষয়কে প্রপঞ্চিত বা সঙ্কুচিত করিতেছে, তাহার উপর বিশেষ শক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে। আবার এই প্রপঞ্চক ও সঙ্কোচক নিয়ম সমুদায় অন্য নিয়মের উপর শক্তি প্রকাশ করে। এই রূপ একটি

* প্রাতি শাখ্য, অনুক্রমণী ও পরিশিষ্ট।

নিয়মে আর একটি নিয়মের সংক্রমণকেই অনুবৃত্তি ও তাহার বিরামকেই নিবৃত্তি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। এই অনুবৃত্তি ও নিবৃত্তির নিয়ম না জানিলে সূত্র গ্রন্থ সহজে বোধগম্য হয় না। বিশেষত যে সূত্র গ্রন্থে মীমাংসা পূর্ব্ব-পক্ষ উত্তর পক্ষ ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে, অনুবৃত্তি ও নিবৃত্তি তাহা বুঝিবার বিশেষ উপযোগী হইয়া থাকে। এই স্থলে বিধি-পক্ষ ও নিষেধ-পক্ষের প্রসক্তি এত জটিল এবং একই গ্রন্থকার কর্ত্তৃক এই উভয় পক্ষ সমর্থনার্থ এই রূপ প্রগাঢ় যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে যে,যে পর্য্যন্ত না সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, ততক্ষণ গ্রন্থকর্ত্তা কোন্ পক্ষ অবলম্বন করিয়া চলিতেছেন, তাহা কিছুমাত্র বুঝিবার সম্ভাবনা নাই। ফলত এই রূপ রচনা অতিশয় বিস্ময়কর। ভারতবর্ষীয় সংস্কৃত গ্রন্থ ব্যতিরেকে প্রায় আর কোন গ্রন্থই এই রূপ দেখা যায় না।

মহর্ষিগণ বহুকাল অনুশীলন ও চিন্তা দ্বারা যে জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়াছেন, এই সমস্ত সূত্র গ্রন্থে তাহার সারাংশ সঙ্কলিত আছে। এই সকল গ্রন্থ যদিও ব্যক্তি বিশেষের রচনা, তথাচ কেবল রীতি ব্যতিরেকে গ্রন্থ কারের নিকট উহা আর কোন বিষয়েই ঋণী নহে। ঐ রীতিও আবার জন-শ্রুতিতে উপনীত হইয়া আসিতে ছিল এবং উহা বহু ব্যক্তির প্রয়াসে প্রস্তুত হইয়াছে। সুতরাং সূত্র গ্রন্থে গ্রন্থ কর্ত্তার বিশেষ কোন গুণের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

ব্রাহ্মণ ও সূত্র কল্পের গ্রন্থ সমুদায়ের মধ্যে একটি বিভেদ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ ও সূত্র গ্রন্থের রচনাগত তারতম্য আছে। কিন্তু বৈয়াকরণেরা বেদে ব্যাকরণ দোষ যেমন বৈদিক প্রয়োগ বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন, সূত্রেও সেই রূপ *। রচনাগত বিভিন্নতা ব্যতিরেকে আর একটি বিশেষ ভেদও দৃষ্ট হয়। সূত্রের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ও মন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্র কারেরা কহিয়া থাকেন যে ব্রাহ্মণ ও মন্ত্র গ্রন্থই শ্রুতি প্রসব করিতেছে। এই সমস্ত গ্রন্থ ভিন্ন আর কোন গ্রন্থেরই শ্রুতি-প্রসবকারিতা নাই। যে সমস্ত গ্রন্থ শ্রুতি বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহা মনুষ্য রচিত নহে। ঐ সমস্ত শ্রুতি স্বয়ং ঈশ্বর মনুষ্যে প্রত্যাদেশ করিয়াছেন। সূত্র গ্রন্থ শ্রুতি-মূলক, এই নিমিত্ত উহা স্মৌত সূত্র বলিয়া অভিহিত হয় এবং উহা শ্রুতি-মূলক হইলেও মনুষ্য-রচিত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। যে স্থলে সূত্র শ্রুতি-বিরুদ্ধ আছে, তাহা অগ্রাহ্য এবং যথায় শ্রুতি-প্রমাণের অসম্ভাব প্রযুক্ত স্বতন্ত্র মত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাও নিরপেক্ষ প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হয় না।

এক্ষণে সূত্র গ্রন্থ যে ব্রাহ্মণ গ্রন্থের পরে প্রস্তুত হইয়াছে, ইহা প্রমাণ করিবার যদি আর কোন উপায়ই না থাকে, তথাচ উভয় বিধ গ্রন্থের এই বিভিন্নতা কাল্পনিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিবার কোন কারণই দেখিতে পাওয়া যায় না। যখন ভারতবর্ষে ধর্ম্মযুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল, তখন এই উভয় বিধ গ্রন্থের এই রূপ বিভেদ উহাতে যে পর্য্যন্ত শক্তি প্রকাশ করে, তাহা যিনি জ্ঞাত আছেন, তিনি এই বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ করিবেন না। অনেকানেক গ্রন্থ এই বিষয়ে সবিশেষ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

* প্রাতি সাখ্য সূত্রে আছে 'তা বশং গমানি' এই স্থলে 'তানি বশংগমানি' হইবে। টীকাকার কহিয়াছেন যে, অত্র তানি শব্দ লোপো দ্রষ্টব্যঃ এই স্থলে তানি শব্দ বিলুপ্ত হইয়াছে। আপস্তম্ব সূত্রে আছে 'অধাসন শায়ী' এই স্থলে টীকাকার কহিয়াছেন যে অধঃশব্দস্য সবর্ণ দীর্ঘশ্ছান্দসোঽপপাঠো বা। অধঃ-আসন এই উভয় পদ মিলিত হইয়া অধাসন হইতে পারে না। সুতরাং ইহা বৈদিক প্রয়োগ বা অপপাঠ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এই রূপ অনেকানেক সূত্র গ্রন্থে ব্যাকরণ দোষ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

তত্ত্ববিদ্যা।

ভোগ কাণ্ড।

উপক্রমণিকা।

আমরা জ্ঞানেতে যে সকল সত্য উপলব্ধি করিয়া থাকি,ভাবেতে সেই গুলি উপভোগ করিয়া পরিপাক করিতে পারিলে, তবে আমাদের ইচ্ছাতে কর্ম্ম-করিবার বল জন্মে; এই হেতু জ্ঞানকাণ্ডের পরে ভোগ কাণ্ডকেই অধিকার দেওয়া হইতেছে।

পূর্ব্ব খণ্ডে সংশয় হইতে প্রত্যয়ে উত্তীর্ণ হইবার সেতু সন্নিবেশিত হইয়াছে; এক্ষণে সেই সুরম্য প্রদেশে উপনীত হইয়া তথাকার ফল ভোগ করিবার যে রূপ পদ্ধতি, তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

তত্ত্ব-সকল উপলব্ধি করা জ্ঞানের কার্য্য; ভাবের কার্য্য কি?—না, সেই গুলিকে আদর্শ রূপে বরণ করত তাহাতে জীবন সমর্পণ করা,—ইহারই নাম উপভোগ। এক্ষণে জ্ঞানের উপলব্ধি ব্যাপারকে আলোচনা ক্ষেত্র হইতে অব্যাহতি দিয়া, তাহার স্থলে ভাবের এই উপভোগ ব্যাপারকে অভিষেক করা যাইতেছে। পূর্ব্বে জ্ঞানের মূল তত্ত্ব সকল লইয়া আন্দোলন করা হইয়াছে, এক্ষণে ভাবের মূল আদর্শ সকলের প্রতি মনোনিবেশ করা যাইতেছে।

বর্ত্তমান বিষয় দুই রূপে অনুশীলিত হইতে পারে;—এক, ভাবকে জ্ঞান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া উহাকে স্বতন্ত্র রূপে বিবেচনা করা; অপর,জ্ঞানের সহিত ভাবের পদে পদে যোগ রক্ষা করিয়া চলা। আমরা শেষোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করিতেই ব্রতী হইয়াছি। কারণ, যদি আমরা এরূপ জানিতাম যে জ্ঞানের সহিত ভক্তির কোন সম্পর্কনাই, তাহা হইলে অবশিষ্ট কেবল কুতূহল-নিবৃত্তি রূপ প্রলোভন কখনই আমাদিগকে সেই কঠোর জ্ঞানালোচনাতে প্রবৃত্ত করিতে পারিত না; প্রত্যুত, ইহার পরে ভক্তিতে উত্তীর্ণ হইব, এই ভাবিয়াই আমরা সমুদায় জ্ঞান-পথ মনের সন্তোষে অতিবাহন করিয়াছি।

প্রথম অধ্যায়।

পূর্ব্ব খণ্ডের প্রথমেই ইন্দ্রিয়-বোধ, বুদ্ধি, এবং প্রজ্ঞার মধ্যে এই রূপ ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে যে,ইন্দ্রিয়-বোধ অনুসরণ করিয়া আমরা বিষয় উপলব্ধি করি, বুদ্ধি অনুসরণ করিয়া আমরা বিষয়কে উপলব্ধি করি, এবং প্রজ্ঞা অনুসরণ করিয়া আমরা পরমাত্মাকে উপলব্ধি করি। অতএব প্রজ্ঞা যে কেবল ইন্দ্রিয় বোধ হইতেই পৃথক্-স্বভাব এমন নহে,উহা বুদ্ধি হইতেও পৃথক্-স্বভাব; তাহার প্রমাণ এই যে মূল তত্ত্ব সকল কোন রূপেই আমাদের বুদ্ধিতে আইসে না, কিন্তু প্রজ্ঞাতে সে সকল নিশ্চয় রূপে উপলব্ধি হইয়া থাকে। প্রজ্ঞার আদি এবং অন্ত সেই মূল সত্য, যাঁহার সুন্দর মঙ্গল ছটাতে আধ্যাত্মিক ভৌতিক সমুদায় জগৎ বাস্তবিক সত্য হইয়া দীপ্তি পাইতেছে। বাস্তবিক সত্যের সেই যে ভাব, তাহা কি আমাদের বুদ্ধির সিদ্ধান্ত? আমরা কি আপনারা বুদ্ধি খাটাইয়া সত্য হইয়াছি—না বহির্জ্জগৎকে বুদ্ধি প্রয়োগ দ্বারা সত্য করিয়াছি? অতএব আর সকলই যদি বুদ্ধি দ্বারা স্থির করা সাধ্য হয়, তথাপি আমি বাস্তবিক কি না, জগৎ বাস্তবিক কি না, ইহা স্থির করিতে গিয়া বুদ্ধির সমুদায় আড়ম্বর নিষ্ফল হইয়া ভূতলে নিপতিত হয়। মূল সত্যকে যিনি যত টুকু লাভ করেন,তাহা তাঁহার কৃপা ব্যতিরেকে কেবল মাত্র আত্ম-চেষ্টা দ্বারা কখনই সিদ্ধ হইতে পারে না। এই হেতু মূল সত্যকে যখনই যিনি বুদ্ধির বশে আনয়ন করিতে গিয়াছেন, তখনই তিনি তাহার এই ফল পাইয়াছেন যে জাগ্রৎ জীবন্ত বাস্তবিক সত্যের পরিবর্ত্তে কোথাকার এক স্বপ্নবৎ নির্জ্জীব

কাল্পনিক সত্য সমাগত দেখিয়া সত্যের নামে তাঁহার বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। কিন্তু সত্য-স্বরূপ যিনি, তিনি দূরে যান নাই, তিনি নিকটেই আছেন, আমরাই আপন বুদ্ধিমত্তায় অন্ধ হইয়া মনে করিতেছি যে আমরা তাঁহা হইতে দূরে আছি, আমাদের উপর তাঁহার চক্ষু নাই—তাঁহার হস্ত নাই। অতএব আমরা যদি পরমাত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করি, তবে তন্নিমিত্তে তাঁহারি নিকট প্রার্থনা করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক, নতুবা আমরা যদি আপন বলে তাঁহাকে উপযুক্ত রূপে জানিতে যাই, তবে অবশ্যই শূন্য হস্তে ফিরিয়া আসিব, ইহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। এখনকার জিজ্ঞাস্য এই যে মূল সত্য পরমাত্মা যখন আমাদের প্রজ্ঞাতে দেখা দেন, তখন আমাদের হৃদয়ে কি রূপ ভাবের উদ্রেক হয়? তখন একান্ত নির্ভরের ভাব আসিয়া আমাদের সমুদায় আত্মাকে অভিভূত করে; আমরা যে কি অকিঞ্চন, এবং পরমাত্মা যে কি মহান্, তখন তাহাই উজ্জ্বলতর রূপে প্রকাশ পাইতে থাকে। এই রূপ একান্ত নির্ভরের ভাবকেই ভক্তি কহা যায়। প্রজ্ঞা-অবিদ্যমানে যেমন সকলই স্বপ্নবৎ অর্থশূন্য ভাবে পরিণত হয়, ভক্তি-অভাবে সেই রূপ সকলই শ্রী-হীন রূপে প্রতিভাত হয়। নিজে স্বপ্নবৎ হইলে সকলই স্বপ্নবৎ দেখায়, নিজে শ্রী-হীন হইলে সকলই শ্রী-হীন দেখায়;—সুতরাং আমরা যদি প্রজ্ঞা হইতে পারমার্থিক সত্য এবং ভক্তি হইতে পারমার্থিক শ্রী লইয়া আত্মসাৎ করিতে অবহেলা করি, তাহা হইলে আমরা নিজে অপদার্থ ও শ্রী-ভ্রষ্ট হইয়া সকলকেই যে সেই রূপ দেখিব ইহাতে আর বিচিত্রতা কি?

প্রজ্ঞা ও ভক্তি যখন পরমাত্মার দিকে উন্মুখ হয়, তখন আত্মার সেই যে ক্রিয়া তাহা অত্যন্ত অন্তর্মুখীন হইয়া থাকে, হস্ত পদ পরিচালনার ন্যায়, বা বিষয় চিন্তার ন্যায়, বহির্মুখীন নহে। পূজার্হ মনুষ্য বিশেষকে আমরা জোড় করে মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করি, কিন্তু আত্মা মস্তকও নত করে না, করদ্বয়ও সম্মিলিত করে না, অথচ যার পর নাই অকৃত্রিম ভক্তিভাবে পরমাত্মাকে প্রণাম করিয়া থাকে; আত্মার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য আমাদের শরীরও নত হয়, হস্তও কৃতাঞ্জলিপুটে আবদ্ধ হয়, নেত্রও সজল হয়, এ সকলই হয় বটে, কিন্তু এ সকল বিনা আয়াসে আপনা আপনি হয়, আত্মাকে এ সকল লইয়া ব্যস্ত হইতে হয় না; কেন না আত্মা বিনা-নেত্রে পরমাত্মাকে দর্শন করিতেছে, বিনা-শ্রবণে তাঁহার আদেশ শুনিতেছে, বিনা-বাক্যে তাঁহার স্তুতি গান করিতেছে, বিনা-শরীরে তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিতেছে, আত্মা কোন সহায় সম্পত্তি ও আড়ম্বর ব্যতিরেকেও পরমাত্মার সহবাসে নিমগ্ন হইয়া, পরম আনন্দে অভিষিক্ত হইয়া, অনন্ত জীবনের মত কৃতার্থ হইতেছে। পরমাত্মার সেই বিষয়াতীত অপরিমিত সৌন্দর্য্য, যাহা ভক্তি-রভসে আমাদের হৃদয়ের মূল শুদ্ধ আকর্ষণ করিয়া লয়, তাহার জ্যোতিতে যখন আমরা জগৎ সংসার নিরীক্ষণ করি, তখন আমাদের অন্তঃকরণে এক অনির্ব্বচনীয় প্রেমরস আবির্ভূত হয়;—সকলেই আমরা একই পরমেশ্বরের সৃষ্ট, সকলেই আমরা একই জগতে, একই রাজ্যে, একই নিয়মের অধীনে বাস করিতেছি, সকলেই আমরা একই পরিবারস্থিত, কেহই আমাদের পর নহে,—এই এক অনিবার্য্য-প্রেমানল সমুদায় জগৎকে একাকার করিয়াও তাহাতে ক্ষান্ত হয় না; কেন না পরমাত্মার প্রসাদ রূপ অক্ষয় ইন্ধনের সহিত তাহা এমনি যুক্ত রহিয়াছে যে কিছুতেই তাহার আশা, আনন্দ এবং উৎসাহের পর্য্যাপ্তি হয় না। পরমাত্মা হইতে প্রাপ্ত তাঁহার প্রসাদ-চিহ্ন স্বরূপ—আমাদের আত্মাতে আমরা যতটুকু সৌন্দর্য্য ধারণ করি, তাহাই আমাদের নিকট—বাহিরের যাবতীয় পদার্থের সৌন্দর্য্য নিরূপণের আদর্শ স্বরূপ হয়; এবং এই আদর্শকে আমরা যে পরিমাণে বাহিরে প্রয়োগ করিতে পারি, সেই পরিমাণে আমাদের প্রেম চরিতার্থ হয়। ঈশ্বরের সম্বন্ধে যখন আমরা জগৎকে নিরীক্ষণ করি, তখন তাহা ভক্তির দেবালয় তুল্য দিব্য শোভা ধারণ করে; কিন্তু যখন উহাকে আমরা আমাদের নিজের সম্বন্ধে নিরীক্ষণ করি, তখন তাহা প্রেমের ক্রীড়া-কানন রূপে পরিণত হয়; কেন না,—জগৎকে যত আমরা আমাদের নিজের মনের মত করিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারি, ততই আমাদের প্রেম চরিতার্থ হয়; কিন্তু সেরূপ করিতে গিয়া আমরা যখন দেখি যে জগতের সৌন্দর্য্য কেবল আমাদের নিজের মনোনুরূপ নহে—পরন্তু আর এক অচিন্ত্য প্রকার, যখন দেখি যে আমাদের স্বল্প প্রেম তাহার নিকট পরাভব পাইয়া ফিরিয়া আইসে, যখন আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে যে ইহার মধ্যে এক অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য সংভুক্ত রহিয়াছে অথচ তাহা ধরিতে গিয়া আমাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে, তখন—সেই যে এক ভূমা ভাব তাহাতে আমাদের প্রেম আপাততঃ ক্ষুব্ধ হইলেও আমাদের ভক্তি তাহার দিকে প্রসারিত হইয়া অনুপম আনন্দ উপভোগে কৃতার্থ হইতে পারে।

প্রজ্ঞা হইতে এক পদবী নিম্নে বুদ্ধি, এবং তাহা হইতে আর এক পদবী নিম্নে ইন্দ্রিয়বোধ অবস্থিতি করে। বুদ্ধি কি? না, আপনাকে জানিয়া বিষয় সকলকে জানা—সাধারণ জ্ঞান শক্তিকে বিশেষ বিশেষ জ্ঞানে পরিণত করা, ইহাকেই বুদ্ধি কহে। ইন্দ্রিয়বোধ কি? না, যে অন্ধশক্তি দ্বারা বিষয় আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তি বা জ্ঞান-শক্তিকে প্রতিরোধ করে, তাহাই ইন্দ্রিয় বোধ শব্দে আখ্যাত হয়। বুদ্ধি জ্ঞানবান্ আত্মা হইতে অজ্ঞান বিষয়ে অবতীর্ণ হয়, ইন্দ্রিয়-বোধ অজ্ঞান বিষয় হইতে জ্ঞানবান্ আত্মার অভিমুখীন হয়;—ইন্দ্রিয়-বোধ এবং বুদ্ধি, শরীর এবং আত্মা, পরস্পরের মধ্যে এই রূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা বর্ত্তমান রহিয়াছে।

আত্মজ্ঞান অনুসারে অন্যকে জানাতে যেমন বুদ্ধি প্রকাশ পায়, সেই রূপ আত্মভাব অনুসারে অন্যের ভাব উপভোগ করাতে প্রীতি প্রকাশ পায়, কারণ বাহিরের সামগ্রী বিশেষে যত ক্ষণ না আমরা আমাদের মনের অনুরূপ কোন এক আদর্শ আরোপ করিতে পারি, তত ক্ষণ আমরা তাহার সৌন্দর্য্য গ্রহণে বঞ্চিত থাকি। আমরা যখন একটা পুষ্পের পত্রপরিচ্ছদ গুলির সুবিন্যাস দর্শনে প্রীতি লাভ করি, তখন, আমাদের মনোমধ্যে যে এক সামঞ্জস্য ও পারিপাট্য ভাবের আদর্শ আছে, তদনুসারে আমরা সেই পুষ্পের অবয়ব গুলিকে অগ্রে কল্পনা করি, পরে উহাদিগকে ঐ সাধারণ আদর্শের একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত রূপে অনুভব করিয়া, এই রূপে আমাদের মনের ভাবকে বাহিরে মূর্ত্তিমান্ করিয়া, কাজে কাজেই আনন্দিত হই। বিশেষতঃ মনুষ্যের শরীরে, মনুষ্যের কথা বার্ত্তাতে, মনুষ্যের ভাব ভক্তিতে, আমাদের নিজের মনের ঐ প্রকার অনেক গুলি আদর্শ আমরা সহজে ফলাইতে পারি বলিয়া, মনুষ্যকে আমরা যেমন প্রীতি করি, জগতের মধ্যে এমন আর কাহাকেও নহে।

ইন্দ্রিয়-বোধ উপলক্ষে পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি যে, দেশে অবস্থান ও কালে

পরিবর্ত্তন, অবস্থা ও পরিবর্ত্তন, এই দুয়ের মধ্যে ইন্দ্রিয়বোধ স্ফূর্ত্তি পায়। বুদ্ধি কি করে?—না, সেই অবস্থা পরিবর্ত্তনের মধ্যে কতকটা বহির্ব্বিষয়ের শক্তি এবং কতকটা আমাদের আপনাদের শক্তি উপলব্ধি করিয়া আত্মানাত্ম-জ্ঞানের কলিকা উন্মোচিত করে। মনে কর, আমরা একান্ত অনন্যমনা হইয়া কোন একটা গুরুতর বিষয় ভাবিতেছি, ইতি-মধ্যে সহসা একটা উন্মুক্ত লিপি আমাদের দৃষ্টি-ক্ষেত্রে নিপতিত হইল; ইহাতে আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইল মাত্র, কিন্তু সে ঘটনার প্রতি আমাদের বুদ্ধির একটুকুও মনোযোগ হইল না। সুতরাং সেই লিপি কিংবা তাহার অন্তর্গত লিখন-ছটা, কিংবা অক্ষরাবলির ভেদাভেদ, তখন ইহার কিছুই আমাদের জ্ঞান-গোচর হইল না। ইতি-পূর্ব্বে আমাদের দৃষ্টি হয় ত ধূসর বর্ণ মৃত্তিকার উপরে নিহিত ছিল, এক্ষণে কৃষ্ণবর্ণ অক্ষরাবলি আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করিল। এই প্রকারে, অবস্থার পরিবর্ত্তন মাত্র ইন্দ্রিয়-বোধে প্রথমে সমানীত হয়, পরিশেষে বুদ্ধি আপন অন্তর-স্থিত আদর্শ অনুসারে তাহার অর্থ আবিষ্কার করিয়া তাহাকে জ্ঞানে পরিণত করে;—যেমন, শিক্ষিত আদর্শ অনুসারে আমরা ঐ লিপিটির অক্ষর সকলের, পদ সকলের ও পরিচ্ছেদ সকলের ভেদাভেদ নিরূপণ করিয়া, তবে আমরা তাহাকে জ্ঞানে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হই।

আমাদের দেহাদির যে রূপ অবস্থা যে রূপ পরিবর্ত্তনের দিকে উন্মুখ থাকে, সেইটি সংঘটিত হইলেই ইন্দ্রিয়-সুখ আবির্ভূত হয়;—যেমন, আমাদের প্রজ্বলিত জঠরানল যখন অন্ন ভোজনের দিকে উন্মুখ থাকে, তখন অন্ন ভোজন করিলেই আমরা সুখী হই। যে সুরের পর যে সুর, বা নিস্তব্ধতার পর যে সুর, শ্রবণে ভাল লাগে; যে বর্ণের পর যে বর্ণ, বা অন্ধকারের পর যে বর্ণ, নয়নে ভাল লাগে; যে রসের পর যে রস রসনাতে ভাল লাগে; সেই রূপে অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইলেই ইন্দ্রিয়-সুখ অনুভূত হইয়া থাকে। ভিতরে যে আমাদের প্রাণ-ক্রিয়া সকল চলিতেছে, তাহাও, যার পর যে-টি সেই ভাবে চলিলে, তবেই আমরা শারীরিক ভাল থাকি, তাহার ব্যাঘাত হইলেই রোগে আক্রান্ত হই। এই প্রকারে আমরা যখন ইন্দ্রিয়-সুখে সুখী হই, তখন তাহা আমাদের আপনার নিয়মে হই না, ভৌতিক নিয়মেই হইয়া থাকি;—বাহিরে কোথায় কি পরিবর্ত্তন হইতেছে, তদ্দ্বারা আমরা সুখে দুঃখে নিয়মিত হই। যত ক্ষণ না আমাদের অন্তরে প্রকৃষ্ট রূপে জ্ঞানের উদ্রেক হয়, তত ক্ষণ অবস্থার পরিবর্ত্তনে আমরাও পরিবর্ত্তিত হইতে থাকি;—না আমাদের আপনার উপর, না সেই পরিবর্ত্তনের উপর, আমাদের কোন হস্ত থাকে। অবস্থা পরিবর্ত্তনের উপর নিয়ন্তৃত্ব করিয়া আমরা যে সুখ লাভ করি, সে এক প্রকার সুখ, এবং সেই পরিবর্ত্তনের দিকে হালি ছাড়িয়া দিয়া যে এক সুখ লাভ করি, সে এক প্রকার সুখ, পূর্ব্বোক্ত সুখ আমাদের সঙ্গের সঙ্গী, শেষোক্ত সুখ পথের সম্বল মাত্র—আনুষঙ্গিক উপকরণ মাত্র।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল ঠুংরি।

গাওরে জগপতি জগবন্দন।
ব্রহ্ম সনাতন পাতক-নাশন।
এক দেব ত্রিভুবন-পরিপালক।
কৃপাসিন্ধু সুন্দর ভবনায়ক।
সেবক-মনোমদ মঙ্গল দাতা।
বিদ্যা সম্পদ বুদ্ধি বিধাতা।
যাচে চরণ-ভক্ত করযোড়ে।
বিতর প্রেম সুধা চিত্ত-চকোরে।

বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজ।

গত পৌষ মাসের নবম দিবসে বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের গৃহ-নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়াছে। তদুপলক্ষে প্রধান আচার্য্য মহাশয় তথায় গমন করিয়াছিলেন। ঐ দিবস প্রাতঃ কালে ভাবী গৃহের নিকটে একটি প্রশস্ত স্থানে ব্রহ্মোপাসনার স্থান প্রস্তুত হইয়াছিল। ব্রাহ্মগণের আহ্বান ক্রমে অনেক ভদ্র লোক তথায় আগমন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে স্বাধ্যায়ান্ত ব্রহ্মোপাসনা ও তাৎপর্য্যের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের কএকটি শ্লোক পাঠ সমাপ্ত হইলে শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বেদী হইতে ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করিলেন—

হে মঙ্গলময় পরম পিতা! তুমিই সকল মঙ্গলের উৎস, তোমার মঙ্গল-ভাবে এ জগৎ পূর্ণ রহিয়াছে। তুমি আমারদিগের পরমারাধ্য দেবতা, তোমার উপাসনাই আমারদিগের জীবনের লক্ষ্য। হে জীবনের জীবন! তোমাকে সম্মুখে রাখিয়া যাহা কিছু সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করি, তাহাই পবিত্রতা এবং সাধুভাবে পরিপূর্ণ। আমরা অদ্য যে মহদ্ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতেছি, যদি তাহাতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তোমাকে স্মরণ না করি, যদি তন্মধ্যে তুমিই কেবল আমাদের একমাত্র লক্ষ্য না হও, তাহা হইলে আমাদের আয়াস ও পরিশ্রম সকলই অকর্মণ্য এবং লক্ষ্যবিহীন হইয়া পড়ে—এখানে ব্রাহ্মসমাজ-মন্দির বলিয়া যে গৃহ নির্ম্মিত হইতেছে, তাহাও জীবন-শূন্য শরীরের ন্যায় বৃথা হইয়া যায়। অতএব হে নাথ! এই মহদ্ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইবার প্রারম্ভে তোমার নিকটে এই প্রার্থনা, যেন সকল বিষয়েই তুমি আমাদের একমাত্র লক্ষ্য থাক, কোন প্রকার মলিন পঙ্কিল চিন্তা যেন আমারদিগের নিকট হইতে তোমাকে প্রচ্ছন্ন না রাখে এবং কোন প্রকার অপবিত্র ভাব যেন আমারদিগকে তোমা হইতে দূরস্থ না করে। হে নাথ! তোমার অনন্ত করুণা-রাশি সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই মানবাত্মাতে যে সত্যের জ্যোতিঃ নিহিত রাখিয়াছে এবং তোমার অপার মহিমা উপলব্ধি করিবার যে জ্ঞান-বীজ আমারদিগের মাতৃ-ভূমিতে সর্ব্বাগ্রে বপন করিয়াছে; এই ব্রাহ্মসমাজ-মন্দির তাহার একটি মহান্ ফল। যেমন এক ফল হইতেই ক্রমে লক্ষ লক্ষ বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, কৃপানিধান! এই ভিক্ষা দেও, যেন এই ফলটিও ক্রমে সেই রূপ বহুতর বৃক্ষ উৎপাদন করে, যাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য পৃথিবীর এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া মানব-মণ্ডলীর শ্রান্ত পাপ-তাপ-তাপিত আত্মাকে বিমল ছায়া দ্বারা শান্ত সুশীতল করে। আমরা যেমন সকলেই তোমার পুত্র, সেই প্রকার যেন একমাত্র অভেদ্য ধর্ম্ম-গ্রন্থি দ্বারা বদ্ধ হইয়া এক পরিবারের ন্যায় তোমার আরাধনা-রূপ অমৃতময় ফলের স্বাদ গ্রহণ পূর্ব্বক বলিষ্ঠ হইয়া মৃত্যুকে জয় করত তোমার অমৃত নিকেতনের অধিবাসী হইবার যোগ্য হই। হে স্বপ্রকাশ! তুমি আপন স্বরূপ আমারদিগের নিকট প্রকাশ কর, যাহাতে এই সত্য আমারদিগের মনে সর্ব্বদা প্রদীপ্ত থাকে যে তোমাকে লাভ করাই আমারদিগের জীবনের পরম উদ্দেশ্য। নাথ! তোমার মঙ্গল ভাবে আমাদের আত্মাকে পরিপূর্ণ করিয়া পবিত্র ব্রাহ্মসমাজ হইতে সকল প্রকার বিদ্বেষ ভাব দূর কর, তোমার সকল সন্তানকে এক ভ্রাতৃভাবে আবদ্ধ করিয়া কেবল তোমার দিকেই লইয়া যাও, এবং নিয়ত তোমার প্রসন্ন মুখ-শ্রী প্রদর্শন করিয়া বিমলানন্দ ভোগের অধিকারী কর। দীন-নাথ! আমাদের উপর তোমার যে অপার প্রেম বিরাজ করিতেছে, তাহা যেন আমারদের সকল প্রীতিকে তোমাতেই একত্রীভূত করে এবং এই সমাজ-মন্দির যেন এতদঞ্চলে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সাক্ষ্য দান ও চতুর্দ্দিকে ব্রাহ্মধর্ম্মের সনাতন সত্য-সকল বিকীর্ণ করে। হে মঙ্গলময় সর্ব্বসিদ্ধি-দাতা! আমার এই প্রার্থনা সিদ্ধ কর যেন আমাদের প্রত্যেক আত্মা তোমার মঙ্গল ভাবে পরিপূরিত হইয়া তোমার প্রতিষ্ঠা এবং অর্চ্চনার জন্য এক মন্দিরস্বরূপ হয়। হে নাথ! মানবাত্মাই তোমার প্রকৃত মন্দির, তাহা যেন দিন দিন কেবল তোমারই মঙ্গল ভাবে উন্নত হইয়া সমু-

দায় বাধা ও বিঘ্নকে অতিক্রম করত অনৈক্যের মূলোৎপাটন করিয়া অনন্ত কালে কেবল তোমারি কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। আমরা সকলে যেন এই নূতন মন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন জীবন প্রাপ্ত হইয়া তোমার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম-সকল কার্য্যে পরিণত করিতে সক্ষম হই; এবং মোহকৃত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ও দুর্ম্মতি হইতে বিরত থাকিয়া তোমার নিয়মিত ধর্ম্ম পালনে যত্নশীল হই এবং শ্রদ্ধা ও প্রীতি পূর্ব্বক অহরহ তোমার অপার মহিমা ও পরম মঙ্গলস্বরূপ চিন্তনে উৎসাহ যুক্ত হই, যাহাতে ক্রমে তোমার সহিত নিত্য সহ-বাস-জনিত ভূমানন্দ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

অনন্তর প্রধান আচার্য্য মহাশয় বেদী হইতে এই উপদেশ প্রদান করিলেন—

আমরা অদ্য এই শুভ ক্ষণে মুক্ত সূর্য্য-কিরণে মুক্ত বায়ুতে বসিয়া শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বরূপ পরমেশ্বরের আরাধনাতে যে আনন্দ উপভোগ করিতেছি, এ আনন্দের আকর কোথায়? এই আনন্দের আকর সেই আনন্দ-স্বরূপ, যিনি সকল ভুবনের আলো। সূর্য্য-কিরণ সৌর জগৎকে আলো করে, কিন্তু তিনি সকল ভুবনের আলো। আমরা সেই স্বপ্রকাশ আনন্দ-স্বরূপের আনন্দ আভা এই শুভ ক্ষণে উপভোগ করিতেছি, সব সুহৃদে মিলে সেই সখার নাম উচ্চারণ করিতেছি। আমারদের অদ্য এখানে সম্মিলনের কি প্রয়োজন? আমরা আমারদের জীবনের কোন্ লক্ষ্য সাধনের নিমিত্তে এখানে একত্রিত হইয়াছি? আমারদের আত্মার যে একটি মহত্তর গম্ভীরতর স্বর্গীয় ভাব, সেই ভাবকে সার্থক করিবার জন্যই আমরা এখানে সম্মিলিত হইয়াছি। আমরা শরীর পোষণের জন্য অন্ন-পান আহরণ করি, রোগ হইতে মুক্ত হইবার জন্য চিকিৎসককে অবলম্বন করি; কিন্তু আমারদের আত্মার পাপ-মলিনতা কে অপনয়ন করিতে পারে? মনুষ্যের সাহায্যে হয় তো সাংঘাতিক রোগ হইতে, ঘোর বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইতে পারি; কিন্তু পাপের পরিত্রাতা কোথায়? আত্মা মলিন হইলে কে তাহাকে উদ্ধার করিতে পারে? এজন্য ঈশ্বর আমাদের একমাত্র অবলম্বন—ঈশ্বরের অমৃত সলিলে সেই মলিনতার পরিহার হয়। আমরা পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইতেছি এবং তাঁর নিকটে এই প্রার্থনা করিতেছি যে যেন এই স্থানে তাঁহার মন্দির নির্ম্মিত হইয়া তাহা চিরস্থায়ী হয়—যেন সাধু অসাধু সকলে এখানে আসিয়া তাঁহার মঙ্গল ছায়া প্রাপ্ত হয়—যেন এখান হইতে দেব-লোকে যাইবার জন্যে সকলে প্রস্তুত হইতে পারে। যাহাতে এই বোয়ালিয়া নগরে জগদীশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়, এই জন্য এখানে আমারদের আগমন। দেখ! এ কি মহান্ লক্ষ্য। যিনি "শাশ্বত-মভয়-মশোকমদেহং পূর্ণমনাদিচরাচর গেহং" তাঁর উপাসনার একটি গৃহ এই স্থানে নির্ম্মাণ করিবার উদ্দেশে তাঁহার প্রসাদ প্রার্থনা করিতেছি, আমরা তাঁর জগতে তাঁরই প্রীতি-পূজা স্থাপন করিবার জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতেছি—তিনি আমারদের এই কামনা পূর্ণ করুন। এই ব্রহ্মোপাসনা আমারদের জীবনের ফল, ব্রাহ্মসমাজ এই বঙ্গ-ভূমির অলঙ্কার। আমারদের মাতৃ-ভূমির দুর্দ্দশা চতুর্দ্দিকে নয়ন-গোচর হইতেছে—জ্বরে, দুর্ভিক্ষে, বঙ্গভূমি হাহা রব করিতেছে, কত নিরন্ন ব্যক্তি অন্নাভাবে শয়ান রহিয়াছে; কত ক্লেশের মধ্যে, দুর্ভিক্ষের মধ্যে, পাপের মধ্যে, পরাধীনতার মধ্যে, বঙ্গভূমি ক্রমাগত ক্রন্দন করিতেছে। এই দুঃখময় বঙ্গ-ভূমিতে কি আশায় জীবন ধারণ করিতেছি? একমাত্র ব্রাহ্মসমাজের আশায়। আমরা ব্রহ্মের উপর নির্ভর করিয়া আশা করিতেছি যে ব্রাহ্মসমাজের সাহায্যে ব্রহ্মের উপাসনা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া প্রতি জনের আত্মাকে উন্নত করিবে, পরিবারের মধ্যে শ্রী সমৃদ্ধি সুস্থতা বর্দ্ধন করিবে, সমাজের মধ্যে বিদ্যা বিনয় সভ্যতা বিস্তার করিবে এবং রাজ্যেতে স্বাধীনতা বিনির্ম্মুক্ত করিবে। আমারদের আশা এমনি মহতী আশা। ব্রাহ্মসমাজ আমারদের বঙ্গ-ভূমির ভূষণ, ব্রাহ্মসমাজ সকল মঙ্গলের একমাত্র প্রস্রবণ। এই ব্রহ্মোপাসনার জন্য আমারদের অন্যের উপর কিছু মাত্র নির্ভর করিতে হয় না। ব্রহ্মোপাসনা আমারদের নিজস্ব ধন। ইহাতে অন্য জাতির হস্ত নাই, ইহাতে পরকীয় ভাষার গৌরব নাই, ইহার জন্য অপর জাতির আচার ব্যবহারের দাসত্ব করিতে হয় না। সহজ নিশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যে যোগ, তাহাই ব্রহ্মের উপাসনা। এই ব্রহ্মোপাসনার ভাব এদেশে আধুনিক নহে। যেমন হিমালয় হইতে গঙ্গা নদী বিনির্গত হইয়া এখানে পদ্মাবতী নামে খ্যাত হইয়া সমুদ্রে সম্মিলিত হইতেছে, তেমনি পূর্ব্ব কাল হইতে ব্রহ্মোপাসনা ভারতবর্ষে প্রচলিত হইয়া এই বঙ্গ দেশে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম নাম গ্রহণ করিয়া আমারদের আত্মাকে ব্রহ্মধামে লইয়া চলিবে। পুরাতন বেদ শাস্ত্রে, প্রাচীন মনু-সংহিতাতে, পূর্ব্বকালের ভগবদ্গীতায়, এবং আধুনিক তন্ত্র শাস্ত্রেও ব্রহ্মের কীর্ত্তন ও উপাসনা নিগদিত হইতেছে। বেদে বলে "আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত।" "তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা।" পরমাত্মাকেই প্রিয় রূপে উপাসনা করিবেক—সেই অন্তরতর পরমাত্মা পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, আর আর সকল হইতে প্রিয়। স্মৃতিতে মনু বলিয়াছেন "উপাস্যং পরমং ব্রহ্ম আত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ।" সেই পরব্রহ্মই উপাস্য, যাঁহাতে এই জীবাত্মা প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে। ভগবদ্গীতাতে উক্ত হইয়াছে "পিতাহমস্য জগতোমাতা ধাতা পিতামহঃ" আমি এই সমুদায় জগতের পিতা মাতা ধাতা এবং পিতামহ। তন্ত্রেতে আছে "সকলভুবনবীজং ব্রহ্মচৈতন্যমীড়ে।" সকল ভুবনের বীজ যে ব্রহ্মচৈতন্য, তাঁহাকে ধ্যান করি। দেখ! সকল শাস্ত্রে এক-বাক্য হইয়া তাঁহাকে গান করিতেছে, যাহা ব্রহ্ম-সঙ্গীতে আমরা এই মাত্র শ্রবণ করিলাম—"ভাবো তাঁরে হবে ধন্য, সর্ব্ব শাস্ত্রে গায়।" সকল শাস্ত্র হইতেই ব্রহ্মের উপাসনা প্রাপ্ত হইতেছি। গঙ্গা যেমন স্রোতস্বতী হইয়া হিমালয়কে বঙ্গ দেশের সহিত যোগ করিতেছে, তেমনি সেই উত্তর পশ্চিমের ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে উপনিষদের ব্রহ্মবিদ্যা বঙ্গ দেশে চলিয়া আসিয়া উভয় দেশকে সমান সূত্রে গ্রথিত করিতেছে এবং সেই পুরাতন কালকে নূতন-রূপে উজ্জ্বলিত করিতেছে। কেবল কি শাস্ত্রের মধ্যেই ব্রহ্মের কীর্ত্তন আছে? আর কি কোথাও নাই? শাস্ত্রের নিতান্ত পক্ষপাতীরা যাহাকে শাস্ত্র বলিয়া মানেন না, তাহাতেও ব্রহ্মের অনন্ত মহিমার অপূর্ব্ব বর্ণনা শ্রুত হয়। নানকের গ্রন্থ দেখ। যখন পঞ্জাবের পুরাতন কালের বিখ্যাত ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশে বেদের যাগ-যজ্ঞ-সকল বিলুপ্ত হইল, তখনো ব্রহ্মের মহিমা তথায় লুপ্ত হইল না—তিনি আরো নূতন-রূপে উজ্জ্বল হইয়া নানকের হৃদয়ে উদিত হইলেন। গুরু নানক কেবল আপনার আত্মার বলে পঞ্জাবে ব্রহ্ম-পূজা প্রবর্ত্তিত করিলেন, সমুদয় ব্রহ্মাবর্ত্তকে ব্রহ্মাগ্নি দ্বারা পুনর্ব্বার প্রজ্বলিত করিয়া দিলেন। তাঁহার সেই আদি গ্রন্থ জগদ্বন্ধু অনাদিকেই কীর্ত্তন করিতেছে। "আদি অনাদি অনীল অনাহত যুগ যুগ একোবেশ।" তুমি সকলের আদি, অথচ স্বয়ং অনাদি; তুমি অনীল, তুমি বর্ণ-হীন; তুমি অনাহত, তোমার মঙ্গল সংকল্পে কেহ বাধা দিতে পারে না—যুগ যুগ একোবেশ, সকল কালেই তোমার সমান ভাব। এই আদি গ্রন্থ গুরু নানকের আত্মা হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া সমুদয় পঞ্জাব দেশকে অমৃত-সলিলে প্লাবিত করিয়াছে; ইহা অদ্যাপি সূর্য্যোদয় অবধি রাত্রি তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত প্রতি দিন সঙ্গীত স্বরে অমৃতসরে অনবরত নিনাদিত হইতেছে। দেখ, যদি এক জনের সাধু ইচ্ছা হয়, ঈশ্বর তাহাতে কেমন প্রচুর ফল প্রদান করেন। এক জন দ্বারা সমুদয় পঞ্জাব দেশ পবিত্র হইল। সেই সাধু ইচ্ছার অনুকরণ কর। উত্তর-পশ্চিম পঞ্জাব—দক্ষিণ-পূর্ব্ব বঙ্গ-ভূমি, এক ধর্ম্ম-সূত্রে আবদ্ধ হইবে। ঊর্ণনাভি যখন আপনার বাস-স্থান নির্ম্মাণ করে, তখন সে যেমন তাহার সূত্র এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে একে বারে সংলগ্ন করিয়া সূত্রের মধ্যবর্ত্তী স্থলে ক্রমে আপনার সংকীর্ণ গৃহ নির্ম্মাণ করে; সেই প্রকার প্রথম সূত্র ব্রহ্মের আরাধনা পঞ্জাবে স্থাপিত হইয়াছিল, এখন বঙ্গদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম অবতীর্ণ হইয়াছে, ক্রমে ক্রমে ইহার অবকাশ-মধ্যে ব্রহ্ম-নাম ঘোষণা হইবে। এখন বঙ্গদেশে এই ব্রাহ্মধর্ম্ম বিস্তার করিবার জন্য আমারদের

প্রতি জনের চেষ্টা চাই। বঙ্গদেশকে উদ্ধার যদি বঙ্গবাসীরা না করেন, তবে আর কে করিবে? আগে আপনার দেশকে উদ্ধার কর, পরে অন্য দেশের কথা ভাবিতে পারিবে। কৃষকেরা প্রথমে ক্ষেত্রকে আলি দ্বারা সীমা-বদ্ধ করে, ক্ষেত্রকে পরিমিত করিয়া তাহাকে কর্ষণ করে; সেই প্রকার আমারদেরও ধর্ম্মবীজ বপনের জন্য পরিমিত ক্ষেত্র কর্ষণ করিতে হইবে। ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্তে আমাদের পক্ষে পরিমিত ক্ষেত্র এই বঙ্গ-ভূমি। এই বঙ্গ-ভূমিকে ধর্ম্ম-ফলে পুণ্য-ভূমি করিবার জন্যে আমারদের সমুদয় বল বীর্য্য ক্ষেপণ করিতে হইবে। এই বঙ্গ-ভূমিতে প্রথম স্থাপিত আদি ব্রাহ্ম-সমাজ-রূপ বৃক্ষটিকে জীবিত রাখ, প্রাণপণে তাহাকে পোষণ কর, তবে বঙ্গ-ভূমি তাহার ছায়াতে শান্তি লাভ করিবে। তাহাকে জীবিত রাখিলে তাহা হইতে শাখা-প্রশাখা-সকল বিস্তৃত হইবে এবং সেই শাখা-প্রশাখা হইতে বট বৃক্ষের ন্যায় সত্য মূল-সকল দূরাদূর-স্থিত ভিন্ন ভিন্ন ভূমিতে অবতরণ করিবে। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম সমুদয় পৃথিবীর ধর্ম্ম। পৃথিবীর সকল স্থান হইতেই ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের সংবাদ উদ্দীপ্ত হইতেছে। আমরা অতি দীন হীন পরাধীন, আমাদের দেশে ঈশ্বর যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রদান করিয়াছেন, তখন কেন না অন্য দেশে তাহা প্রদান করিবেন—কিন্তু জানি যে আমরা দীন হীন বলিয়া মাতার ন্যায় আমারদের উপর তাঁহার অধিক স্নেহ। তিনি এই জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম এখানে প্রেরণ করিয়া আমারদের হৃদয়ে প্রকাশিত হইলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম পৃথিবীর ধর্ম্ম, পৃথিবীর নানা জাতীয় ভাষা, পরিচ্ছদ, রীতি নীতি, আচার ব্যবহারের মধ্যে সকল দেশের সকল মনুষ্যকে আপনার মঙ্গল শাসনের অধীনে আনিবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম ইহ কাল ও পর কালের ধর্ম্ম—আমরা এখানে যে ব্রাহ্মধর্ম্মে অধিকারী, দেবতারা উন্নত লোকে থাকিয়া সেই ব্রাহ্মধর্ম্মেরই অধিকারী। আমরা এখানে বসিয়া যে ঈশ্বরের উপসনা করিতেছি, দেবতারা উৎকৃষ্ট লোক-সকল হইতেও সেই ঈশ্বরেরই উপাসনা করিতেছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম স্থানেতে বদ্ধ নাই, ব্রাহ্মধর্ম্ম কালেতে বদ্ধ নাই। কি মর্ত্ত্য লোকে, কি স্বর্গ লোকে, কি ব্রহ্মলোকে, সর্ব্বত্র ইহার শাসন। ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন এক সঙ্কীর্ণ সম্প্রদায় ভুক্ত নহে। ব্রাহ্মধর্ম্ম একই সম্প্রদায় এবং ইহার পরম গুরু এক ঈশ্বর। ব্রাহ্মধর্ম্ম মুক্ত বায়ুর ন্যায়, ব্রাহ্মধর্ম্ম মুক্ত কিরণের ন্যায়—যত দূর আকাশ তত দূর ইহার মহিমা। সুনির্ম্মলা শান্তির উদ্দেশে এই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তক সেই মহান্ প্রভু পরব্রহ্ম। আমরা তাঁরই হস্ত হইতে অমৃত পান করিব, এই আমারদের লালসা।

হে পরমাত্মন! যাহাতে আমরা আমারদের পাপ-মলা প্রক্ষালন করিতে পারি, যাহাতে তোমার অমৃতময় প্রেম-সুধা পান করিতে পারি, যাহাতে সদ্ভাবে সাধুভাবে তোমার উপাসনা করিতে পারি, এই উদ্দেশে এখানে একটি ব্রাহ্ম-সমাজ গৃহ পত্তন করিতে আমরা সকলে উদ্যত হইয়াছি, তুমি তাহাতে তোমার প্রসাদ ও আশীর্ব্বাদ বিতরণ কর। হে দেব! আমারদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমারদের এই সাধু ইচ্ছা সম্পূর্ণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

উপাসনা কার্য্য শেষ হইলে প্রধান আচার্য্য মহাশয় স্বহস্তে কর্ণিক লইয়া ব্রাহ্ম-সমাজ-গৃহের ভিত্তি স্থাপন পূর্ব্বক তথায় এক খানি তাম্র ফলক সংস্থাপিত করিলেন।

বোয়ালিয়ার ব্রাহ্মগণ যে রূপ যত্ন-সহকারে ব্রাহ্মসমাজ-গৃহ নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, যে রূপ উৎসাহের সহিত গৃহারম্ভ ক্রিয়া সমাধা করিলেন, ব্রাহ্মধর্ম্মকে হৃদয়ে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ঈশ্বর তাঁহাদিগের সেই রূপ যত্ন, আগ্রহ ও উৎসাহ চিরস্থায়ী করুন। তাঁহারা পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপালনের নিমিত্ত কুসংস্কৃত প্রতিবেশবাসীদিগের অনেকবিধ উৎপীড়ন সহ্য করিয়াছেন, ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি সাধনের নিমিত্ত আপনাদের অনেক স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়াছেন এবং বিশুদ্ধ ব্রহ্মোপাসনা প্রচার করিবার নিমিত্ত আন্তরিক যত্ন করিতেছেন, সর্ব্বদর্শী ঈশ্বর তৎসমুদায় সার্থক করুন।

বোয়ালিয়া ব্রাহ্ম-সমাজ-মন্দিরের ভিত্তি-নিহিত তাম্র-ফলক।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজ মন্দির।

৯ই পৌষ ১৭৮৮ শক, সন ১২৭৩ সাল,

২৩ শে ডিসেম্বর ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দ। রবি বার।

Beauleah Brahmo Somaj-Hall,

Sunday, the 23rd December 1866.

বিজ্ঞাপন

আগামী ৩১ চৈত্র শুক্র বার রাত্রি ৮ আট ঘটিকার সময়ে বর্ষ শেষ উপলক্ষে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

আগামী ১ বৈশাখ শনি বার পূর্ব্বাহ্ণ ৮ আট ঘটিকার সময়ে নব বর্ষ উপলক্ষে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

আগামী ২ বৈশাখ রবি বার পূর্ব্বাহ্ণ ৭ সাত ঘটিকার সময়ে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

বর্ষ শেষ হওয়াতে যাঁহাদিগের অগ্রিম মূল্য নিঃশেষিত হইয়াছে, তাঁহারা আগামী বর্ষের নিমিত্ত অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

বিজ্ঞাপন।

যাঁহাদিগের নিকট পত্রিকার মূল্য দ্বাদশ মাস অনাদায় আছে, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া বৈশাখ মাসের মধ্যে উহা পরিশোধ করিবেন। নতুবা সমাজ জ্যৈষ্ঠ মাস অবধি তাঁহারদিগের নিকটে মাসুল দিয়া পত্রিকা প্রেরণে অসমর্থ হইবেন।

বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গলা অক্ষরে টীকা সহিত সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য চারি আনা। যাঁহারা অন্যূন ১০ টাকার এই পুস্তক নগদ মূল্যে ক্রয় করিবেন, তাঁহাদিগকে শতকরা ২৫ টাকা হিসাবে কমিশন দেওয়া যাইবে।

ভ্রম শোধন।

এই পত্রিকার ২৩৭ পৃষ্ঠার ১ স্তম্ভের ৩০ পংক্তিতে 'ক্রিয়ায়' এই পদের পরিবর্ত্তে 'ক্রিয়ার ন্যায়' এই দুইটি পদ হইবে।

কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের

১৭৮৮ শকের পৌষ, মাঘ এবং ফাল্গুন মাসের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	৩৩১
পুস্তকালয়	২৬৬৶১৫
যন্ত্রালয়	৩৫৬৷৶৫
ডাক মাসুল	৩৫৷৷১০
অনিরূপিত	১৷৶০
গচ্ছিত	২২৭৷৶০
	১২১৮৶১০

ব্যয়

মাসিক বেতন	২৯১
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	১৫০৷৶৫
পুস্তকালয়	৬৫৸৶০
যন্ত্রালয়	৩৬৮
ডাক মাসুল	৯২৷৶০
অনিরূপিত	২৮৸১০
আলোকের ব্যয়	৯৪৸১০
কাগজ পত্রাদি	৯৶০
গচ্ছিত	১৪৬৶৫
	১২৪৬৷৶১০

আয়	১২১৮৶১০
পূর্ব্বকার স্থিত	১৩৭৸৫
	১৩৫৫৸৶১৫
ব্যয়	১২৪৬৷৶১০
স্থিত	১০৯৷৷৫

শ্রী সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

১৭৮৮ শকের পৌষ, মাঘ এবং ফাল্গুন মাসের দানের বিবরণ।

আয়

প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দেব	১২
" মহানন্দ রায়	৮
শ্রীযুক্ত কাশীনাথ দে	৪
" হরনাথ ঠাকুর	২
" গোপালচন্দ্র পাল	২
" গোকুলকৃষ্ণ সিংহ... ..	২
" হলধর মল্লিক	২
" বেচারাম চট্টোপাধ্যায়	২
" রামমোহন দে	২
" লক্ষ্মীনারায়ণ বসু	১
" কিশোরীমোহন চক্রবর্ত্তী ..	১
" জগচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ..	১
" রাখালরাজ রায়	১
" যজ্ঞেশ্বর কুণ্ডু	১
" হরিদাস শ্রীমাণি	১
	৪২

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত কাশীনাথ দে	৬
" কাশীশ্বর মিত্র	১
" দানাধারে প্রাপ্ত	৭৷০
	৫৬৷০

ব্যয়

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার জন্য দান।

শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসুর আশ্বিন নাং মাঘ ৫ মাসের বেতন	৫০

আয়	৫৬৷০
পূর্ব্বকার স্থিত	১৩৪৷৷৶০
	১৯০৸৶০
ব্যয়	৫০
স্থিত	১৪০৸৶০

শ্রী সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

বৈশাখ ২৭৩ সংখ্যা।	পৃষ্ঠ
ঋগ্বেদ সংহিতা	১
মেদিনীপুরে গোপগিরিতে বসন্ত কালে ব্রহ্মোপাসনা	২
কলিকাতা মাসিক ব্রাহ্মসমাজ	৩
তত্ত্ববিদ্যা	৪
স্মৃতি শাস্ত্র	১০
বহুবিবাহ	১৫
নূতন পুস্তক	১৬
The Moral perfection of Jesus.	১৭

জ্যৈষ্ঠ ২৭৪ সংখ্যা।	
ঋগ্বেদসংহিতা	২৫
নব বর্ষের ব্রাহ্মসমাজ	২৬
মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	২৮
তত্ত্ববিদ্যা	৩১
সংস্কৃত সাহিত্য	৩৫
থিওডোর পার্কর	৩৮
পৌত্তলিকতা	৪১
Resurection of Jesus.	৪৩

আষাঢ় ২৭৫ সংখ্যা।	
ঋগ্বেদসংহিতা	৪৯
কলিকাতা মাসিক ব্রাহ্মসমাজ	৫০
কলিকাতা মাসিক ব্রাহ্মসমাজ	৫২
তত্ত্ববিদ্যা	৫৩
সংস্কৃত সাহিত্য	৫৭
থিওডোর পার্কর	৬১
পৃথিবী ও মনুষ্য	৬৫
আত্মোৎকর্ষ বিধান	৬৭
নূতন পুস্তক	৬৮
ব্রহ্মসাধন	৬৮
The Christian mythology.	৭০

শ্রাবণ ২৭৬ সংখ্যা।	
ঋগ্বেদসংহিতা	৭৩
কলিকাতা মাসিক ব্রাহ্মসমাজ	৭৫
ভবানীপুর চতুর্দ্দশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ	৭৫
তত্ত্ববিদ্যা	৮২
সংস্কৃত সাহিত্য	৮৭
নূতন পুস্তক .. .. .. :	৯১
ব্রহ্মসাধন	৯২
Mission of the apostle.	৯৩

ভাদ্র ২৭৭ সংখ্যা।	
ঋগেদসংহিতা	৯৭
কলিকাতা মাসিক ব্রাহ্মসমাজ	৯৯
ব্রহ্মবিদ্যালয়	১০১
তত্ত্ববিদ্যা	১০৪
ধর্ম্মের আদর্শ	১১৩
থিওডোর পার্কর	১১৩
নূতন পুস্তক	১১৭
From the Englishman.	১১৭

আশ্বিন ২৭৮ সংখ্যা।	
ঋগ্বেদসংহিতা	১২১
কলিকাতা মাসিক ব্রাহ্মসমাজ ..	১২২
ব্রহ্মবিদ্যালয়	১২৩
তত্ত্ববিদ্যা	১২৭
সাধারণ আদর্শ	১৩৫
হরদেব চট্টোপাধ্যায়ের পরলোক প্রাপ্তি	১৩৮
From the National Paper.	১৪২

কার্ত্তিক ২৭৯ সংখ্যা।	পৃষ্ঠ
ঋগ্বেদসংহিতা	১৪৫
শরচ্চন্দ্রালোকে ব্রহ্মোপাসনা	১৪৬
থিওডোর পার্কর	১৪৭
আত্মোৎ কর্ষ বিধান	১৫০
সংস্কৃত সাহিত্য	১৫৫
এক জন ব্রহ্মবাদিনীর উক্তি ..	১৫৬
From the National Paper.	১৫৭

অগ্রহায়ণ ২৮০ সংখ্যা।	
ঋগ্বেদসংহিতা	১৬১
ব্রাহ্মধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার	১৬২
থিওডোর পার্কর	১৬৪
বিজ্ঞান	১৬৭
সংস্কৃত সাহিত্য	১৭১
পৃথিবী ও মনুষ্য	১৭৫
প্রেরিত পত্রের উত্তর	১৭৭
নূতন পুস্তক	১৭৯
ব্রহ্মসাধন	১৭৯

পৌষ ২৮১ সংখ্যা।	
ঋগ্বেদসংহিতা	১৮১
সিন্দুরীয়াপটী ব্রাহ্ম সমাজ	১৮৩
থিওডোর পার্কর	১৮৫
সংস্কৃত সাহিত্য	১৮৯
বিজ্ঞান	১৯৩
ব্রহ্মসাধন	১৯৭
The abnormal phinomina of the Human mind.	১৯৮

মাঘ ২৮২ সংখ্যা।	
ঋগ্বেদসংহিতা	২০১
উদ্দীপন	২০৩
থিওডোর পার্কর	২০৫
সংস্কৃতসাহিত্য	২০৯
বিজ্ঞান	২১১
গণেশপুরাণ ও বৌদ্ধধর্ম্ম	২১৩

ফাল্গুন ২৮৩ সংখ্যা।	
ঋগ্বেদসংহিতা	২১৭
সপ্তত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ ..	২১৯
থিওডোর পার্কর	২৩১

চৈত্র ২৮৪ সংখ্যা।	
ঋগ্বেদসংহিতা	২৩৩
কলিকাতা মাসিক ব্রাহ্মসমাজ ..	২৩৪
ব্রহ্মবিদ্যালয়	২৩৬
থিওডোর পার্কর	২৩৮
সংস্কৃতসাহিত্য	২৪১
তত্ত্ববিদ্যা—ভোগকাণ্ড	২৪৫
বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজ	২৪৯

	সংখ্যা	পৃষ্ঠ
আত্মোৎকর্ষ বিধান	২৭৫ ..	৬৭
আত্মোৎকর্ষ বিধান	২৮৯ ..	১৫০
উদ্দীপন	২৮২ ..	২০৩
ঋগ্বেদ সংহিতা	২৭৩ ..	১
ঋগ্বেদ সংহিতা	২৭৪ ..	২৫
ঋগ্বেদ সংহিতা	২৭৫ .	৪৯
ঋগ্বেদ সংহিতা	২৭৬ ...	৭৩
ঋগ্বেদ সংহিতা	২৭৭ ..	৯৭
ঋগ্বেদ সংহিতা	২৭৮ ..	১২১
ঋগ্বেদ সংহিতা	২৭৯ ..	১৪৫
ঋগ্বেদ সংহিতা	২৮০ ..	১৬১
ঋগ্বেদ সংহিতা	২৮১ ..	১৮১
ঋগ্বেদ সংহিতা	২৮২ ..	২০১
ঋগ্বেদ সংহিতা	২৮৩ ...	২১৭
ঋগ্বেদ সংহিতা	২৮৪ ...	২৩৩
এক জন ব্রহ্মবাদিনীর উক্তি ..	২৭৯ ..	১৫৬
কলিকাতা মাসিক ব্রাহ্মসমাজ ..	২৭৩ ...	৩
কলিকাতা মাসিক ব্রাহ্মসমাজ ..	২৭৫ ..	৫০
কলিকাতা মাসিক ব্রাহ্মসমাজ ..	২৭৫ ..	৫২
কলিকাতা মাসিক ব্রাহ্মসমাজ ..	২৭৬ ...	৭৫
কলিকাতা মাসিক ব্রাহ্মসমাজ ..	২৭৭ ..	৯৯
কলিকাতা মাসিক ব্রাহ্মসমাজ ..	২৭৮ ..	১২২
কলিকাতা মাসিক ব্রাহ্মসমাজ ..	২৮৪ ..	২৩৪
গণেশ পুরাণ ও বৌদ্ধধর্ম্ম ..	২৮২ .	২১৩
তত্ত্ববিদ্যা	২৭৩ ..	৪
তত্ত্ববিদ্যা	২৭৪ ..	৩১
তত্ত্ববিদ্যা	২৭৫ ..	৫৩
তত্ত্ববিদ্যা	২৭৬ ..	৮২
তত্ত্ববিদ্যা	২৭৭ ..	১০৪
তত্ত্ববিদ্যা	২৭৮ ..	১২৭
তত্ত্ববিদ্যা—ভোগকাণ্ড	২৮৪ ..	২৪৫
থিওডোর পার্কর	২৭৪ ...	৩৮
থিওডোর পার্কর	১৭৫ ..	৬১
থিওডোর পার্কর	২৭৭ ..	১১০
থিওডোর পার্কর	২৭৯ ..	১৪৭
থিওডোর পার্কর	২৮০ ..	১৬৪
থিওডোর পার্কর	২৮১ ..	১৮৫
থিওডোর পার্কর	২৮২ ..	২০৫
থিওডোর পার্কর .. .	২৮৩ ..	২৩১
থিওডোর পার্কর	২৮৪ ..	২৩৮
ধর্ম্মের আদর্শ	২৭৭ ..	১১৩
নব বর্ষের ব্রাহ্মসমাজ	২৭৪ ..	২৬
নূতন পুস্তক	২৭৩ ..	১৬
নূতন পুস্তক	২৭৫ ..	৬৮
নূতন পুস্তক	২৭৬ ..	৯১
নূতন পুস্তক	২৭৭ ..	১২৭

	সংখ্যা	পৃষ্ঠ
নূতন পুস্তক	২৮০ ..	১৭৯
পৌত্তলিকতা	২৭৪ ..	৪১
পৃথিবী ও মনুষ্য	২৭৫ ..	৬৫
পৃথিবী ও মনুষ্য	২৮০ ...	১৭৫
প্রেরিত পত্রের উত্তর	২৮০ ..	১৭৭
ব্রহ্মসাধন	২৭৫ ..	৬৮
ব্রহ্মসাধন	২৭৬ ..	৯২
ব্রহ্মসাধন	২৮০ ..	১৭৯
ব্রহ্মসাধন	২৮১ .	১৯৭
ব্রহ্মবিদ্যালয়	২৭৭ ..	১০১
ব্রহ্মবিদ্যালয়	২৭৮ ..	১২৩
ব্রহ্মবিদ্যালয়	২ ৪ ..	২৩৬
ব্রাহ্মধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার ..	২৮০ ..	১৬২
ভবানীপুর চতুর্দ্দশ সাম্বৎসরিক— ব্রাহ্মসমাজ	২৭৬ ..	৭৫
মেদিনীপুরে গোপগিরিতে বসন্ত কালে ব্রহ্মোপাসনা ..	২৭৩ ..	২
মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	২৭৪ ..	২৮
বহুবিবাহ	২৭৩ ..	১৫
বিজ্ঞান	২৮০ ..	১৬৭
বিজ্ঞান	২৮১ ..	১৯৩
বিজ্ঞান	২৮২ ..	২১১
বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজ	২৮৪ ..	২৪৯
শরচ্চন্দ্রালোকে ব্রহ্মোপাসনা ..	২৭৯ ..	১৪৬
সংস্কৃত সাহিত্য	২৭৪ ..	৩৫
সংস্কৃত সাহিত্য	২৭৫ ..	৫৭
সংস্কৃত সাহিত্য	২৭৬ ..	৮৭
সাধারণ আদর্শ	২৭৮ ..	১৩৫
সংস্কৃত সাহিত্য	২৭৯ ..	১৫৫
সংস্কৃত সাহিত্য	২৮০ ..	১৭১
সংস্কৃত সাহিত্য	২৮১ ..	১৮৯
সংস্কৃত সাহিত্য	২৮২ ..	২০৯
সংস্কৃত সাহিত্য	২৮৪ ..	২৪১
সপ্তত্রিংশ সাম্বৎসরিক— ব্রাহ্মসমাজ	২৮৩ ..	২১৯
হরদেব চট্টোপাধ্যায়ের— পরলোক প্রাপ্তি	২৭৮ ..	১৩৮
From the Englishman.	২৭৭ ...	১১৭
From the National Paper. ...	২৭৮ ..	১৪২
From the National Paper. ...	২৭৯ ...	১৫৭
Misson of the apostle.	২৭৬ ...	৯৩
Resurection of Jesus.	২৭৪ ...	৪৩
The Moral perfection of Jesus.	২৭৩ ...	১৭
The Christian mythology.	২৭৫ ...	৭০
The abnormal phinomina of the Human mind.	২৮১ ...	১৯৮

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাসুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২৪। কলিগতাব্দ ৪৯৭৭। ২৪ চৈত্র শুক্র বার।